বিপিনচন্দ্র পাল

জীবন, সাহিত্য ও সাধনা

ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী

এম. এ., পি-এইচ. ডি., কাব্যতীর্থ, সাহিত্যতীর্থ।

প্রথম প্রকাশ :

জন্মাষ্টমী, ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৭৩

প্রকাশনায় : চলন্তিকা প্রকাশক, ৪, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রণে : শ্রীরতিকান্ত ঘোষ, দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওআর্কস্
২০৯ এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পনের দিন বয়সে যাঁকে হারিয়েছি
এবং তারপর থেকে
অর্ধশতাব্দীকালযাবৎ যাঁর অস্তিত্বের উত্তরাধিকার
বহন করে চলেছি,
সেই আমার স্বর্গত পিতৃদেব

পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

স্মরণে

বাংলার সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসে বিপিনচন্দ্র পা একটি বিস্মৃত এবং উপেক্ষিত চরিত্র। অথচ তাঁহার চরিত্রের নানাদিকে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর মনীষার ক্ষেত্রে খুব সহজলভ নয়। বিপিনচন্দ্র পাল কেবলমাত্র একটি ব্যক্তি নহেন। তিনি তাঁহার শিক্ষ এবং সাধনার ভিতর দিয়া বাংলাদেশের একটি যুগের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন শুধু তাহাই নহে তিনি তাঁহার প্রগতিশীল চিন্তাধারার জন্য পরবর্তী যুগের সঙ্গেও যোগ রক্ষা করিয়াছেন।

সাধারণতঃ বিপিনচন্দ্র পালকে বাংলার নবজাগরণের যুগের একজন প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই বিষয়ে এই সম্পর্কিত অন্যান্য মনীষীদের সঙ্গে তাঁহার একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। তিনি সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই নবজাগরণকে কোনও প্রকার ভাবসর্বস্ব ধারণা সৃষ্টি করিবার পরিবর্তে ইহাকে প্রত্যক্ষ সমাজের নানা সমস্যার ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই তথাকথিত জাতীয় নবজাগরণ সেদিন প্রধানতঃ সাহিত্যাশ্রয়ী ছিল। সেইজন্য সমাজ এবং জীবনের মধ্যে তাহার প্রভাব শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই। যদিও একথা সত্য যে সেদিন শিক্ষা-বিস্তারের মধ্য দিয়া সমাজের চিন্তাধারায় পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল তথাপি সেই অনুযায়ী সমাজ যথাযথভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ধর্ম সমাজে সেদিন একটি বড় সমস্যা ছিল। সেই সমস্যা হিন্দু সমাজের ভিতর হইতে অনেকেই সমাধান করিতে সক্ষম না হইয়া নতুন ধর্মসম্প্রদায়ের পরিকল্পনার মধ্যে তাহার সমাধান কল্পনা করিয়াছিলেন। একথা সত্য, মুষ্টিমেয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহার দ্বারা হিন্দু সমাজের কোন সমস্যারই সমাধান হয় নাই। অথচ একথাও সত্য, সমগ্র হিন্দুসমাজকে সেদিন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং সেদিন জাতীয় পুনর্জাগরণের জন্য যাহা প্রয়োজন ছিল তাহা হিন্দুসমাজ হইতে বিছিন্ন হইয়া গিয়া স্বতন্ত্র কোন ধর্ম সম্প্রদায় সংগঠন নহে, বরং সামগ্রিকভাবে

হিন্দুসমাজের ভিতর হইতেই তাহার সমাধান প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য যদিও বিপিনচন্দ্র পাল ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন তথাপি সামগ্রিকভাবে সমাজের শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে সেদিন পাশ্চাত্য শিক্ষা লইয়া যেমন বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছিল বিপিনচন্দ্র পাল তাহার মধ্যে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন নাই। শিক্ষার যে একটা জাতীয় রূপ আছে এবং তাহার দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় জীবনে দেশাত্মবোধের উন্মেষ হইতে পারে, নিরবচ্ছিন্ন পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা তাহা সম্ভব নহে সেকথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেইজন্য প্রথম হইতেই তিনি শিক্ষার ভিতর দিয়া "জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং জাতীয় ধারায় সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থা সংগঠনে" উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়, বিপিনচন্দ্র পাল তাহার শিক্ষার আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একথা সেদিন বিশ্বাস করিতেন যে বিদেশী ভাষা কখনই জাতীয় শিক্ষার মাধ্যম হইতে পারে না। মাতৃভাষাই জাতীয় শিক্ষার বাহন। যদিও একথা সত্য যে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার প্রয়াস ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষী-দিগের মধ্যে দেখা গিয়াছিল তথাপি বিপিনচন্দ্র পালের সর্বপ্রকার ভাববিলাসিতা-বিবর্জিত যুক্তিবাদী মন যখন এই সত্যকেই গ্রহণ করিল তখন এই যুক্তি আরও গুরুত্ব লাভ করিল।

শিক্ষা সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পালের আর এক দিকে দৃষ্টি ছিল তাহা সেযুগে আর কাহারও ছিল না। তিনি মনে করিতেন কোনও জ্ঞানই বিশেষ কোন দেশে কিংবা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। তিনি গভীরভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন জ্ঞান মাত্রই ঈশ্বর প্রদত্ত। সেইজন্য ইহা দেশ-কাল নিরপেক্ষ। সুতরাং আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শন কিংবা কলাবিদ্যা বলিয়া যাহা মনে করি, তাহা কেবলমাত্র পাশ্চাত্য নহে তাহা আমাদেরও নিজস্ব। প্রত্যেক মানুষেরই তাহাতে সমানাধিকার আছে। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার এই বিমুক্ত উদার দৃষ্টি সেদিনকার শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল সংকীর্ণতার অবসান ঘটাইতে পারিত। কিন্তু আমাদের রক্ষণশীল সমাজ কিছুতেই উদার দৃষ্টি লইয়া এই বিশ্বজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাহার ফলে

বিপিনচন্দ্র পালের শিক্ষাসম্পর্কিত এই উদার বিশ্বাস যথাযথ মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই।

বিপিনচন্দ্র পাল সেদিন জাতিগঠনের জন্য যে সমস্ত উপদেশ এবং পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা যদি কার্যকর হইত তবে বর্তমানে শিক্ষা যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার অধিকাংশেরই কোনো অস্তিত্ব থাকিত না। তিনি গোড়া হইতেই আমাদের দেশে 'বিলাতী ছাঁচে' শিক্ষা প্রবর্তনের বিরোধী ছিলেন। আমাদের জনসমাজ যেভাবে গঠিত হইয়াছে পাশ্চাত্য দেশে তেমনভাবে হয় নাই। পাশ্চাত্যে বর্ণ পরিচয় লাভ না করিলে শিক্ষিত হইতে পারেনা। কিন্তু আমাদের দেশে নিরক্ষরেরাও বহুল পরিমাণে শিক্ষিত। লোকশিক্ষার যে ঐতিহ্য এই দেশে প্রচলিত আছে যাহার ফলে নিরক্ষরও অতি সহজে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারে পাশ্চাত্য সমাজে তাহা নাই। সুতরাং আমাদের শিক্ষার আদর্শ কিছুতেই পাশ্চাত্যের অনুকারী হওয়া সঙ্গত হয় না। শিক্ষা বিষয়ে এই গূঢ় সত্যটিও সেদিন আমাদের শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে কেহ যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

আগেই বলিয়াছি, বিপিনচন্দ্র পালের ঈশ্বরের প্রতি সুগভীর ভক্তি এবং বিশ্বাস ছিল, ইহার দ্বারাই তাঁহার ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। যদিও তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি কোনদিন বিদ্রূপ প্রকাশ করেন নাই কিংবা ব্রাহ্মধর্মের পক্ষ লইয়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কোনদিন প্রচারে যোগ দেন নাই। তিনি হিন্দুধর্মের আচারেও বিশ্বাসী ছিলেন; এমন কি, ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও পিতার মৃত্যুর পর হিন্দুর আচার অনুযায়ীই একমাস অশৌচ পালন করিয়াছিলেন এবং মাসান্তে তিনি হিন্দু প্রথা অনুযায়ী পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র পিতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাই যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নহে তাঁহার নিজস্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যের প্রতি সুগভীর আস্থা এবং বিশ্বাসও প্রকাশ পাইয়াছে। এখানেই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

বিপিনচন্দ্রের মত সে যুগে এত বহুমুখী কর্মধারা আর কাহারও ছিল না। সাংবাদিকতা এবং রাজনীতিও তাঁহার কর্ম এবং সাধনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাংবাদিকতার সূত্রে সেই যুগেই তিনি একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন যাহা তাঁহার নিজস্ব আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ এবং পরাধীন জাতির পক্ষে অত্যন্ত

বিস্ময়কর ছিল। অন্ধ হৃদয়াবেগ দ্বারা তিনি জীবনে কোনদিন চালিত হন নাই। চিন্তায়, কর্মে, ধ্যানে, ধারণায়, প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসে তিনি ঐতিহ্যানুসারী ছিলেন। এইখানেই তাঁহার চরিত্রের মধ্যে একটু জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ নিতান্ত সহজভাবেই তাঁহার কর্ম এবং সাধনার পথে তিনি অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে যে দূরদর্শিতার পরিচয় ছিল তাহাও সেই যুগে আর কাহারও ছিল না; সেইজন্য তিনি শেষ জীবনে কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত না থাকিয়া নির্ভীকভাবে স্বাধীন মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

একথা সকলেই জানেন যে বিপিনচন্দ্র পালের আর একটি প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র ছিল, তাহা তাঁহার বাগ্মীতা। কিন্তু সেযুগে অন্যান্য মনীষীদের মধ্যে এই গুণের যে পরিচয় পাওয়া যায় বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে তাহার পার্থক্য ছিল। বাগ্মীতার ক্ষেত্রে হৃদয়াবেগ একটি প্রধান সহচর হইয়া থাকে। সেই যুগেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল না। সমাজ সংস্কারই হউক, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রাজনৈতিক বিষয়ই হউক, সর্বত্রই হৃদয়াবেগের দ্বারা যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের বাগ্মীতার প্রধান গুণই ছিল তিনি তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য কেবলমাত্র যুক্তির জাল বিস্তার করিতেন। তাঁহার সেই ধারা পরবর্তীকালেও খুব অল্পলোকই অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন।

বিপিনচন্দ্র পাল বিপুল কর্মশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বহির্মুখী কর্মেরও অন্ত ছিল না। সেইজন্য তিনি হয়ত বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু নানা সূত্র ধরিয়া সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব যে কতভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা আজ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইব না সত্য, তথাপি তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে বিপিনচন্দ্র পাল একটি বিস্মৃত এবং অবহেলিত চরিত্র।

অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, কলিকাতা বঙ্গবাসী ইভ্নিং কলেজের বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত শিবদাস চক্রবর্তী মহাশয় বিপিনচন্দ্র পালের জীবন, সাহিত্য এবং সাধনা সম্পর্কে গবেষণার কার্যে ব্রতী হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র দাখিল করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে গতানুগতিক পথ সহজ পথ হইলেও নিষ্ফল; কিন্তু দুর্গম

পথ কঠিন হইলেও পরিণামে ফলপ্রসূ। তাই তিনি গবেষণার উচ্চফল লাভ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন, যে দুর্গম এবং দুর্লভ ক্ষেত্র হইতে তথ্য সন্ধান করিয়াছেন তাহা একটি অবহেলিত মনীষীর জীবনের পুনরুদ্ধারে পরম সহায়ক হইয়াছে। আমরা বিপিনচন্দ্র পালকে যদি ভুলিয়া যাইতাম তবে জাতি হিসাবে আমাদের যে পাপ হইত তাহা হইতে তিনি আমাদের উদ্ধার করিয়াছেন। বিপিনচন্দ্র পালের জীবনের তথ্য দেশে এবং বিদেশে, বাংলাভাষায় এবং ইংরেজী ভাষায়, সংবাদপত্রে এবং সাহিত্যে যেভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহা হইতে তাহা সুশৃঙ্খল করিয়া প্রকাশ করা দুরূহ কাজ ছিল। লেখক তাঁহার অধ্যবসায়গুণে এই দুরূহ কাজকে সহজ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আধুনিক বাঙ্গালী পাঠক বাঙ্গালার এক বিস্মৃত মনীষার সঙ্গে পরিচয় লাভ করিবেন; সেইজন্য লেখক বাঙ্গালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
বিভাগীয় প্রধান

তাঁর অনর্গল লেখনী। ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রায় চল্লিশ বছর আগে কটক ভাষণে তিনিই প্রথম পরশাসনমুক্ত ভাবী স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের সম্ভাব্য বাস্তব রূপরেখা জাতির সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন।

ভারত আজ পরশাসনমুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। যাঁদের চিন্তাধারা এবং কর্ম-প্রয়াস এই মুক্তির মূলে, তাঁরা সকলেই কৃতজ্ঞ জাতির নমস্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিপিনচন্দ্র পাল আজ একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম। প্রবীণদের স্মৃতির মধ্যে তিনি কিছু পরিমাণে জীবিত থাকলেও নবীনদের স্মৃতিতে তাঁর উপস্থিতি একান্তভাবে অনুজ্জ্বল। জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস এবং জাতীয় নেতাদের জীবনেতিহাসের যথোপযুক্ত প্রচারের অভাব ছাড়া এর অন্য কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না।

বিপিনচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনার এক বছর পরে—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এবং তাঁর তিরোভাব হয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। এই কাল-পরিধিকে অঙ্গীকার করে নিয়ে আমি যেমন একদিকে বিপিনচন্দ্রকে সমগ্র আলোচনার মধ্যমণিরূপে দাঁড় করিয়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি রূপরেখা অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছি, অন্যদিকে তেমনি বিচিত্র মনীষার অধিকারী বিপিনচন্দ্রের একটি পূর্ণ ভাব-মূর্তি উপহার দিতে সচেষ্ট হয়েছি।

বিপিনচন্দ্র ছিলেন অন্তরতম সত্তায় চিন্তানায়ক। যে চিন্তার কায়িক মূর্তি অভিব্যক্ত হয় কর্মে এবং তত্ত্ব-রচনায়, সেই চিন্তাই ছিল তাঁর স্বরূপধর্ম। চিন্তামাত্রেই অবশ্য গ্রহণ-বর্জনের জন্য ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং বিচারের অপেক্ষা রাখে। বিপিনচন্দ্র তাঁর জীবদ্দশায় জাতির সামনে এমন কতকগুলি চিন্তা তত্ত্বের আকারে উপস্থাপিত করেছিলেন, যেগুলি সে সময় বিশেষ বিতর্কের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। সমসাময়িক কাল তাঁর চিন্তার অনেক অংশকেই প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যাখ্যান করলেও পরোক্ষে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

বিপিনচন্দ্রের চিন্তাধারা ব্যাপকক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছিল। রাজনীতি এবং তার আনুষঙ্গিক অর্থনীতি ছাড়াও সাহিত্যনীতি সম্পর্কেও তিনি যে সমস্ত অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, তা' সমসাময়িক কালের বিদগ্ধ সাহিত্যপাঠক এবং সাহিত্য-রসিকদের তো বটেই, পরবর্তীকালের সাহিত্য বিচারকদেরও অনিবার্য-ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অথচ এই অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এযাবৎ যে সামান্য

আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট পরিচয়টি পরিস্ফুট হয়নি। এযাবৎ যাঁরা বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে কিছুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, তাঁরা এই বিরাট ও বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের জীবন ও চিন্তাধারার একাংশে ত্বরিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। ফলে সাংবাদিক, রাষ্ট্রনীতিবিদ্, দেশনায়ক, দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং সাহিত্যসমালোচকরূপে তাঁর পূর্ণ পরিচয় আজও দেশবাসীর কাছে অপরিজ্ঞাত রয়ে গেছে। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যেই বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গবেষণায় আমার আত্মনিয়োগ।

আমার গবেষণা-পরিকল্পনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করছি। বিপিনচন্দ্রের যখন আবির্ভাব ঘটে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের পত্তনের পর তখন এক শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই শতাব্দীকালের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য এবং রাজনীতি ও অর্থনীতি-চিন্তায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, বিপিনচন্দ্রের আবির্ভাবের পটভূমি প্রদর্শনের জন্য তার একটি রূপরেখা 'আদি কথা' নামে মূল গবেষণার প্রারম্ভিক অংশরূপে সংযোজিত করেছি। কারণ, যুগস্রষ্টারা যুগেরই সৃষ্টি।

মূল গ্রন্থ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে মুখ্যত তাঁর স্ব-লিখিত জীবনী (বাংলা এবং ইংরেজী) এবং মার্কিন ভ্রমণকাহিনী অবলম্বন করে দেশনায়করূপে তাঁর প্রকাশ্য আবির্ভাবের প্রস্তুতি পর্বের ইতিবৃত্তটি বিশ্লেষণ-মূলকভাবে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সাংবাদিক এবং দেশনায়করূপে বিপিনচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট করে তাঁর 'রাষ্ট্র-চিন্তা'র একটি সুসংবদ্ধ রূপরেখা সংযোজিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়টি আয়তনে অন্যান্য অধ্যায়গুলি অপেক্ষা বড়ো। এই অধ্যায়ে বিপিনচন্দ্রের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের এযাবৎ-অনালোকিত একটি দিকের উপর পর্যাপ্ত আলোকপাতের চেষ্টা করেছি। সে দিকটি হচ্ছে তাঁর সাহিত্য-সাধনার দিক। নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি কোনোদিনই সাহিত্য-সাধনায় রত থাকতে পারেননি। কারণ, তিনি ছিলেন স্বদেশচর্যায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তবু স্বদেশচর্যার অবসরে তিনি যে সমস্ত আলোচনা ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং পরিমাণে স্বল্প হলেও যে রস-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার প্রভা

বিকীর্ণ হয়েছে। এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ তাঁর নিজের রচনাবলীর উপর নির্ভর করেছি এবং আলোচনামুখে তাঁর রচনা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে উদ্ধৃতি দিয়েছি। কারণ, তাঁর অধিকাংশ রচনাই এখনও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে স্বদেশী এবং বিদেশী বহু বিদগ্ধ ব্যক্তির উক্তি ও মন্তব্য এবং বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্রের নিজের উক্তি ও মন্তব্যের আলোকে যুগপুরুষরূপে তাঁর একটি ভাব-মূর্তি অঙ্কনের চেষ্টা করেছি।

বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ পাঠক-পাঠিকা যাতে কেবলমাত্র বাংলা ভাষাজ্ঞানের সাহায্যেই পাঠ করতে পারেন, সেইজন্য গ্রন্থের মধ্যে ইংরেজী উদ্ধৃতি বর্জন করেছি। যে সমস্ত ইংরেজী গ্রন্থ এবং অন্যান্য ইংরেজী রচনা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েছে, সেগুলির বাংলা অনুবাদ ঊর্ধ্ব-কমার মধ্যে রেখে গ্রন্থে পরিবেশন করেছি এবং সংশ্লিষ্ট মূল ইংরেজী গ্রন্থ বা রচনা থেকে উদ্ধৃতি অথবা উদ্ধৃতির সূত্র গ্রন্থকার বা রচয়িতার নাম, প্রকাশকাল ইত্যাদি সহ প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে 'সূত্র-নির্দেশ'-অংশে উল্লিখিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা প্রয়োজনবোধে সেগুলি দেখতে পারবেন।

গ্রন্থের মধ্যে নানাস্থানে 'বাংলা দেশ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই কথাটি ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পূর্ববর্তী অখণ্ড বঙ্গভূমি অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এই গ্রন্থ রচনার সময় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বর্তমান 'বাংলাদেশ'-এর অভ্যুদয় ঘটেনি।

আমার গবেষণা-কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী। কাজ করতে করতে যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই তাঁর কাছে অসঙ্কোচে উপস্থিত হয়েছি। তিনি সমস্ত কথা শুনে যথোচিত নির্দেশ ও উপদেশ দান করে আমার সমস্যার সহজ সমাধান করে দিয়েছেন। গবেষণার সময় তাঁর আশীর্বাদ ছিল আমার কাছে একটি বড়ো সম্বল। গ্রন্থপ্রকাশের এই আনন্দময় মুহূর্তে সর্বাগ্রে তাঁকেই কৃতজ্ঞচিত্তের প্রণাম নিবেদন করি। আমার গবেষণা-পত্রের আর দু'জন পরীক্ষক ছিলেন ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল এবং ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়। এই সুযোগে তাঁদেরকেও আমি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথানুযায়ী আমার মৌখিক পরীক্ষার (*viva voce*) পরীক্ষক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক (বর্তমানে ইউ. জি. সি অধ্যাপক এবং ললিতকলা ও সঙ্গীত বিভাগের ডীন)

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পরীক্ষার পর তিনি সহৃদয় মন্তব্যের মাধ্যমে যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন সে-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে তাঁকেও আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারে আমি নানা গ্রন্থাগার এবং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ঋণী। তার মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, 'মিলন-মন্দির'-এর গ্রন্থাগার এবং চৈতন্য লাইবেরীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাছেই আমার ঋণের পরিমাণ সর্বাধিক। কারণ, তদানীন্তন কর্মাধ্যক্ষ এবং কর্মীদের সহৃদয় সহযোগিতায় পরিষদ-মন্দিরের পাঠ-কক্ষে বসে আমি অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এবং নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের রচনাবলী পড়বার সুযোগ লাভ করেছিলাম। এই সুযোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার এবং চৈতন্য লাইব্রেরীর তদানীন্তন কর্মাধ্যক্ষ ও কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই ব্যাপারে ব্যক্তিহিসাবে একজনের কাছে আমার ঋণ অপরিমেয়। তিনি হচ্ছেন মনীষী বিপিনচন্দ্রের মধ্যম পুত্র শ্রদ্ধেয় জ্ঞানাঞ্জন পাল, যিনি তাঁর অনাড়ম্বর সংগ্রহ-শালায় তাঁর পূজ্যপাদ পিতৃদেবের অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অমূল্য রত্নজ্ঞানে কৃপণের মতো বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে চলেছেন। সেই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পাঠের সুযোগ দেওয়া ছাড়াও তিনি গবেষণার শুরু থেকে গ্রন্থপ্রকাশ পর্যন্ত যেভাবে সস্নেহ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে রেখেছেন, শুধু মৌখিক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন তার যথোপযুক্ত স্বীকৃতির পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তিনি আমার প্রণম্য।

বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে অনেক তথ্য পুরানো সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'জনের কাছ থেকে আমি অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ করেছি। একজন হচ্ছেন যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক কবি দক্ষিণারঞ্জন বসু এবং অপরজন হলেন আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক সুলেখক শ্রীযুক্ত অমিতাভ চৌধুরী। দক্ষিণাদার দাক্ষিণ্যে যেমন অমৃতবাজার পত্রিকার কিছু পুরানো ফাইল দেখবার সুযোগ পেয়েছি, শ্রীযুক্ত চৌধুরীর সহৃদয়তায় তেমনি আনন্দবাজার পত্রিকা এবং হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের পুরানো ফাইল দেখবার সুযোগ লাভ ঘটেছে। এই সুযোগে সে কথা স্মরণ করে দু'জনকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্বদেশীযুগের প্রামাণ্য পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্ভবতঃ এখনো রচিত হয়নি। তবু ঐতিহাসিক-দম্পতি অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে একাধিক গ্রন্থে এ যুগের ঘটনাবলী এবং স্বরূপ-লক্ষণের উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করেছেন। স্বদেশী যুগের ইতিবৃত্ত রচনায় আমি এঁদের গ্রন্থাবলী থেকে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করেছি এবং দু'একবার এঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেও লাভবান হয়েছি। সে কথা অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করে এঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বিপিনচন্দ্র-রচিত প্রবন্ধাবলীর একটা বড়ো অংশ অধিকার করে আছে 'জীবনী সাহিত্য'। বিপিনচন্দ্রের জীবনী-সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ) গবেষণা-গ্রন্থ 'বাংলা চরিত সাহিত্য' আমার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। তা' ছাড়া নানা সময়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেও উপকৃত হয়েছি। ডক্টর ভট্টাচার্যকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

ব্যক্তিগতভাবে স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ অনেকের কাছ থেকে অনেক প্রকার সাহায্য পেয়েছি, যা' অবশ্যস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণ করি আমার দীর্ঘকালের অকৃত্রিম সুহৃদ অনুজপ্রতিম অধ্যাপক (বর্তমানে অধ্যক্ষ) ডক্টর জিতেন্দ্রকুমার ঘোষের কথা। প্রয়োজনীয় উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা যখন আমার পরিকল্পনা রূপায়নের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল তখন তিনি পাশে থেকে ভরসা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে আমাকে সঙ্কল্পে স্থির রেখেছিলেন। তারপর থেকে গবেষণা-পত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমাকে নানাভাবে নানা সময়ে সাহায্য করেছেন, যা' তিনি জানেন আর আমি জানি। তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের অবকাশ কম। অনুরাগরঞ্জিত প্রীতির মধ্যে সে-কথা আমার মনে স্মরণীয় হয়ে থাক্।

ডক্টর ঘোষের পর যাঁকে আমি আমার কাজের সবচেয়ে কাছাকাছি পেয়েছি, তিনি হচ্ছেন আমার পরমস্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান্ মানবশঙ্কর ঘোষ, এম্.এ.। প্রয়োজন মতো স্মরণ করলেই আন্তরিকতার সঙ্গে সাড়া দিয়ে তিনি যেভাবে সম্পর্কোচিত কর্তব্য পালন করেছেন, তার দৃষ্টান্ত একালে বিরল। এই গ্রন্থের 'নির্দেশিকা'-অংশটি বহু যত্নে তিনিই প্রস্তুত করে দিয়েছেন। তাঁর ক্ষেত্রেও

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নেই। আমি গভীর স্নেহে তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

কাজের কাছাকাছি না থাকতে পারলেও মনের কাছাকাছি থেকে যাঁরা আশা দিয়ে, ভরসা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, উপদেশ দিয়ে কিংবা সাধ্যমতো বই সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে সার্থকতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁদের কাছেও আমার ঋণের পরিমাণ কম নয়। তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় আচার্য ত্রিপুরা-শঙ্কর সেন, অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগী, অধ্যাপক ভোলানাথ হালদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ রায়, শ্রীযুক্ত দ্বারেশ চন্দ্র শর্মাচার্য, শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত জীবানন্দ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত দিব্যেন্দুসুন্দর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রণজিৎ কুমার সেন এবং প্রীতিভাজন সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সরল চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক রমেন্দ্র নারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ গুপ্তর কথা বিশেষ-ভাবে স্মরণ করি। এঁরা সকলেই আমার শুভানুধ্যায়ী। যথাযোগ্যস্থানে আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করি।

গবেষণায় আমার সিদ্ধিলাভের সংবাদে সেদিন যাঁরা অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে অকপট আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন এবং এখন গ্রন্থপ্রকাশের সংবাদে সমান-ভাবে আনন্দিত, তাঁদের মধ্যে দু'জনের কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এঁরা দু'জনেই আমার শ্রদ্ধেয় এবং দু'জনেই আমার দীর্ঘকালের শুভৈষী। একজন হচ্ছেন অধ্যক্ষ কবি জগদীশ ভট্টাচার্য এবং অপরজন বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান এবং কলা বিভাগের ডীন, বিদ্যাসাগর-অধ্যাপক ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ। এঁদেরকেও আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করি। এই প্রসঙ্গে আর একজন শুভৈষীর কথা অশ্রুসজল চোখে স্মরণ করছি যিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। এই গ্রহের মাটি থেকে অকালে চিরবিদায় গ্রহণ না করলে তিনিও এঁদের মতোই আমার সাফল্যে আনন্দিত হতেন। তিনি হলেন প্রখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ্ ও নাট্যসমালোচক অধ্যাপক ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য। তাঁর লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশে আমার প্রণতি জানাই।

গবেষণা গ্রন্থের মুদ্রিত মূর্তি দেখবার সৌভাগ্য দুর্লভ, একথা গবেষকমাত্রেই জানেন। বাজারে এ ধরনের গ্রন্থের চাহিদা কম বলে অনেক প্রকাশকই সম্পূর্ণ

নিজেদের ব্যয়ে গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশ করতে তেমন উৎসাহ দেখান না। এ বিষয়ে আমার নিজেরও কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। সুতরাং 'চলন্তিকা প্রকাশক'-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীশীতলচন্দ্র চৌধুরী এই গ্রন্থ মুদ্রণের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করবার ঝুঁকি নিয়ে যেমন আমার শুভানুধ্যায়ীর কাজ করলেন, তেমনি রুজির সঙ্গে রুচির সামঞ্জস্য বিধানের দৃষ্টান্তও স্থাপন করলেন। তাঁকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ মশায়কেও, যিনি শুধু প্রুফ দেখে দিয়েই কর্তব্য শেষ করেননি, এই গ্রন্থের পারিপাট্য বিধানের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনমতো গ্রন্থকারকে এবং প্রকাশককে সচেতন করেছেন। 'চলন্তিকা প্রকাশক'-এর কর্মী শ্রীউমাশঙ্কর সরকার মশায়ের আন্তরিক সহযোগিতার কথা স্মরণ করে তাঁকেও আমার ধন্যবাদ জানাই।

অপরিচিত গ্রন্থকারকে পাঠকসমাজের কাছে পরিচায়িত করবার উদ্দেশ্যে যিনি তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে একটি সুচিন্তিত ভূমিকা লিখে দিয়ে এই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করলেন এবং গ্রন্থকারকেও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান, লোক-সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির প্রখ্যাত গবেষক, ঠাকুর-অধ্যাপক সেই ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমার প্রণাম নিবেদন করি।

যথেষ্ট সতর্কতাসত্ত্বেও মুদ্রণগত ভুল পরিহার করা সম্ভব হয়নি। আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এই ত্রুটি নিজগুণে মার্জনা করবেন। তবুও অপরিহার্য বিবেচনা করে কয়েকটি ভুলের কথা এখানে উল্লেখ করছি।

পৃষ্ঠা	ছত্র	মুদ্রিত	প্রকৃত
৩৯	২২	অমরেশ ত্রিপাঠী	অমলেশ ত্রিপাঠী
৯৩	১৬	প্রতুলচন্দ্র ব্যানার্জি	প্রতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি
১৩২	২৬	চিকাগো বক্তৃতায় (১৮.৩)	চিকাগো বক্তৃতায় (১৮৯৩)
১৩৭ ১৫৮	৭ ৮	কৃষ্ণকুমার দত্ত	কুমারকৃষ্ণ দত্ত
১৬৭	২৭	বিজয় রাঘবারারিয়ারের	বিজয় রাঘবাচারিয়ারের
২৯০	১৯	ডি কুটম্বী	ডি কুইম্বী
৪১৫	১৭	বারীন্দ্রনাথ	বারীন্দ্রকুমার

সর্বশেষে নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থ যদি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সঙ্গে (যে যুগের অরুণোদয় ঘটেছিল ভারতের পূর্বপ্রান্তের সেই একদা অখণ্ড বাংলা দেশে) এবং বাংলা তথা ভারতের এক বিস্মৃতপ্রায় মহা-মনীষীর চিন্তাধারা এবং কর্মাদর্শের সঙ্গে একালের মানুষের পরিচিতিসাধনে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, তা'হলেই আমি আমার এই দীন প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। নমস্কার। ইতি—

বঙ্গবাসী ইভ্‌নিং কলেজ)
এবং
বঙ্গবাসী মর্ণিং কলেজ, কলকাতা।
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
জন্মাষ্টমী, ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৭৩

বিনীত
শিবদাস চক্রবর্ত্তী

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
ভূমিকা		চ—ঙ
নিবেদন		ক—ঢ
আদিকথা		৵০—৩৷০
প্রথম অধ্যায়	পরিবার-পরিজন-পরিবেশ	১—২০
দ্বিতীয় অধ্যায়	স্বাধিকার-সন্ধানে	২৩—৫০
তৃতীয় অধ্যায়	ধর্মক্ষেত্রে	৫৩—৮৫
চতুর্থ অধ্যায়	কর্মক্ষেত্রে	৮৯—২৩২
পঞ্চম অধ্যায়	অন্তর্জীবন-সাহিত্য ও সাধনা	২৩৫—৪০২
ষষ্ঠ অধ্যায়	যুগপুরুষ—লাল-বাল-পাল	৪০৫—৪৩৬
পরিশিষ্ট ঃ		
(ক)	পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর কাছে লেখা পত্র	৪৩৭—৪৪০
(খ)	কবিতাগুচ্ছ ও গীতিগুচ্ছ	৪৪১—৪৫৮
ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী		৪৫৯—৪৭০
নির্দেশিকা		৪৭১—৪৮৫

আদিকথা

মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন—'মানুষ যত ছোট হউক না কেন, তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনের সঙ্গে তাহার সমসাময়িক সমাজ-জীবনের ধারা ওতপ্রোত-ভাবে মিশিয়া রহে। এইজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ভিতর দিয়া তাহার সমসাময়িক সমাজের জ্ঞান, ভাব ও কর্মচেষ্টা ফুটিয়া ওঠে। এই সমাজকে চিনিতে হইলে সেই সমাজের অন্তর্গত স্বতন্ত্র মানুষগুলিকে চিনিতে হয়। আবার এই ক্ষুদ্র মানুষগুলির জীবন ও কর্মের মূল্য বুঝিতে গেলে তাহাদের সমসাময়িক সমাজের মধ্যে ফেলিয়া তাহার কালি কষিতে হয়। জীবনচরিত সমাজের নিগূঢ় শক্তি ও অভিব্যক্তির সূত্র ধরাইয়া দেয়। এইরূপেই ব্যষ্টিরূপে ব্যক্তিকে ও সমষ্টিরূপে সমাজকে দেখিতে হয়। ব্যষ্টিকে ছাড়িয়া সমষ্টির বাস্তবতা থাকে না।'[১]

মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের জীবৎকালের পরিধি ১৮৫৮ থেকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত এই কাল যে যুগের অঙ্গ, সেই যুগের সূচনা হয় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে। সেইজন্য বিপিনচন্দ্রের আবির্ভাবের পটভূমিকা ও তাঁর অবদানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী শতবর্ষের (১৭৫৭-১৮৫৭) যুগ-প্রবৃত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তটি অনুধাবন করা অপরিহার্য।

পলাশীর রক্তরঞ্জিত প্রান্তরের অপর পারে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুনের সূর্যাস্ত একদা বাঙালী কবির ভাবাতুর চিত্তকে বেদনায় বিমথিত করে তুলেছিল। 'পলাশীর যুদ্ধের' কবির সেই মর্ম-বেদনা মূর্ছান্তে উন্মীলিত-নেত্র মোহনলালের আর্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে অমর হয়ে আছে।[২] কিন্তু বাঙালী ঐতিহাসিক তাঁর সুতীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত করে এই ঘটনার মধ্যে নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। কবির উৎকণ্ঠা ঐতিহাসিকের আশাবাদী ভাবনার কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে। ২৩শে জুনের অবিস্মরণীয় সূর্যাস্ত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে নবীন প্রভাতের 'তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়'-এর রহস্যঘন ভূমিকারূপে দেখা দিয়েছে।[৩] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভারতবর্ষের মধ্যযুগের অবসান হয়ে তার আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল।

দারিদ্র্য ও দুর্নীতি, অজ্ঞতা ও নৈতিক শিথিলতা, হীন স্বার্থপরতা ও অভাবনীয় অযোগ্যতার বিষক্রিয়ায় মোগল-সভ্যতার প্রাচীন সৌধ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এমন জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল যে সামান্য একটি আঘাতই তার উন্মূলনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভের মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় সৈন্যের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার শোচনীয় পরাজয় সেই সত্যেরই সন্দেহাতীত প্রমাণ।[৪]

পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভের জয়লাভ ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের পত্তন এবং ভারতবর্ষে মধ্যযুগের অবসান হয়ে আধুনিক যুগের সূচনা। এই আধুনিক যুগের আত্মপ্রকাশের ধারাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে 'নবজাগরণ' বা রেনেসাস নামে চিহ্নিত।[৫]

রেনেসাসের মূল প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে জন এডিংটন সিমণ্ডস্ বলেছেন যে, রেনেসাস শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দের তাৎপর্য হচ্ছে, জ্ঞানবিদ্যার পুনরুজ্জীবন, যদিও সাম্প্রতিককালে ঐ শব্দটি ব্যাপকতর তাৎপর্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।[৬] বিষয়টি স্পষ্টতর করবার উদ্দেশ্যে সিমণ্ডস্ আরও বলেছেন—'রেনেসাস বা নবজন্ম বলতে এমন একটা স্বাভাবিক আন্দোলনকে বোঝায়, এক বা একাধিক বিশেষ লক্ষণের দ্বারা যার ব্যাখ্যা করা বিধেয় নয়; বরং একে বহুপ্রতীক্ষিত সময়ের সমাগমে মানব-মনে অঙ্কুরিত এক সামগ্রিক প্রয়াসরূপেই গ্রহণ করা সমীচীন, যার অগ্রগত অভিযানে আমরা এখনও অংশ গ্রহণ করে চলেছি।'[৭] সিমণ্ডসের সুরে সুর মিলিয়ে বলা যেতে পারে, নবজাগরণ বা রেনেসাসের তাৎপর্য হচ্ছে 'মানস-সত্তার পুনরুজ্জীবন'; ভাব, ভাবনা ও চেতনার অর্থাৎ মানসলোকের সর্বস্তরে অগ্রগতির অসহ আকুতি।

ইউরোপীয় রেনেসাসের সঙ্গে বঙ্গীয় নবজাগরণেরও সাদৃশ্য আছে। ইউরোপীয় রেনেসাস ইতালীতে উদ্ভূত হয়ে ধীরে ধীরে সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। বঙ্গীয় নবজাগরণেরও উদ্ভব ভাগীরথীতীরে কিন্তু তার ব্যাপ্তি সমগ্র ভারত ভূখণ্ডে। বাংলার নবজাগরণ তাই সমগ্র ভারতের নবজাগরণ। ইতালীয় রেনেসাস ও বাংলার উনিশ শতকীয় নবজাগরণের মধ্যে সর্বাংশে সাদৃশ্য আশা করা যায় না; কারণ, উভয়ের মধ্যে স্থানিক ও কালিক ব্যবধান দুস্তর। দুই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দুই দেশের মানুষের মৌল প্রকৃতির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং ইতালীয় রেনেসাসের

অভিব্যক্তির ধারার সঙ্গে বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণের ধারার তুলনা করলে একে নবজাগরণ বা রেনেসাস নামে চিহ্নিত করতে দ্বিধা জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।[৮] তবে রেনেসাসের যে মৌল লক্ষণ—'মানস-সত্তার পুনরুজ্জীবন', সিমণ্ডস্ যাকে 'রিভাইভ্যাল অব্ লার্নিং' বলে উল্লেখ করেছেন, সে লক্ষণটি বঙ্গীয় নবজাগরণের মধ্যে স্পষ্টলক্ষ্য। এই নবজাগরণ বাঙালীর চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে যে বিচিত্র ভাব-তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করেছিল, তারই উচ্ছ্বসিত ধারায় অবগাহন করে ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষ নবজন্ম লাভ করেছিল। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন যে নূতন সাহিত্যাদর্শ, ভাষা-সংস্কার, সামাজিক পুনর্গঠন, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ধর্মীয় আন্দোলন, এমন কি আচার-আচরণে পরিবর্তন অর্থাৎ বাংলা দেশে যত প্রকারের নূতনত্বের সূচনা হয়, সে সমস্তই এক কেন্দ্রীয় আবর্ত থেকে উদ্গত তরঙ্গমালার মতো প্রাদেশিক সীমানা অতিক্রম করে ভারতবর্ষের সুদূর সীমান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল।[৯]

পলাশীর যুদ্ধের পর বিশ বৎসরের মধ্যেই সমগ্র দেশ মধ্যযুগীয় ধর্মভিত্তিক শাসনের ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করে। দেশের ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতিকে কেন্দ্র করে গঠিত সমগ্র সমাজ-জীবনের অভ্যন্তরে প্রতীচ্যের প্রাণ-স্পন্দনের নবীন স্পর্শ অনুভূত হতে থাকে। আচার্য যদুনাথের ভাষায় 'প্রাচ্য সমাজের শুষ্ক বক্ষোপঞ্জরে যেন দিব্য ঐন্দ্রজালিকের প্রভাবে, প্রথমে ক্ষীণভাবে হলেও, স্পন্দন দেখা দিল।' এখানে ঐতিহাসিকের উপলব্ধি আশ্চর্যভাবে কবির উপলব্ধির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে। প্রতীচ্য শিক্ষা-সভ্যতার সংস্পর্শলাভের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তেও একদা অনুরূপ উপলব্ধি জাগ্রত করেছিল—'য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।'[১০]

রবীন্দ্রনাথ-কথিত সেই চেষ্টার মৌল স্বরূপটির নাম দেওয়া যেতে পারে —'সর্বাঙ্গীণ সমাজ-সংস্কার-প্রয়াস'। এই প্রয়াস ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থনীতি ও রাজনীতির খণ্ডিত ক্ষেত্রের মধ্যে নবীন চেতনার ও প্রয়াসের উন্মেষ করে 'বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে' শুরু করলো।

ইংরেজ রাজত্বের পত্তনের পূর্বে এ দেশের সামাজিক অবস্থা কোন্ স্তরে অবনত

হয়েছিল, তার একটি বাক্-চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন—'বলিতে ক্লেশ হয়, ক্ষোভে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না, মুসলমান অধিকারের পূর্বে, হিন্দু রাজত্বের অভ্যুদয়ে ও প্রভাবকালে প্রাচীন গ্রীক পর্যটক ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ যে হিন্দু জাতিকে সাহসী, সত্য-নিষ্ঠ, সরল-প্রকৃতি, আতিথেয়, স্বদার-নিরত দেখিয়া গিয়াছিলেন, কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতাতে সেই জাতিকে যেন সেই সমস্ত সদ্‌গুণে বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছিল। স্থানে স্থানে মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী স্থাপিত হইয়া, তাঁহাদের রাজ-সভার দূষিত সংস্রবে অগ্রে হিন্দু ধনীদের সর্বনাশ হয়, তৎপরে ধনীদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশের নীতি কলুষিত হইতে থাকে।' মুসলমান রাজাদের দৃষ্টান্তে দেশে যে সমস্ত কুরীতি প্রচলিত হয়, তার মধ্যে তিনটি কুরীতির কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, 'ধনীদের মধ্যে স্ত্রীজাতির অবরোধ ও বহুবিবাহ প্রথা', দ্বিতীয়তঃ, 'পুরুষদিগের মধ্যে দুশ্চরিত্রতা', তৃতীয়তঃ, 'তোষামোদজীবিতা, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনাপরতা।'[১১] শাস্ত্রীমহাশয়ের এই বর্ণনা থেকে একথা সহজেই অনুমেয় যে, পলাশীর যুদ্ধের সমসাময়িক কালে দেশের লোকের মনে সামাজিক চেতনার কোন অস্তিত্ব ছিল না। কোন মতে জৈব অস্তিত্ব রক্ষার মধ্যেই দেশের মানুষের সমস্ত কর্ম-প্রয়াস সীমিত ছিল। 'নবজাগরণ' প্রকৃতপক্ষে এই মহাবিনষ্টির অন্ধকার গহ্বর থেকে নবীন আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকিত লোকে উত্তরণের আকুতি।

এই আকুতি প্রত্যক্ষভাবে সংশয় ও বিতর্কের আকারে অর্থাৎ যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে জগৎ ও জীবনাচরণসম্পর্কিত প্রচলিত সংস্কারগুলিকে পরীক্ষা ও বিচারের ঐকান্তিক আগ্রহের আকারে আত্মপ্রকাশ করলো, অন্যদিকে সে জাতির নবজাগ্রত চেতনায় অঙ্কুরিত করে তুললো কতকগুলি নতুন মূল্যবোধ—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, যুক্তিবাদ, ঐহিকতা, নারীর বন্ধনমুক্তি, স্বদেশপ্রেম এবং সর্বোপরি মানবিকতা। *ধর্ম-সংস্কারে, শিক্ষা-বিস্তারে, সাহিত্য-সম্ভারে* এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনার ক্রম-প্রসারে সদ্য-অঙ্কুরিত নতুন মূল্যবোধগুলি বিকশিত হয়ে উঠতে লাগলো।

জাতীয় সত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সেই গরিমময় ইতিহাস বহু মহাপুরুষের অবদানকে আত্মসাৎ করতে করতে অগ্রগত হয়েছে। তবে যাঁর চিন্তা, চেতনা ও কর্মোদ্যমকে পাথেয় করে সে জয়যাত্রার পথে প্রথম পদক্ষেপ করেছিল, তিনি হচ্ছেন 'ভারতপথিক' রাজা রামমোহন রায়। বিষয়ানুসারী আলোচনায়

প্রবেশের পূর্বে সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের প্রথম জীবনের (কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাসের পূর্ব পর্যন্ত) সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পলাশীর যুদ্ধের সতের বছর পরে এবং নন্দকুমারের ফাঁসির এক বছর আগে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে, মতান্তরে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগরের এক কুলীন ব্রাহ্মণ-পরিবারে রামমোহনের জন্ম হয়।[১২] এই বছরেই সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস গভর্নর-জেনারেল হন। এর কয়েক বছর আগে (১৭৬৯-৭০) ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়ে যায় যা' 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। রামমোহনের জন্মকালীন পরিবেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন যে রাজা যখন জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হতে থাকেন, সেই সময় ছিল সম্ভবতঃ আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা অন্ধকার যুগ; পুরানো সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে অথচ তার পরিবর্তে একটা নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সমগ্র দেশ জুড়ে ধ্বংসের রাজত্ব চলছে। সমাজের মুখ্য অঙ্গগুলি শিথিল হয়ে গেছে; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গ্রাম, ঘর, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, আইন ও শাসন-ব্যবস্থা, সমস্তই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অবস্থিত। সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবন সংরক্ষণের জন্য সর্বাঙ্গীণ পুনর্গঠন ও নবীকরণ প্রয়াস একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ছিল।[১৩]

রামমোহনের বাল্যজীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য বিবরণ উদ্ধার করা কঠিন। তাঁর কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাসের পূর্ববর্তী জীবনসম্পর্কে বিভিন্ন জীবনীকার এমন সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন যা' অনেকক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হয়। এই সমস্ত বিচিত্র তথ্যপুঞ্জ থেকে যে সত্যের ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব তা'তে জানা যায় যে তিনি 'জীবনের প্রথম চৌদ্দ বৎসর প্রধানতঃ রাধানগরের বাড়ীতেই কাটাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বাড়ীতেই চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার সহিত সুখসাগরের নিকটবর্তী পালপাড়া গ্রাম-নিবাসী নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় হয়। এই নন্দকুমার প্রথম জীবনে অধ্যাপক ছিলেন, পর-জীবনে তান্ত্রিক সাধনা করিয়া হরিহরানন্দনাথ কুলাবধূত নামে পরিচিত হন। মনে হয়, রামমোহনের সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার অনেকটা ইঁহার শিক্ষার ফল। অন্ততঃ তিনিই যে রামমোহনকে তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট করেন, তাহা নিঃসন্দেহ'।[১৪]

পনের বছর বয়সে রামমোহন অন্য ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে

দু'তিন বছরের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন বলে ডক্টর কার্পেন্টার তাঁর রামমোহন-জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রামমোহনের নিজের রচনায় তাঁর তিব্বত-ভ্রমণ প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই। তবে ১৮০৩-০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীনে' তিনি বলেছেন—'আমি পৃথিবীর সুদূর প্রদেশগুলিতে, পার্বত্য ও সমতলভূমিতে পর্যটন করিয়াছি।' ধর্মশিক্ষার জন্য তিনি যে কাশী ও পাটনায় গিয়েছিলেন বলে তাঁর কোনো কোনো জীবনীকার উল্লেখ করেছেন, ব্রজেন্দ্রনাথ তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে সে সম্পর্কেও সংশয় উত্থাপন করেছেন। তবে তিনি যে সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীশ্চিয়ান শাস্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট অধ্যয়ন ও জ্ঞান লাভ করেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ছিল বিচিত্র আপাতবিরোধী উপাদানে গঠিত। অথচ রামমোহনের সমন্বয়ী প্রতিভার প্রশস্ত ক্ষেত্রে তারা নির্বিবাদে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করেছে। পরবর্তী জীবনে যিনি আধুনিক ভারতের স্রষ্টা, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ঘোর বৈষয়িক মানুষ। ব্রজেন্দ্রনাথের ভাষায়—'কিংবদন্তী ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র দলিলপত্রের উপর নির্ভর করিলে রামমোহনের প্রথম জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয়, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সেযুগের সকল সমৃদ্ধ ভদ্রসন্তানের মত স্বগ্রামে থাকিয়া পিতার ও নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত ছিলেন। হয়ত বা তখন তাঁহার সাধারণ ভদ্রলোক অপেক্ষা ফার্সী ও সংস্কৃত জ্ঞান বেশী ছিল, কিন্তু তখনও তিনি দেশাচার বা প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্রোহ করেন নাই।' এরপর রংপুরে থাকবার সময় চাকুরি বা ব্যবসা উভয় সূত্রেই তিনি যথেষ্ট অর্থ আয় করেন। তিনি চাকুরি করেছেন, কলকাতায় কোম্পানির কাগজের ব্যবসা করেছেন এবং সিবিলিয়ানদের টাকাকড়ি কর্জ দিয়েছেন। আবার আর্থিক দুরবস্থার জন্য তাঁর পিতা ও ভ্রাতা যখন দেওয়ানী জেলে বন্দী, তখন নিজের আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও পিতা বা ভ্রাতাকে অর্থসাহায্য করেননি।[১৫] রামমোহন রায়ের ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক রূপটি অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী অল্পকথায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন: 'অর্থোপার্জনকে যাঁরা হীন মনে করেন, বাঈজীর গানের আসরকে আধ্যাত্মিক সীমান্তের বহির্ভূত মনে করেন, কূটনীতির সূত্রধারণকে দুর্নীতি বলিয়া মনে করেন, সেইসব দুর্বলযকৃৎ ব্যক্তিদের জন্য রামমোহন-চরিত্র সৃষ্ট হয় নাই।...... নীতিবাগীশ ও ধর্মধ্বজিগণ রামমোহন-চরিত্রের খুঁটিনাটি লইয়া তর্ক করুক। দোষ-

গুণ, ভুলভ্রান্তি লইয়া মানব-জীবন যাহাদের প্রিয়, রামমোহন তাদের বান্ধব। তিনি 'আধুনিক মানুষ'।[১৬] ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রামমোহন ডিগবী সাহেবের সঙ্গে প্রথমে সরকারী কর্মচারী রূপে, পরে তাঁর 'খাস কর্মচারী' রূপে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। প্রথমে রামগড়, রামগড় থেকে যশোহর, যশোহর থেকে ভাগলপুর, ভাগলপুর থেকে ডিগবীর সঙ্গে তিনি রংপুরে যান। ডিগবীর খাস কর্মচারী রূপে রামমোহন সাধারণ লোকের কাছে 'ডিগবীর দেওয়ান' বলে পরিচিত হন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই ডিগবী রংপুর কালেক্টরীর ভার স্মেণ্টকে বুঝাইয়া দিয়া দীর্ঘ ছুটি লইলে, রামমোহনও রংপুর ত্যাগ করিয়া কলকাতায় ফিরিয়াছিলেন।[১৭] এর কিছুদিন পর থেকে তিনি স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। সুতরাং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে বঙ্গীয় নবজাগরণের ইতিহাসে 'রামমোহন-পর্ব'-এর সূচনাকাল গণ্য করা যেতে পারে। এই সময় থেকেই বিষয়ী রামমোহনের অন্তর্লোক থেকে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হন 'ভারত-পথিক' রামমোহন রায়।

॥ ধর্ম-সংস্কার ॥

রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি'র আঘাতটি আমাদের ধর্ম-জীবনেই প্রথম অনুভূত হলো। কারণ, ধর্ম চিরদিনই ভারতীয় জনজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে এসেছে। তাই ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রতি-ক্রিয়াটি একান্তভাবে প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠল। 'জীবন-হারা অচল অসাড়' যে জাতি দীর্ঘকাল যাবৎ 'পদে পদে জীর্ণ লোকাচারের' নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, সে একদিকে সেই নিগড়-মুক্তির নেশায় মত্ত হয়ে উঠল, অন্ধ নিষ্ঠাবাদের পঙ্ক-কুণ্ড থেকে আলোকদীপ্ত যুক্তিবাদের প্রত্যয়-ভূমিতে উত্তরণের জন্য তার মনে প্রবল আগ্রহ দেখা দিল। জীবনচর্যার স্তরে এই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তার মানসলোকেও প্রভাব বিস্তার করলো। অন্যদিকে তার সাম্প্রদায়িক ভাবনা সমন্বয়ী সাধনার অভিমুখী হলো। এই উভয়মুখী প্রয়াসেই প্রচণ্ড প্রাণাবেগ সঞ্চার করেছে রাজা রামমোহন রায়ের অনলস কর্ম-সাধনা।

রামমোহন লক্ষ্য করলেন যে ভারতবর্ষের যেটি প্রাচীনতম ধর্ম, সেই ধর্ম-মতাবলম্বীদের সামাজিক জীবন সহমরণ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ-

প্রথা প্রভৃতি নানাবিধ কুপ্রথা ও কুসংস্কার এবং তজ্জনিত সঙ্কীর্ণ মনোভাবের ভারে আচ্ছন্ন। সেইজন্য প্রথমে তিনি সেই ধর্মে অনুসৃত সমকালীন রীতিনীতির সংস্কারে উদ্যোগী হলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি তারিখে জনৈক ইংরেজ বন্ধুর কাছে লিখিত একখানি পত্রে তিনি স্পষ্টভাষায় জানালেন যে রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখ-সমৃদ্ধি ভোগের পথ প্রশস্ত করতে হলে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান-বিধির কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিশোধন একান্তভাবে প্রয়োজন।[১৮] এই ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই রামমোহন সহমরণ বা সতীদাহ-প্রথা রহিতের জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধে লিপ্ত হন।

এই উপলব্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপনে ব্রতী হন। পদে পদে যাকে আভ্যন্তরীণ বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তার অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। রামমোহন তাই প্রথমেই জাতির অগ্রগমনের পথে যে সমস্ত স্বেচ্ছা-সৃষ্ট বাধা ছিল, সেগুলির অপসারণে মনোযোগী হলেন। এই দূরদৃষ্টির জন্যই রাজা রামমোহন রায় নবীন ভারতবর্ষের আদি যুগাবতার রূপে গণ্য হবার অধিকারী। পাশ্চাত্ত্য দেশের দু'জন ধর্ম-সংস্কারক লুথার এবং কেলভিনের সংস্কার-প্রয়াসের সঙ্গে রামমোহনের সংস্কার-প্রয়াসের তুলনা করে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার যথার্থই বলেছেন যে পাশ্চাত্ত্য দেশে রিফর্মেশন আন্দোলনের উদ্গাতা লুথার এবং কেলভিন সচেতনভাবে জাতীয়তাবোধ বা গণতান্ত্রিক চেতনার উদ্বোধনে সচেষ্ট হননি, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের এই দিব্যপুরুষ সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক উন্নতি যে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল—এই সত্যটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।[১৯]

বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির চাপে এবং অলৌকিকতায় অত্যধিক আস্থার ফলে হিন্দুর সামাজিক জীবনে কালে কালে ধর্মের নামে অনেক কুপ্রথা ও কুসংস্কার প্রাধান্য লাভ করে। সেগুলির মধ্যে গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন এবং সহমরণ-প্রথা নৃশংসতার দিক থেকে তুলনাতীত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই এই নৃশংস-প্রথা দূরীকরণের প্রতি সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতার ফলে এই বিষয়ে কোনো চেষ্টাই সহজে সফল হতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তৎকালীন সরকার এক আইনের বলে গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জনের প্রথা

রহিত করেন। কিন্তু সতীদাহ-প্রথা রহিতকরণে আরও সময় লেগেছিল। সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনের নেতৃত্বের গৌরব রামমোহন রায়ের প্রাপ্য। এই প্রথা নিবারণের জন্য যদিও সরকারী ও বে-সরকারী উভয় স্তরেই কিছু কিছু চেষ্টা চলছিল, তা'হলেও রামমোহনের ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত আন্দোলনের ফলেই এই প্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়।

পতিব্রতা স্ত্রীর পক্ষে সদ্যবৈধব্যবরণের পর স্বেচ্ছায় মৃত পতির চিতায় আরোহণ হিন্দুসমাজে প্রশংসিত হয়ে এসেছে। কিন্তু হিন্দুর কোনো প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থেই 'সহমরণ' বিধবার অবশ্য-পালনীয় বিধিরূপে গণ্য হয়নি। বাংলা দেশে স্মার্ত-শিরোমণি রঘুনন্দন কর্তৃক 'সহমরণ' বিধবার পক্ষে উচ্চ পুণ্যকর্মরূপে বিহিত হবার ফলে বাংলা দেশে এর ব্যাপক অনুষ্ঠান শুরু হতে থাকে। ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্ত রঘুনন্দনের বিধানের দুটি বিশিষ্ট কারণ অনুমান করেছেন—"স্মার্তচূড়ামণি যখন নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশে মুসলমান রাজ্য নানা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। শাসন-ব্যবস্থার শিথিলতার সুযোগে নৈতিক ধর্মভ্রষ্ট আচারহীন ব্যক্তিগণ যথেচ্ছাচার করিত এবং কুমারী ও বিশেষ করিয়া বিধবাদের মানসম্ভ্রম-পবিত্রতা অব্যাহত রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ব্যতীত বল্লাল সেনের কৌলীন্য-প্রথার ব্যাপক প্রচলনে হিন্দু পরিবারের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। একজন পুরুষ বহু নারীর পাণিগ্রহণ করিত, কিন্তু সকল স্ত্রীর প্রতি সমানভাবে কর্তব্য পালন অসম্ভব বলিয়া স্বামিসোহাগে বঞ্চিতা নারীর পক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে ঈর্ষাবশে পতির প্রাণনাশের কারণ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু পতির মৃত্যুতে সতী হইবার ভয়ে কেহ পতিহন্ত্রী হইতে সাহস পাইত না। এই সকল নানাকারণে বঙ্গদেশে এই প্রথার ব্যাপক প্রসার হইয়াছিল।"[২০] এর সঙ্গে একটি তৃতীয় কারণ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। নিঃসন্তান বালবিধবাকে মৃত পতির সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে বিত্তলোভী আত্মীয়স্বজনেরা অনেক সময় ছলে-বলে হতভাগিনী বালবিধবাকে নৃশংসভাবে মৃত পতির চিতারোহণে বাধ্য করতেন। মুসলমান আমলের শেষভাগে বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও এই অর্থনৈতিক কারণই সম্ভবতঃ সতীদাহ প্রথার ব্যাপক প্রসারের কারণ হয়েছিল।

সমকালীন সরকারী তথ্য ভিত্তি করে ডক্টর নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ 'দি হিষ্ট্রি অব্ বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০৫)' গ্রন্থে যে বিবরণ দান করেছেন, তা' থেকে জানা যায় যে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিভাগে ২৫৩ জন নারী সতী হয়েছিলেন, ঢাকায় ৩১ জন এবং মুর্শিদাবাদে ১১ জন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিভাগে সতী হয়েছিলেন ৪৪২ জন, ঢাকায় ৫৮ জন এবং মুর্শিদাবাদে ৩০ জন। আর ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মোট সতীর শতকরা ৬৩ জন ছিলেন একমাত্র কলকাতা বিভাগের অধিবাসিনী মহিলা।

মোগল আমলেও এই প্রথা রহিতের জন্য চেষ্টা হয়। তাতে কোনো ফল হয় না। '১৭৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে খৃষ্টান মিশনারীরা সতীদাহপ্রথা রহিতের জন্য সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে থাকেন, কিন্তু তাতেও বিশেষ কোনো ফল হয় না।'[২১] লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৩, ১৮১৫ এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সহমরণ নিবারণের জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। গোঁড়া হিন্দুসমাজ তার বিরুদ্ধে বাংলা সরকারের কাছে আবেদন পেশ করেন। এই আবেদনের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে রামমোহন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সরকারের কাছে একখানি পাল্টা আবেদন-পত্র দাখিল করেন। তারপর ঐ সালের নভেম্বর মাসে 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' নামে বাইশ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা রচনা করে সহমরণ যে শাস্ত্রবিহিত অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য নয়,—এই মত জনসাধারণ্যে প্রচার করতে থাকেন। এই বিষয়ে তাঁর 'দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। তেত্রিশ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাখানি ছিল কাশীনাথ তর্কবাগীশ রচিত 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'-এর উত্তর।[২২] সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রামমোহনকে দীর্ঘ দিন যাবৎ সংগ্রাম করতে হয়। শেষ পর্যন্ত রামমোহনের প্রচেষ্টাই জয়যুক্ত হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন। রক্ষণশীল সম্প্রদায় এতেও নিরস্ত হলো না। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ৮০০ জন হিন্দু এই আইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডেশ্বরের দরবারে আপীল করলেন। প্রিভি কাউন্সিলে যখন এই আপীলের শুনানির উদ্যোগ চলছিল, তখন রামমোহন দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় আকবর-প্রদত্ত 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হয়ে দিল্লীশ্বরের দৌত্যভার নিয়ে বিলাতে উপস্থিত। তিনি উপরি-উক্ত আপীলের বিরুদ্ধে আর একটি আপীল রচনা করে হাউস্ অব্ কমন্সে পেশ করেন। প্রিভি কাউন্সিল সমস্ত তথ্যাদি

বিচার করে সতীদাহ নিবারক আইনের বিরুদ্ধে আপীল ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই নাকচ করে দিলেন। রক্ষণশীলতাব বিরুদ্ধে প্রগতিশীলতার জয় ঘোষিত হলো। নবজাগরণ-সম্ভূত নবীন সংস্কৃতির আলোক-শিখায় প্রাচীন সংস্কারের একটি প্রকোষ্ঠের অন্ধকার চিরতরে বিদূরিত হয়ে গেল। সতীদাহ-প্রথা নিবারণের সমস্ত কৃতিত্ব একা রামমোহনের প্রাপ্য নয়। কারণ দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ নব্য শিক্ষিত প্রগতিশীল হিন্দুসম্প্রদায় রামমোহনের এই কল্যাণকর প্রয়াসে শক্তি সঞ্চার করেছেন। সেদিক থেকে রামমোহনের জয় সমগ্র প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের জয়। তা'হলেও আন্দোলনে বজ্রকঠিন নেতৃত্বদানের মহিমা নিঃসন্দেহে রামমোহনের প্রাপ্য।

সতীদাহ নিবারণের পর আলোচ্যমান যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আন্দোলন—বিধবা-বিবাহ প্রচলনের আন্দোলন। এই আন্দোলনেব নেতৃত্ব করেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বাংলার অবিস্মরণীয় মহাপুরুষ 'দয়ার সাগর' পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহনের পর বিদ্যাসাগরই হচ্ছেন দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি নবজাগ্রত জাতির মানসলোকে নবীন চেতনাব প্রচণ্ড আলোড়ন উপস্থিত করেন।

বাল-বিধবার পক্ষে দ্বিতীয়বার পতি-গ্রহণ ধর্মের নামেই নিষিদ্ধ হয়ে ছিল। অথচ শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ আপৎকালে নারীর অন্য পতি গ্রহণের বিধান ছিল। পরাশর সংহিতায় বলা হয়েছে :

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চাস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

শাস্ত্রবিমুখ রক্ষণশীল সম্প্রদায় দেশাচারকেই প্রাধান্য দিয়ে বিধবা-বিবাহের বিরোধিতা করে এসেছেন। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রকেই শস্ত্র করে রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এই সংগ্রামে অবশ্য সমকালীন প্রগতিশীল সম্প্রদায়, ব্রাহ্ম-সমাজ, ইয়ং বেঙ্গল, তত্ত্ববোধিনী-গোষ্ঠীর মানুষ, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত-সমাজ ও জমিদারশ্রেণীর একাংশ শক্তি সঞ্চার করেছিল। বিদ্যাসাগরের পূর্বেও অবশ্য এদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, "অনেকের সংস্কার আছে, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব-প্রথমে বঙ্গসমাজে বিধবা-বিবাহের বিচার উপস্থিত করেন। কিন্তু বোধহয়

তাহা ঠিক নহে। ১৮৪২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও-শিষ্যগণ যে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটার' নামক কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে তাঁহারা বিধবা-বিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার উপস্থিত করেন।...এমন কি 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' ইত্যাদি যে পরাশর বচনের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্বপ্রথমে উক্ত পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধৃত করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই পণ্ডিতদ্বয় পশ্চাতে থাকিয়া ঐ সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া লেখকদিগের হস্তে দিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। তাহার কোনও প্রকাশ নাই। তবে উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের সহিত নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দের যে আত্মীয়তা ছিল, তাহা জ্ঞাত আছি।"[২৩]

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১৮৪২ সালে কেন, তার অনেক আগে থেকেই এদেশের সমাজের প্রগতিশীল অংশ বাল্যবিধবার আজীবন বৈধব্য পালনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'য় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে এই প্রসঙ্গে প্রতিবাদ-ধ্বনি উত্থিত হয়।[২৪] বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত আন্দোলনের পূর্বে বাংলাদেশের দু'এক জায়গায় বিধবা-বিবাহের চেষ্টাও হয়; কিন্তু সে চেষ্টা সার্থকতা লাভ করেনি। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে একটি রচনা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। সমাজের রক্ষণশীল অংশ বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করতে থাকেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ঐ বছরের অক্টোবর মাসেই বিধবা-বিবাহ প্রচলনের পক্ষে আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের নিকট আবেদন-পত্র পেশ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই ভারত সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইন পাস হয়ে যায়। এই আইনে পুনর্বিবাহিতা নারীর সন্তান আইনসঙ্গত সন্তান বলে গণ্য হবে—এই মর্মে ঘোষণা করা হলো। তবে আইনে একথাও বলা হলো যে, মৃত পতির সম্পত্তিতে পুনর্বিবাহিতা হিন্দু বিধবার কোন প্রকার অধিকার থাকবে না। শুধু একটি বিষয়ে অধিকার হরণ করা হলো না। পুনর্বিবাহের সময় কোন নাবালক সন্তান থাকলে তার অভিভাবকতার অধিকার বহাল রয়ে গেল। বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণ ছিল—নারীর

বন্ধনমুক্তির প্রয়াস। এই প্রয়াসের অন্যতম সাফল্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম চিরস্মরণীয়।

বৈধব্য-প্রথার মতো বহুবিবাহ-প্রথাও ছিল সেকালের আর একটি বড়ো অভিশাপ। যে বছর (১৮৫৫) বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ আইন সিদ্ধ করবার জন্য আবেদন-পত্র পেশ করেন, সেই বছরেই বর্ধমানের মহারাজা ভারত সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বহুবিবাহ-প্রথার কুফল ব্যাখ্যা করে একখানি আবেদন-পত্র পেশ করেন। ঐ বছর 'বন্ধুবর্গ সমবায় সভা'ও কিশোরীমোহন মিত্রের উদ্যোগে বহুবিবাহ রহিতের প্রার্থনা জানিয়ে বহুজন-স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন-পত্র দাখিল করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক ভদ্রলোক একই প্রার্থনা-সম্বলিত আর একখানি আবেদন-পত্র ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে একটি বিল উত্থাপনের প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যায়। কিন্তু আকস্মিক সিপাহী-বিদ্রোহের জন্য ঐ প্রতিশ্রুতি আপাততঃ কার্যকর হতে পারে না। সিপাহী-বিদ্রোহ শান্ত হলে আবার এবিষয়ে চেষ্টা চলতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহেও এই কু-প্রথার বিরুদ্ধে ধিক্কার-বাণী উত্থিত হয়। অবশেষে বাংলার ছোটলাট স্যার সেসিল বিডনের নির্দেশে একটি কমিটিও গঠিত হয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই কমিটির অন্যতম সভ্য। তিনি আইনের বলে এই প্রথা রহিতের জন্য মত প্রকাশ করেন। কিন্তু এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সার্থক হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন যে, এ কথা লক্ষণীয় যে, আইনের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও বিধবা-বিবাহ জনপ্রিয় হতে পারলো না, অথচ বহুবিবাহ ও কৌলীন্য-প্রথা প্রজাতন্ত্রী ভারতে আইনের বলে নিষিদ্ধ হবার বহু পূর্বেই প্রকৃতপক্ষে এ দেশ থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল।[২৫] বহুবিবাহ-প্রথা রহিতের আন্দোলনও ছিল নবজাগ্রত চেতনা-সম্ভূত নারীর বন্ধন-মুক্তির প্রয়াসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

নবজাগরণের চেতনা-সঞ্জাত 'সর্বাঙ্গীণ সমাজ-সংস্কার-প্রয়াস' ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে একদিকে ধর্মের নামে প্রচলিত সামাজিক কু-প্রথাগুলির উচ্ছেদসাধনে উদ্দিষ্ট হলো, অন্যদিকে ধর্ম-বিধির যুগোচিত সংস্কারে নিয়োজিত হলো। এই

উভয়মুখী প্রয়াসের পুরোভাগেই রাজা রামমোহন রায়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজ সর্বজনস্বীকার্য। 'ব্রাহ্ম-সমাজ' স্থাপন রামমোহনের একই প্রয়াসের দ্বিতীয় ধারার অন্তর্গত বলা চলে।

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'চরিত চিত্র' গ্রন্থে বলেছেন—'রাজা রামমোহনের সময়ে এবং তাঁর জন্মের পূর্ব হইতেই দেশে একটা নূতন জিজ্ঞাসা যে জাগিয়াছিল, রাজার নিজের জীবন ও প্রচারই তার সাক্ষী। আর এই জিজ্ঞাসার আশ্রয়েই রাজার তত্ত্বান্বেষণের সূচনা ও ক্রমে তাঁর ধর্মপ্রচারের প্রতিষ্ঠা হয়।' কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহন সামাজিক কু-প্রথার সংহারে এবং প্রচলিত ধর্ম-বিধির সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। আরবী, পারসী, সংস্কৃত, হিব্রু, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় সুশিক্ষিত রামমোহন এই সমস্ত ভাষার সাহায্যে বিভিন্ন ধর্মের আকর গ্রন্থগুলি পাঠ করেছিলেন—একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন তান্ত্রিকপ্রবর হরিহরানন্দ নাথের শিষ্য, অতএব তান্ত্রিক সাধনরীতিতে প্রত্যয়শীল। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'তান্ত্রিক সাধনের মূল ব্রহ্ম-জ্ঞান। মহানির্বাণ তন্ত্রাদিতে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সকল তন্ত্র অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।' সুতরাং একদিকে তান্ত্রিক শিক্ষা, অন্যদিকে পৃথিবীর নানা ধর্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন—এই উভয়ের প্রভাবে তিনি একেশ্বরবাদী ও নিরাকারবাদী হয়ে ওঠেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলে গণ্য হওয়া বিধেয়। এই উপলব্ধ সত্য লোক-সমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 'আত্মীয়-সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করলেন এবং ঐ সময় থেকেই স্বকীয় ভাষ্যসহ বেদান্ত গ্রন্থ, ঈশ, তবলকার, কঠ, মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদ প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ করতে শুরু করলেন। রামমোহনের নবীন মতবাদের প্রতি নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকে আকৃষ্ট হলেন, কিন্তু রক্ষণশীল সম্প্রদায় অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। রামমোহন সে রোষ উপেক্ষা করে তাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন। 'ভারতবর্ষের লোক নিছক মূর্তিপূজক ও ঘোর কুসংস্কারী'—এই অপবাদ খৃষ্টান মিশনরীরা বেপরোয়াভাবে তখন ছড়াচ্ছেন এদেশে, ভারতবর্ষের লোকদের খৃষ্টান করবার অভিপ্রায়ে। রামমোহন তখন ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদ যে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধারণা আর খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ যে ভুল তা নিয়ে ডাঃ মার্শম্যান্ প্রভৃতি খৃষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে প্রবল তর্ক করেছেন

ও তাঁদের পরাস্ত করেছেন।[২৬] তাই বলে খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল না। তাঁর ধর্মমত নিয়ে দলাদলির ফলে 'আত্মীয়-সভা' বেশীদিন স্থায়ী হতে পারলো না। তখন তিনি 'ইউনিট্যারিয়ান সোসাইটি' নামে আর একটি সভা স্থাপন করলেন। এই সভা স্থাপন ও পরিচালনে পাদরি য়্যাডাম সাহেব ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়ক। এই সভায় প্রচারিত ধর্মমত খৃষ্টানধর্ম থেকেই গৃহীত হয়েছিল এবং খৃষ্টান মতেই উপাসনা হতো। বস্তুতঃ রামমোহন শাস্ত্রনির্দিষ্ট কোনো সত্যকেই অগ্রাহ্য করেননি, তবে তাঁর যুক্তিবাদী মন কোনো একখানি বিশেষ ধর্মগ্রন্থ বা কোনো একজন ধর্ম-প্রচারককেই অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে পারেনি।··· মনিয়ের উইলিয়ামস্ যথার্থ বলেছেন যে, যুক্তিনিষ্ঠ জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তুলনামূলক ধর্ম-বিজ্ঞানের প্রথম আগ্রহী ছাত্র।[২৭] যাই হোক্, ইউনিট্যারিয়ান সোসাইটিও রামমোহনের অভীষ্টসাধনে খুব বেশী সহায়ক হতে পারলো না। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট 'ব্রাহ্ম-সমাজ' নামে নতুন সভা স্থাপন করে রামমোহন তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী কর্ম-মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি জোড়াসাঁকোয় নির্মিত নতুন বাড়ীতে এই সমাজের কাজ আরম্ভ হয়।

নবজাগ্রত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত এই ব্রাহ্ম-সমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। বহু ধর্মমত ও বিচিত্র সংস্কৃতির আবাসভূমি এই ভারতবর্ষ। রামমোহনের সময় তাদের মধ্যে তিনটি প্রধান সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানুষ—হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টান পারস্পরিক বিদ্বেষ ও বিরোধে মগ্ন ছিল। এই বিচিত্র বৈরভাবাপন্ন সংঘর্ষমগ্ন শক্তির মধ্যে কী ভাবে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায়—এই প্রশ্ন রামমোহনের চিন্তায় সমাধানের দাবী নিয়ে উপস্থিত হলো। কারণ, এই সমন্বয়-সাধনের সার্থকতার মধ্যেই নবীন ভারতবর্ষের জন্ম-সম্ভাবনা নিহিত ছিল। ব্রাহ্ম-সমাজের মাধ্যমে রামমোহন এই ধরনের একটি সমন্বয়-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যথার্থই বলেছেন—'এই ধরনের পারস্পরিক সমন্বয় ও মিলনের সূত্র আবিষ্কার করে রাজা যৌগিক জাতীয়তা ও সমন্বয়ী সভ্যতার পীঠস্থান আধুনিক ভারতবর্ষের জনক ও কুলপতি হতে পেরেছিলেন।'[২৮] রামমোহনের তিরোধানের পর অবশ্য ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁর আদর্শ থেকে সরে আসতে থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের সময় ব্রাহ্ম-সমাজ একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হতে থাকে।

কিন্তু রামমোহনের যে সে উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি একটি দলিলে তা লিখে যান। তাঁর ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বার সর্বধর্মসম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত ছিল। 'তিনি নির্দিষ্ট করিয়া যান যে,……যে-কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন, তাঁহারই জন্য জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ-নির্বিশেষে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। ……যাহাতে পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণার প্রসার হয়, প্রেম-নীতি-ভক্তি-দয়া-সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে, অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না।'[২৯] সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করে ভারতবর্ষে আধুনিক আদর্শের একটি নতুন জাতি পত্তনের দিকে এইটাই হলো প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু রামমোহনের ব্রাহ্ম-সমাজ আর একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এ দেশের লোকের মনে সংশয়বাদের অঙ্কুরোদগম হয়। প্রচলিত ক্রিয়া-কর্ম ও কিংবদন্তীর প্রতি মানুষের মনে অল্পবিস্তর অনাস্থা জন্মাতে শুরু করে। ধর্মসাধনার বহিরঙ্গ ক্রিয়াকলাপাদিতে কোনো পার্থক্য দেখা না গেলেও, এই সংশয়বাদের অঙ্কুরই অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের দু'দশকের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোক ও উত্তাপে লালিত হয়ে ক্রমবর্ধমান বৃক্ষে পরিণত হতে শুরু করে। যুক্তিবাদী মানুষের মনে খৃষ্টধর্মের প্রতি অভিমুখিতা দেখা দেয়। মিশনারীরাও নানা প্রলোভন দেখিয়ে এদেশের মানুষকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে থাকেন। স্ব-ধর্মে অধিষ্ঠিত থেকে যে সুযোগ-সুবিধা লাভ অসম্ভব, দেখা গেল, ধর্মান্তর গ্রহণ করলে সে সুযোগ-সুবিধা লাভ সহজেই সম্ভব। এই অবস্থায় সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচণ্ড ভাঙনের সম্মুখীন হলো। যুগরুচির দাবি অনুসারে সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা-দানই ছিল ঐ ভাঙন প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। ব্রাহ্ম-সমাজ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ যুক্তিবাদী মানুষের সামনে সেই সুযোগ-সুবিধা লাভের পথ উন্মুক্ত করে দিল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়—'কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান ও জীবনহীন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে জীবন্ত সমাহিত হিন্দুধর্মের তিনি পুনরুদ্ধার করিলেন। যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম দিন দিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল, যে জড় পাষাণস্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্মের হৃদয় হতচেতন হইয়া পড়িতেছিল, সেই মৃতভারে, সেই জড়স্তূপে রামমোহন রায় প্রচণ্ড বলে আঘাত করিলেন—তাহার ভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার আপাদমস্তক বিদীর্ণ হইয়া

রামমোহন রায়

গেল। ……সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্মের উপর আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের জীবনরক্ষা করিলেন। ……তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খৃষ্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মতো মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।'[৩০]

সুতরাং রামমোহন যে বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান, কি ইসলাম ধর্ম প্রচারকের মতো কোনো নতুন ধর্মমতের প্রচারক নন, একথা সহজেই অনুমেয়। উপনিষদ-বেদান্তে প্রচারিত নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার প্রচারক রামমোহন রায় প্রকৃতপক্ষে বিশেস যুগ-প্রয়োজন-সম্ভূত হিন্দুধর্মের অন্যতম সংস্কারক। বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায়—'কিয়ৎ পরিমাণে মার্টিন লুথারের মত রাজা রামমোহনও শাস্ত্র-নির্ধারণে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী ব্রাহ্ম আচার্যগণের ন্যায় শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও অধিকার একেবারে অস্বীকার করেন নাই। আবার অন্যদিকে লুথারের ন্যায় তিনি শাস্ত্রার্থ নির্ধারণে সদগুরুর প্রয়োজন অগ্রাহ্য করিয়া, কেবলমাত্র স্বানুভূতির উপরেই শাস্ত্রোপদেশের সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভারও অর্পণ করেন নাই। …আর এইরূপেই রামমোহন তত্ত্ববিচারে ও ধর্মসাধনে ভারতের প্রাচীন এবং য়ুরোপের আধুনিক সাধনার উচ্চতম আদর্শের মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াছিলেন।'[৩১]

হিন্দুধর্ম কোনো একক মানব-প্রচারিত ধর্মমত নয়। অগণ্য ঋষির বহুকাল-ব্যাপী সাধন-লব্ধ বিচিত্র জ্ঞান ও অনুভবের সমন্বিত রূপের নাম হিন্দুধর্ম। সুতরাং স্বভাবতঃই বহু ও বিচিত্রকে আহ্বান ও আলিঙ্গনের শক্তি এর মধ্যে শুধু সম্ভাবনা নয়, সম্ভবরূপে বিদ্যমান ছিল। প্রাচীনত্বের ফলে হিন্দুধর্মের সেই গণতান্ত্রিক রূপটি কালে কালে নানাবিধ দেশাচারের ভস্মজালে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'ভস্মস্তূপের মধ্যে ঋষিদের হৃদয়জাত যে অমর অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল, ভস্ম উড়াইয়া দিয়া তিনি তাহাই বাহির করিয়াছেন।'[৩২] ব্রাহ্ম-সমাজকে তাই তিনি জাতি-ধর্মসম্প্রদায়-নির্বিশেষে সর্বমানবের আধ্যাত্মিক সাধনার মিলন-ক্ষেত্ররূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রামমোহনের এই স্বপ্ন অবশ্য সর্বাংশে সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ পরবর্তীকালে তিনটি পর্যায়ে ব্রাহ্ম-সমাজের যে ক্রম-রূপান্তর ঘটে তাতে ব্রাহ্ম-সমাজ মূল লক্ষ্য থেকে কতকাংশে ভ্রষ্ট হয়েছিল,

সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিকের ভাষায়—'সার্বজনীন ও সম্পূর্ণ অ-সাম্প্রদায়িক সংস্থারূপে পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত রামমোহনের ব্রাহ্ম-সমাজ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর আমলে ব্রাহ্ম-সমাজ যে রূপান্তর পরিগ্রহ করে, তা' থেকে মূলতঃ অনেকাংশে স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল।'[৩৩]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বেই ব্রাহ্ম-সমাজ বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়রূপে আত্মপ্রকাশ করে এ কথা আগেই বলা হয়েছে। পরে এই সমাজই 'আদি ব্রাহ্ম-সমাজ' নামে পরিচিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত ব্রাহ্ম-সমাজ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী ছিল। তিনি নিজেও ছিলেন ভক্তিমার্গের সাধক এবং বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী। ঔপনিষদিক শিক্ষায় লালিত ব্রাহ্ম-সমাজীদের ধারণা ছিল, বেদসমূহেও বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ জ্ঞানমার্গী ব্রাহ্মগণ এই ধারণায় সংশয় প্রকাশ করায় দেবেন্দ্রনাথ চারজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে বেদ-সম্পর্কিত এই ধারণার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কাশী পাঠালেন। কাশী থেকে তাঁরা সংবাদ নিয়ে ফিরে এলেন যে, উপনিষদেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অর্চনার কথা আছে; কিন্তু বেদে বহু দেবতার অস্তিত্ব ও অর্চনার উল্লেখ আছে। এই আবিষ্কারের অপরিহার্য ফলস্বরূপ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্ম-সমাজে বেদের অভ্রান্তবাদ পরিত্যক্ত হলো। এই ব্যাপার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন যে এই ঘটনাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে দেশে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রথম উল্লেখযোগ্য আন্দোলন।[৩৪] তা'হলেও সম্ভবতঃ এই ধরনের আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলেই দেবেন্দ্রনাথের আমলে ব্রাহ্ম-সমাজ সাময়িকভাবে প্রাণবেগ হারিয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে যিনি ব্রাহ্ম-সমাজকে আবার গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তোলেন, তিনি হলেন কেশবচন্দ্র সেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁর সত্যকার নেতৃত্ব চলেছিল ১৮৫৮ থেকে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নবজাগরণের অভিব্যক্তি-ধারার প্রথম প্রান্তে রাজা রামমোহন রায়, দ্বিতীয় প্রান্তে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ। উভয়েই যুগাবতার, উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনে উভয়েই সমন্বয়সাধিকা প্রতিভার মূর্ত বিগ্রহ। কিন্তু একজন মূলতঃ যুক্তিবাদী, অপরজন মূলতঃ ভক্তিবাদী। বাংলা দেশ প্রধানতঃ ভক্তিবাদের দেশ। ভক্তিবাদের গাঙ্গেয় প্রবাহে রামমোহন যে

যুক্তিবাদের জোয়ার জাগিয়ে তুলেছিলেন, ঐতিহাসিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে সেই জোয়ার এই শতাব্দীর শেষপাদে তাই প্রাকৃতিক নিয়মেই স্তিমিত হয়ে এলো। রামকৃষ্ণদেবের সহজিয়া যুক্তি-শোধিত ভক্তিবাদ স্বামী বিবেকানন্দের আধার আশ্রয় করে জগৎ জয় করলো। কারণ, 'ব্রাহ্মধর্মের শেষ পর্যায়ের কাহিনী হচ্ছে, যে প্রাচীনতর ধর্ম থেকে তার উদ্ভব ঘটেছিল, সেই ধর্মের মধ্যেই তার ক্রমাগত শোষিত হওয়ার কাহিনী।'[৩৫] তবে স্বাভিমত বা ব্যক্তিগত বিবেকের স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং একান্তভাবে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে ব্রাহ্ম-ধর্ম ভারতবর্ষের ধর্মীয় জীবনে এক নূতন ভাব-চেতনার সঞ্চার করেছিল এবং এ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের অভিমুখে অগ্রগমনকে ত্বরান্বিত করেছিল। এখানেই ব্রাহ্ম আন্দোলনের ঐতিহাসিক সার্থকতা।

ধর্ম-চেতনার এই পটভূমিকাতেই বিপিনচন্দ্র পালের আবির্ভাব।

॥ শিক্ষা-বিস্তার ॥

নবজাগরণের যুগে বাংলা দেশে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিবৃত্ত প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারের ইতিবৃত্ত। প্রারম্ভিক পর্যায়ে এই ইংরেজী শিক্ষা ছিল অংশত বিষ, অংশত অমৃত। কালে কালে অবশ্য তার বিষক্রিয়া ক্ষয়িত হয়ে তার অমৃতময়ী সঞ্জীবনী শক্তিই বাংলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনকে নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে ক্রমেই জাতির স্তিমিত মননশক্তি ও আচ্ছন্ন বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হয়। নবজাগ্রত ভারতের আত্মা প্রতীচ্য সভ্যতা ও আধুনিক জড়বিজ্ঞানের গ্রহণীয় অবদানসমূহকে আত্মস্থ করবার জন্য যেমন উন্মুখ হয়ে ওঠে তেমনি তাদের মারমুখী আহ্বানের সম্মুখীন হবার দুঃসাহসও অর্জন করে। ইংরেজী শিক্ষা-লব্ধ যুক্তিবাদের বলে বলীয়ান হয়েই সে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির যুগোচিত পুনর্মূল্যায়নে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই ইংরেজী শিক্ষাই নানা ভাষাভাষী, ভিন্ন ভিন্ন আচারাবলম্বী ভারতবাসীকে একই চিন্তা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জাতীয় সংহতির সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে। এই ইংরেজী শিক্ষার বলেই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবাসী নবীন জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত হয়ে ইংরেজ শাসনের সমালোচনায় ক্রমশঃ মুখর হয়ে ওঠে।

সরকারী উদ্যোগে ইংরেজী-শিক্ষা প্রসারের পূর্বে এদেশে জন-শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, এ কথা ঠিক নয়। পাঠশালা, টোল, মক্তব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের হিন্দু-মুসলমানদের শিক্ষা দান করা হতো। কিন্তু 'যে জ্ঞানের দ্বারা হৃদয়-মন সমুন্নত হয়, জগত ও মানবকে বুঝিবার সহায়তা হয়, এমন কোনও জ্ঞান দেশে বিদ্যমান ছিল না। এমন কি বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থসকল পণ্ডিতগণেরও অজ্ঞাত ছিল।'[৩৬] শিক্ষাক্ষেত্রের এই শোচনীয় অবস্থায় দেশের লোকের মন স্বভাবতঃই শিক্ষা-ব্যবস্থার যুগোচিত সংস্কারের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। এই সময়কার জন-মনোভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন—'বৎসরের পর বৎসর যতই ইংরাজ-রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, যতই ক্রমে শাসনকার্যের জন্য আইন-আদালত প্রভৃতি স্থাপিত হইতে লাগিল, যতই ইংরাজ বণিকগণ দলে দলে আসিয়া কলিকাতা শহরে আপনাদের বাণিজ্যাগার স্থাপন করিতে লাগিলেন, ততই এদেশীয়দের এবং বিশেষভাবে কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হইতে লাগিল।' সুতরাং এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগেই এদেশে ইংরেজী শিক্ষার পত্তন হয়। ডক্টর সুশীলকুমার দে ১৭৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যাপ্টেন বেলামিজ্ চ্যারিটি স্কুল'কেই বাংলা দেশের প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৭] এই স্কুল ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা ফ্রি স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

তৎকালীন ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায়, ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এদেশে এক বিশেষ ধরনের অনেকগুলি ইংরেজী স্কুল গড়ে ওঠে। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বৈষয়িক উন্নতির জন্য তখন কিছু ইংরেজী জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। ঐ সমস্ত স্কুলে সেই প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হতো। ঠিক ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান অর্জন বা শিক্ষা দানের আগ্রহ তখনও জাগ্রত হয়নি। তা'ছাড়া, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে এসেছিল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে, ঘটনাচক্রে পরে শাসন-কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই কোম্পানির শাসনের প্রথম আমলে ব্যবসায়িক উন্নতিই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য; শিক্ষার উন্নতিবিধানকে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাঁদের কর্তব্যের অঙ্গীভূত বলে মনে করেননি। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক

'কলিকাতা মাদ্রাসা' স্থাপন এবং ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে জোনাথান ডানকান কর্তৃক 'বেনারস সংস্কৃত কলেজ' স্থাপন এই পর্বের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই উভয় প্রতিষ্ঠানেই প্রাচ্য বিদ্যার পাঠ্যক্রম অনুসারে শিক্ষা দান করা হতো। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেকলে কর্তৃক বিখ্যাত 'মন্তব্যপত্র' পেশ করা পর্যন্ত সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার পুনরুজ্জীবন এবং এই শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ দান,—প্রকৃতপক্ষে এ-ই ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নীতি।

অষ্টাদশ শতকের নবম দশক থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলা দেশে তাই অনেক স্কুল স্থাপিত হলেও ইংরেজী শিক্ষা কোনো সুপরিকল্পিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন বাংলা দেশে নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে এই কলেজের গৌরবময় ভূমিকা অনস্বীকার্য। যদিও এই কলেজ ছিল প্রাচ্য বেশবাসের আবরণে প্রতীচ্য বিদ্যা বিতরণের পীঠস্থান, আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে প্রতীচ্য ভাবধারার প্রচার এর লক্ষ্য ছিল, তা'হলেও প্রাচ্য-মনস্কতাই ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই কলেজ দেশের প্রাচীন ও আধুনিক আঞ্চলিক ভাষার অনুশীলনের প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা'ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের শিক্ষাদানের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিদ্যার বিস্তারের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গুরুত্ব স্বভাবতঃই কম।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে (২০শে জানুয়ারি) বে-সরকারী উদ্যোগে 'মহাবিদ্যালয়' বা 'হিন্দু কলেজ' স্থাপনই প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে সুশৃঙ্খল রীতিতে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সঙ্গে দু'জন মহাপ্রাণ ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে জড়িত। একজন হলেন রাজা রামমোহন রায়, অপরজন ডেভিড হেয়ার।

নবীন ভারতবর্ষের সংগঠনে রাজা রামমোহনের ভূমিকা সুবিদিত। কথিত আছে, রামমোহনের নাম-সংযুক্তির ফলে পাছে হিন্দু কলেজ গোড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়, সেইজন্য তিনি স্বেচ্ছায় এই কলেজের পরিচালক সমিতিতে নিজের নাম সংযোজনে অস্বীকৃতি জানান। তবে তাঁর অলক্ষ্য সক্রিয় সহযোগিতা সর্বদা এই কলেজের কল্যাণকামনায় নিয়োজিত ছিল। আর ডেভিড হেয়ার ছিলেন লণ্ডনের একজন ঘড়ি-নির্মাতার পুত্র। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে

পঁচিশ বছর বয়সে তিনি ঘড়ির ব্যবসায় করতে কলকাতায় আসেন। কিন্তু আর পাঁচজন স্বদেশবাসীর মতো তিনি অর্থ আয় করে দেশে ফিরে যাননি। তিনি তাঁর প্রবাসকেই স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের মহান সঙ্কল্পসাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর সমস্ত অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োজিত করেছিলেন। ডেভিড হেয়ার না ছিলেন সরকারী কর্মচারী, না ছিলেন ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁর ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষাও ছিল সীমাবদ্ধ। শুধু বিশুদ্ধ জনহিত-ব্রতের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি এক অসামান্য কাজে আত্মনিয়োগ করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তকদের অন্যতম-রূপে ডেভিড হেয়ারের নাম তাই আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি আপার চিৎপুর রোডের গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে মাত্র ২০ জন ছাত্র নিয়ে হিন্দু কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। পরে সেখান থেকে কলেজ চিৎপুরের রূপনারায়ণ রায়ের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়, তারপর স্থানান্তরিত হয় জোড়াসাঁকোর ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে। তারও পরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি কলেজ স্কোয়ারের উত্তর দিকে ডেভিড হেয়ার প্রদত্ত একখণ্ড জমির উপর এই কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে এই ভূমিখণ্ডের উপর নির্মিত গৃহে কলেজ স্থানান্তরিত হয়। 'ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষাদানের অগ্রাধিকার অঙ্গীকার করে নিয়ে প্রথমে এখানে ইংরেজী, ফারসী, সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য প্রস্তাবিত হয়। তবে অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ থেকে ফারসী শিক্ষাও বন্ধ হয়ে যায়।'[৩৮] যাই হোক, হিন্দু কলেজের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাদান এবং ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সমগ্র শিক্ষা-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে এই কলেজ একটি প্রজন্মের মহত্তম আকাঙ্ক্ষার মূর্তিমান প্রতীকে পরিণত হয়েছিল,—যে প্রজন্ম নবীন শিক্ষা-ব্যবস্থাকে শুধু রুজি-রোজগারের উপায় মনে না করে মেধা, বুদ্ধি ও নৈতিক শক্তির উন্নতি-বিধায়ক উপায় বলে গ্রহণ করেছিল"।[৩৯]

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ডের উদ্যোগে শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন ঊনবিংশ শতকে বাংলা দেশে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসের

প্রাথমিক পর্বে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এঁরা ছিলেন খৃষ্টান ধর্মযাজক এবং এঁদের উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে এদেশবাসীকে খৃষ্টান-ধর্মে দীক্ষিত করা। তা' সত্ত্বেও বহু যুবক তাদের ধর্মমত বিসর্জন না দিয়েও এই কলেজ থেকে প্রাচ্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করেছিল। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের জন্য বে-সরকারী উদ্যোগ, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের জন্য মিশনারীদের আগ্রহ—এই উভয় ব্যাপার এদেশে নিয়মিত ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তনে সরকারের সক্রিয় মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

এদেশে বিধিবদ্ধভাবে ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ইতিবৃত্তটি চিত্তাকর্ষক। অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ এ বিষয়ে সম্মতি দান করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে যখন সনদ আইন পাস হয়, তখন মিস্টার উইলবার-ফোর্স সেই বছরের সনদ-আইনে দু'টি ধারা সংযুক্ত করে ভারতবর্ষে স্কুলমাস্টার পাঠাবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের জন্য তাঁকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেই ধারা দু'টি প্রত্যাহৃত হয়। একজন ডিরেক্টর স্পষ্টতঃই বলেন যে আমেরিকায় ইংরেজী স্কুল-কলেজ স্থাপনের ফলে আমেরিকা তাঁদের অধিকার-চ্যুত হয়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তাঁরা একই রকম ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে ইচ্ছুক নন। নেটিভেরা যদি লেখাপড়া শিখতে চায়, তা'হলে তাদের অবশ্যই ইংলণ্ডে আসতে হবে।[৫০] উনবিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত তাঁরা এই দ্বিধাগ্রস্ততা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ক্রমশঃ দেশবাসীর মধ্যে যখন উচ্চশিক্ষার আগ্রহ প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগলো তখন কোম্পানির সরকার বাধ্য হয়ে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে 'কমিটি অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' নামে একটি সমিতি গঠন করলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সনদ-আইন পাসের সময় বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক প্রথম ভারতীয় জনগণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে দশ হাজার পাউণ্ড ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর হয়। কিন্তু সেই অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়ের জন্য কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় না। তার কারণ, এ দেশের জনশিক্ষা পুরানো দেশীয় শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে অথবা আধুনিক য়ুরোপীয় শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে নির্ধারিত হবে—এ সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের সময় লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত এই কমিটির সুপারিশক্রমেই লর্ড বেণ্টিঙ্কের সরকার ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চের এক সিদ্ধান্তে ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই বিধিবদ্ধ করেন। বিধিবদ্ধভাবে ইংরেজী

শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিবৃত্তের সঙ্গে মেকলের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মেকলের অজ্ঞতাজনিত অবজ্ঞা সুবিদিত।[৪১] তিনি স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির বশেই এদেশে ইংরেজী শিক্ষা পত্তনের জন্য ওকালতি করেছিলেন। তিনি জানতেন, অস্ত্রের দ্বারা রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু দেশের মানুষের হৃদয় জয় না করতে পারলে রাজ্য রক্ষা করা যায় না। মেকলের মনে হয়েছিল পরাধীন ভারতবাসীর হৃদয় জয় একমাত্র ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারের দ্বারাই সম্ভব। তাঁর দূরদর্শী কল্পনায় এ কথাও ধরা পড়েছিল যে, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করে হয়তো ভারতবাসী একদিন ইউরোপীয়দের মতো স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি করে বসবে। যদি তা-ই হয়, তাতেও আতঙ্কের কোনো কারণ নেই। সেদিন হয়তো ইংরেজকে তার 'শস্ত্রে জয়-করা সাম্রাজ্য' হারাতে হবে কিন্তু 'শাস্ত্রে জয়-করা সাম্রাজ্য' অক্ষয় হয়ে থাকবে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কমনস্-সভায় যে সনদ-আইন পাস হয়, তাতে জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে কোম্পানি সরকারের অধীনে যে কোনো ভারতবাসীর উচ্চতন পদ-প্রাপ্তির অধিকার স্বীকৃত হয়। কমনস্-সভার সভ্যরূপে মেকলে সেই অধিবেশনে এই ধারার সমর্থনে যে বক্তৃতা করেছিলেন, সে বক্তৃতাটি মেকলের স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশী সভ্যতার জন্য সোচ্চার গর্ববোধ এবং ভারত-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দূরদৃষ্টির জন্য ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা লাভ করেছে। সে-বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন—'আমাদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের ভাগ্য ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ইতিহাসের দিক থেকে যে রাজ্যের সঙ্গে অন্য কোনো রাজ্যের মিল নেই, যে রাজ্য রাজনৈতিক দিক থেকে একক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, তার জন্য কোন্ ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে আছে তা' অনুমান করা কঠিন। ......তবে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে হয়তো তারা ভবিষ্যতে কোনোদিন য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠান দাবি করতে পারে। সে রকম দিন কোনোদিন আসবে কিনা আমি বলতে পারিনে। যদি আসেই আমি তাকে এড়াতে বা রুখতে চেষ্টা করবো না। কারণ, সেই দিন হবে ইংরেজদের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবের দিন। ...রাজদণ্ড আমাদের অধিকার-বিচ্যুত হতে পারে। ...অস্ত্রের জয় বিপর্যস্ত হতে পারে। কিন্তু আর এক প্রকারের জয় আছে যা' কোনো বিপর্যয়ের অধীন নয়। আর এক সাম্রাজ্য আছে যা' প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের নিয়ম থেকে মুক্ত। সেই জয় হচ্ছে যুক্তির সাহায্যে বর্বরতা-বিজয়; সেই সাম্রাজ্য হচ্ছে আমাদের সাহিত্য, শিল্প, ন্যায়-নীতি

ও আইনের অবিনশ্বর সাম্রাজ্য'।[৪২] মেকলের এই উক্তি যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতই হোক্, তাঁর দূরদৃষ্টি যে ভ্রান্ত নয়, মহাকাল তা' অনেকাংশে প্রমাণ করেছে।

এর পর মেকলে ভারতবর্ষে আসেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই কমিটি অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। কমিটির সভ্যগণ তখন প্রাচ্যরীতি বা প্রতীচ্যরীতিতে শিক্ষাদান সম্পর্কে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল,—দুই শিবিরে বিভক্ত। রক্ষণশীল শিবির প্রাচ্যবাদী (ওরিয়েণ্টালিস্ট) ও প্রগতিশীল শিবির প্রতীচ্যবাদী (য়্যাঙ্গলিসিস্ট) নামে পরিচিত। মেকলে ছিলেন শেষোক্ত শিবিরের সমর্থক। মেকলের ওজস্বী বাগ্মিতা বহুদিনের বাদানুবাদের অবসান ঘটালো। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চের ঘোষণায় লর্ড বেণ্টিঙ্কের সরকার ইংরেজী শিক্ষাকে নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী সরকারী ভাষারূপে অভিষিক্ত হলো। বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সমস্ত গৌরব মেকলের প্রাপ্য নয়। কারণ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই বাংলা দেশে বে-সরকারী প্রচেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। 'তা' সত্ত্বেও, এদেশে ইংরেজী শিক্ষার ভাগ্য নির্ধারণে মেকলের প্রভাব ছিল অপরিসীম এবং এই বিষয়ে জনসাধারণের মনে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা বিদ্যমান রয়েছে, তা' অনেকাংশে ন্যায্য'।[৪৩]

বেণ্টিঙ্কের ঘোষণার পর সরকারী অর্থে প্রাচ্য গ্রন্থের মুদ্রণ বন্ধ হয়ে গেল। শিক্ষাবিস্তারের জন্য এ যাবৎ নির্ধারিত সরকারী অর্থ ইংরেজী শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয়িত হওয়া শুরু হলো। মেডিক্যাল কলেজ ছাড়াও অবিলম্বে ছয়টি নতুন স্কুল স্থাপিত হলো। পরের বছর আরও ছয়টি নতুন স্কুল যুক্ত হলো। ১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে সরকারের অধীনে সর্বসাকুল্যে ২৩টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল। তবে ক্রমশঃই সংস্কৃত ও আরবী স্কুলের সংখ্যা কমে আসতে লাগলো। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ আর একটি ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়। বিদ্যালয়ে পাঠ্য-পুস্তকাদির মুদ্রণ ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, স্থাপনা-কাল থেকে ঐ সময় পর্যন্ত এক লক্ষেরও বেশী বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় সাড়ে একত্রিশ হাজার ইংরেজী পুস্তক বিক্রীত হয় এবং সেই সূত্রে বিনিযুক্ত মূলধনের উপর শতকরা কুড়ি ভাগ লাভ হয়। অথচ এডুকেশন কমিটি সংস্কৃত ও আরবী পুস্তক মাত্র ৫২ খানা বিক্রয় করতে পেরেছিলেন।[৪৪]

এইভাবে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে মুখ্যতঃ ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে বাংলা দেশে শিক্ষা-বিস্তারের সূচনা হতে থাকে। তাই বলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান-ব্যবস্থা লুপ্ত হলো না। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে 'কাউন্সিল অব্ এডুকেশন' গঠিত হলো। এই কাউন্সিল অবশ্য উচ্চশিক্ষার উপরেই জোর দিয়েছিলেন। এই কাউন্সিল যখন কাজ আরম্ভ করেন, তখন সরকারী পরিচালনাধীনে মাত্র ৭টি কলেজ ও ১৬টি ইংরেজী স্কুল ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন ডাইরেক্টরেট অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন স্থাপিত হয় তখন স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪৭। কিন্তু দেড় বছরের মধ্যেই ৭৯টি ইংরেজী স্কুল এবং ১৪০টি দেশী (ভার্নাকুলার) স্কুল সরকারী সাহায্য পেতে থাকে।[৪৫]

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাসম্পর্কিত আদেশপত্রে (এডুকেশন ডেস্‌পাচ) প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সুবিন্যস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা লিপিবদ্ধ হলো। এই পত্রে মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞার জন্য দুঃখপ্রকাশ করা হলো। প্রকৃতপক্ষে এই সময় প্রথম শিক্ষা প্রকাশ্যে সরকারের অন্যতম পবিত্র কর্তব্য বলে স্বীকৃতি লাভ করলো। এর পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার স্বর্ণযুগের সূচনা হলো।

ইংরেজী তথা আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ইতিবৃত্তের সঙ্গে 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আবার ইয়ং বেঙ্গলের প্রসঙ্গে হেনরী লুইস্ ভিভিয়ান ডিরোজিওর নামের উল্লেখ অপরিহার্য। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতার ইণ্টালী অঞ্চলে এক পর্তুগীজ বংশোৎপন্ন ফিরিঙ্গি পরিবারে ডিরোজিওর জন্ম হয়। ছয় বছর বয়স থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ডিরোজিও ডেভিড ড্রুমণ্ড নামীয় জনৈক স্কচ ভদ্রলোক স্থাপিত ধর্মতলার একাডেমিতে শিক্ষালাভ করেন। ড্রুমণ্ড ছিলেন কবি, ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এঁরই সান্নিধ্যে ডিরোজিওর প্রতিভার উন্মেষ হয়। অতি অল্প বয়সেই তিনি ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন এবং সর্বোপরি স্বাধীন চিন্তার অনুশীলনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ডিরোজিও ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে হিন্দু কলেজে ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক-রূপে যোগদান করেন।[৪৬] তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো বছর।

এই ডিরোজিও-ই প্রকৃতপক্ষে ইয়ং বেঙ্গলের স্রষ্টা। 'ডিরোজিও'র সংস্রবে এসেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনে মহা বিপ্লব ঘটতে শুরু করে। তাঁর শিক্ষণ-প্রয়াস শুধু ক্লাসঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি

একাডেমিক 'অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি বিতর্ক-সভা স্থাপন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগানবাড়িতে এই সভার সাপ্তাহিক অধিবেশন বসতো। এখানে সন্ধ্যার পর ডিরোজিও এই সভার সম্পাদক উমাচরণ বসুর সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হতেন। সভায় সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা হতো। ছাত্ররা সত্যসন্ধানী জিজ্ঞাসুর মতো আলোচনায় যোগদান করতো। এই সভার সভ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই ইয়ং বেঙ্গলদের প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ডেভিড হেয়ার নিয়মিতভাবে এই সভায় যোগদান করতেন। ডিরোজিও পদত্যাগ করবার পর হেয়ারই এই সভার সভাপতি হন।

ডিরোজিওর শিক্ষা ও সান্নিধ্যে একদল বাঙালী তরুণ এমন নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার পূজারী হয়ে উঠলেন, যা' উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। প্রকাশ্যে সুরাপান, প্রকাশ্যে হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধাচরণ, মন্ত্রপাঠের পরিবর্তে 'ইলিয়াড'-এর ছত্র পাঠ, ব্রাহ্মণ যুবকদের উপবীত-ত্যাগ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচলিত প্রথা ও মূল্যবোধকে কথায় ও কাজে অস্বীকারের ফলে ইয়ং বেঙ্গল উচ্ছৃঙ্খল তরুণ সম্প্রদায় বলে গণ্য হলেন। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন—'তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সংস্কৃত ও জ্ঞানালোক-সম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা।' [৪৭] এই সমস্ত কারণে কলকাতার জনসমাজ হিন্দু কলেজ তথা ইয়ং বেঙ্গলের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ডিরোজিওকে অপসারিত করা স্থির করলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল ডিরোজিও পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর সংস্রব দীর্ঘস্থায়ী হলো না কিন্তু তিনি তরুণ-মনে যে অভিনব ভাবনার তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করে গেলেন, তার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। বন্যার জল যখন অতর্কিতভাবে প্রবল বেগে জনপদকে প্লাবিত করে, তখন তার তরঙ্গাঘাতে হয়তো প্রাচীন সৌধের ভিত্তিমূল শিথিল হয়, হয়তো দু'একটি সৌধ ভূমিসাৎ হয়; কিন্তু যে পলিমাটি সে রেখে যায়, আগামী দিনের পক্ষে তার কল্যাণকর ভূমিকা অস্বীকার করা অসম্ভব। ইয়ং বেঙ্গলের ক্রিয়া-কলাপ আচার-আচরণ সবই যে সমর্থনীয়

শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিবৃত্তের সঙ্গে মেকলের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মেকলের অজ্ঞতাজনিত অবজ্ঞা সুবিদিত।[৪১] তিনি স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির বশেই এদেশে ইংরেজী শিক্ষা পত্তনের জন্য ওকালতি করেছিলেন। তিনি জানতেন, অস্ত্রের দ্বারা রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু দেশের মানুষের হৃদয় জয় না করতে পারলে রাজ্য রক্ষা করা যায় না। মেকলের মনে হয়েছিল পরাধীন ভারতবাসীর হৃদয় জয় একমাত্র ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারের দ্বারাই সম্ভব। তাঁর দূরদর্শী কল্পনায় এ কথাও ধরা পড়েছিল যে, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করে হয়তো ভারতবাসী একদিন ইউরোপীয়দের মতো স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি করে বসবে। যদি তা-ই হয়, তাতেও আতঙ্কের কোনো কারণ নেই। সেদিন হয়তো ইংরেজকে তার 'শস্ত্রে জয়-করা সাম্রাজ্য' হারাতে হবে কিন্তু 'শাস্ত্রে জয়-করা সাম্রাজ্য' অক্ষয় হয়ে থাকবে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কমনস্-সভায় যে সনদ-আইন পাস হয়, তাতে জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে কোম্পানি সরকারের অধীনে যে কোনো ভারতবাসীর উচ্চতন পদ-প্রাপ্তির অধিকার স্বীকৃত হয়। কমনস্-সভার সভ্যরূপে মেকলে সেই অধিবেশনে এই ধারার সমর্থনে যে বক্তৃতা করেছিলেন, সে বক্তৃতাটি মেকলের স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশী সভ্যতার জন্য সোচ্চার গর্ববোধ এবং ভারত-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দূরদৃষ্টির জন্য ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা লাভ করেছে। সে-বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন—'আমাদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের ভাগ্য ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ইতিহাসের দিক থেকে যে রাজ্যের সঙ্গে অন্য কোনো রাজ্যের মিল নেই, যে রাজ্য রাজনৈতিক দিক থেকে একক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, তার জন্য কোন্ ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে আছে তা' অনুমান করা কঠিন। ······তবে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে হয়তো তারা ভবিষ্যতে কোনোদিন য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠান দাবি করতে পারে। সে রকম দিন কোনোদিন আসবে কিনা আমি বলতে পারিনে। যদি আসেই আমি তাকে এড়াতে বা রুখতে চেষ্টা করবো না। কারণ, সেই দিন হবে ইংরেজদের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবের দিন। ···রাজদণ্ড আমাদের অধিকার-বিচ্যুত হতে পারে। ···অস্ত্রের জয় বিপর্যস্ত হতে পারে। কিন্তু আর এক প্রকারের জয় আছে যা' কোনো বিপর্যয়ের অধীন নয়। আর এক সাম্রাজ্য আছে যা' প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের নিয়ম থেকে মুক্ত। সেই জয় হচ্ছে যুক্তির সাহায্যে বর্বরতা-বিজয়; সেই সাম্রাজ্য হচ্ছে আমাদের সাহিত্য, শিল্প, ন্যায়-নীতি

ও আইনের অবিনশ্বর সাম্রাজ্য'।[৪২] মেকলের এই উক্তি যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতই হোক্, তাঁর দূরদৃষ্টি যে ভ্রান্ত নয়, মহাকাল তা' অনেকাংশে প্রমাণ করেছে।

এর পর মেকলে ভারতবর্ষে আসেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই কমিটি অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। কমিটির সভ্যগণ তখন প্রাচ্যরীতি বা প্রতীচ্যরীতিতে শিক্ষাদান সম্পর্কে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল,—দুই শিবিরে বিভক্ত। রক্ষণশীল শিবির প্রাচ্যবাদী (ওরিয়েন্টালিস্ট) ও প্রগতিশীল শিবির প্রতীচ্যবাদী (য়্যাঙ্গলিসিস্ট) নামে পরিচিত। মেকলে ছিলেন শেষোক্ত শিবিরের সমর্থক। মেকলের ওজস্বী বাগ্মিতা বহুদিনের বাদানুবাদের অবসান ঘটালো। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চের ঘোষণায় লর্ড বেন্টিঙ্কের সরকার ইংরেজী শিক্ষাকে নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী সরকারী ভাষারূপে অভিষিক্ত হলো। বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সমস্ত গৌরব মেকলের প্রাপ্য নয়। কারণ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই বাংলা দেশে বে-সরকারী প্রচেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। 'তা' সত্ত্বেও, এদেশে ইংরেজী শিক্ষার ভাগ্য নির্ধারণে মেকলের প্রভাব ছিল অপরিসীম এবং এই বিষয়ে জনসাধারণের মনে তার ভূমিকা সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা বিদ্যমান রয়েছে, তা' অনেকাংশে ন্যায্য'।[৪৩]

বেন্টিঙ্কের ঘোষণার পর সরকারী অর্থে প্রাচ্য গ্রন্থের মুদ্রণ বন্ধ হয়ে গেল। শিক্ষাবিস্তারের জন্য এ যাবৎ নির্ধারিত সরকারী অর্থ ইংরেজী শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয়িত হওয়া শুরু হলো। মেডিক্যাল কলেজ ছাড়াও অবিলম্বে ছয়টি নতুন স্কুল স্থাপিত হলো। পরের বছর আরও ছয়টি নতুন স্কুল যুক্ত হলো। ১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে সরকারের অধীনে সবসাকুল্যে ২৩টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল। তবে ক্রমশঃই সংস্কৃত ও আরবী স্কুলের সংখ্যা কমে আসতে লাগলো। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ আর একটি ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়। বিদ্যালয়ে পাঠ্য-পুস্তকাদির মুদ্রণ ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, স্থাপনা-কাল থেকে ঐ সময় পর্যন্ত এক লক্ষেরও বেশী বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় সাড়ে একত্রিশ হাজার ইংরেজী পুস্তক বিক্রীত হয় এবং সেই সূত্রে বিনিযুক্ত মূলধনের উপর শতকরা কুড়ি ভাগ লাভ হয়। অথচ এডুকেশন কমিটি সংস্কৃত ও আরবী পুস্তক মাত্র ৫২ খানা বিক্রয় করতে পেরেছিলেন।[৪৪]

এইভাবে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে মুখ্যতঃ ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে বাংলা দেশে শিক্ষা-বিস্তারের সূচনা হতে থাকে। তাই বলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান-ব্যবস্থা লুপ্ত হলো না। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে 'কাউন্সিল অব্ এডুকেশন' গঠিত হলো। এই কাউন্সিল অবশ্য উচ্চশিক্ষার উপরেই জোর দিয়েছিলেন। এই কাউন্সিল যখন কাজ আরম্ভ করেন, তখন সরকারী পরিচালনাধীনে মাত্র ৭টি কলেজ ও ১৬টি ইংরেজী স্কুল ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন ডাইরেক্টরেট অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন স্থাপিত হয় তখন স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪৭। কিন্তু দেড় বছরের মধ্যেই ৭৯টি ইংরেজী স্কুল এবং ১৪০টি দেশী (ভার্নাকুলার) স্কুল সরকারী সাহায্য পেতে থাকে।[8৫]

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাসম্পর্কিত আদেশপত্রে (এডুকেশন ডেস্‌পাচ) প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সুবিন্যস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা লিপিবদ্ধ হলো। এই পত্রে মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞার জন্য দুঃখপ্রকাশ করা হলো। প্রকৃতপক্ষে এই সময় প্রথম শিক্ষা প্রকাশ্যে সরকারের অন্যতম পবিত্র কর্তব্য বলে স্বীকৃতি লাভ করলো। এর পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার স্বর্ণযুগের সূচনা হলো।

ইংরেজী তথা আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ইতিবৃত্তের সঙ্গে 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আবার ইয়ং বেঙ্গলের প্রসঙ্গে হেনরী লুইস্ ভিভিয়ান ডিরোজিওর নামের উল্লেখ অপরিহার্য। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতার ইন্টালী অঞ্চলে এক পর্তুগীজ বংশোৎপন্ন ফিরিঙ্গি পরিবারে ডিরোজিওর জন্ম হয়। ছয় বছর বয়স থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ডিরোজিও ডেভিড ড্রুমণ্ড নামীয় জনৈক স্কচ ভদ্রলোক স্থাপিত ধর্মতলার একাডেমিতে শিক্ষালাভ করেন। ড্রুমণ্ড ছিলেন কবি, ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এঁরই সান্নিধ্যে ডিরোজিওর প্রতিভার উন্মেষ হয়। অতি অল্প বয়সেই তিনি ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন এবং সর্বোপরি স্বাধীন চিন্তার অনুশীলনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ডিরোজিও ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে হিন্দু কলেজে ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক-রূপে যোগদান করেন।[৫৬] তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো বছর।

এই ডিরোজিও-ই প্রকৃতপক্ষে ইয়ং বেঙ্গলের স্রষ্টা। 'ডিরোজিও'র সংস্রবে এসেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনে মহা বিপ্লব ঘটতে শুরু করে। তাঁর শিক্ষণ-প্রয়াস শুধু ক্লাসঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি

একাডেমিক 'অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি বিতর্ক-সভা স্থাপন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগানবাড়িতে এই সভার সাপ্তাহিক অধিবেশন বসতো। এখানে সন্ধ্যার পর ডিরোজিও এই সভার সম্পাদক উমাচরণ বসুর সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হতেন। সভায় সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা হতো। ছাত্ররা সত্যসন্ধানী জিজ্ঞাসুর মতো আলোচনায় যোগদান করতো। এই সভার সভ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই ইয়ং বেঙ্গলদের প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ডেভিড হেয়ার নিয়মিতভাবে এই সভায় যোগদান করতেন। ডিরোজিও পদত্যাগ করবার পর হেয়ারই এই সভার সভাপতি হন।

ডিরোজিওর শিক্ষা ও সান্নিধ্যে একদল বাঙালী তরুণ এমন নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার পূজারী হয়ে উঠলেন, যা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। প্রকাশ্যে সুরাপান, প্রকাশ্যে হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধাচরণ, মন্ত্রপাঠের পরিবর্তে 'ইলিয়াড'-এর ছত্র পাঠ, ব্রাহ্মণ যুবকদের উপবীত-ত্যাগ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচলিত প্রথা ও মূল্যবোধকে কথায় ও কাজে অস্বীকারের ফলে ইয়ং বেঙ্গল উচ্ছৃঙ্খল তরুণ সম্প্রদায় বলে গণ্য হলেন। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন—'তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সংস্কৃত ও জ্ঞানালোক-সম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা।'[৪৭] এই সমস্ত কারণে কলকাতার জনসমাজ হিন্দু কলেজ তথা ইয়ং বেঙ্গলের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ডিরোজিওকে অপসারিত করা স্থির করলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল ডিরোজিও পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর সংস্রব দীর্ঘস্থায়ী হলো না কিন্তু তিনি তরুণ-মনে যে অভিনব ভাবনার তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করে গেলেন, তার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। বন্যার জল যখন অতর্কিতভাবে প্রবল বেগে জনপদকে প্লাবিত করে, তখন তার তরঙ্গাঘাতে হয়তো প্রাচীন সৌধের ভিত্তিমূল শিথিল হয়, হয়তো দু'একটি সৌধ ভূমিসাৎ হয়; কিন্তু যে পলিমাটি সে রেখে যায়, আগামী দিনের পক্ষে তার কল্যাণকর ভূমিকা অস্বীকার করা অসম্ভব। ইয়ং বেঙ্গলের ক্রিয়া-কলাপ আচার-আচরণ সবই যে সমর্থনীয়

ছিল তা' নয়। হয়তো অনেক ভুলও তাঁরা করেছিলেন। কিন্তু 'এই পথেই, যত ভুল পথ তা' হোক্ না কেন, মধ্যযুগীয় বাংলা আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত হতে চলেছিল'।[৪৮]

শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের প্রসঙ্গটিও আলোচনার দাবি-রাখে। বাংলাদেশে ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন বা বেথুন সাহেবের নাম সুবিদিত। তিনি ছিলেন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি এবং গভর্নর-জেনারেলের মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য। পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পণ্ডিতপ্রবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের পরামর্শে ও সাহায্যে তিনি এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতিবিধানে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে প্রতিষ্ঠিত বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্ত্রীশিক্ষাদরদী বেথুন সাহেবের সক্রিয় প্রয়াসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'কিন্তু ১৮৪৯ সালে মহাত্মা বীটন বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান করিলেন বলিয়া এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে, বঙ্গদেশে তাহাই স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রচলন। বহুকাল পূর্ব হইতেই এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল'।[৪৯]

স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম সার্থক উদ্যোগের গৌরব ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'র প্রাপ্য। শ্রীরামপুরের ধর্মযাজকত্রয়ীর অন্যতম ওয়ার্ড তখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডে অনুকূল জনমত গঠন করেন। সোসাইটির মহিলা সভ্যগণ কলকাতার নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। রাধাকান্ত দেব ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। তিনি সোসাইটির প্রচেষ্টাকে নানাভাবে সাহায্য করলেন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার রচিত 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থখানি রাধাকান্ত দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। স্ত্রীশিক্ষা যে অশাস্ত্রীয় নয় এবং এতে যে ব্যবহারিক দোষ নেই, 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থে তারই প্রামাণ্য স্বীকৃতি ছিল।

কলকাতা স্কুল সোসাইটির কয়েকজন মহিলা সভ্যের অনুরোধে লণ্ডনের ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কুমারী কুক (মিস্ কুক) নামে জনৈক শিক্ষিতা মহিলাকে এদেশে পাঠালেন। কুমারী কুক এসে দেখলেন যে স্কুল সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়েছে এবং তাঁকে বেতন দিয়ে নিযুক্ত করবার মতো আর্থিক সঙ্গতি সোসাইটির নেই। তখন চার্চ মিশনারীর সভ্যগণ অগ্রসর হয়ে কুকের ভার গ্রহণ করলেন। ঐ মিশনের অধীনে থেকে তিনি পরম উৎসাহে আপন সংকল্পসাধনে উদ্যোগী হলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮২২

খৃষ্টাব্দের মধ্যেই আটটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২ এবং ছাত্রীসংখ্যা ৪০০ জন। এর পর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে 'লেডিস্ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন ইন ক্যালকাটা অ্যাণ্ড ইটস্ ভিসিনিটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং চার্চ মিশনারীর অধীনস্থ স্কুলগুলি লেডিস্ সোসাইটির পরিচালনাধীনে আসে। এইভাবে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা ক্রম-বিস্তার-মুখী হতে থাকে।

তবে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন নিয়ে কলকাতার হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন বিষয়কে কেন্দ্র করে গোড়া হিন্দু সমাজে যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তার সুন্দর একটি বাক্‌চিত্র উপহার দিয়েছেন: 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' মহানির্বাণতন্ত্রের এই বচনালঙ্কৃত নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গাড়ি যখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিত ও নানা কথা কহিত; এবং সুকুমারমতি শিশু-বালিকাদিগকে উদ্দেশ করিয়া কত অভদ্র কথাই কহিত। লোকে বলিতে লাগিল—এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না।······বঙ্গের রসিক কবি ঈশ্বর গুপ্তও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন:

> "যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে সবে,
> এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে;
> আর কিছুদিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
> আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।" ৫০

বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে রাধাকান্ত দেব, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতা যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বেথুন-স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের পর সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত নির্দেশপত্রে (ডেস্‌পাচ) সুশৃঙ্খল শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলনের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও বিলাতী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হ্যালিডে শিক্ষাবিস্তারের কাজে অগ্রণী হন। বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর

সহযোগী। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং নদীয়ায় বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ছিল মোট ১,৩০০ এবং বিদ্যালয় পরিচালনার মোট ব্যয় ছিল মাসিক ৮৪৫ টাকা।[৫১] ভারত সরকার অবশ্য এই সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্য স্থায়ী অর্থ সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন। ফলে, বিদ্যালয়গুলি শোচনীয় অবস্থায় পড়ে। সরকারী সাহায্যের আশা না থাকলেও বালিকা বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর নিরাশ হলেন না। বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য তিনি এক নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার স্থাপন করলেন।

আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের এই পরিবেশে বিপিনচন্দ্র পালের আবির্ভাব।

॥ সাহিত্য-সম্ভার ॥

উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণ বাঙালীকে যে 'সর্বাঙ্গীণ সমাজ-সংস্কার প্রয়াস'-এ উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল, সেই প্রয়াসের অঙ্গীভূত হয়েই আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের জয়যাত্রার সূচনা।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগ-পরিবর্তনকে বিশেষ কোনো সন-তারিখের দ্বারা চিহ্নিত করা কঠিন। কারণ, পরিবর্তনের ধারাটি যথেষ্টভাবে বেগবান না হওয়া পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর পরে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের তিরোধানকালকে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অবসান-কাল বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু একথা কখনই সত্য নয় যে, ভারতচন্দ্রের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী-মানস মধ্যযুগীয় ভাবাবেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে আধুনিক যুগের ভাবে ও ভাবনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যে আধুনিকতার সুর সঞ্চারিত হতে এই সময় থেকে কমপক্ষে অর্ধ-শতাব্দীকাল লেগেছিল। ডক্টর সুশীল কুমার দে সমস্ত পরিস্থিতি বিচার করে ১৮০০ খৃষ্টাব্দকেই বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা-কাল বলে গণ্য করেছেন।[৫২] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ সত্যই এক উল্লেখযোগ্য কাল। কারণ, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়ে বাংলা গদ্যের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, আর এই বাংলা গদ্যভাষাই হয় নূতন যুগের সাহিত্যের অপরিহার্য বাহন।

গদ্যরীতির উদ্ভব, মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন, সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তা' হলেও এই অর্ধ-শতাব্দীকাল সাহিত্যসৃষ্টির দিক থেকে বন্ধ্যাকাল,—প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সাহিত্যের প্রস্তুতি-কাল, একথা অনস্বীকার্য। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলকভাবে হলেও, প্রাথমিক পর্বের ইউরোপীয় ও ভারতীয় লেখকদের নিষ্ঠাময় শ্রম যে বীজ বপন করেছিল, যথাসময়ে সেই বীজই অঙ্কুরিত হয়ে আধুনিক যুগের মহান্ মনোরম বিকাশে পরিণত হয়েছিল। আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় বিকাশ-কাল প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।[৫২]

প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাস সে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিবৃত্তের সঙ্গে অপরিহার্য সম্পর্কে আবদ্ধ। বাংলা দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস হচ্ছে মোগল শাসনের পতন এবং বৃটিশ শাসনের পত্তন ও ক্রম-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভের বঙ্গ-বিজয় বাঙালীর ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা সন্দেহ নেই। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীরা সেদিন এই ঘটনাকে ঠিক দেশ-বিজয়ের ঘটনা মনে করে এর প্রতি বিশেষ কোনো গুরুত্ব আরোপ করেননি। বাণিজ্যিক স্বার্থ-সংরক্ষণের প্রতিই তখন তাঁদের সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। ইংরেজ-বিরোধী সিরাজের পতনে ইংরেজদের নিরঙ্কুশ বাণিজ্যিক স্বার্থের অন্তরায় দূরীভূত হলো—এই ধারণাই ছিল সেদিন তাঁদের পরম সান্ত্বনা। পরিবর্তিত মোগল-শাসন-ব্যবস্থার অধীনে থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দেও ক্লাইভ নাকি 'মহান্ মোগল-শক্তির পুনরুজ্জীবন' করতে পেরেছেন বলে আত্ম-প্রসাদ লাভ করেছিলেন।[৫৩] সিরাজের পতনের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তাই ইংরেজদের মনোযোগ এদেশের শাসন-ব্যবস্থার শৈথিল্য দূরীকরণের দিকে আকৃষ্ট করে। মীরজাফরের কুশাসন সম্পর্কে সন্দেহাতীত ধারণা থাকা সত্ত্বেও কোম্পানি তাঁকে উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর হননি। নিজেদের স্বার্থের দিক থেকে অল্পবিস্তর সংস্কার সাধন করে দেশীয় শাসন-ব্যবস্থাই তাঁরা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। দেশীয় শাসকদের অপদার্থতাই ক্রমশঃ শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে তাঁদের অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেয়। এইভাবেই 'বণিকের মানদণ্ড' ধীরে ধীরে একদা 'রাজদণ্ড'-রূপে দেখা দিয়েছিল। বাংলাদেশে বৃটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠালাভে তাই প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগেছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশের রাষ্ট্র ও সমাজের ইতিহাস বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার ইতিহাস। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু নবাবী শাসনের নানাবিধ অনাচার-অত্যাচার, অন্যদিকে কোম্পানির অসাধু ইংরেজ কর্মচারীদের অব্যাহত শোষণ বাঙালীর প্রাণশক্তিকে পঙ্গুপ্রায় করে ফেলেছিল। তখন দ্বৈত-শাসনের কাল। শাসন করেন নবাব, শোষণ করে ইংরেজ। দেশের উপর ইংরেজ প্রভুত্ব বিস্তার করে চলেছে অথচ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের কোন আগ্রহ নেই। তারা শুধু রাজস্বের প্রাপ্য অংশ পেলেই খুশী। এই দ্বৈত-শাসনের সাঁড়াশী-পেষণে বাঙালীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। যে জমিদারশ্রেণীর মানুষ ছিলেন এযাবৎ সাহিত্য-শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, দ্বৈত-শাসনের চাপে তাঁরাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। এর মধ্যে এলো ১৭৬৯-৭০-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ,—যা' 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। ডক্টর সুশীল কুমার দে জানিয়েছেন যে, হেস্টিংসের ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের লেখা থেকে জানা যায়, এই দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে লোকক্ষয়ের পরিমাণ ছিল মোট অধিবাসীসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ; কুড়ি বছর পরে কর্নওয়ালিশ সরকারীভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে বাংলা দেশের এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল জনহীন জঙ্গলে পরিণত হয়ে হিংস্র বন্য প্রাণীর আবাসভূমি হয়েছিল।[৫৪] মন্বন্তরের পরিণাম শুধু লোকক্ষয়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। সর্বনাশা বিশৃঙ্খলার সুযোগে সারা দেশ চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির অবাধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

পলাশীর যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বিশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা অনেকাংশে তুলনীয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তুর্কী আক্রমণের সময় থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ইলিয়াস্ শাহী সুশাসন প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত সার্ধ-শতাব্দী কালের মধ্যে যেমন বাংলা সাহিত্যে মৌলিক সৃষ্টির কোনো নিদর্শন মেলে না, তেমনি পলাশীর যুদ্ধের পর লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত অর্ধ-শতাব্দীকালের বাংলা দেশেও উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-চর্চার নিদর্শন বিরল। এই বিপর্যয়ের যুগে এক শ্রেণীর স্থূলরুচি স্বভাব-কবি ভবানীবিষয়ক এবং রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গান রচনা করে বাংলা কাব্যের শূন্য মঞ্চমুখর করে রেখেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের পরিচয় 'কবিওয়ালা' এবং এঁদের রচিত গান 'কবি-গান' নামে পরিচিত। কবি-গানের অস্তিত্বের কাল-সীমা সপ্তদশ শতাব্দীর কোনো সময় থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও ডক্টর সুশীল কুমার দে

বিদ্যাসাগর

১৭৬০ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে কবি-গানের সমৃদ্ধির যুগ বলে উল্লেখ করেছেন। কবিওয়ালাদের মধ্যে নিতাই বৈরাগী, রাসু ও নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, রামানন্দ নন্দী, রাম বসু, ভোলা ময়রা, এণ্টুনি ফিরিঙ্গির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে রাম বসু প্রমুখ কেউ কেউ উচ্চ কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হলেও এঁরা কোনো স্থায়ী কবি-কীর্তি রেখে যেতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় এর কারণের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন—'ইংরেজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবিদলের গান।……তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিকসম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া আমোদের উত্তেজনা চাহিত—তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না'।[৫৫] 'আমোদের উত্তেজনা' সৃষ্টিই যে রচনার উদ্দেশ্য তার সাহিত্যিক মূল্য নগণ্য হওয়াই স্বাভাবিক। তা' সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে 'প্রাচীন যুগের সিদ্ধিকে নবীন যুগের আগন্তুকদের হাতে সমর্পণ করিয়া ইঁহারা প্রাচীন-নবীনের সংযোগকে সুদৃঢ় করিয়াছেন। এবং সে গুরুব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন কবিওয়ালাদের উত্তর-সাধক—কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত'।[৫৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাঙালীর সমাজ-ব্যবস্থায় যেমন রূপান্তর ঘটতে থাকে, তেমনি তার সাহিত্যও গতানুগতিক ধারা পরিহার করে আধুনিকতার অভিমুখী হয়।

ডক্টর সুকুমার সেনের ভাষায়—'বিলাতী সংস্কৃতির ও শিক্ষার প্রভাবে নগর-বাসী ভদ্র বাঙালীর যে মানসিক পরিবর্তন শুরু হইল তাহার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবাহে গতিপরিবর্তন ঘটিল। প্রথমে হইল রি-অ্যাকশান, আত্মরক্ষার চেষ্টা। ইহারই ফলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির ব্যঙ্গ-কবিতায় বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি অবজ্ঞা ও ধিক্কার ধ্বনিত হইয়াছে। তাহার পর দেখা দিল ব্যাপকভাবে সমাজসংস্কার-প্রচেষ্টা। এই সমাজ-সচেতনতা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম লক্ষণ'।[৫৭] এই 'রি-অ্যাকশান' ও সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টা—দ্বৈতসত্তায় বাঙালী-মানসের এই আত্মপ্রকাশের আকৃতি যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের পূর্বেই দেখা দিয়েছিল, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গবিদ্রূপমূলক সামাজিক নকশাজাতীয় পুস্তিকাগুলি (নববাবুবিলাস, নববিবি-

বিলাস ইত্যাদি) এবং রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কারমূলক রচনাসমূহ (ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, গোস্বামীর সহিত বিচার, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ, চারি প্রশ্নের উত্তর, পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ প্রভৃতি) তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে।

প্রাচীন ধারা ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালীর সাহিত্য-চর্চা প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় ধারাকে আশ্রয় করেই অগ্রসর হয়েছিল। প্রাচীন ধারার বাহন ছিল পদ্য-ভাষা আর আধুনিক ধারার বাহন গদ্য-ভাষা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অবশ্য মুখ্যত গদ্য-ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্তের দ্বারা চিহ্নিত। কিন্তু এই গদ্যের উদ্ভবের নেপথ্যে অন্তরঙ্গ প্রেরণার চেয়ে বহিরঙ্গ প্রভাব ছিল অধিকতর ক্রিয়াশীল। বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও প্রসারের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং শ্রীরামপুর মিশনের অবদান অগ্রগণ্য। ইউরোপীয় ধর্মযাজকদের সাহায্যে খৃষ্টধর্মের বাণী-প্রচার এবং শাসনকার্যে সুবিধার জন্য তরুণ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্যেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা। ইতিহাসের বিচারে সে উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিল বলা চলে না। কিন্তু উদ্যোক্তাদের অলক্ষ্যে বাংলা গদ্য যে সাহিত্যিক ভাষার রূপ পরিগ্রহণে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। আর এই কৃতিত্বের সর্বাপেক্ষা গৌরব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপকরূপে উইলিয়ম কেরীর প্রাপ্য। কেরীর নিজস্ব বাংলা রচনা সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, চণ্ডীচরণ মুন্সী, গোলোকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখ দেশীয় পণ্ডিত ও লেখকেরা বাংলা গদ্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছাড়া আর কারও সামনেই সুনির্দিষ্ট আদর্শ ছিল না। একমাত্র তিনিই 'সচেতন শিল্পিমন ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ লইয়া গদ্যনির্মিতির ভিত্তি রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন'।[৫৮] বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত সুষমা আবিষ্কারের প্রথম গৌরব মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাপ্য। বাংলা গদ্যে নানাবিধ রচনা-রীতি প্রবর্তন ও লাবণ্য সঞ্চার করে তিনি বিদ্যাসাগরের গদ্য-চর্চার পথ সুগম করে গিয়েছিলেন। তা' হলেও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক-গোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রয়াস ঐতিহাসিক দিক থেকে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে শ্রীরামপুর

মিশনের অবদানও স্মরণীয়। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ব্যতীত শ্রীরামপুর মিশন হয়তো অর্জিত সিদ্ধির অধিকারী হতে পারতো না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক-গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা মুখ্যতঃ ছাত্র-পাঠ্য গ্রন্থরচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু 'বাংলা গদ্যের কায়াকান্তি গঠনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পুস্তক-পুস্তিকাগুলির যে অল্পাধিক প্রভাব রহিয়াছে তাহা সর্বথা স্বীকার্য'।[৫৯] এই কলেজের অস্তিত্ব ১৮৫৪ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল তবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণায় এর ঐতিহাসিক ভূমিকা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে রামমোহন-পর্বের সূচনা এবং এর স্থিতি-কাল ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই হিন্দু কলেজ (১৮১৭), কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), কলকাতা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮) স্থাপিত হয় এবং এই সময়-সীমার মধ্যেই দিগ্‌দর্শন (১৮১৮), সমাচার-দর্পণ (১৮১৮), ব্রাহ্মণ-সেবধি (১৮২১), সম্বাদ-কৌমুদী (১৮২১), সমাচার-চন্দ্রিকা (১৮২২), সংবাদ-প্রভাকর (১৮৩১) প্রভৃতি সাময়িক পত্রের উদ্ভব হয়। আধুনিক জ্ঞান-বিদ্যা এবং গদ্যাশ্রয়ী সাহিত্যের প্রসারে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং সাময়িক পত্রের ভূমিকা যেমন অবশ্যস্বীকার্য, তেমনি রামমোহনের কীর্তি-খ্যাতি প্রতিষ্ঠায় এদের অবদান অনস্বীকার্য।

রামমোহনের গদ্য-চর্চা সাহিত্য-সৃষ্টির ইচ্ছা-প্রণোদিত নয়, সমাজ-সংস্কার-প্রয়াস-প্রসূত। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের আদর্শ সামনে রেখেই তিনি গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন। একদিকে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি মিশনারীদের হীন আক্রমণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারণ, অন্যদিকে দেশীয় পণ্ডিতদের ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রতি আক্রমণ—এই দুই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই তাঁকে লেখনী ধারণ করতে হয়েছিল। রামমোহনের প্রথম গদ্য-রচনা (বেদান্ত-গ্রন্থ, বেদান্ত-সার) প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে। এর পর তিনি অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। এগুলির প্রেরণা-উৎস যা-ই হোক্, প্রতিপক্ষের যুক্তি-খণ্ডন এবং আত্মপক্ষের বক্তব্য সমর্থন করতে গিয়ে তিনি অজ্ঞাতসারে বাংলা সাহিত্যকে আদর্শ যুক্তিতর্কের ভাষা দান করে গেছেন। রামমোহনের রচনা-রীতি সম্বন্ধে অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন বলেছেন—'রামমোহনের রচনায় বিশেষত্ব কি? চিন্তাধারার সুস্পষ্টতা, অনাবশ্যক শব্দের বর্জন, উচ্ছ্বাসরাহিত্য, সুনির্বাচিত অর্থভূয়িষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ'।[৬০]

রামমোহনের পর যাঁদের লেখনী-গুণে বাংলা গদ্য-ভাষা ধীরে ধীরে পূর্ণাবয়ব সাহিত্যিক বাহনে রূপান্তরিত হয়, তাঁদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

মহর্ষির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'স্বরচিত জীবনচরিত' ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—এ ঘটনা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দশকের ঘটনা। তখন বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা গদ্য অনেক দূর অগ্রগত হয়েছে। তবে এর অনেক পূর্বের রচনা 'ব্রাহ্ম-ধর্ম' (১৮৫১-৫২), 'ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা' (১৮৬২) প্রভৃতির মধ্যেই মহর্ষির সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় মেলে। মুখ্যতঃ ব্রাহ্ম-সমাজ এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার জন্য রচিত হলেও এইসব রচনা কথ্য-বাক্‌রীতিকে আশ্রয় করে সাধুরীতির গদ্যেও প্রাঞ্জলতা সঞ্চার করেছিল।

অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী'র (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ) প্রথম সম্পাদক ও প্রধান লেখক। 'তত্ত্ববোধিনী' ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপত্র হলেও গদ্যরূপের সুসংগঠনে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে এবং সৃজনরুচির পরিবর্তনসাধনে এই পত্রিকার অবদান স্মরণীয়। অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ রচনা 'তত্ত্ববোধিনীর' পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দুই ভাগে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১৮৭০, ১৮৮৩)' পরবর্তীকালের ঘটনা। এর পূর্বে প্রকাশিত দুইখণ্ড 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫২, ১৮৫৩), 'চারু পাঠ' তিন ভাগ (১৮৫২-৫৯) এবং 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬) তাঁর স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষরে সমুজ্জ্বল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের আদি প্রবক্তারূপে অক্ষয়কুমারের নাম অগ্রগণ্য। 'অক্ষয়কুমার রসস্রষ্টা সাহিত্যিক ছিলেন না, তাঁর রচনাতে পদলালিত্য বা সাহিত্যিক মাধুর্য নাই। কিন্তু তাঁহার গদ্যভঙ্গি ছিল সহজ, সরল, নিরাড়ম্বর এবং প্রকাশক্ষম।...পাশ্চাত্ত্য প্রথায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন বাঙ্গালা দেশে তিনিই প্রথম করেন। ভাষায় ও ভাবে বাঙ্গালা দেশে নবজাগরণের অরুণালোকের আভাস দেখিয়াছিল তাঁহারই মনীষা'।[৬১]

রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগরের গদ্য-চর্চাও মুখ্যতঃ সমাজ-সংস্কার-প্রয়াস-প্রসূত। তা'হলেও শিল্পি-ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর-সমন্বিত গদ্যরীতির প্রথম উদ্ভাবক

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথও বিদ্যাসাগরকেই বাংলা গদ্যের 'প্রথম যথার্থ শিল্পী' বলে উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র প্রথম প্রকাশকাল ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ। এর পূর্বে তিনি 'বাসুদেবচরিত' নামে একখানি গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সেখানি অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র পর একে একে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮), 'জীবনচরিত' (১৮৪৯), 'বোধোদয়' (১৮৫১), 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (দু'খণ্ডে—১৮৫৫) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অসম্পূর্ণ 'বিদ্যাসাগর-চরিত স্বরচিত' (১৮৯১) এবং 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৯২) গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষার সমুন্নতি অধিকতর লক্ষণীয় হলেও এ দু'খানি অনেক পরবর্তীকালের রচনা। প্রথম জীবনের গ্রন্থগুলির মধ্যেই তাঁর সাহিত্যিক মনীষা উদ্ভাসিত। বাক্যকে শ্বাস-পর্ব এবং সার্থ-পর্বে ভাগ করে প্রয়োজনমতো ছেদ-চিহ্নের নিয়মিত ব্যবহারের সাহায্যে পদ-লালিত্য সৃষ্টি এবং অর্থগ্রহণের পথ সহজ করবার কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরেরই প্রাপ্য। কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলেছেন—'ভাষার সঙ্গীতগুণই যে সাহিত্য-সৃষ্টির আদি প্রেরণা, তাহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, বাংলা গদ্যের রূপটি উদ্ধার করিতে কোন্ নিগূঢ় শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় গদ্যের ছন্দ-ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই উপরে বঙ্কিম ও পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের কারুকীর্তির অশেষ নিদর্শন নির্মাণ করিয়াছেন'।[৬২]

ভারতচন্দ্র এবং কবিওয়ালাদের অনুবর্তন করেই বাংলা সাহিত্যে কবি-সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব। ভারতচন্দ্রের তিরোধানের পর রঙ্গলাল-মধুসূদনের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ে বাংলা কাব্যের ধারাকে যাঁরা লুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমে কবি-ওয়ালারা, পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উল্লেখযোগ্য। ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কবিওয়ালাদের যুগ, ১৮৩০ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত ঈশ্বর গুপ্তের যুগ।

বিখ্যাত 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকার যোগ্য সম্পাদকরূপে তিনি সেকালের প্রবীণ ও নবীন উভয় শ্রেণীর সাহিত্যিকদের আকৃষ্ট করেছিলেন। প্রবীণদের মধ্যে যেমন রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য, তেমনি নবীনদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্রের নাম উল্লেখের দাবি রাখে। 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর সম্পাদকরূপে

তাঁর গদ্য-রচনা এবং স্বদেশ-চেতনা ঐতিহাসিক মহিমার অধিকারী। তা'হলেও মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর মুখ্য পরিচয়—তিনি কবি।

ঈশ্বর গুপ্ত যখন বাংলা সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হন তখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার দ্বন্দ্বে বাঙালীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার, রামমোহন-প্রবর্তিত একেশ্বরবাদী ধর্মমতের প্রচার, ডিরোজিও-শিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায় কর্তৃক ভারতীয় সংস্কৃতির অস্বীকার প্রভৃতি ঘটনার ফলে সনাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৌধে তখন ভাঙন শুরু হয়েছে। বাঙালীর জাতীয় জীবন তখনও সমন্বয়ের মন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেনি; রক্ষণশীল সম্প্রদায় সেই ভাঙনরোধের চেষ্টায় ব্যগ্র। এই অবস্থায় 'সাধারণ বাঙালী যে চিত্তসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল, ঈশ্বর গুপ্তও সেই যুগ-জিজ্ঞাসার কবলে পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সেই মনোদ্বন্দ্ব ও চেতনার বিরোধ তাঁহার অসংখ্য কবিতায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া আছে। তাঁহার কবিতার মধ্যেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালী চিত্ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে'।[৬৩]

উচ্চতর কবিত্ব-শক্তির অধিকারী না হলেও সেইকালে ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন কবি-শিরোমণি। মুখ্যতঃ স্ব-সম্পাদিত পত্রিকার চাহিদাপূরণের জন্য রচিত হলেও তাঁর কবিতা বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন বিচিত্র, সংখ্যার দিক থেকেও তেমন অজস্র। ব্যঙ্গ-কবিতাগুলিই তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাতেই প্রথম 'দেবদেবীর মাহাত্ম্য নয়, কোন অসাধারণ ঘটনা বা চরিত্র নয়, পৌষপার্বণ, তপসে মাছ, পাঁঠা, আনারস, বড়দিন প্রভৃতি দৈনন্দিন বাঙালী-জীবনের অকিঞ্চিৎকর বস্তু বা ব্যাপার সাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয়ের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল'।[৬৪]

দ্বৈতচারিতা সে সময়ের যুগ-স্বভাবের প্রায় অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের শিল্পী-স্বভাবে এই দ্বৈতচারিতার বিস্ময়কর নিদর্শন মেলে। ঈশ্বর গুপ্ত কৌলীন্য-প্রথা ও বহুবিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছেন, আবার বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে ও স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলনে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। একদিকে বৃটিশ শাসনের মহিমা কীর্তন করে লিখেছেন—'উড়ুক বৃটিশ-ধ্বজা সমুদয় স্থলে', অন্যদিকে স্বদেশ-প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন—'কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'। আবার 'কানপুরের জয়' শীর্ষক কবিতায় ঝাঁন্সীর রানীকে

'টোঁটকাটা কাকী' বলে তাঁর দেশাত্মবোধক সংগ্রামকে ব্যঙ্গ করেছেন। 'ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়-যুগের কবি নন, সংঘর্ষ-যুগের কবি। তাই তাঁহার কবিতায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্যতার তাল ঠোকাঠুকির চিত্রই প্রধান হইয়াছে। তিনি ইহাদের সমন্বয়ের নির্দেশ দেন নাই, পরন্তু নিজেকে একটি পক্ষে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই সভ্যতা-দ্বন্দ্বে একটি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।......তাঁহার মধ্যে আধুনিকতার যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা ঐ যুগেরই লক্ষণ, ঈশ্বরচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি নয়।......তাই ঈশ্বরচন্দ্র আধুনিক যুগের স্রষ্টা নন, আধুনিক যুগের নকিব'।[৬৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পুরানো ভাবধারার সঙ্গে যখন নতুন ভাবধারার সংঘর্ষ ঘটে, তখন দ্বৈতচারিতা সম্ভবত জাতির আত্মচৈতন্যের একটি অপরিহার্য লক্ষণরূপে দেখা দেয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যখন বঙ্গদেশে কাব্য-সাধনায় রত, ইংল্যাণ্ডে তখন ভিক্টোরীয় যুগ চলছে। ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে ইংরেজী সাহিত্যের জনৈক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ঐ যুগের প্রবণতা-সমূহের নেপথ্যে অপরিহার্যভাবে স্বভাবগত দ্বৈত মনোভাব (এসেনশিয়াল ডুয়েলিটি অব্ ক্যারাক্টার) লক্ষ্য করেছেন এবং সমগ্রভাবে সেই যুগ-লক্ষণকে 'দি সার্চ ফর ব্যালান্স' বা ভারসাম্যের সন্ধান বলে পরিচায়িত করেছেন।[৬৬]

প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দ থেকেই বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য প্রকাশিত হয়ে বাংলা কাব্যে গুপ্ত-যুগের অবসান ঘটে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন দত্তর 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' প্রকাশিত হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে টেকচাঁদ ঠাকুরের (পারীচাঁদ মিত্র) 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থ-সাহিত্যে চলিতভাষা ব্যবহারের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে বাংলা গদ্যের এক নতুন দিগন্তের সন্ধান এনে দেয়।

এই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দেই বিপিনচন্দ্র পালের আবির্ভাব।

॥ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনার ক্রমপ্রসার ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নবজাগরণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির কোনো উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রাখতে পারেনি সত্য, কারণ এই নবজাগরণ ইতালীর রেনেসাঁসের মতো ফ্লোরেন্সের সমকক্ষ কোনো উৎপাদনকেন্দ্র বা ভেনিসের সমকক্ষ

বাণিজ্যিক কেন্দ্র সৃষ্টি করতে পারেনি। তবু পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন-আমলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে ভাঙা-গড়ার সম্মুখীন হয় তা' এই প্রসঙ্গে আলোচনার দাবি রাখে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মোগল সভ্যতাকে 'ব্যয়িত বুলেট' (স্পেণ্ট বুলেট) আখ্যা দিয়ে মোগলশাসনাধীনে দেশের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে আচার্য যতুনাথ সরকার জানিয়েছেন যে, দেশের শাসকসম্প্রদায় ছিলেন শোচনীয়ভাবে অসাধু ও অযোগ্য এবং জনসাধারণের অধিকাংশ মুষ্টিমেয় স্বার্থপর, দম্ভী এবং অযোগ্য শাসক-গোষ্ঠীর পীড়নে চরম দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও নৈতিক অধঃপতনের স্তরে উপনীত হয়েছিল। তা' সত্ত্বেও দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার নিজস্ব বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য পরিমাণে বেশী ছিল। হিন্দু, আর্মেনীয় এবং মুসলমান বণিকেরা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল, তুরস্ক, আরব, পারস্য এমনকি তিব্বতের সঙ্গেও বাণিজ্যিক আদানপ্রদানে ব্যস্ত ছিল। বাংলা দেশের মুখ্য রপ্তানি-দ্রব্য ছিল কাপাস-তুলা এবং রেশমনির্মিত বস্ত্রাদি, কাঁচা রেশম, চিনি, লবণ, পাট, সোরা এবং আফিঙ। কাপাস তুলার কাপড়, বিশেষতঃ ঢাকাই মসলিনের চাহিদা সারা পৃথিবীতে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল চিনি-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। মোটের উপর দেশে প্রায় পূর্ণ কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা ছিল এবং ভূমিহীন সর্বহারা বলে কিছু ছিল না'।[৬৭]

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদে ভাঙনের সূচনা হয়। প্রথমেই অর্থ-নিষ্কাশনের (ইকনমিক ড্রেন) কথা উল্লেখ্য। মীরজাফর এবং মীরকাসিমকে বাংলার মসনদ প্রাপ্তির জন্য ইংরেজকে প্রচুর অর্থ দিতে হয়। এইভাবে '১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন অর্থ-নিষ্কাশনের পালা সাঙ্গ হলো, তখন দেখা গেল নিষ্কাশিত অর্থের পরিমাণ এক কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে'।[৬৮] পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার অন্তর্বাণিজ্যের লবণ, সুপারি এবং তামাকের ব্যবসায়ে ইউরোপীয়দের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কোম্পানির কর্মচারীরা অন্তর্বাণিজ্যের এই তিনটি পণ্য নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলো। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরকাসিম যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখন কোম্পানির কর্মচারীরা এই মুখ্য পণ্যদ্রব্যগুলি ছাড়াও অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ব্যবসায় আত্মসাৎ করে বসেছে। বাংলার অন্তর্বাণিজ্যে এই ধরনের ব্যাপক বৃটিশ হস্তক্ষেপের ফলে প্রদেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভয়ানক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো।[৬৯] এইভাবে বৃটিশ

বণিকদের নির্দয় আঘাতে বাংলার প্রাচীন কুটিরশিল্পগুলি ধ্বংস হতে লাগলো। সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে হলো বাংলার তাঁতশিল্পকে। বয়ন-শিল্পীদের ইংরেজ বণিকদের কাছে তাদেরই ধার্য অন্যায্য মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করতে বাধ্য করা হতে লাগলো। শোনা যায়, তন্তুবায়-সম্প্রদায়ের অনেকে ইংরেজদের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি কেটে ফেলতেন। পলাশীর যুদ্ধের অর্ধ-শতাব্দীকালের মধ্যে এইভাবে বাংলার ঐতিহ্যময় সমৃদ্ধিশালী শিল্প-সমূহ চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ভারতীয় শিল্পের উন্নতিবিধানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আদৌ মনোযোগ ছিল না। যে কোনো উপায়ে বাণিজ্যিক স্বার্থের পরিপুষ্টিই ছিল কোম্পানির মূল নীতি। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ-আইনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার খর্ব করা হয় এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনদ-আইনে কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকার একেবারেই লুপ্ত হয়; কোম্পানি শুধু প্রশাসনিক সংস্থায় রূপান্তরিত হয়। তা' সত্ত্বেও এই বিষয়ে ইংরেজদের স্বভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ইংরেজ বণিকদের চক্রান্তে বাংলাদেশ কাঁচামালের বাজারে পরিণত হয়। এ দেশ থেকে ওদেশে কাঁচামাল আমদানি করে তা' থেকে শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করে এদেশের বাজারে বিক্রয়ের জন্য আমদানি করা শুরু হলো। নানাবিধ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কুটির-শিল্প যেটুকু অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল ইংলণ্ডের যন্ত্রজাত দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তা-ও অসম্ভব হয়ে উঠলো। এই অবস্থায় মৃতপ্রায় দশায় কালযাপন এবং বিলুপ্তি,—এই দুই বিকল্পের মধ্যে শোষিত প্রাণশক্তি নিয়ে বাঙালীর পক্ষে আর মৃতপ্রায় দশায় কালযাপনের সাধ্য রইল না।'[৭০]

এই প্রসঙ্গে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কর্নওয়ালিশ-প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। কর্নওয়ালিশের এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে রমেশচন্দ্র দত্ত 'বৃটিশজাতি কর্তৃক এযাবৎ ভারতে প্রবর্তিত ব্যবস্থাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত ও সার্থকতম ব্যবস্থা' বলে উল্লেখ করেছেন।[৭১] কারণ, তাঁর মতে এই সুব্যবস্থার জন্যই বাংলাদেশে আর দুর্ভিক্ষ হয়নি এবং এই ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণকে সুরক্ষিত করেছিল। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে বলতে হয় যে, কর্নওয়ালিশের এই ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার মিশ্র ফলপ্রসূ হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমির উপর জমিদারদের অধিকার পাকাপোক্ত করলো সন্দেহ নেই; কিন্তু রাজস্বের হার

অত্যন্ত উচ্চ হওয়ায় এবং অত্যন্ত কড়া নিয়মে সেই রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হওয়ায় অনেক জমিদার তা' নিয়মিত কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারলেন না। ফলে অনেকের জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে গেল। জমিদারেরা এই ভয়ে রাজস্বের অর্থ আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর উৎপীড়ন, অত্যাচার শুরু করলেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারী রাজস্ব পরিশোধের দিকে অত্যধিক নজর থাকায় কৃষিকল্যাণমূলক কাজে জমিদারদের ভূমিকা শোচনীয় হয়ে উঠলো। ফলে কৃষির উন্নতি না হয়ে অবনতিই ঘটলো। এইভাবে পল্লী-বাংলার ভূমিভিত্তিক সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দুর্বল হয়ে পড়লো। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' যদি জমিদারদের সঙ্গে না করে কৃষক-প্রজাদের সঙ্গে করা হতো, তা'হলে হয়তো তা' অবিমিশ্র-ভাবে শুভ ফলপ্রসূ হতো।

ইংরেজ আমলের অর্থনীতির দু'টি বিশিষ্ট অবদান—মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং মজুর শ্রেণী। 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী দুই প্রকার—(১) জমিবিহীন অর্থাৎ চাকরিজীবী বা সামান্য ব্যবসায়-জীবী এবং (২) সামান্য জমিজমাসম্পন্ন।······মজুর শ্রেণীর দুইটি প্রধান ভাগ—(১) গ্রামের ক্ষেতমজুর এবং (২) শহরের কলকারখানার মজুর।' এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের উদ্ভব ঘটে এবং নবযুগের নতুন শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে শ্রেণীবিরোধের বীজ উপ্ত হয়। 'ধনিকতন্ত্রের প্রথম যুগে সম্পদ-সচ্ছলতা হেতু এই বিরোধ তেমন স্পষ্ট হয় না।······বিংশ শতাব্দীতে এই শ্রেণী-সংগ্রাম স্পষ্ট ও ব্যাপক রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে'।[৭২] বলা বাহুল্য প্রাচীন কালের রক্ত-কৌলীন্যের পরিবর্তে আধুনিক কালের অর্থ-কৌলীন্যের উদ্ভবও বৃটিশ আমলের অর্থনীতির অবদান।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসা করা সত্ত্বেও শাসক ও শোষক রূপে ইংরেজের দ্বৈতসত্তার স্বরূপটি রমেশচন্দ্রের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধি-লগ্নে দাঁড়িয়ে তাই তিনি শান্তিরক্ষা, ন্যায়-বিধান এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে ইংরেজের শাসক-সত্তার যেমন সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, তেমন ইংরেজের কলঙ্কময় শোষক-সত্তার দিকেও স্পষ্টভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মন্তব্য করেছেন—'কিন্তু সূচনাকাল থেকেই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের আর্থিক সম্পর্ক সর্বদা অপরিচ্ছন্ন রয়ে গেছে ; এবং বিপুল সম্পদসম্ভার, উর্বরা ভূমি এবং পরিশ্রমী জনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসনের দেড় শতাব্দী পরে বর্তমান পৃথিবীতে দরিদ্রতম দেশে পরিণত'।[৭৩]

বৃটিশ ভারতে রাজনৈতিক চেতনা উদ্বোধনের প্রথম গৌরব অবিসংবাদিত ভাবে রাজা রামমোহন রায়ের প্রাপ্য। রামমোহন রায়ের রাষ্ট্র-চিন্তা সম্পর্কে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, অ্যারিস্টটলের নাম অঙ্গীকার করে যেমন পাশ্চাত্য দেশে রাষ্ট্র-চিন্তার ইতিহাসের প্রকৃত সূচনা, আধুনিক ভারতে রাষ্ট্র-চিন্তার ইতিহাস তেমন রাজা রামমোহন রায়ের পুণ্য নাম অঙ্গীকার করে শুরু হয়েছে। সুদীর্ঘ ত্রয়োবিংশ শতাব্দী পরে পাশ্চাত্য জগতে যেমন অ্যারিস্টটলের আদর্শে ফিরে যাবার চিন্তা সোচ্চার হয়ে উঠেছে, রাজার রাষ্ট্র-চিন্তার প্রকৃতি যথাযথভাবে উপলব্ধির পর আধুনিক ভারতে তেমন একদিন রামমোহনের আদর্শে ফিরে যাবার জন্য আন্দোলন সৃষ্ট হওয়াও অসম্ভব নয়।

রামমোহনের রাজনৈতিক আগ্রহ তাঁর সর্বাত্মক স্বাধীনতাপ্রিয়তা-প্রসূত। এই স্বাধীনতাপ্রিয়তা ছিল স্বভাবে উদার। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি যেমন ছিলেন সার্বজনীন ধর্মের প্রবক্তা, রাষ্ট্র-চিন্তার ক্ষেত্রেও তিনি তেমন ছিলেন সমস্ত মানুষের মুক্তিকামী। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা তাঁর ধারণায় পরস্পর-বিরোধী চেতনা ছিল না। আন্তর্জাতিকতাকে তিনি জাতীয়তার পরিপূরকরূপে মনে করতেন। তাই ইংল্যাণ্ডে যাবার পথে তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে, তখন দু'খানি ফরাসী জাহাজে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রতীক—ত্রিবর্ণ নিশান উড়তে দেখে সেই জাহাজে গিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ফিরে আসবার সময় 'ফ্রান্স, ধন্য ধন্য ধন্য' বলতে থাকেন। তাই ফ্রান্স-ভ্রমণের ছাড়পত্র চেয়ে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর কাছে যে পত্র তিনি লেখেন, তার মধ্যে বিশ্বমানবের মিলনের বাণী এবং আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে জাতিসঙ্ঘ গঠনের আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এখানেই রামমোহনের যুগাতীত ব্যক্তিত্বের পরিচয় সুস্পষ্ট। তিনি লিখেছিলেন—'......বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে বিশ্বের সমস্ত মানুষ একটি বিরাট পরিবারের অন্তর্গত, জাতি ও উপজাতিসমূহ তার বিচিত্র শাখা মাত্র।...আমি বলতে চাই, আমার মনে হয়, যদি প্রত্যেক দেশের পার্লামেণ্ট থেকে সমসংখ্যক সভ্য নিয়ে একটি কংগ্রেস গঠন করা হয় এবং দুই দেশের ভিতরকার বিরোধসমূহ মীমাংসার জন্য সেই কংগ্রেসে উত্থাপন করা হয়, তা' হলে সংবিধানসম্মত সরকারগুলির উদ্দেশ্যসিদ্ধি আরও সুন্দরভাবে হতে পারে;...'[৭৫] তাই ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে যে বৈপ্লবিক উত্থান ঘটে তা' তাঁর

হৃদয়কে আনন্দে আন্দোলিত করেছিল এবং বিলাতে প্রবাসকালে যখন 'রিফর্ম বিল' পাস হয় তখন তিনি সে সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিলেন।

বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'রাজার এই মানবতা তাঁহার রক্তের মধ্যে ছিল। সকল বাঙালীর রক্তের মধ্যে ইহা আছে। ভাগ্যবানের মধ্যে ফুটিয়া ওঠে, অন্যে এই দেবদুর্লভ বস্তুকে অজ্ঞাতসারে নিজের প্রকৃতির ভিতরে লুকাইয়া রাখে। রাজার অন্তর্নিহিত এই উদার মানবতার আদর্শ উপনিষদের শিক্ষা ও ব্রহ্মজ্ঞান সাধনার দ্বারা আশ্চর্যরূপে ফুটিয়াছিল'।[৭৬] এই ঔপনিষদিক শিক্ষার সঙ্গে মিশেছিল বিদেশী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের শিক্ষা। কারণ, তাঁর রাজনৈতিক ধারণা মন্টেস্ক, ব্ল্যাকস্টোন, এবং বেন্থামের ভাবধারায় পরিস্ফুট হয়েছিল, এবং তাঁদের রচনার সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় ছিল বলে মনে হয়।'[৭৭]

রামমোহন স্বাপ্নিক ছিলেন না ; তিনি ছিলেন বাস্তব সত্যে বিশ্বাসী। তিনি তাঁর দেশবাসীর তদানীন্তন মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সুদীর্ঘকালের পরশাসনে পঙ্গুপ্রায় জাতি তখন সদ্য-প্রতিষ্ঠিত শাসন-শৃঙ্খলায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে ; তার না আছে রাজনৈতিক শিক্ষা, না আছে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা। এমন জাতির পক্ষ নিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করা বৃথা। তাই বৃটিশ শাসনের কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য যে পরিমাণ নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার প্রয়োজন, তার জন্যই তিনি অক্লান্ত সংগ্রাম করে গেছেন। রামমোহনের নিম্নলিখিত বিষয়ক রচনাবলীকে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণার পরিচয়বাহী বলে উল্লেখ করেছেন—(১) হিন্দু উত্তরাধিকার আইনানুসারে নারীর প্রাচীন অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, (২) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সঙ্কোচন আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট এবং ইংলণ্ডেশ্বরের বরাবর আবেদন-পত্র, (৩) ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে লর্ড আমহার্স্টের নিকট লেখা পত্র, (৪) খৃষ্টধর্মী জনসাধারণের বরাবর চরম আবেদন, (৫) ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং পুরানো ও নতুন সীমানা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নকশা, (৬) ভারতবর্ষের বিচার ও রাজস্ব প্রথা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর, ইত্যাদি, (৭) ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের স্থায়িভাবে বসবাস সম্পর্কিত মন্তব্য, (৮) তাঁর পত্র ও বক্তৃতাসমূহ।[৭৮] সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে রামমোহন তাঁর কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে যে আন্দোলন সৃষ্টি করেন, তাকে বৃটিশ ভারতে প্রথম নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বলে উল্লেখ করা

চলে। এই আন্দোলন অবিলম্বে ফলপ্রসূ হয়নি। তবে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের এইটাই সম্ভবতঃ প্রথম দৃষ্টান্ত। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ জুরী আইনের-বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলনও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঐ আইনে যে কোনো হিন্দু অথবা মুসলমান অপরাধীর বিচারে অংশগ্রহণে ইউরোপীয় অথবা দেশীয় খৃষ্টানদের অধিকার স্বীকৃত হলো, কিন্তু দেশীয় বা ইউরোপীয় কোনো খৃষ্টান অপরাধীর বিচারে অংশগ্রহণে হিন্দু অথবা মুসলমানের অধিকার স্বীকৃত হলো না। জনৈক ইংরেজ বন্ধুর সহায়তায় রামমোহন হিন্দু-মুসলমান-স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্র পার্লামেন্টে দাখিল করে এই অবিবেকী আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন।

রামমোহন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেন, তা হিন্দুকলেজে শিক্ষিত একদল তরুণ কর্তৃক অনুসৃত হয়। এঁরা সকলেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ডিরোজিওর সান্নিধ্যে স্বদেশ-প্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। তাঁরাচাদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র এঁদের মধ্যে প্রধান। এঁরা সকলেই ছিলেন রাজনৈতিক চেতনায় অনুপ্রাণিত। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর রাজার বিলাতযাত্রার সময় থেকে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে জর্জ টমসনের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের অন্তর্বর্তী কালে এঁরা বাঙালীর অন্তরে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন।[৭৯] এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে এই সময়কার রাজনৈতিক চেতনায় বৃটিশ শাসনের প্রতি অনাস্থার সুর অনুপস্থিত। একদিকে বৃটিশ শাসনের কল্যাণকর ভূমিকায় বিশ্বাস, অন্যদিকে নিজেদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা সমকালীন রাজনীতি-চর্চার প্রধান ভাব ছিল।

ডিরোজিও-শিষ্যগণ ছাড়া আর যাঁরা রামমোহনের রাজনৈতিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন, তাঁদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর, 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'-সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত এবং 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ উল্লেখযোগ্য। দ্বারকানাথ এবং প্রসন্নকুমার উভয়েই নিয়মতান্ত্রিক পথে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য চেষ্টা করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে যে জমিদারি অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয় (পরে নাম হয় ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি) তাকেই 'বিশিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠান' বলে গণ্য

করা যেতে পারে।[৮০] মুখ্যত জমিদারদের স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হলেও রায়তদের সুযোগ-সুবিধাবিধানের দিকেও এই প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'ও নিজস্ব উপায়ে রাজনৈতিক চেতনাপ্রসারের সহায়তা করেছিল। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার মাধ্যমে এর যোগ্য সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত রায়তদের দুঃখদুর্দশা মোচনের জন্য বলিষ্ঠ লেখনী চালনা করে রাজনৈতিক আন্দোলনের পথকে সুগম করেছিলেন। নিজস্ব পত্রিকার স্তম্ভের মাধ্যমে অসহায় রায়তদের পক্ষসমর্থনের গৌরব ভারতীয় রূপে সর্বপ্রথম তাঁরই প্রাপ্য।[৮১]

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক চেতনার প্রসারে আর এক ধাপ অগ্রগতির সূচনা। রাধাকান্ত দেব হন এই সংস্থার সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সম্পাদক। এই সংস্থার বহুমুখী উদ্দেশ্যের মধ্যে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান গভর্নমেন্টের যোগ্যতাবৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রেট-বৃটেন এবং ভারতবর্ষের সাধারণ স্বার্থের উন্নতিবিধান ও পরাধীন দেশের প্রজা-বৃন্দের দুঃখদুর্দশা মোচনের প্রয়াস অঙ্গীভূত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই দেবেন্দ্রনাথ মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের নেতৃস্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে বৃটিশ শাসকবর্গের কাছ থেকে ভারতবাসীর সাধারণ সুখ-সুবিধা আদায়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাবি উত্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক পার্লামেন্টে যে আবেদন-পত্র পেশ করা হয়, তাকে ভারতীয় জনসংস্থা কর্তৃক প্রদর্শিত সংগঠনী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞতার প্রথম রাজনৈতিক দলিল বলে গণ্য করা যেতে পারে।[৮২] বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের এই সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি তত্ত্ববোধিনী-সভার সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার পরোক্ষ অবদান।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংঘটিত ওহাবী আন্দোলনের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ওহাবী আন্দোলনের জন্মভূমি আরবদেশ। রামমোহনের প্রায় সমকালীন মুসলমান নেতা রায়বেরেলির শাহ্ সৈয়দ আহ্মদ (১৭৮৬-১৮৩১) ওহাবী ভাবধারা ভারতবর্ষে আমদানি করেন এবং পাটনা হয় এই ভাবধারা-প্রচারের মুখ্য কেন্দ্র। ওহাবী আন্দোলন প্রকৃতিতে ভারতীয় ছিল না ; ওহাবী

আন্দোলন ছিল বিশুদ্ধ ইসলামী আন্দোলন। এর লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে দার-উল-হার্ব-এর পরিবর্তে দার-উল-ইসলাম (মুসলিম রাজ্য) প্রতিষ্ঠা করা। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পাঞ্জাবের শিখসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তবে ওহাবপন্থিগণ পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন যাবৎ বৃটিশের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে ওহাবী আন্দোলন বৃটিশ ভারতে প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনরূপে চিহ্নিত হবার যোগ্য।[৮৩] অবশ্য এই জাতীয়তাবাদ ছিল খাঁটি মুসলিম জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশে ২৪ পরগনা জেলার বারাসত অঞ্চলে তিতুমীর বা তিতুমিয়া নামে সুপরিচিত মীর নাসির আলি মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ওহাবী ভাবধারা প্রচার করেন এবং অচিরেই তিতুমীরের আন্দোলন বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। অল্পদিনের মধ্যেই অবশ্য তিনি ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে পর্যুদস্ত ও নিহত হন। সে যাই হোক্, 'ওহাবীদের ভিতর থেকেই প্রথম রাজনৈতিক আসামী দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। এঁরাই প্রথম সন্ত্রাস-বাদী'।[৮৪] ওহাবী আন্দোলনের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উপাদান থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক স্বভাবের ফলে এই আন্দোলন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারে নি।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস-বিখ্যাত সিপাহী-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম রূপে চিহ্নিত করা যায় কি না, এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে প্রবল মতভেদ বিদ্যমান। বাংলাদেশে অন্ততঃ সিপাহী-বিদ্রোহ তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাড়া জাগাতে পারে নি। তবে এ কথা স্বীকার্য যে, বিদ্রোহের পরবর্তী সময় থেকেই দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ দৃঢ়তর হতে থাকে এবং রাজনৈতিক চেতনায় বলিষ্ঠতা প্রকাশিত হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারির 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন: 'সেইদিন আগতপ্রায়, যেদিন ভারতবর্ষের সমস্ত সমস্যার সমাধান ভারতবাসীকেই করতে হবে'।[৮৫]

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের এই পর্বে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল আবির্ভূত হন।

॥ সূত্র-নির্দেশ

(১) সত্তর বৎসর : বিপিনচন্দ্র পাল, যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, ১৯৬২ পৃঃ ৫—৬

(২) 'কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্রকিরণ !/বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি! তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,/আসিবে ভারতে চির-বিষাদ-রজনী'। —পলাশীর যুদ্ধ : নবীনচন্দ্র সেন, ১ম সং (১৮৭৭), ৪র্থ সর্গ, পৃঃ ; ১৪

(৩) '...it was the beginning, slow and unpercieved, of a glorious dawn, the like of which the history of the world has not seen elsewhere'. —The History of Bengal, Vol. II, Edited by Sir Jadunath Sarker, University of Dacca, P. 497

(৪) 'Meanwhile Clive set out with 3,000 men.. Of these 2,200 were sepoys and topasses ; 800 European infantry and artillery men....After a momentary hesitation he reached Plassey at midnight 22-23 June, and found himself within striking distance of Siraj-Ud-daula's army, consisting of 50,000 men'.—The Cambridge History of India, Vol. V (First Indian Reprint) : H. H. Dodwell, PP. 149—150

(৫) 'It was truly a Renaissance, wider, deeper and more revolutionary than that of Europe after the fall of Constantinople'.—Sir Jadunath Sarker : op. cit. P. 498

(৬) A Short Histoy of Renaissance in Italy : John Addington Symonds. London, 1893, P. 1.

(৭) Ibid, P. 3.

(৮) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত The History of Bengal (1757—1905) গ্রন্থে বিধৃত ডক্টর অমরেশ ত্রিপাঠী রচিত 'Bengali Literature in the 19th century' শিরোনামীয় প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। ইতালীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে বঙ্গীয় নবজাগরণের বিশদ তুলনা করে ডক্টর ত্রিপাঠী উভয়ের ভিতরকার বৈসাদৃশ্যের দিকটি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন এবং বঙ্গীয় নবজাগরণকে তিনি 'রেনেসাঁস' না বলে 'cultural efflorescence' বলে উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৪৭৫)।

(৯) Sir Jadunath Sarker : op. cit., P. 498

(১০) কালান্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৫৫, পৃঃ ৫।

(১১) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (৩য় সংস্করণ) শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৩৬—৩৭

(১২) রামমোহনের জন্মের দুইটি সন (১৭৭২ এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ) প্রচলিত। রামমোহনের বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্তৃক নির্মিত ব্রিষ্টলের সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দই

রামমোহনের প্রকৃত জন্ম-সন বলে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাও দ্রষ্টব্য।—রামমোহন রায়: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৫ম সং পৃঃ ১২।

(১৩) Rammohan Roy : Dr. Brojendra Nath Seal, 1952, P. 2-3

(১৪) রামমোহন রায়: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৫ম সং পৃঃ ১৩—১৪

(১৫) ঐ ঐ পৃঃ ৪৮

(১৬) চিত্র-চরিত্র: প্রমথনাথ বিশী, ১৩৭২, পৃঃ ৪

(১৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩১

(১৮) 'I agree with you that in point of vices, the Hindus are not worse than the generality of Christians in Europe and America, but I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well-calculated to promote their political interest.......It is, I think, necessary that some changes should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort'.—The English Works of Raja Rammohan Roy, Allahabad, 1906, Pp. 929-30

(১৯) History of Indian Social and Political Ideas : Dr. Biman Behari Majumder, Calcutta, 1967, P. 24

(২০) উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ: ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত, কলিকাতা, ১৯৫৯, পৃঃ ১৯৮

(২১) Dr. Biman Behari Majumder : op. cit. P. 8

(২২) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯১—৯২

(২৩) শিবনাথ শাস্ত্রী: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮২—৮৩

(২৪) Dr. Biman Behari Majumder : op. cit. P. 12

(২৫) Dr. Biman Behari Majumder : op. cit., P. 15

(২৬) ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন: সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৬৩, সূচনা, পৃঃ ১

(২৭) Bengali Literature in the Nineteenth Century : Dr. Sushil K. Dey, 2nd Revised Edn., Cal. 1962, P. 548.

(২৮) 'The Raja by his finding this point of concord and convergence became the father and patriarch of modern India, an India with a composite nationality and synthetic civilisation.'—Dr. Brojendra Nath Seal : op. cit., P. 3

(২৯) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬১—৬২

(৩০) 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ : একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৪২৬

(৩১) চরিত-চিত্র—'সুরেন্দ্রনাথ' : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ১১৩—১১৪

(৩২) ভারতপথিক রামমোহন রায় : রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সং ১১শ খণ্ড, পৃঃ ৪২৬

(৩৩) 'This universal and completely non-sectarian character of the Brahmo Samaj as conceived and founded by Rammohan Roy makes it something radically different from the organization into which it was transformed in the days of Debendra Nath Tagore, Keshab Chandra Sen and Sivanath Sastri'.—The History of Bengal (1757-1905) C. U. P. 567.

(৩৪) 'This was really the first serious movement of rationalism and individualism in the country'.—The Brahmo Samaj and the battle for Swaraj : Bipin Chandra Pal, Sadharan Brahmo Samaj, (New Edn.), May, 1945, P. 15.

(৩৫) 'The story of Brahmoism, in its last phase, is the story of its progressive absorption within the older religion from which it had sprung'.—The History of Bengal (1757—1905), C. U. P. 573

(৩৬) শিবনাথ শাস্ত্রী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৪

(৩৭) Dr. S. K. De : op. cit., P. 458

(৩৮) Ibid, Part II, P. 480.

(৩৯) The History of Bengal (1759—1905). C. U. P. 436

(৪০) The Economic History of India (Vol. II) : Romesh Ch. Dutta, First Indian Edition, Delhi, 1960, Pp. 143-144

(৪১) ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারির বিখ্যাত মন্তব্যপত্রে (মিনিট) লর্ড মেকলে এক জায়গায় লিখেছিলেন— ...a single shelf of a good European Library was worth the whole native literature of India and Arabia'.

(৪২) R. C. Dutta : op. cit., Vol. I, P. 424

(৪৩) Dr. S. K. De : op. cit., P. 469.

(৪৪) Ibid, Pp. 472-73.

(৪৫) History of Bengal (1757-1905), C. U. P. 448

(৪৬) 'ভারতকোষ' : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬১

(৪৭) একাল আর সেকাল : রাজনারায়ণ বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ ২য় সং, ১৯৫৬, পৃঃ ৩২

(৪৮) 'In this way, however blundering the way might have been,

mediaeval Bengal was being transformed into modern Bengal'.—
Dr. S. K. Dey : op. cit., P. 499

(৪৯) শিবনাথ শাস্ত্রী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৭
(৫০) শিবনাথ শাস্ত্রী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৯০
(৫১) বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩১, পৃঃ ৫১
(৫২) Dr. S. K. De : op. cit., P. 3.
(৫৩) Letter of the Governor and the Select Committee to the Court, Sept. 30, 1765—Quoted in Ibid., P. 6
(৫৪) Ibid., P. 20
(৫৫) কবি-সঙ্গীত : লোক-সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা, ১৩৭২ পৃঃ ৭৯
(৫৬) আধুনিক বাংলা কাব্য : তারাপদ মুখোপাধ্যায়, প্রথম সং, ১৩৬১, পৃঃ ১২
(৫৭) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ডক্টর সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ১৩৫০, পৃঃ ৪—৫।
(৫৮) বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা : ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবর্ধিত সং ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২
(৫৯) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় সং ১৯৬৫, পৃঃ ৪৪
(৬০) উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য : ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, ২য় সং, ১৩৬৫, পৃঃ ৩১
(৬১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড : সুকুমার সেন, ১৩৫০, পৃঃ ৭
(৬২) সাহিত্য-বিতান : মোহিতলাল মজুমদার, পৃঃ ৩২
(৬৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য : ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় সং ১৯৬৫ পৃঃ ১৮৬
(৬৪) দীনবন্ধু মিত্র : ডক্টর সুশীলকুমার দে পৃঃ ১৭
(৬৫) আধুনিক বাংলা কাব্য : তারাপদ মুখোপাধ্যায়, প্রথম সং, ১৩৬১, পৃঃ ৫৬
(৬৬) 'It would be better, therefore, to define the tendencies of this age as the outcome of an essential duality of character, made up of so many elements that it would be impossible to bring them under one principle. But no matter how different may be the precise quality of each, they still can be grouped round one common impulse, the most elementary of all : the search for stability, for balance ;...' Legouis & Cazamian's History of English Literature, New Edition, London, 1961, pp. 1094—95.
(৬৭) Studies in the Bengal Renaissance ; Jadavpur, 1958, P. 1.
(৬৮) An Advanced History of India : Majumder, Raychoudhury and Dutta : 1956, P. 896.

(৬৯) The History of Bengal (1757-1905), C. U. P 165.

(৭০) 'Faced with the alternative between turning the corner and extinction, the people of Bengal, with sapped vitality, were not in a position to turn the corner'.—The Economic History of Bengal, Vol. I : N. K. Sinha, 1956, P. 226.

(৭১) R. C. Dutta : op. cit., vol. I, P. 95.

(৭২) ডক্টর্‌ সুশীলকুমার গুপ্ত : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৬—৪৭

(৭৩) R. C. Dutta : op. cit. vol. I., P. 40

(৭৪) Dr. B. B. Majumder : op. cit., P. 22

(৭৫) '...the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches....I beg to observe that it appears to me, the ends of constitutional Government might be better attained by submitting every matter of political difference between two countries to a congress composed of an equal number from the Parliament of each,.........'. Rammohan's letter to the Minister of Foreign Affairs of France, Paris. Quoted in Ibid., Pp. 73-74

(৭৬) নবযুগের বাংলা : বিপিনচন্দ্র পাল, ১৯৬৪, পৃঃ ৩২—৩৩

(৭৭) Studies in the Bengal Ranaissance, Jadavpur, 1958, P. 139

(৭৮) Dr. B. B. Majumder : op. cit. P. 25

(৭৯) Dr. B. B. Majumder : op. cit. P. 50

(৮০) The History of Bengal (1757-1905), C. U., P. 167

(৮১) 'To him belongs the credit of being the first Indian to plead for the helpless ryots through the columns of his journal'—Ibid., P. 169

(৮২) 'the first political document of constructive statesmanship emanating from an Indian Public Body'.—Studies in the Bengal Renaissance, Jadavpur, P. 45.

(৮৩) The History of Bengal (1757-1905) : C. U., P. 190

(৮৪) 'The wahabis supplied the first political convicts for transportation. They are the first terrorists'.—Notes on the Bengal Renaissance : Amit Sen, Calcutta, 2nd Edn., P. 51

(৮৫) 'The time is nearly come when all Indian questions must be solved by Indians'. Quoted in 'The History of Bengal (1757-1905) : C. U., P. 171

"মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে—
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।"

-রবীন্দ্রনাথ

"এ জগতে আসিয়া ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি ইহা সৌভাগ্যের কথা। আবার যদি এই সংসারে জন্মিতে হয়, তাহা হইলে এই ভারতবর্ষেই জন্মিতে চাই, সুখ-সমৃদ্ধিশালী অন্য কোন দেশে জন্মিতে চাহি না। এই ভারতবর্ষের মধ্যে এই বাংলাদেশে জন্মিয়াছি, ইহা আরও সৌভাগ্যের কথা। সর্বোপরি এই বাংলাদেশে এ যুগে জন্মিয়াছি ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা। মৃত জাতি কি করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয় এ যুগে এই বাংলাদেশে জন্মিয়া তাহা স্বচক্ষে অনেকটা দেখিয়াছি। এ পরম সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।"

—সত্তর বৎসর [আত্মজীবনী] : বিপিনচন্দ্র পাল, ১৯৬২, পৃঃ ১

প্রথম অধ্যায়

পরিবার-পরিজন-পরিবেশ

[In the Forge]

বাল্য থেকে কৈশোর

শ্রীহট্ট জেলার পৈল গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর (২২শে কার্তিক, ১২৬৫ বঙ্গাব্দ) বিপিনচন্দ্র পাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মকাল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা চিহ্নিত। তাঁর জন্মের এক বছর আগে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস-খ্যাত সিপাহী-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়; ঐ বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁর জন্ম-সন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারানীর ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয় এবং ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা-পরিচালনার ভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার থেকে স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী গ্রহণ করেন।

বিপিনচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন শ্রীহট্ট ছিল ঢাকা বিভাগের অধীনে বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত একটি জেলা। সমগ্র আসামও তখন ছিল বাংলার ছোটলাটের অধীনে কমিশনারশাসিত অঞ্চল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসাম যখন স্বতন্ত্র প্রদেশে রূপান্তরিত হয়, তখন বাঙালী-অধ্যুষিত শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলা নব-গঠিত আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শ্রীহট্ট ছিল বল্লালী কৌলীন্য প্রথার প্রভাবমুক্ত অঞ্চল। কুলীন ব্রাহ্মণ বা কুলীন কায়স্থ বলে কোনো বংশমর্যাদার অস্তিত্ব শ্রীহট্ট অঞ্চলে ছিল না। যাঁরা যত আগে এসে এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা তত বেশী বংশ-মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বিপিনচন্দ্র তাঁর বংশাবলীর প্রমাণ উদ্ধার করে তাঁর বাংলা আত্মজীবনীগ্রন্থ 'সত্তর বৎসর'-এ জানিয়েছেন যে, তাঁদের পূর্বপুরুষ হিরণ্য পাল মঙ্গলকোট থেকে এসে পৈল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই মঙ্গলকোট সম্ভবতঃ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোট এবং হিরণ্য পালের উপাধি 'পাল' থেকেই সম্ভবতঃ গ্রামের নাম হয় 'পৈল'।[১]

পৈল গ্রাম ছিল হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত এবং হবিগঞ্জ শহর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। এই গণ্ডগ্রামে যেমন বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন

বর্ণের হিন্দু বাস করতেন, তেমন অনেক মুসলমানেরও বসতি ছিল। বর্ণভেদ যেমন হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করতো না, তেমন ধর্মভেদও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির হানি ঘটায়নি। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির শৈশব-স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র 'সত্তর বৎসর'-এ বলেছেন—'হিন্দু মুসলমানের ধর্মকে শ্রদ্ধা করিতেন। ও পথ তাঁহার নিজের পথ নহে কিন্তু ও পথে যে পরমার্থ মেলে না এ কল্পনা হিন্দু করিতেন না। মুসলমানও সেইরূপ হিন্দুর ধর্মকে নিজে না মানিলেও সর্বদা সম্মান করিয়া চলিতেন। মুসলমান না হইলে যে মানুষ নরকে যাইবে এ সংবাদ তখনও মুসলমানের কানে পৌঁছায় নাই অথবা কোনদিন পৌঁছিয়া থাকিলেও বাঙালী মুসলমান সেকথা ভুলিয়া গিয়াছিল।······আমাদের গ্রামে এখনকার সামাজিক অবস্থা কি জানি না, কিন্তু আমার শৈশবে, বাল্যে এবং প্রথম যৌবনে হিন্দু-মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্ম লইয়া কোন বিরোধ ছিল না'।

বিপিনচন্দ্রের পিতার নাম ছিল রামচন্দ্র পাল, মায়ের নাম নারায়ণী। নারায়ণী ছিলেন বিপিনচন্দ্রের পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথম পক্ষের স্ত্রী নিঃসন্তান ছিলেন। তাই স্বামীর বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই পাত্রী নির্বাচন করে স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। বিপিনচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র দুই বছর তখন তাঁর বিমাতা লোকান্তরিত হন। তাঁর জননী সাত আট বছর সতীনের ঘর করেছিলেন। কিন্তু এতদিনের মধ্যে কোনোদিন দুই সতীনের ভিতর মনোমালিন্যের কারণ ঘটেনি। মাতা ও বিমাতার মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'নিজে ঘটকালি করিয়া স্বামীর বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া বিমাতা ঠাকুরাণী আমার মায়ের সুখ-শান্তির জন্য নিজেকে বিশেষভাবে যেন দায়ী মনে করিতেন এবং এই কারণে সর্বদা আমার মাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিতেন।······মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁহার যা-কিছু অলঙ্কারপত্র ছিল তাহা আমার ভবিষ্যৎ-পত্নীর জন্য মায়ের হাতে তুলিয়া দিয়া যান'।

বিপিনচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁর পিতা ঢাকা সাব্-জজ আদালতের পেশকার ছিলেন। এখান থেকে তিনি মুন্সেফ হয়ে প্রথমে যশোহর জেলার কোন মহকুমায় যান। সেখান থেকে তিনি বরিশালের অন্তর্গত কোটের-হাট মহকুমায় বদলি হন। তখনও সাবডিভিশনের সৃষ্টি হয়নি। মুন্সেফরা

পদমর্যাদায় এস্. ডি. ও-র সমকক্ষ ছিলেন। তাঁরা দেওয়ানী এবং ফৌজদারী উভয় শ্রেণীর মামলার বিচার করতেন।

কোটেরহাটে বাসকালেই এক সরস্বতী পূজার দিন পাঁচ বছর বয়সে বিপিনচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ বা হাতেখড়ি হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিদ্যারম্ভের আগে থেকেই তাঁর শৈশব-শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। আত্মজীবনীতে বিপিনচন্দ্র লিখেছেন—'আমার কথা ফুটিতে আরম্ভ হইলেই, বাবা আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে কাছে বসাইয়া বা কোলে লইয়া সংস্কৃত শ্লোক মুখে মুখে আবৃত্তি করাইতেন। যতদূর মনে আছে, বাল্মীকি রামায়ণের আদি শ্লোক—

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীসমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥'

এইটাই সকলের আগে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। তারপরে—

রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতি

কৃত্তিবাসের রামায়ণের এই শ্লোকটি শিখিয়াছিলাম।……বিস্তর চাণক্য-শ্লোক তাঁর নিজের কণ্ঠস্থ ছিল। সেগুলিও তিনি আমাকে শিখাইয়াছিলেন।'

হাতেখড়ির পর 'শিশুবোধ' পাঠের ভিতর দিয়ে তাঁর বাল্যশিক্ষার সূচনা হয়। শিশুবোধ ছিল সুন্দর সুন্দর শিক্ষণীয় উপাখ্যান এবং চাণক্য-শ্লোকসহ বিচিত্র সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্কলন। তার মধ্যে 'দাতা কর্ণ'র উপাখ্যানটি এবং চাণক্য-শ্লোকের বিখ্যাত পংক্তি—'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' বালক বিপিনচন্দ্রের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। এই সম্পর্কে তিনি তাঁর ইংরেজী আত্মজীবনী-গ্রন্থ 'মেমরিজ অব্ মাই লাইফ য়্যাণ্ড টাইমস্' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মন্তব্য করেছেন—'এই সমস্ত পুরানো স্মৃতির প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন মনে হয়, এই পুস্তকে উদ্ধৃত চাণক্য-শ্লোক থেকেই আমি একান্ত বাল্যকালে গণতন্ত্রের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলাম।'[২]

বিপিনচন্দ্রের বয়স যখন সাত বছর, তখন কোটেরহাটের 'চৌকি' উঠে যায় এবং তাঁর পিতা সাময়িকভাবে কর্মহীন হয়ে সপরিবারে দেশের বাড়ী পৈল গ্রামে ফিরে আসেন। এখানে এমন একটি ঘটনা ঘটে যা' তাঁর পিতার চরিত্র-বলের পরিচায়ক তো বটেই, এমনকি তাঁর নিজের চরিত্রগঠনেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। গ্রামে এসেই রামচন্দ্র সংবাদ পেলেন যে গ্রাম্য সমাজের নেতৃবর্গ গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারকে অন্যায়ভাবে জাতিচ্যুত করেছে। সমস্ত

সংবাদ বিস্তৃতভাবে জানবার পর তিনি জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণ-পরিবারের প্রধানকে ডাকিয়ে এনে তাঁকে নিজের পারিবারিক পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করলেন। এইজন্য গ্রাম্য ভদ্রলোকেরা রামচন্দ্র পালের পরিবারকে একঘরে করলেন। প্রায় ষোল বছর যাবৎ তাঁকে এইভাবে একঘরে হয়ে থাকতে হয়েছিল। তবুও তিনি নিজে যা' অন্যায় বলে মনে করেছেন, অধিকাংশের চাপে তার কাছে নতিস্বীকার করতে পারেন নি। বিপিনচন্দ্র বলেছেন যে তিনি ইংরেজি জানতেন না এবং আধুনিক বৈঠকে আমরা যাকে বিবেক বলি, সে সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা ছিল না; কিন্তু তাঁর নিজস্ব সত্য-বোধ এবং ন্যায়-বোধ সর্বদা সর্বপ্রকার বৈষয়িক সুবিধা ও সামাজিক সুযোগ লাভের আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে বিচরণ করেছে।'[৩] পিতার ব্যক্তিত্বের এই নির্লোভ দৃঢ়তা যে পুত্রের ব্যক্তিত্বে সঞ্চারিত হয়েছিল, বিপিনচন্দ্রের জীবন তার প্রমাণ।

কিছুদিন গ্রামের বাড়ীতে বাস করবার পর রামচন্দ্র পাঁচ ছয় মাসের জন্য অস্থায়িভাবে ফেঁচুগঞ্জের মুন্সেফের পদে কাজ করেন। তারপর চিরদিনের জন্য চাকুরি-জীবন পরিত্যাগ করে শ্রীহট্টে গিয়ে জেলার আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। এটি হচ্ছে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

শ্রীহট্টেই বিপিনচন্দ্রের প্রকৃত শিক্ষা-জীবনের সূচনা হয়। প্রথমে তাঁর পিতা ফারসী শিখবার জন্য তাঁকে এক মৌলবীর কাছে পাঠান। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। এর কারণ, যে পদ্ধতিতে ফারসী শিক্ষা দেওয়া হতো তা' তাঁর প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল ছিল না। অর্থের সঙ্গে পরিচিত না হয়ে অন্ধের মতো কোনো কিছু মুখস্থ করার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক বিরূপতা ছিল। পরিণত বয়সে বাল্যকালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'অর্থবিহীন শব্দ আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করে না অথবা স্মৃতির মধ্যে রক্ষিত হয় না। এখনও পর্যন্ত, আমার অধীত বিষয়ের অপ্রয়োজনীয় অংশ আমি মনে রাখতে পারি না। অথচ প্রয়োজনীয় তথ্য ও চিন্তা যথেষ্ট পরিমাণে আমার মনে রয়ে যায়'।[৪]

বিপিনচন্দ্রের পিতা যখন শ্রীহট্টে গিয়ে ওকালতি শুরু করেন, তখন শ্রীহট্ট শহরে তিনটি ইংরেজী স্কুল ছিল। এদের মধ্যে একটি মধ্যমান ইংরেজী স্কুল, আর দু'টি স্কুলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স মান পর্যন্ত পড়ানো হতো। প্রথমে তাঁকে 'ন্যায়সড়ক' নামে পরিচিত শহরের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ইংরেজী স্কুলে ভর্তি

করানো হয়; তারপর অল্পদিনের মধ্যেই তিনি 'শেখঘাট' নামে পরিচিত শহরের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ইংরেজী স্কুলে স্থানান্তরিত হন। কারণ, দু'টি উচ্চমান ইংরেজী স্কুলের মধ্যে এইটির খ্যাতি ছিল বেশী।

স্কুল-জীবনের দ্বিতীয় বছরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ডবল প্রোমোশন' পেয়ে বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু তাঁর উদীয়মান মেধা উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়ের ভার বহন করতে পেরে উঠল না। এই সময় থেকে সহপাঠীদের তুলনায় তিনি নিম্নস্থান অধিকার করতে লাগলেন। শুধু একটি বিষয়ে নিজের যথাযোগ্য স্থান রক্ষা করতে পারলেন; সে হচ্ছে—ইংরেজী। এই সময় জেলা-জজ তাঁদের বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। তিনি বালক বিপিনচন্দ্রের ইংরেজী রচনা দেখে যথেষ্ট প্রশংসা করে যান।

স্কুল-জীবনের একটি স্মৃতি দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর মনে মুদ্রিত ছিল। শ্রীহট্ট শহরে একটি সোডা-ওয়াটার তৈরির যন্ত্র স্থাপিত হয়। সেই কারখানা থেকে একজন মুসলমান সোডা-ওয়াটার এবং লেমনেড নিয়ে ইস্কুলের ছেলেদের কাছে বিক্রি করতে আসতো। বিপিনচন্দ্র প্রমুখ বালকেরা মহানন্দে এই নূতন পানীয় কিনে উপভোগ করতেন। একদিন বিপিনচন্দ্র তার কাছ থেকে এক বোতল লেমনেড নিয়ে দাম দিতে ভুলে গেলেন। লোকটি বাকী পয়সা আদায় করবার জন্য একদিন তাঁদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত। রামচন্দ্র তখন আদালতে যাবার জন্য প্রস্তুত। লোকটির পরিচয় এবং তার আসবার উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে তিনি অপরাধী পুত্রকে ডেকে পাঠালেন। পুত্র যখন ঋণের কথা স্বীকার করলো, তখন তিনি লোকটিকে তার পাওনা বুঝিয়ে দিলেন কিন্তু এই অপরাধের জন্য পুত্রকে কঠোর কায়িক শাস্তি গ্রহণ করতে হলো। অপরাধ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, বিনামূল্যে কারও কাছ থেকে জিনিস নেওয়া; দ্বিতীয়তঃ, মুসলমানের ছোঁয়া জল পান করা। শুধু কায়িক শাস্তি দান করেই রামচন্দ্র ক্ষান্ত হলেন না। ইংরেজী পড়েই পুত্র এমন অনাচারী হয়ে উঠছে ভেবে, তিনি বিপিনচন্দ্রকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। ছ'মাস যাবৎ তাঁকে ঘরে বসে থাকতে হলো। তখন বিপিনচন্দ্রের মা গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন। তিনি শ্রীহট্টে ফিরে এসে স্বামীকে বোঝালেন যে যুগের হাওয়ার বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রাম করে ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা উচিত নয়। তখন মায়ের সুপারিশে তিনি আবার যথারীতি স্কুলে যাবার অনুমতি পেলেন।

এর পরের ঘটনাটি কৌতুকবহ। বিপিনচন্দ্রের নিজের ভাষায়—'সেই বছরেই বোধহয় কিংবা তার পরের বছর চৈত্র মাসে একদিন হঠাৎ অতি প্রত্যূষ হইতে আমার পাৎলা দাস্ত আরম্ভ হয়।......এ সময় মা শ্রীহট্টের বাসায় ছিলেন না।......চৈত্র-বৈশাখ মাসে শ্রীহট্টে প্রায়ই বিসূচিকার আক্রমণ দেখা যাইত।... আমার সামান্য পেটের অসুখেই বাবা অত্যন্ত ভয় পাইলেন। সেদিন কাছারিতে গেলেন না।...আমার দাস্ত তখন প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বেশ পিপাসা আছে। এই পিপাসা উপশমের জন্য ডাক্তার আমাকে লেমনেড দিতে বলিলেন। অমনি বাজার হইতে লেমনেড আসিল। অবশ্য মুসলমানের কলে, মুসলমানেরই তৈয়ারী, মুসলমানের ছোঁয়া লেমনেড। বাবা নিজের হাতেই সেই লেমনেড গ্লাসে ঢালিয়া আমার মুখে ধরিলেন। এই লেমনেড খাইয়া যে মার খাইয়াছিলাম তখনও সে কথা ভুলি নাই। এবার বাবার উপরে তার শোধ তুলিবার জন্য সেই ঘর-ভরা লোকের মাঝখানে, মুসলমানের ছোঁয়া জল কিছুতেই লইব না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। বাবা বলিলেন, এতে দোষ নাই। ......ঔষধ সকল অবস্থাতেই নারায়ণের প্রসাদ বা চরণামৃতের মত, ঔষধরূপে নারায়ণ। এইরূপ সাধ্যসাধনার পরে আমি অনেক কেঁড়েলি করিয়া শেষে বাবার নিজের হাতে মুসলমানের তৈরী লেমনেড খাইলাম'।[৫] কোমলে-কঠিনে গড়া মানুষ রামচন্দ্র পালের ব্যক্তিত্বের একটি দিক এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি চাণক্য-নীতি অনুসারে 'পঞ্চবর্ষ' যাবৎ পুত্রকে সস্নেহ প্রশ্রয়ে লালন করেছেন ; তারপর 'দশবর্ষ' যাবৎ তাড়না করেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ তাড়নার অন্তরালে স্নেহশীল পিতৃহৃদয় ফল্গুধারার মতো ক্রিয়াশীল রয়ে গেছে। তিনি বলেছেন—'বাবার হাতে যত মার খাইয়াছি তাহা লেখাপড়ায় অমনোযোগের জন্য নহে, কিন্তু এই শীলতা ও সদাচারের ক্রটির জন্য'।

পিতার বাৎসল্যের মতো বিপিনচন্দ্রের মায়ের বাৎসল্যেরও একটি বিশিষ্টতা ছিল। বিপিনচন্দ্র ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র-সন্তান। মায়ের বাৎসল্যের সিংহভাগ ছিল তাঁর একারই প্রাপ্য। কিন্তু কার্যতঃ তিনি তা' থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সম্পর্কিত এবং নিঃসম্পর্কিত আট দশজন বালক তাঁদের শহরের বাসায় থেকে লেখাপড়া শিখত। প্রতিদিন স্কুলছুটির পর তাঁরা আট দশ জন বালক বৃত্তাকারে মাকে ঘিরে বসতো। বোন কৃপাও সেই দলে থাকতো। মা ভোজ্য বস্তু সবাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দিতেন। নিজের একমাত্র পুত্র-বলে তাঁকে এক

কণা মাছ বা অন্যান্য সুস্বাদু জিনিস বেশী দিতেন না। ক্ষুধায় অধীর হয়ে ছট্‌ফট্‌ করলেও সকলের আগে মা তাঁর হাতে কিছু দিতেন না। এ নিয়ে মায়ের বিরুদ্ধে বালক বিপিনচন্দ্রের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। মনে হতো, উনি মা নন, নিশ্চয় সৎমা। নিজের মা শৈশবেই স্বর্গারোহণ করেছেন। এই রকম সন্দেহে যখন তাঁর মন আন্দোলিত তখন মা একদিন বালক পুত্রকে কাছে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে বললেন—'এখন তুই বড় হয়েছিস, এখনও কি তুই বুঝবি না, কেন আমি তোর আগে অপর ছেলেদের যত্ন ও আদর করি। তাদের মা এখানে নেই। আমার আদর-যত্নে একটু ত্রুটি হলে তাদের প্রাণে কত লাগবে? তোমাকে ইচ্ছা করলেও আমি অযত্ন করতে পারি নে। তাদের অযত্ন হওয়া অতি সহজ'। পরকে আপন করতে গেলে যে শিক্ষার প্রয়োজন হয়, সেই শিক্ষার প্রথম পাঠ তিনি বাল্যকালে মায়ের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন।

ভাবী জীবন-গঠনে স্কুল-জীবনের একজন শিক্ষকের নির্দেশনা ও শিক্ষণনৈপুণ্য বিপিনচন্দ্র কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন বাবু দুর্গাকুমার বসু, ইংরেজি ও ইতিহাসের শিক্ষক এবং তাঁদের স্কুলের হেডমাস্টার। বাগ্মী ও লেখকরূপে বিপিনচন্দ্রের ইংরেজি-ভাষাজ্ঞান সুবিদিত। এই দুর্গাকুমার বসু মশায়ের বিশিষ্ট শিক্ষণ-পদ্ধতির গুণেই তিনি বালককাল থেকেই ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট অধিকার অর্জনের সুযোগ পান। তাঁর সস্নেহ নির্দেশনায় বিপিনচন্দ্র পাঠ্য-তালিকা-বহির্ভূত অনেক সুনির্বাচিত ইংরেজি পুস্তক পাঠ করেন। ফলে বাল্যকাল থেকেই তাঁর জ্ঞানের পরিধি সাধারণ শিক্ষার্থী অপেক্ষা প্রসার লাভ করে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'...আমি অনেক সময় বিস্ময়ের সঙ্গে ভেবে দেখেছি যে, স্বাধীন ও সহজভাবে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের জন্য আমার যে সুনাম আছে, বাবু দুর্গাকুমার বসুর শিক্ষা না পেলে সে সুনাম আমি অর্জন করতে পারতাম কি না সন্দেহ'।[৬]

শ্রীহট্টের সামাজিক জীবন এবং বিপিনচন্দ্রের পারিবারিক পরিবেশ—উভয়ই বালকমনে ধর্মীয় ভাব উন্মেষের অনুকূল ছিল। বিপিনচন্দ্রের গ্রামের বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব হতো। তখন ওঁরা সকলেই গ্রামের বাড়িতে যেতেন। বালক বিপিনচন্দ্র মহা উৎসাহে এই সমস্ত উৎসবে যোগদান করতেন। বাল্যস্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'কিন্তু বিল্বষষ্ঠীর রাত্রি পর্যন্ত এই প্রতিমাতে পুত্তলিকা বুদ্ধি থাকিলেও সপ্তমীর দিন প্রত্যুষে পুরোহিত যখন কলাবধূকে স্নান

করাইয়া মন্ত্রপূত করিয়া দুর্গা প্রতিমার পাশে আনিয়া রাখিতেন, তখন হইতে প্রতিমাতে আর প্রতিমা-বুদ্ধি থাকিত না। পূজার ক'দিন এ যে মাটির পুতুল, কিছুতেই ইহা ভাবিতে পারিতাম না।······দেবতা মানুষের মতনই, অথচ মানুষ নহেন, এইটুকু ধারণা হইয়াছিল'।[৭] এ ছাড়া তাঁদের শ্রীহট্টের বাসায়ও প্রায় সর্বদাই ব্রতপূজা অনুষ্ঠিত হতো। প্রতি শনিবারে শনিপূজা হতো। বিপিনচন্দ্রের মা প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করতেন। এ ছাড়া জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি সাবিত্রীব্রত করতেন এবং সারা মাঘ মাস প্রতি রবিবারে সূর্যের ব্রত করতেন। বালক বিপিনচন্দ্র মায়ের কাছে বসে ব্রতকথা শুনতেন এবং ব্রতশেষে প্রসাদের ভাগ নিতেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'এই সকল পারিবারিক পূজা-পার্বণের ভিতর দিয়া যা কিছু ধর্মশিক্ষা লাভ হইয়াছিল। এ শিক্ষা মতের শিক্ষা ছিল না, ভাবের শিক্ষা এবং অনুভূতির শিক্ষা ছিল'।

ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ শাক্ত মতে কালী-উপাসক হলেও শ্রীহট্ট শহর ছিল প্রধানতঃ বৈষ্ণব-শহর। শ্রীহট্টের সম্পন্ন সাহা-সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব। এঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনুবর্তী ছিলেন। বহুদিন আগে থেকে শ্রীহট্ট শহরে একটি মণিপুরী উপনিবেশ গড়ে ওঠে। তাঁরাও ছিলেন ধর্ম-বিশ্বাসে বৈষ্ণব। বিপিনচন্দ্রের কথায় 'আদিতে এই মণিপুরীরা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্যান্য মানুষের মতো ধর্ম-বিশ্বাসে বৌদ্ধ ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কোনো শিষ্য কর্তৃক তাঁরা হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হন।'[৮] এর পর থেকে তাঁরা হন রাধাকৃষ্ণের উপাসক, শান্তিপুর ও নবদ্বীপের গোঁসাইয়েরা হন তাঁদের গুরু এবং নবদ্বীপ হয় তাঁদের প্রধান তীর্থস্থান। বিপিনচন্দ্রের মতে মণিপুরের আধুনিক সামাজিক ইতিহাস হিন্দুধর্ম প্রচার-প্রচেষ্টার একটা বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল। এই সমস্ত কারণে শ্রীহট্ট শহরে অনেক বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান গড়ে ওঠে। অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঝুলন, রথযাত্রা, রাসযাত্রা ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। তা' ছাড়া তার পিতাও ছিলেন কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণব। সুতরাং তাঁর পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেও বৈষ্ণব প্রভাব বিদ্যমান ছিল।[৯] এই সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে বালক বিপিনচন্দ্রের মনে বৈষ্ণব ভাবধারার যে বীজ উপ্ত হয়, কালক্রমে তা'ই অঙ্কুরিত হয়ে বিশিষ্ট ভাবনার মহীরূহে পরিণত হয়ে ওঠে।

বাল্যকাল থেকেই বিপিনচন্দ্রের মনে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় সংস্কারের ভিত্তি

জীর্ণ হতে থাকে। শ্রীহট্ট ছিল হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে তীর্থস্থান-স্বরূপ। 'সাহজলালের দরগা যেমন মুসলমানদিগের একটা তীর্থস্থান, দুর্গাবাড়ী সেইরূপ হিন্দুদিগেরও ছোটখাট এক পীঠস্থান।[১০] কারও কারও মতে তন্ত্রোক্ত ৫২ পীঠের মধ্যে শ্রীহট্ট একটা পীঠ। কারণ শ্রীহট্টে সতীর হাত পড়েছিল এবং 'শ্রীহস্ত' শব্দ থেকেই শ্রীহট্ট নামের উৎপত্তি হয়। সে যাই হোক, এই উভয় তীর্থস্থান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে শ্রদ্ধা-ভক্তির বস্তু ছিল। বিশেষতঃ বিপিনচন্দ্রের পিতা ছিলেন ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত। সেই সূত্রে তিনি মোসলেম সাধনার সংস্পর্শে আসেন। হিন্দুর দেব-দেবী এবং মুসলমানদের উপাস্য সম্পর্কে তাঁর ঈশ্বর-বুদ্ধি সমান দৃঢ় ছিল। 'ধর্মে ধর্মে যে কোন বিরোধ আছে, তাঁহার কথায়বার্তায় কখনও এই ভাব প্রকাশ পাইত না। মুসলমানের ঈশ্বর এক ও হিন্দুর ঈশ্বর অন্য এ কল্পনা তিনি কখনও করেন নাই।' এই আবহাওয়ার মধ্যেই বিপিনচন্দ্রের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। তাই প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস না জন্মালেও, হিন্দু আচার-বিচারের কড়াকড়ির বিরুদ্ধে অল্পবয়স থেকেই তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে। তিনি বলেছেন 'এইরূপে শ্রীহট্টে থাকিতেই আমার জাতবর্ণের বিচারের বন্ধন ভিতরে ভিতরে একেবারে ভাঙিয়া যায়'।

শ্রীহট্টের ছাত্রজীবনেই বিপিনচন্দ্রের মনে স্বদেশপ্রেমের বীজ উপ্ত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ। বিপিনচন্দ্র তখন শ্রীহট্ট জেলা স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। এই সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাত থেকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শ্রীহট্টে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যান। সেকালের বিলাত-ফেরত বাঙালী পোশাক-পরিচ্ছদে, আহার-বিহারে, চাল-চলনে ইংরেজদের অনুকরণ করতেন। সুরেন্দ্রনাথও ছিলেন পুরোদস্তুর সাহেব। ইংরেজ সিভিলিয়ানরা যেভাবে থাকতেন, তিনিও সেইভাবে থাকতেন। সুরেন্দ্র-জায়াও মেমসাহেবদের মতো চলাফেরা করতেন। সাদারল্যাণ্ড নামে একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান ছিলেন তখন শ্রীহট্টের ম্যাজিস্ট্রেট। সাদারল্যাণ্ড প্রথমদিকে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সস্নেহ ব্যবহার করতেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথ বুঝলেন যে সেই সস্নেহ ব্যবহারের মধ্যে একটা অনুকম্পার ভাব মিশে আছে। অর্থাৎ সাদারল্যাণ্ড নেটিভ সিভিলিয়ানকে ইংরেজ সিভিলিয়ানের সমমর্যাদা দিতে প্রস্তুত নন। এই

কারণে কিছুদিনের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথ ও ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিরোধের ভাব ঘনিয়ে ওঠে। এই সময় একদিন সুরেন্দ্র-জায়া ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে যে মঞ্চে মেমসাহেবরা বসে ছিলেন, সেই মঞ্চে গিয়ে স্বামীর পদোচিত আসন দখল করে বসলেন। এতে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল। তাঁরা সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। একটা ফৌজদারী মামলার নথিতে যে সমস্ত কথা লেখা ছিল, সুরেন্দ্রনাথ নিজে সে সমস্ত কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা না করে সেই নথিতে স্বাক্ষর দেন। এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হলো। সাদারল্যাণ্ড হলেন এই ষড়যন্ত্রের প্রকৃত নায়ক। ম্যাসপ্রেট (Muspratt) নামে একজন সিভিলিয়ান ছিলেন তখন শ্রীহট্টের জজ। তিনি সমস্ত নথিপত্র পরীক্ষা করে মন্তব্য করেন যে এই ত্রুটির জন্য দায়ী সুরেন্দ্রনাথের অসাবধানতা। তিনি একথারও উল্লেখ করেন যে ঐ নথিতে স্বাক্ষর দেবার সময় সুরেন্দ্রনাথের উপর অত্যধিক কাজের চাপ পড়েছিল। জজসাহেব হাইকোর্টকে জানান যে কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখলেই সুরেন্দ্রনাথের এই সামান্য অপরাধের যথেষ্ট শাস্তি হবে। কিন্তু গভর্নমেণ্ট জজ-সাহেবের অভিমত গ্রাহ্য না করে সুরেন্দ্রনাথের বিচারের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করলেন। কমিশনের মন্তব্য অনুকূল হলো না। ফলে সুরেন্দ্রনাথকে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে সিভিল সার্ভিস থেকে সরে আসতে হলো। আত্মজীবনীতে এই ঘটনার উল্লেখ করে বিপিনচন্দ্র মন্তব্য করেছেন—'···তখনই এই ধারণা জন্মে যে, ইংরাজের আদালতে ইংরাজ যদি বাঙালীর পিছনে লাগে তবে বাঙালীর পক্ষে সুবিচার লাভ একরূপ অসম্ভব। এইভাবেই আমার প্রথম যৌবনেই স্বাদেশিকতার উন্মেষ হইতে আরম্ভ করে'।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দেই বিপিনচন্দ্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তখন ষোল বছর পূর্ণ না হলে এই পরীক্ষা দেওয়ার নিয়ম ছিল না। তা' ছাড়া টেস্ট পরীক্ষায় তিনি সমস্ত বিষয়ে উত্তীর্ণ হতেও পারলেন না। এইজন্য হেড মাস্টারমশায় তাঁকে সেবার পরীক্ষায় উপস্থিত হতে দিতে অস্বীকার করলেন। তাঁর ধারণা, এক বছর যথারীতি পড়াশুনা করলে হয়তো বিপিনচন্দ্র পরের বছরের পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করবেন। কিন্তু হেড-মাস্টারমশায়ের সে আশা পূর্ণ হলো না। এবারেও তিনি স্কুলের পড়ায় তেমন

মন দিলেন না। ফলে, পরের বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে তিনি কোনমতে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ বিপিনচন্দ্রের জীবনে একটি স্মরণীয় বছর। এই বছরে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এই বছরেই ঢাকার দু'খানি বাংলা সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' এবং 'হিন্দুহিতৈষিণী'তে কয়েকটি পদ্য ও গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের ভিত্তি পত্তন হলো। এই সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন …'এগুলি আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। কবিতাটি পয়ার মাত্র ছিল। বড় হইয়া অবধি আমি অনেক সময় কহিয়াছি যে, ১৮ বৎসরের পূর্বে যে কবিতা লেখে না সে মানুষ নয়। ১৮ বৎসরের পরে যে কবিতা লেখে সে হয় পাগল, না হয় কবি। আমি এই দুইয়ের একটাও আশা করি নাই'। তা' সত্ত্বেও প্রথম যৌবনের এই লঘু সাহিত্যিক প্রয়াস তাঁর জীবনে দু'টি কারণে উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিজের কথায় 'প্রথম, এই সময়েই আমার অন্তরে একটু দেশাত্মবোধ জন্মিতে আরম্ভ করে। তাহারই প্রেরণায় জীবনের প্রথমে এ সকল রচনাতে প্রবৃত্ত হই। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমার এই অতি অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার আকাঙ্ক্ষা-সূত্রেই শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাসের সঙ্গে প্রথম যৌবনের সখ্য-সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে।

যৌবন-জলতরঙ্গ

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে স্বতন্ত্র আসাম প্রদেশ গঠিত হলে শ্রীহট্ট জেলা বাংলার শাসন-ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নব-গঠিত আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। আসাম তখন অত্যন্ত অনগ্রসর প্রদেশরূপে গণ্য ছিল। সরকার জনসাধারণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে আসামের স্কুল থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য মুক্তহস্তে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে বিপিনচন্দ্র তৃতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও মাসিক দশ টাকা হারে বৃত্তি লাভ করলেন।

এইভাবে শ্রীহট্টের ছাত্রজীবনের অবসান ঘটলো। উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের জন্য বিপিনচন্দ্র এবার কলকাতায় আসবার জন্য উদ্যোগী হতে লাগলেন। তখন শ্রীহট্ট থেকে কলকাতা পর্যন্ত সরাসরি রেলপথে আসবার ব্যবস্থা ছিল না। শ্রীহট্ট থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত জাহাজে এসে গোয়ালন্দ থেকে কলকাতার ট্রেনে চাপতে হতো। শ্রীহট্ট থেকে গোয়ালন্দ ছিল জাহাজে পাঁচ ছয় দিনের পথ। ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে একদিন পিতামাতার একমাত্র পুত্র বিপিনচন্দ্র

স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী জননী এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একাকী সুদূর কলকাতা-প্রবাসে যাত্রা করলেন। প্রবাস-যাত্রায় পিতার চেয়ে মায়ের তাগিদ ছিল বেশী। বিপিনচন্দ্র তাঁর পিতৃ-পেশা আইন-ব্যবসায়ে কৃতী হয়ে উঠুন, তাঁর পিতার কাম্য ছিল না, তা' নয়। তবে তিনি নিজের চেষ্টায় বার্ষিক প্রায় আড়াই হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর আরও কিছু ছোটখাটো ভূ-সম্পত্তি ছিল। সুতরাং পুত্র যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রামে বাস করে সম্মানিত জমিদারের মতো জীবন যাপন করতে চায়, তা'হলেও তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু মায়ের তাতে ঘোরতর আপত্তি ছিল। 'তিনি সর্বদা বলতেন যে আমি,...তাঁর একমাত্র পুত্র, যদি অকালে মারা যাই, সে-ও শতগুণে ভালো, তবু যেন 'মূর্খ' এবং 'চাষা' হয়ে বেঁচে না থাকি।[১১] সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় আসবার জন্য তাঁর মায়ের কাছ থেকেই তিনি সবচেয়ে বেশী উৎসাহ পান।

পল্লী-বালকের চোখে প্রথম শহর-দর্শনের অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের প্রথম কলকাতা-দর্শনের অভিজ্ঞতা তাঁর নিজের কথায়...'কলিকাতার প্রথম দর্শনে মনে কি ভাব জন্মিয়াছিল বলিতে পারি না। তবে বিলাতের পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া প্রথম লণ্ডনের আলো দেখিয়া ইংরেজ বালকের মনে যে ভাবের উদয় হয়, কেতাবে পড়িয়াছি, কলিকাতার প্রথম দর্শনে আমার অন্তরে সেরূপ কোন ভাব জন্মে নাই, এ কথা বলিতে পারি'।[১২]

কলকাতায় তখন বিভিন্ন জেলার প্রবাসী ছাত্ররা নিজেরা এক-একটি ছাত্রাবাস গড়ে তুলে বাস করতো। ১৫নং নিমু খানসামা লেনে শ্রীহট্টের ছাত্রদের জন্য এমনি 'সিলেট মেস্' ছিল। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণের ফলে সেই নিমু খানসামা লেনের অস্তিত্ব অবশ্য বহুদিন আগে লুপ্ত হয়ে গেছে। শিয়ালদহে ট্রেন থেকে নেমে বিপিনচন্দ্র সুন্দরীমোহন দাসের সঙ্গে শ্রীহট্ট ছাত্রাবাসে গিয়ে উঠলেন। এখান থেকেই তাঁর কলকাতা-জীবনের সূচনা হয়। এখান থেকেই প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর উচ্চতর শিক্ষা-জীবনের সূচনা হয়। শ্রীহট্ট ছাত্রাবাস অবশ্য পরে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে যায়। বিপিনচন্দ্র তাঁর আত্মকথায় সেকালের কলকাতার ছাত্রাবাসগুলির একটি সুন্দর বাক্-চিত্র উপহার দিয়েছেন: 'ছাপ্পান্ন বছর আগে আমার কলেজ-জীবনে কলকাতার ছাত্রাবাসগুলি ছিল ক্ষুদ্র জন-রাজ্য বা রিপাবলিকের মতো এবং

সেগুলি পূর্ণ গণতান্ত্রিক রীতিতে পরিচালিত হতো। ছাত্রাবাসের অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে সর্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। প্রতি মাসের শেষে সমস্ত সভ্যরা মিলে একজন ম্যানেজার নির্বাচন করতেন। সভ্যদের কাছ থেকে টাকা আদায় এবং আবাসিকদের খাদ্য-ব্যবস্থা ও আবাস-পরিচালনার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত থাকতো।......দু'জন সভ্যের মধ্যে কোনো বিবাদ-বিরোধের উদ্ভব হলে আবাসিকদের আদালতে তার নিষ্পত্তি করা হতো। মনে পড়ে, এই ধরনের ঘটনার বিবরণ পরীক্ষার জন্য রাতের পর রাত আমাদের বসতে হতো; এবং এই আদালতে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনো সভ্য প্রশ্ন তুলতেন না বা সেই সিদ্ধান্ত অমান্য করতেন না।'[১৩]

কলকাতায় বিপিনচন্দ্রের ছাত্র-জীবন ১৮৭৫ থেকে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত। এই সময়ের মধ্যে তাঁর জীবনে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে যার ফলে তাঁর জীবনধারা ভিন্ন পথের অভিমুখী হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ঐ বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি শ্রীহট্টের বাড়িতে যান। যেদিন শ্রীহট্টে গিয়ে পৌঁছুলেন, তার পরদিন সকালে তাঁর আড়াই বছরের ছোট বোন তারই কোলে শুয়ে মারা গেল। এর দু' মাসের মধ্যে তাঁর স্নেহময়ী জননী পরলোক গমন করলেন। বিপিনচন্দ্রের নিজের কথায় ··'আমার মায়ের লোকান্তর-প্রাপ্তি প্রকৃতপক্ষে ঘর ও পরিবারের সঙ্গে আমার হৃদয় ও জীবনের বন্ধন-রজ্জু অপসারিত করে দিল।'[১৪] ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তিনি হিন্দুয়ানির বন্ধন ছিন্ন করে প্রকাশ্যে ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করলেন।

বিপিনচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন যখন এইভাবে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে দিক্-পরিবর্তনের অভিমুখী, তখন বাঙালীর জাতীয় জীবনেও ঋতু-বদলের পালা শুরু হয়ে গেছে। ১৮৭৫ থেকে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই বাংলা-দেশে নবীন জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ হয়। বিপিনচন্দ্রের মতে এই নবীন জাতীয়তাবোধের উৎস হলো,—আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তা ও ভাবধারার সংস্পর্শ-সঞ্জাত নবজাগ্রত বাংলা সাহিত্য। 'বিশেষ অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই নবজাগরণের যুগাবতার'।[১৫] তাঁর মতে বাঙালীর চিন্তা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) গোষ্ঠীর অবদান অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় চিন্তা ও ফরাসী সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্টদের অবদানের সঙ্গে তুলনীয়।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৫৬ থেকে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ কালকে 'বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ' বলে উল্লেখ করে বলেছেন…'এই কালের মধ্যে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্ম-সমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গ-সমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল,……'।[১৬] এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়-কথিত ইণ্ডিয়ান মিউটিনি বা সিপাহী-বিদ্রোহ প্রাসঙ্গিকভাবে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সিপাহী-বিদ্রোহের নেপথ্যে বিশুদ্ধ জাতীয়তাবোধের প্রেরণা সম্পর্কে বিতর্ক থাকতে পারে, এই বিদ্রোহের ডাক বাঙালীর কাছ থেকে যে আশানুরূপ সাড়া পায়নি তারও হয়তো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে।[১৭] কিন্তু এই ঐতিহাসিক সত্য সম্ভবতঃ অস্বীকার করা যায় না যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায়সমূহে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই হোক্ অথবা সশস্ত্র উপায়েই হোক্, যে ভাবে যখনই ভারতবাসী বৃটিশ শক্তিকে মুখোমুখি আহ্বান জানিয়েছে, তখনই এই বিদ্রোহের স্মৃতি জাগ্রত ও ধ্বনিত হয়েছে।[১৮]

শাস্ত্রীমহাশয়-কথিত ঘটনাবলীর মধ্যে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই দু'টি মুখ্য ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল—সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক। এই জাতীয়তাবোধের মূল উৎস বঙ্গীয় নবজাগরণ। নবজাগ্রত বাংলার রূপকার রূপে সেই যুগে বহু অনুপ্রাণিত ধর্মীয় নেতা, মহান সমাজ-সংস্কারক, উদারচেতা দেশপ্রেমিক, গণ্যমান্য রাজনীতিবিদ্ এবং শক্তিমান সাহিত্যিক প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছিল এই বাংলাদেশে। বিশেষজ্ঞের মতে, রামমোহন রায়ের পরেই কেশবচন্দ্র ছিলেন নবীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠার পর ক্রমে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সংঘর্ষের সূচনা হতে থাকে। এই সংঘর্ষে কেশবচন্দ্র তিনটি বিষয়ের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমতঃ ধর্মীয় বিষয়ে সত্যাসত্য নির্ধারণে ব্যক্তিগত যুক্তিবাদের প্রাধান্য, দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত আচরণ, এমনকি গার্হস্থ্য ও সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার বিষয়ে ভ্রান্তি ও অভ্রান্তির বিচারে স্বকীয় বিবেকের প্রাধান্য, তৃতীয়তঃ ব্রাহ্ম-

সমাজের ব্যাপার পরিচালনায় সমাজভুক্ত অধিকাংশ সভ্যের মতামতের প্রাধান্য স্বীকার। এই ধরনের আদর্শগত সংঘর্ষের জন্যই আদি ব্রাহ্ম-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেশবচন্দ্র নিজস্ব অনুবর্তীদের নিয়ে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ' স্থাপন করেন। এই সমাজ নিজস্ব ব্যাপার পরিচালনায় গণতান্ত্রিক স্ব-শাসনের নীতি স্বীকার করে নিয়েছিল। সাধারণ সংস্থা পরিচালনায় অধিকাংশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে কেশবচন্দ্রই সম্ভবতঃ প্রথম গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ করেন। এ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছেন: 'এই রাজনৈতিক স্বরাজ-আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজ-চালিত ধর্মীয় ও সামাজিক বিদ্রোহের সন্তান'।[১৯]

এদিকে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে বিরোধ ও বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠলো। ছাত্র বিপিনচন্দ্র এই বিবাহ-সম্পর্কিত প্রতিবাদ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন আইনে বিবাহেচ্ছু পাত্র-পাত্রীর যে নিম্নতম বয়ঃসীমা নির্ধারিত হয়, এক্ষেত্রে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের বয়স তার চেয়ে কম ছিল। পাত্রের বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হয়নি, পাত্রীর বয়স ছিল চৌদ্দ বছরের নীচে। অথচ আচার্য কেশবচন্দ্র এবং তাঁর অনুবর্তীরা ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্গত বিবাহসমূহকে আইনসিদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে এই ধরনের একটি বিশেষ বিবাহ আইনের দাবি জানিয়েছিলেন। গোঁড়া হিন্দুসমাজ, এমনকি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র প্রমুখ প্রগতিশীল ব্রাহ্ম-নেতাদের ইচ্ছানুসারেই এই সিভিল ম্যারেজ আইন বিধিবদ্ধ হয়। সুতরাং স্বয়ং কেশবচন্দ্র যখন এই আইনের প্রথম ধারা ভঙ্গ করে অপ্রাপ্তবয়স্ক পাত্রের সঙ্গে তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহে উদ্যোগী হলেন, তখন স্বভাবতঃই তাঁর সমাজের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ ও বিরোধ দেখা দিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের আচার্যের কাছে লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য করলেন না, এমনকি যথোপযুক্ত সৌজন্যসহকারে সেই প্রতিবাদপত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার পর্যন্ত করলেন না। তিনি জাঁকজমকের সঙ্গে কন্যাপক্ষের লোকজন সঙ্গে নিয়ে কুচবিহার যাত্রা করলেন। এর ফলে ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে বিরোধ ও বিক্ষোভ প্রবলতর আকার ধারণ করলো। কলকাতা এবং মফঃস্বলের নানা স্থানে প্রকাশ্য সভার অনুষ্ঠান করে কেশবচন্দ্রের আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে লাগলো।

উদ্বেলিত, বিপিনচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। এই পরিবেশে সেদিন কোনো সত্য-সন্ধিৎসু ও সমাজ-সচেতন তরুণের পক্ষেই অনন্যমনা হয়ে পাঠ্য-পুস্তকে মনোনিবেশ করা সম্ভব ছিল না। বিপিনচন্দ্রও তা' পারেন নি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে তাঁর মন ছিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে অপর পারে তখন 'ক্যানিং লাইব্রেরী' নামে একটি বড়ো বইয়ের দোকান ছিল। সেখানে গিয়ে তিনি রুচি অনুযায়ী নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করতেন। এই সময় হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী',—বিশেষতঃ 'বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে' কবিতাটি তাঁর প্রাণে দেশ-মাতৃকার প্রতি অনুরাগের উদ্বোধন করে। তা'ছাড়া, একদিকে 'বঙ্গদর্শন', 'আর্য-দর্শন', 'জ্ঞানাঙ্কুর' প্রভৃতি সেকালের বাংলা মাসিক পত্রাদি পাঠ, অন্যদিকে নতুন বাংলা রঙ্গালয়—বেঙ্গল থিয়েটার, ন্যাশনাল থিয়েটারে স্বাদেশিক নাটকের অভিনয় দর্শন তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকাভিনয় তখনকার তরুণ মনে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাজাত্যাভিমানের উদ্রেকে সহায়তা করেছিল। তা'ছাড়া গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কতকাল পরে বল ভারত রে' এবং 'যমুনা-লহরী' শীর্ষক গান, মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন সবে দীন' প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমাত্মক গান রঙ্গালয়ের সাহায্যে বহুলপ্রচারের ফলে জাতীয়তাবোধ স্ফুরণের সহায়ক হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র তাঁর বাংলা আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন···"আমার ছাত্রজীবনে এগুলির খুবই চর্চা ছিল। মেসে মেসে এই সকল গান হইত। ··এই সকল সঙ্গীতেই সর্বপ্রথম আমাদের 'স্বদেশী'র প্রেরণা জাগিয়াছিল। সেই সময় হইতেই বিলাতী পণ্য-বর্জনেরও প্রথম সূত্রপাত হয়। রাজনারায়ণ বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নবগোপাল মিত্র ইহারাই এই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। ইহারাই 'হিন্দু মেলা'র প্রতিষ্ঠা করেন।

ভাবী জীবনে নিশ্চিত স্থিতিলাভের আশায় সুদূর মফঃস্বল শহরের মানুষ বিপিনচন্দ্র উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসেছিলেন। অন্ততঃ তাঁর পিতার ইচ্ছা সেইরকমই ছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হলো না। নব্যবঙ্গের যৌবন-জলতরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর জীবন ভিন্ন পথের অভিমুখী হলো। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁর এফ্. এ বা এল্. এ. পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নভেম্বরের শেষভাগে বিপিনচন্দ্র পানি-বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। সেজন্য

সে-বছর তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হলো না। তার পরের বছর পরীক্ষা দিলেন কিন্তু গণিতে উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিলেন। তখন পাঁচদিন এল্. এ. পরীক্ষা হতো। পঞ্চম দিনের পূর্বাহ্নের পরীক্ষা দিয়ে তিনি পরাহ্নের রসায়নের পরীক্ষায় বসতে পারলেন না। প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে বসতে না বসতেই খুব কম্প দিয়ে জ্বর এলো। যে কয়দিন পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাতে পাস-নম্বর ছিল, কিন্তু শেষদিনের শেষ পরীক্ষায় পাস করতে পারলেন না। এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে গেল।

সূত্র-নির্দেশ

(১) সত্তর বৎসর : বিপিনচন্দ্র পাল, যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, পৃঃ ১১—১২

(২) 'Looking back upon these ancient memories, it seems to me that I received my first lessons in democracy, even as a little boy, from the text reproduced in this book from Chanakya'— Memories of my Life & Times . B. C. Pal, Vol. I, Calcutta, 1932, P. 19.

(৩) 'He did not know English and had no idea of this thing which we call conscience in our modern parlance, but his own sense of truth and right always towered above all considerations of material advantage or social expediency'. Ibid, pp. 20—21

(৪) 'Words without meaning never enter my mind or are retained by my memory. Even to this day I can never keep in my mind non-essentials in the things that I read, while the essential facts or thoughts are retained in a fair proportion'—Ibid., P. 26

(৫) সত্তর বৎসর : পৃঃ ৮৫—৮৬

(৬) ...'I have often wondered if I could use English words with the freedom and facilities with which I am credited if Babu Durga Kumar Basu had not led me through this training'.— Memories of My Life and Times, Vol. I, P. 37.

(৭) সত্তর বৎসর : পৃঃ ১১৩—১৪

(৮) Memories of My Life and Times, Vol. I. P. 71

(৯) প্রবাহিনী'র (সাপ্তাহিক) ১৩২১, ২রা শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের 'জয় রাধে গোবিন্দ, বল রাধে গোবিন্দ' শীর্ষক রচনাটি দ্রষ্টব্য।

(১০) সত্তর বৎসর : পৃঃ ১০৭

(১১) '......She always declared that I, her only son, should die in my boyhood rather than I should grow up as a 'dunce' and a 'boor'. —Memories of Life and Times, Vol. I, P. 183

(১২) সত্তর বৎসর : পৃঃ ১৫৪

(১৩) Memories of My Life and Times, Vol. I, pp. 193-194.

(১৪) 'My mother's death practically removed the bands that had tied my beard and my life to my family and home'.—Ibid, P. 324

(১৫) 'Bankimchandra was, in a special sense, the prophet of this renaissance'.—Ibid, P. 226

(১৬) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ . ৩য় সং, পৃ· ২২৪—২২৫

(১৭) এই সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র মন্তব্য করেছেন : 'The Sepoy Mutiny particularly in Bengal, left the general population of the country absolutely cold. They had belonged to a generation that had seen and suffered from the anarchy and disorder of the immediate Pre-British rule'. —Memories of My Life and Times, Vol. II, Introduction, pp. iii

(১৮) Studies in the Bengal Renaissance, Jadavpur, 1958 P. 153

(১৯) 'The Political Swaraj movement is the child of the religious and social revolt led by the Brahmo Samaj...'

—The Brahmo Samaj and the battle for Swaraj : Bipin Ch. Pal, 1945, P. 12

(২০) 'This was my first public association with the Brahmo Samaj'.— 'Memories of My Life and Times', Vol. I, P. 338

(২১) নবযুগের বাংলা : বিপিনচন্দ্র পাল, ১৯৬৪ পৃঃ ১১৯

(২২) জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০, পৃঃ ১১৯

(২৩) সত্তর বৎসর : পৃঃ ১৯০

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ স্বাধিকার-সন্ধানে ॥
(On the Anvil)

সংশয় থেকে জিজ্ঞাসার উদ্রেক হয়, জিজ্ঞাসা থেকে বিচারের প্রবৃত্তি জাগে। এইভাবে সংশয়-জিজ্ঞাসা-বিচারের সরণী বেয়ে অগ্রসর হতে হতে মানুষ একদা সত্যের সন্ধান লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নবজাগরণ সে যুগের যুবজনমানসে সংশয় এবং সংশয়জনিত জিজ্ঞাসা এবং বিচারপ্রবণতা জাগ্রত করেই নতুন সত্যোপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। নবজাগরণের নেপথ্য উৎস ছিল ইংরেজি শিক্ষা। এই ইংরেজি শিক্ষা-লব্ধ পাশ্চাত্য ভাবধারায় অবগাহন করেই সেকালের শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় আধুনিক মনোভাবের অধিকারী হয়ে উঠেছিল। বাংলা আত্মজীবনী গ্রন্থে বিপিনচন্দ্র যথার্থই বলেছেন—'এইজন্য আমাদের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম বাধিয়াছিল সমাজ ও ধর্মের সঙ্গে, রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে নহে'।[১]

বিপিনচন্দ্র ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দুঘরের সন্তান। স্বভাবে নাস্তিক ছিলেন তা'ও বলা চলে না। অথচ যুগের হাওয়ার প্রভাব এমনই অমোঘ যে সেদিন ভাগীরথী-তীরের হাওয়া সুদূর মফঃস্বল শহর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে সেখানকার আবহাওয়াকে চঞ্চল করে তুলেছিল। এই যুগের হাওয়ার প্রভাবেই একান্ত বালক বয়সে বিপিনচন্দ্রের মনে হিন্দুয়ানির প্রচলিত বিধি-নিষেধের প্রতি প্রচ্ছন্ন বিরূপতার উদ্রেক হয়। হিন্দুসমাজে যাদের জল চল নয়, তাদের ছোঁয়া খাদ্য বা পানীয় গ্রহণে কোনোদিনই তাঁর অপ্রবৃত্তি ছিল না। একটু বড়ো হলে তিনি হিন্দুসমাজের ছুঁৎমার্গকে প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করে চলতে আরম্ভ করলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'এইরূপে শ্রীহট্টে থাকিতেই আমার জাতবর্ণের বিচারের বন্ধন ভিতরে ভিতরে একেবারে ভাঙিয়া যায়'।[২] শ্রীহট্টে বাসকালে হিন্দুয়ানির যে বন্ধন ভিতরে ভিতরে ভেঙে গিয়েছিল, কলকাতায় আসবার পর তা' একেবারে খসে পড়লো। শ্রীহট্টে গোপনে হিন্দুর অখাদ্য খেতেন, কলকাতায় এসে প্রকাশ্যে খাদ্যাখাদ্যের বিচার পরিত্যাগ করলেন। মেসে হিন্দুয়ানি রক্ষার জন্য যখন নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হলো, তখন তিনি মেসের বাইরে গিয়ে নিয়ম

ভঙ্গ করা শুরু করলেন। এই ধরনের কাজে তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন আমরণ-*সুহৃদ* ডক্টর সুন্দরীমোহন দাশ।

হিন্দুয়ানির প্রতি বিরূপতা শুধু খাদ্যাখাদ্য বিচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। ক্রমশঃ তা অন্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হতে লাগলো। মাতৃবিয়োগের পর হিন্দু-প্রথা অনুসারে একমাস অশৌচপালনের কথা। এই অশৌচপালন অশেষবিধ কৃচ্ছ্র-সাধনসাপেক্ষ। মাতৃবিয়োগের পর যে ক'দিন তিনি শ্রীহট্টের বাড়ীতে ছিলেন, সে ক'দিন পিতার নির্দেশে শাস্ত্রবিহিত কৃচ্ছ্রসাধনের সঙ্গে অশৌচ পালন করে চললেন, কিন্তু এই সমস্ত প্রাচীন প্রথার প্রতি তাঁর মন গোপনে গোপনে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। পরিণত বয়সে এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'এই সমস্ত ব্যাপারের প্রতি বিরূপতার বিশেষ কারণ ছিল এই যে, এ সমস্ত আমার স্বতঃস্ফূর্ত শোক-প্রকাশের নিদর্শন ছিল না ; এ সমস্ত ছিল বহিরঙ্গ কর্তৃত্ব কর্তৃক আমার উপর জোর করে চাপিয়ে-দেওয়া। এতে আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতা-বোধ আহত হচ্ছে বলে মনে হতো।'[৩] মায়ের শ্রাদ্ধের পূর্বে তিনি পারিবারিক পুরোহিত এবং দু'জন আত্মীয়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে এলেন। পুত্র তার মাতৃশ্রাদ্ধ গঙ্গার তীরে বসে সম্পন্ন করুক—এই ছিল তাঁর পিতার ইচ্ছা। সতের বছরের কিশোর বিপিনচন্দ্র হিন্দুশাস্ত্র বিধানানুযায়ী যথারীতি মাতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করে পিতার ইচ্ছা পূরণ করলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধের পূর্বের কয়েকদিন কলকাতায় বাসকালে সন্ধ্যাবেলায় যথেচ্ছভাবে আমিষাহার গ্রহণ করে অশৌচবিধি ভঙ্গ করেছিলেন।

শ্রীহট্ট থেকে বিপিনচন্দ্র যখন কলকাতায় আসেন, তখনও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ জন্মায় নি। 'সত্তর বৎসর'-এ তিনি বলেছেন—'হিন্দু-ধর্মের প্রতি তখনো কোনো বীতরাগ জন্মে নাই। হিন্দুধর্মের সঙ্গে কোনো বিরোধ বাধে নাই ; বাধিয়াছিল হিন্দু আচার-বিচারের সঙ্গে, বিশেষতঃ খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের কঠোর বিধিনিষেধের সঙ্গে। আর বাধিয়াছিল হিন্দুর জাতি-বিচারের সঙ্গে।'

বিপিনচন্দ্রের জনৈক আত্মীয় মীর্জাপুর স্ট্রীটে কেশবচন্দ্র সেন-স্থাপিত ব্রাহ্ম-ছাত্রাবাস 'নিকেতনে' থেকে কলকাতায় পড়াশুনো করতেন। তিনি পূর্বে ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র কলকাতায় এলে প্রথমে তাঁর সেই আত্মীয়টি তাঁকে ব্রাহ্ম করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের মনে

এর প্রতিক্রিয়া অনুকূল হলো না। তিনি বলেছেন—'আমার প্রকৃতির মধ্যে চিরদিন এমন একটা কিছু ছিল, যাহাতে আমাকে কোনো বিষয়ে ভজান কখনই সহজ ছিল না।......সুতরাং এই আত্মীয় আমাকে ব্রাহ্ম হইবার জন্য যত ভজাইতে আরম্ভ করিলেন, ততই আমি ব্রাহ্ম-সমাজের বিরোধী হইয়া উঠিলাম।' প্রকৃতপক্ষে সুন্দরীমোহনের সঙ্গে প্রথম যৌবনসুলভ সখ্যই বিপিনচন্দ্রকে ব্রাহ্ম-সমাজের দিকে আকৃষ্ট করে।

শ্রীহট্টে বাসকালেই সুন্দরীমোহন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কলকাতায় আসবার পর তিনি প্রায় নিয়মিতভাবেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-মন্দিরের উপাসনায় যোগদান করতে আরম্ভ করেন। প্রতি রবিবারে সন্ধ্যাবেলায় সুন্দরী-মোহন যখন ব্রহ্ম-মন্দিরে যেতেন, 'অত্যাগোসহনো বন্ধু'—বিপিনচন্দ্র তখন তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মমন্দিরে সংযাত্রী হতেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি উপাসনা করতেন না, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নির্বিবাদে সময়টা কাটিয়ে দিতেন।

এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল। এই সময় বিপিনচন্দ্রের মনে সাহিত্য-সেবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। কেমন করে ভালো বাংলা লেখা ও বলার অভ্যাস করা যায়,—এ নিয়ে কথায় কথায় একদিন সুন্দরীমোহনের সঙ্গে আলাপ হলো। সুন্দরীমোহন বললেন যে আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ বক্তা কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাদিতে মনোনিবেশ করতে পারলে বাংলা ভাষার উপর অধিকার অর্জন সহজ হয়ে যাবে। বন্ধুর এই উপদেশ বিপিনচন্দ্রের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করলো। ব্রহ্মমন্দিরে গিয়ে তিনি আর অযথা সময় নষ্ট না করে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের উপদেশ শোনা শুরু করলেন। তাঁর নিজের কথায়—'এইরূপে অলক্ষিতে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব আমাকে অধিকার করিতে আরম্ভ করে'।

এর পর আর একটি ঘটনা তাঁকে ব্রহ্মোপাসনার দিকে আকৃষ্ট করে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল অথবা মে মাসে সুন্দরীমোহন একবার দেশে যান। সুন্দরী-মোহন এফ. এ. পাস করে তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। সে সময় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ হয়ে জাহাজে শ্রীহট্টে যেতে হতো। জাহাজের জন্য কখনও কখনও আট দশদিন পর্যন্ত ঢাকা অথবা নারায়ণগঞ্জে অপেক্ষা করতে হতো। পথে সুন্দরীমোহনকে ঢাকায় কিছুদিন অপেক্ষা করতে হলো। ঢাকায় তখন কলেরার উপদ্রব চলছে। কলকাতায় বসে এই সংবাদ পেয়ে বিপিনচন্দ্র বন্ধুর বিপদের

আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি বন্ধুর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ভগবানের কাছে নিয়মিতভাবে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। বিপিনচন্দ্র বলেছেন…'ইহাই আমার জীবনে প্রথম ব্রহ্মোপাসনা। আর্ত হইয়া যেমন শৈশবে ও বাল্যে কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতার নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করিতাম,… …সেইরূপ আর্ত হইয়াই প্রথমে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হই, কিন্তু ব্রহ্ম যে কি বস্তু সে জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই।…… প্রথম যৌবনের সখ্যের টানে পড়িয়া যেমন ব্রহ্মমন্দিরে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, লোকে যাহাকে ধর্ম বলে তাহার টানে নহে; সেইরূপ সখ্যের দায়ে পড়িয়াই ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করি, লোকে যাহাকে ধর্ম বলে তাহার টানে নহে।'

এই বছরের শেষভাগে বিপিনচন্দ্র ঘটনাচক্রে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হন এবং এই পরিচয়ের সূত্র অবলম্বন করেই এক বছরের মধ্যে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেন। শুধু সখ্যের দায় ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে তাঁর স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের সহায়ক হতো কিনা সন্দেহ।

শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র,--এম্. এ.। সে সময় তিনি হেয়ার স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত; অচিরেই প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদে তাঁর যোগদানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। অন্যদিকে ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে শিবনাথ তখন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, বাংলা সাহিত্যেও কবি হিসাবে তাঁর পরিচিতি উপেক্ষণীয় নয়। ব্রাহ্ম-সমাজের একচ্ছত্র অধিপতি রূপে কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা অস্তায়মান; শিবনাথের উদীয়মান ব্যক্তিত্ব তরুণদলকে আকৃষ্ট করতে শুরু করেছে। ওদিকে সুরেন্দ্রনাথ যুবসমাজে নবীন ইতালীর স্বাধীনতার ইতিহাস প্রচার করা আরম্ভ করেছেন। কেমন করে ম্যাটসিনি এবং ইয়ং ইতালী সমাজের সভ্যেরা অস্ট্রীয়ার শাসন-বন্ধন থেকে নিজেদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেন—সুরেন্দ্রনাথের বজ্রকণ্ঠে সেই কাহিনী শুনে তরুণ-সম্প্রদায়ের মনে একটা নতুন স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা জাগ্রত হতে থাকে। কারবনারাইদের অনুসরণে কলকাতার নব্য শিক্ষিত ছাত্রেরা ছোট ছোট গুপ্ত-সমিতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এই সমস্ত গুপ্ত সমিতির গঠনের নেপথ্যে তখন অবশ্য কোনো প্রবল বিপ্লববাদের প্রেরণা ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই সময়ে কয়েকজন যুবককে নিয়ে একটি ছোট কর্মী

বা সাধক দল গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। বিপিনচন্দ্র হলেন এর অন্যতম উদ্যোক্তা। 'সত্তর বৎসর'-এ তিনি বলেছেন —'…আমি ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদের দিক দিয়া ব্রাহ্ম-সমাজে আসি নাই, আসিয়াছিলাম একটা উন্নত ও উদার স্বাধীনতার আদর্শের সন্ধানে। …সে আদর্শ কেশবচন্দ্রের মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই, পাইলাম শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে।' কারণ, তাঁরই ভাষায় —'কেবল আমাদের চক্ষে তখন শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যেই তাঁহার ব্রাহ্ম-ধর্মের আদর্শে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটা সত্য ও সঙ্গত সম্মিলন ও সমন্বয় প্রকাশ পাইয়াছিল।'[২]

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে বিপিনচন্দ্র শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশিষ্ট সাধক দলে দীক্ষিত হলেন। তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন,—শরৎচন্দ্র রায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, তারাকিশোর চৌধুরী (পরবর্তী জীবনে ব্রজবিদেহী শান্তদাস নামে পরিচিত) এবং সুন্দরীমোহন দাস। এই দীক্ষাগ্রহণের একটি সুন্দর বিবরণ তিনি আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন—'নিরাকার ব্রহ্মোপাসক হইলেও শাস্ত্রীমহাশয় কবি-মানুষ, একেবারে বাহ্য ক্রিয়া-কলাপের প্রতি বীতরাগ হন নাই। সুতরাং আমাদের এই দীক্ষাতে কতকটা প্রাচীন হিন্দুযজ্ঞের অনুকরণ করিয়াছিলেন। একটা গামলাতে আগুন জ্বালিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, পরাধীনতা প্রভৃতি আমরা যে আদর্শসাধনের জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিতেছিলাম, তাহার পরিপন্থী যা'-কিছু নিজের প্রবৃত্তি এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সেগুলিকে অশ্বত্থপাতায় লিখিয়া এই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়াছিলাম'।

তারপর প্রত্যেকে শাস্ত্রী মহাশয়-রচিত একখানি প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর দান করেন। প্রতিজ্ঞা-পত্রের বিষয়গুলি ছিল এইরূপ :

"(১) আমরা প্রতিমা-পূজা করিব না এবং প্রচলিত প্রতিমা-পূজার সঙ্গে কোনো প্রকারে সংশ্লিষ্ট থাকিব না ;

(২) আমরা বাক্যে ও কার্যে জাতিভেদ মানিব না এবং যাহাতে এই কুপ্রথা দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যায় প্রাণপণে চেষ্টা করিব ;

(৩) আমরা পরিবারে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিব এবং প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিব ;

(৪) আমরা নিজেরা একুশ বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিব না, কোনো

বালিকাকে তাহার ষোড়শ বৎসরের পূর্বে পত্নী রূপে গ্রহণ করিব না, এবং যে বিবাহে পুরুষের বয়স একুশের এবং বালিকার বয়স ষোড়শ বৎসরের কম, সেরূপ বিবাহে কোনো প্রকারে সাহায্য করিব না এবং তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিব না ;

(৫) আমরা যথাসাধ্য স্ত্রীলোক এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিব ;

(৬) আমরা নিজেদের ও দেশের লোকের স্বাস্থ্য, শক্তি ও শৌর্য-বৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামচর্চার প্রচার করিব এবং নিজেরা অশ্বারোহণ ও বন্দুকচালনা অভ্যাস করিব এবং দেশের মধ্যে যাহাতে এ সকল বিদ্যার বহুল প্রচার হয়, তাহার চেষ্টা করিব ;

(৭) আমরা একমাত্র স্বায়ত্তশাসনকেই বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করি। তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের মুখ চাহিয়া এখন যে বিদেশীর রাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার আইন-কানুন মানিয়া চলিব ; কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও এই গভর্নমেন্টের অধীনে কখনই দাসত্ব স্বীকার করিব না।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলাম যে, আমাদের কাহারও কোন স্বতন্ত্র তহবিল থাকিবে না। যে যাহা উপার্জন করিবে, তাহা সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইবে, এবং এই সাধারণ তহবিল হইতে আমাদের পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় খরচপত্রের ব্যবস্থা হইবে"।[৫] শাস্ত্রীমহাশয় তখনও সরকারী চাকরি করতেন বলে সেদিন নিজে এই দীক্ষা-গ্রহণ করতে পারেন নি। ছয়মাস পরে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শাস্ত্রীমহাশয় সিন্দুরিয়াপট্টির মল্লিকদের বরানগরের বাগানবাড়ীতে নিজে এই দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গগনচন্দ্র হোম এবং উমাপদ রায়। এর পর আর কেউ এই দলে প্রবেশ করেন নি। বিপিনচন্দ্র জানিয়েছেন যে কর্মোপলক্ষে সকলে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ায় এই শেষ প্রতিজ্ঞাটি কেউ পালন করতে পারেন নি ; পালন করা সম্ভব ছিল না। তা' ছাড়া যাঁরা এই প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর দান করেছিলেন, তাঁরা সকলেই যথাসাধ্য অন্যান্য প্রতিজ্ঞাগুলি রক্ষা করে চলেছিলেন।

এই দীক্ষা-গ্রহণকে কেন্দ্র করে বিপিনচন্দ্রের জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হলো। এর পূর্বে তিনি মধ্যে মধ্যে ব্রহ্ম-মন্দিরে গেলেও হিন্দুসমাজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক

ছিন্ন করে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হন নি। এ যাবৎ তিনি পিতার নির্দেশ-মতো মায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধাদি করে এসেছেন। কলকাতায় শ্রীহট্ট অঞ্চলের একজন ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনিই পৌরোহিত্য করতেন। কিন্তু দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি আর হিন্দু-প্রথানুসারে মাতৃশ্রাদ্ধ করতে সম্মত হলেন না। বিপিনচন্দ্রের পিতা পূর্বেই বিপিনচন্দ্রের স্ব-জেলাবাসী সহাধ্যায়ীদের কাছ থেকে পুত্রের মতিগতি পরিবর্তনের কথা জানতে পেরেছিলেন। এবার পুরোহিতের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলেন। পাছে পিতার সঙ্গে একটা প্রকাশ্য বিরোধ হয়, সেইজন্য পিতার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি ১৮৭৭-৭৮ এর শীতের ছুটিতে দেশে গেলেন না। ১৮৭৮-এর গ্রীষ্মের ছুটিটাও তিনি কলকাতায় কাটিয়ে দিলেন। পুত্রের অবাধ্যতার জন্য পিতা আগে থেকেই বিপিনচন্দ্রের কলকাতার খরচের টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পুত্র হিন্দুসমাজে থেকে পিতার বংশধারা রক্ষা করবে—এই আশা যখন তাঁর মন থেকে তিরোহিত হলো, তখন তিনি চৌষট্টি বছর বয়সে পিণ্ডলোপের ভয়ে তৃতীয়বার বিবাহ করলেন। এর অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একসঙ্গে পুত্রের কয়েকমাসের বাকী খরচের টাকা পাঠিয়ে দিয়ে 'প্রাণতুল্যেষু' সম্বোধনে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। প্রথম 'প্রাণতুল্যেষু' সম্বোধনে লিখিত এই পত্রখানিই পুত্রের কাছে পিতার শেষ পত্র। এই ধরনের বিশিষ্ট সম্বোধনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র তাঁর বাংলা আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"আজ বুঝিতেছি, তাঁহার ওই শেষ পত্রে 'প্রাণতুল্যেষু' সম্বোধনের ভিতর কি গভীর বেদনা লুকাইয়া ছিল। একমাত্র পুত্রের সঙ্গে চিরদিনের মতন একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হইল।......পুরাতন যুগে পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিলে পিতামাতার প্রাণে যে তীব্র বিরহ-বেদনা জন্মিত, ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করিয়া আমি বাবার প্রাণে সেই বেদনাই জাগাইয়াছিলাম। এই বেদনার তাড়নাতেই বাবা আমাকে তাঁহার এই শেষ পত্রে জন্মের মত 'প্রাণতুল্যেষু' বলিয়া সম্বোধন করেন।......যখনই যেখানে সত্যের ও ধর্মের নামে নূতনে পুরাতনে এই অপরিহার্য সংগ্রাম বাধে, সেইখানেই এরূপ মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়।"[৬] এর পর তাঁর পিতা আট বছর জীবিত ছিলেন; কিন্তু পিতা-পুত্রে আর পত্র-বিনিময় হয়নি। মৃত্যুর পূর্বে শ্রীহট্টের পৈল গ্রামের বাড়িতে পুত্রের সঙ্গে যখন পিতার শেষ সাক্ষাৎ হয়, তখন বিপিনচন্দ্রের পিতা পুত্রকে তাঁর নামকরণের তাৎপর্য বুঝিয়ে বলেন: "সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় 'বিপিন' শব্দের অর্থ জঙ্গল বা

অরণ্য। 'চন্দ্র' অর্থাৎ চাঁদ। 'বিপিনচন্দ্র' শব্দের অর্থ অরণ্য বা জঙ্গলের চাঁদ। আমার বাবা বলেছিলেন যে তখনকার দিনে তাঁর গ্রাম ছিল অনেকটা অরণ্যের মতো—বহির্জগতের কাছে অপরিচিত অখ্যাত একটি জনপদ মাত্র। তাঁর গভীর আশা ছিল, তাঁর ছেলে একদিন এই অরণ্য নিজের প্রভায় আলোকিত করে তাঁকে নাম ও যশের ভাগী করে তুলবে।"[৭]

বিপিনচন্দ্র পিতার কাছ থেকে একসঙ্গে ছয় মাসের খরচ পেলেন বটে কিন্তু ধর্মান্তরগ্রহণের জন্য নিয়মিত অর্থসাহায্য পাবার আর কোনো আশা রইল না। সুতরাং জীবিকা অর্জনের জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন তাঁর পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠলো।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্রের ছাত্রজীবনের অবসান হলো। এই বছরের মাঝামাঝি সময়েই 'সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ'-এরও প্রতিষ্ঠা হলো। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাগ্মিতা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের অনন্য-সাধারণ মুমুক্ষুত্ব ও ভক্তিসাধন, দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের অকাতর অর্থসাহায্য এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের মনীষা—এই সকলের উপরেই বিশেষভাবে এই নূতন সমাজ গড়িয়া ওঠে'। বিপিনচন্দ্র প্রমুখ যুবকের দল বিচিত্র ও বিস্তৃত কর্মসূচীর আকর্ষণে এই নতুন সমাজে নিষ্ঠার সঙ্গে যোগদান করলেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর নতুন সমাজের উপযোগী কর্মী ও প্রচারকদল গঠনের প্রয়োজনে এই সমাজ 'তত্ত্বকৌমুদী' নামে একখানি বাংলা পাক্ষিক এবং 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এই একই উদ্দেশ্যে পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'সিটি স্কুল' নামে একটি স্কুলও স্থাপিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অনেক তরুণ কর্মী সামান্য জীবিকার বিনিময়ে এই স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। জীবিকার প্রয়োজনে বিপিনচন্দ্রও এখানে কর্মপ্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু বিপিনচন্দ্র ছিলেন 'বাঙ্গাল' দেশের মানুষ; 'বাঙ্গাল'-এর পক্ষে খাস কলকাতার ছেলেদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না মনে করে সিটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁকে শিক্ষক রূপে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। সাময়িকভাবে নিরাশ হতে হলেও বিপিনচন্দ্রের পক্ষে এর ফল শুভই হলো। ইংরেজী ১৮৭৯-র প্রথমভাগে তিনি কটকের একটা এনট্রান্স স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়ে গেলেন।

যে স্কুলে কাজ পেয়ে বিপিনচন্দ্র কটকে গেলেন, সে-স্কুলের নাম ছিল—

কটক একাডেমী। এর প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বত্বাধিকারী ছিলেন প্যারীমোহন আচার্য। বিপিনচন্দ্রের বয়স তখন সবে বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। স্কুলে যারা প্রথম শ্রেণীর (বর্তমানে দশম শ্রেণীর) ছাত্র ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সমবয়স্ক ছিল, কেউ কেউ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠও ছিল। অজাতশ্মশ্রু যুবক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বহন করতে পারবে কিনা—এ বিষয়ে স্বত্বাধিকারীর মনেও সংশয় ছিল। সে সময় প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ইংরেজীর কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল না। ইংরেজীর জন্য লেথ্‌ব্রিজ সাহেবের ইংরেজী সঙ্কলন-গ্রন্থ পড়ানো হতো। বিপিনচন্দ্র নিজেও শ্রীহট্টের স্কুলে এই সঙ্কলন-গ্রন্থ পড়েছিলেন। প্রথম দিনে ক্লাসে গিয়ে তিনি এই সঙ্কলনের প্রথম প্রবন্ধটি পড়ানো শুরু করলেন। প্যারীমোহনবাবু পাশের ঘরে বসে শুনতে লাগলেন। পড়ানো শেষ হলে তিনি বুঝতে পারলেন যে, অল্পবয়স্ক হলেও নতুন প্রধান শিক্ষক তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব বহন করবার যোগ্য। প্রথম দিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'...অবাক হইয়া দেখিলাম যে, কোথা হইতে কিরূপে জানি না, এই পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধের পূর্বে যে মর্ম কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই, সেই মর্ম আমার অন্তরে আপনা হইতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহার তথ্য তখন বুঝি নাই, এখনও জানি না। তবে এ জীবনে প্রায়ই এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে, পূর্বে যাহা পড়ি নাই, শিখি নাই, ভাবি নাই, অনেক সময় সে সকল গ্রন্থ বা শাস্ত্র খুলিয়া পড়িতে যাইবামাত্র তাহার নিগূঢ়তম মর্ম আপনা হইতেই যেন আমার অন্তরে ভাসিয়া উঠিয়াছে'।

কটকে বাসকালে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়, তাঁদের মধ্যে তিনজনের কথা বিপিনচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। একজন ছিলেন উড়িষ্যাবাসী বাঙালী, নাম—রাধানাথ রায়। ইনি ছিলেন স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর এবং স্বভাবে কবি। বাংলা, পরে ওড়িয়া ভাষায় কবিতা রচনা করে ইনি যশস্বী হয়েছিলেন। অন্য দু'জন হলেন রেভেন্‌শ' কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বসু এবং গণিতের অধ্যাপক ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। এঁরা দু'জনেই অল্পদিনের মধ্যে সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য বিলাত যান। ব্যোমকেশবাবু কৃষিবিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসায়ে যোগদান করেন। গিরিশচন্দ্র বিলাত থেকে ফিরে এসে

কিছুকাল পরে কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজ প্রতিষ্ঠা করে জাতীয়তাবাদী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌রূপে সেখানেই জীবন উৎসর্গ করেন।

দীর্ঘদিন যাবৎ পিতার সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়নি। পিতা তাঁকে একবার দেশে যাবার জন্য সংবাদও পাঠিয়েছিলেন। এ বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে তাই তিনি পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে শ্রীহট্ট অভিমুখে রওনা হলেন। লোকমুখে শুনেছিলেন যে তাঁর পিতা তখন গ্রামের বাড়ীতে আছেন। তাই স্টীমার থেকে নেমে প্রথমে তিনি পৈল গ্রামে গেলেন। সেখানে গিয়ে শুনতে পেলেন যে তাঁর পিতা কিছুদিন আগে শ্রীহট্ট শহরে চলে গেছেন। পৈল থেকে নৌকাযোগে শ্রীহট্ট শহরে যেতে চার পাঁচ দিন বিলম্ব হলো। এই বিলম্বের জন্য তাঁর পিতার প্রাণ কতখানি অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, স্থানীয় লোকের মুখে তিনি তা' জানতে পেরেছিলেন। অথচ যখন তিনি পিতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন সেই অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতার কোনো চিহ্ন বাইরে প্রকাশ পেল না। দীর্ঘদিন পরে একমাত্র পুত্রকে কাছে পেয়ে তিনি দৌড়ে এসে তাকে বুকে টেনে নিলেন না, ভাবাতুর কণ্ঠে কুশল প্রশ্ন করলেন না, বিলম্বের কারণ সম্বন্ধেও কোনো খোঁজ নিলেন না। পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে, কেবলমাত্র শির আঘ্রাণ করে একটা কাজের অজুহাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পিতা-পুত্রে সে এক মর্মন্তুদ সাক্ষাৎ। অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'সেই সন্ধ্যায়, দীর্ঘকাল পরে বিদ্রোহী পুত্রের দর্শনে সেই বাৎসল্যপূর্ণ পিতৃপ্রাণে কি ঝড় বহিতেছিল, আজ ভাবিলে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। একদিকে কি গভীর আকাঙ্ক্ষা আমাকে বুকে চাপিয়া প্রাণ জুড়াইবার জন্য হইয়াছিল, অন্যদিকে কি সংযম ও সঙ্কল্প, কি অসাধারণ আত্মসংবরণ ও আত্মগোপনের শক্তি জাগিয়া উঠিয়া সে আকাঙ্ক্ষাকে চাপিয়া রাখিতেছিল……'।[৮] কিছুক্ষণ পরে তিনি ঘরে ফিরে এসে পুত্রকে ডেকে বললেন, তোমার সম্বন্ধে কি করব, এখনও ঠিক করতে পারিনি। তোমাকে ঘরে তুলব কি বাইরে রাখতে হবে, আজও স্থির করিনি। আজ রাত্রে ভাত খেয়ো না, জলখাবার খেয়ে থাকো। একটু কষ্ট হবে, কিন্তু কি করব? বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'আর আমাকে ঘরে তুলিলেন না। সেইদিন হইতে আমি ত্যাজ্যপুত্র হইলাম'।[৯]

গ্রীষ্মের ছুটির পর বিপিনচন্দ্র কটকে ফিরে এলেন। কিন্তু কটক একাডেমির প্রধান শিক্ষকের পদে বেশীদিন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। সে সময়

প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থী নির্বাচন পূজাবকাশের পূর্বেই নিষ্পন্ন হতো। প্রধান শিক্ষকরূপে বিপিনচন্দ্র তাঁর স্কুলের চারজন ছাত্রকে আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীরূপে নির্বাচন করেন। পূজাব ছুটিতে কলকাতায় আসবার আগে তিনি পরীক্ষার্থীদের আবেদনপত্রসমূহ স্বাক্ষরিত করে প্যারী-মোহনবাবুব হাতে দিয়ে আসেন। কথা ছিল, পরীক্ষার্থীরা ফি-এব টাকা দিলে আবেদনপত্রগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রারেব ববাবব পাঠিয়ে দিতে হবে। প্রবেশিকা-পরীক্ষাব জন্য নির্বাচিত হতে পারেনি, এমন ছাত্রদের মধ্যে একজন নির্বাচনলাভের জন্য পীড়াপীড়ি কবে। কিন্তু বিপিনচন্দ্র তার অনুরোধ রক্ষা করেন নি। তিনি কলকাতায় চলে এলে প্যারীমোহনবাবু সেই ছাত্রটির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কবতে না পেরে প্রধান শিক্ষকেব নির্বাচনের পরিবর্তন করেন এবং তাকে পরীক্ষার্থী রূপে স্বীকার করে নেন। তাছাড়া বিপিনচন্দ্রের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্রগুলি সবিয়ে ফেলে নিজে স্কুলেব রেক্টর রূপে আবেদনপত্রগুলিতে স্বাক্ষর দান কবেন। স্কুলেব রেক্টর রূপে পরীক্ষার্থীদেব আবেদনপত্রে স্বাক্ষরদানের অধিকাব অবশ্য তাঁর ছিল। কিন্তু প্রধানশিক্ষকের উপর স্কুলেব সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে এইভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত ও অধিকারকে অগ্রাহ্য কবায় প্রধান শিক্ষকরূপে বিপিনচন্দ্র অপমানিত বোধ করলেন। তিনি পূজাবকাশেব পব কটকে গিয়ে পদত্যাগ কবে ইংরেজী ১৮৭৯-র ডিসেম্বর মাসেব প্রথমেই কলকাতায় ফিরে এলেন। এইভাবে স্কুলের শিক্ষকরূপে বিপিনচন্দ্রের প্রথম কর্মজীবনেব অবসান ঘটলো। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'এই কর্মজীবন সংক্ষিপ্ত হলেও এ-ই ছিল আমার জনজীবনে প্রবেশের প্রথম ধাপ। এইজন্য বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি এবং যাঁরা তাঁর আজ্ঞানুবর্তী হয়ে আমাকে প্রথম একটা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো'। ১০

কটক থেকে কলকাতায় ফিরে এসে বিপিনচন্দ্র একেবারে কর্মহীন হয়ে পড়লেন। কী করবেন ভাবছেন, এমন সময় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁর সঙ্গে উত্তরবঙ্গে গিয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকার্যে সাহায্য করবার জন্য বিপিনচন্দ্রকে আহ্বান জানালেন। শিক্ষকতা থেকে লোক-শিক্ষকতা। তিনি সানন্দে এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে উত্তরবঙ্গের

জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি অঞ্চলে গিয়ে প্রচারকার্যে ব্রতী হলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবার কলকাতায় ফিরে আসবার ডাক এলো।

কয়েক বছর আগে কলকাতা-প্রবাসী শ্রীহট্টের ছাত্ররা শ্রীহট্ট সম্মিলনী বা সিলেট ইউনিয়ন নামে একটা সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীহট্টে শিক্ষা, বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বিপিনচন্দ্র কটক একাডেমির কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসবার অল্পদিনের মধ্যে তাঁর দু'জন সহকর্মী,—রাজচন্দ্র চৌধুরী এবং ব্রজেন্দ্রনাথ সেনও কটক একাডেমি ছেড়ে চলে আসেন। সিলেট ইউনিয়নের কর্মকর্তারা দেখলেন, কর্মহীন এই শিক্ষক-ত্রয়ীর সহযোগিতা পেলে অনায়াসে শ্রীহট্টে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়। ইউনিয়নের আহ্বানে এঁরা তিনজন প্রায় অবৈতনিক কর্মী রূপে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে কর্মগ্রহণে সম্মত হলেন।

ইংরেজী ১৮৮০-র জানুয়ারী মাসে বিপিনচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ শ্রীহট্টে গিয়ে বে-সরকারী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। এই বিদ্যালয়ের নাম হলো, 'সিলেট ন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউশন' বা শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয়। এই নতুন বিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে 'ন্যাশন্যাল' বা 'জাতীয়' শব্দটি সংযোজনের একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে কলকাতায় 'হিন্দু মেলা' স্থাপিত হয়। এই মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় জিমন্যাষ্টিক প্রকৃতির উন্নতিবিধান, ভারতীয় চারুকলা এবং কারুকলার প্রদর্শনী করে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রচার। নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের একখানি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, তার নাম ছিল 'ন্যাশন্যাল পেপার'। মিত্র মহাশয় এমন অত্যুৎসাহে জাতীয় ভাবধারা প্রচারে ব্রতী হন যে বন্ধুরা তাঁকে 'ন্যাশন্যাল মিত্র' নামে অভিহিত করেন। বাংলা আত্মজীবনীতে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—"আমি জানি না ইহার পূর্বে বাংলাদেশে কোথাও 'জাতীয়' নামে কোনো বে-সরকারী স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কি না, খুব সম্ভব হয় নাই।......এই ন্যাশন্যাল বা জাতীয় কথাটা আমাদের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে পাই নাই, আনন্দমোহনের নিকট হইতে পাই নাই; কেশবচন্দ্রের নিকট হইতেও পাই নাই। এ বিষয়ে আমাদের গুরু ছিলেন নবগোপাল মিত্র মহাশয়। আর নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের দীক্ষা-গুরু ছিলেন পুণ্যশ্লোক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়'। বস্তুতঃ নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের

কাছ থেকে জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজ্‌মের যে প্রথম প্রেরণা পান, সেই প্রেরণা-বলেই বিপিনচন্দ্র শ্রীহট্টে গিয়ে বন্ধুদের সহায়তায় ন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউশন বা জাতীয় বিদ্যালয় নামে স্কুল স্থাপন করেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শ্রীহট্ট শহরে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। এই নতুন বাংলা সাপ্তাহিকের নাম ছিল 'পরিদর্শক'। বিপিনচন্দ্র এই পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্বগ্রহণের জন্য আহূত হন। বিপিনচন্দ্র জানিয়েছেন যে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্বাধীন দায়িত্বগ্রহণ তাঁর জীবনে এই প্রথম এবং তাঁর শ্রীহট্টের যে বন্ধুরা তাঁকে এই প্রথম সুযোগ করে দিলেন, তাদের কাছে তাঁর পরবর্তী সাংবাদিক জীবন অনেকাংশে ঋণী।[১১] এই 'পরিদর্শক' পরিচালনাকালে তিনি পরিদর্শক প্রেসে বসে, মুদ্রণ-বিদ্যায়ও পারদর্শিতা লাভ করেন। কারণ, প্রেস-কর্মীরা ছিলেন কলকাতার মানুষ। কোনো কারণে তাঁরা প্রেসের কাজ পরিত্যাগ করে চলে গেলে যাতে পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ব্যাহত না হয়, সেইজন্য বিপিনচন্দ্র এবং তাঁর সহকর্মীদের প্রত্যেকেই বস্তু-সজ্জা, প্রুফ-সংশোধন, এমনকি মুদ্রাযন্ত্র চালানো অর্থাৎ মুদ্রণ-সংক্রান্ত সমস্ত প্রকারের কাজেই অল্পবিস্তর দক্ষতা অর্জন করেন।

এই সময় শ্রীহট্টবাসকালে বিপিনচন্দ্রের পিতা তাঁকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করেন। বিপিনচন্দ্র তখন অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে দিন যাপন করছেন। অন্যান্য শিক্ষকদের প্রাপ্য পরিশোধ করবার পর তাঁদের তিনজনের (বিপিনচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ ও রাজচন্দ্র) জন্য স্কুলের ভাণ্ডারে উদ্বৃত্ত অর্থ তেমন কিছুই থাকে না। 'পরিদর্শক'-এর আর্থিক সামর্থ্যও এমন নয় যে সম্পাদকীয় কর্মের জন্য সেখান থেকে কিছু অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। ফলে বহুদিন তাঁকে একবেলা উপবাসে কাটাতে হয়। এমন সময় বিপিনচন্দ্রের পিতৃবন্ধুরা এসে তাঁর কাছে এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তাঁরা জানালেন যে বিপিনচন্দ্র যদি তাঁর বন্ধুসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী তাঁদের শহরের বাড়ীতে বাস করতে সম্মত হন, তা'হলে তাঁর পিতা তাঁর হাত-খরচের জন্য মাসিক একশ' টাকা ভাতা দেবেন এবং স্কুলের কাজ, ব্রাহ্ম-সমাজের কাজ এবং 'পরিদর্শক'-এর কাজ করায় কোনো আপত্তি করবেন না। তখনকার আর্থিক অবস্থায় বিনা আয়াসে মাসিক একশ' টাকা আয়ের সুযোগ কম লোভনীয় ছিল না। কিন্তু বিপিনচন্দ্র পিতার মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে পেরে এই শর্তসাপেক্ষ-

প্রস্তাবগ্রহণে সম্মত হতে পারলেন না। তিনি জানালেন যে যদি ব্রাহ্ম সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁকে তাঁদের শহরের বাড়িতে বাস করবার অনুমতি দেওয়া হয়, তা'হলে তিনি সানন্দে এবং কৃতজ্ঞচিত্তে পিতার প্রস্তাবগ্রহণে প্রস্তুত। কারণ তাঁর মনে হলো, পিতৃ-নির্ধারিত শর্তে তাঁর প্রস্তাবগ্রহণের অর্থ নিজের বিবেক এবং স্বাধীন ধর্মাচরণ-নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। এইভাবে পুত্রের অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে জানবার পরেই বিপিনচন্দ্রের পিতা সম্পত্তির উইল প্রস্তুত করলেন। এই উইলে নির্দেশ রইল যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান সম্পত্তিসমূহের আয় তাঁর গ্রামের বাড়িতে একটি স্কুল এবং একটি হাসপাতাল পরিচালনায় ব্যয়িত হবে। এই সময় থেকে পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। পুত্রের লেখা পত্রগ্রহণে, এমনকি পুত্রের মুখদর্শনেও পিতার আর আগ্রহ রইল না।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি কেশবচন্দ্র সেন তাঁর 'নব-বিধান' ঘোষণা করেন। নব-বিধানের মৌলিক নীতিসমূহের মধ্যে দু'টি মুখ্য নীতি ছিল : (১) সমস্ত ধর্মই সমান সত্য, (২) সাধুসমাগমের মাধ্যমেই ভক্ত জগতের সাধু-সন্ন্যাসী-অবতারের আত্মার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। নব-বিধান প্রচারের ফলে একদিকে কেশবচন্দ্র ও তাঁর ভক্তবৃন্দ, অন্যদিকে সাধারণ ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক কঠিন সংঘর্ষের সূত্রপাত হলো। অনেকের মতে কেশবচন্দ্রের এই নব-বিধানের উদ্ভাবনা পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি।

এই নতুন ধর্মতাত্ত্বিক সংঘাতের ঢেউ সুদূর শ্রীহট্ট পর্যন্ত পৌঁছতে বেশী বিলম্ব হলো না। শ্রীহট্টের স্থানীয় ব্রাহ্ম-সমাজে কেশবচন্দ্রের কিছুসংখ্যক অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। ফলে কেশবচন্দ্রের ভক্তবৃন্দ ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অনুরাগীবৃন্দের মধ্যে একটি বিতর্ক-সভার আয়োজনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলো। যেদিন সন্ধ্যাবেলায় এই সভার অধিবেশন বসলো, সেদিন শ্রীহট্ট শহরের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হলেন। বিপিনচন্দ্র ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অনুরাগী। তিনি সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত্রি প্রায় এগারোটা পর্যন্ত সভায় দাঁড়িয়ে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করলেন। পরদিন সকালে বিপিনচন্দ্রের মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে শুরু করলো। স্থানীয় চিকিৎসকেরা ভীত হয়ে পড়লেন এবং তাঁকে অবিলম্বে স্কুলের কাজ থেকে ছুটি নিতে নির্দেশ দিলেন। উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য বিপিনচন্দ্র কলকাতায় আসতে বাধ্য হলেন। এইভাবে তাঁর

নিজের জেলায় শিক্ষক-সাংবাদিক-প্রচারক জীবনের অকালে পরিসমাপ্তি ঘটলো। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। সুন্দরী-মোহন এই সংবাদ পেয়ে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ না করেই তাঁর পিতার কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে পত্র লিখলেন। কিন্তু উত্তরে তিনি জানালেন যে তিনি বিপিনচন্দ্রকে আর পুত্র বলে স্বীকার করেন না এবং সেইজন্য বিপিন-চন্দ্রের স্বাস্থ্য বা জীবনের প্রতি তাঁর কোনো দায়িত্ব নেই। বিপিনচন্দ্র এ সম্পর্কে বলেছেন—'যাই হোক্, আমি যদি প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু-সমাজে পুনঃপ্রবেশ করতাম, তা'হলে তিনি অবিলম্বে সপরিবারে কলকাতায় এসে আমার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার দায়িত্ব নিতেন।'[১২] কিন্তু প্রাণের ভয়ে অন্তরে অনুভূত অসত্যের সঙ্গে আপস করতে সত্যব্রতী বিপিনচন্দ্রের মন সায় দিল না। তিনি অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন কিন্তু চিকিৎসকের সম্মতি না পাওয়ায় তাঁর শ্রীহট্টে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হলো না। শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয় থেকে তিনি পদত্যাগ করলেন। তবে কর্মহীন অবস্থায় বেশীদিন কাটাতে হলো না। শ্রীহট্ট থেকে কলকাতায় ফিরে আসবার বছরখানেকের মধ্যেই বাঙ্গালোরে রায় বাহাদুর আর্কট নারায়ণস্বামী মুদালিয়ার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য নিয়োগ-পত্র পেয়ে গেলেন।

নারায়ণস্বামী ছিলেন বাঙ্গালোরের একজন কোটিপতি মানুষ। ১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যখন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্মমত প্রচারের জন্য বাঙ্গালোরে যান, তখন রায়বাহাদুর নারায়ণস্বামীর সঙ্গে শাস্ত্রীমহাশয়ের পরিচয় হয়। শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রভাবে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি বাংলাদেশ থেকে একজন যোগ্য ব্রাহ্ম-যুবককে তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য মনোনীত করে পাঠাবার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত শিবনাথকে অনুরোধ জানান। বিপিনচন্দ্র তখন শ্রীহট্ট থেকে ফিরে এসে কলকাতায় কর্মহীন জীবনযাপন করছেন। এই অবস্থায় পণ্ডিত শিবনাথ বিপিনচন্দ্রকে বাঙ্গালোরে গিয়ে নারায়ণস্বামীর স্কুলের ভারগ্রহণের জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি একথাও জানিয়ে দিলেন যে বাঙ্গালোরে বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকাজের জন্যও নতুন বৃহৎ ক্ষেত্রের সন্ধান পাবেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বিপিনচন্দ্র বাঙ্গালোরে যান। এই বছরের ডিসেম্বর মাসেই তাঁর বিবাহ হয়। পাত্রী হলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর

আশ্রিতা জনৈকা বালবিধবা, নাম—নৃত্যকালী। বাঙ্গালোরে যাবার পূর্বেই শাস্ত্রীমহাশয়ের বাড়িতে এই মহিলার সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পরিচিত হন। নৃত্যকালী ছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-কন্যা। সেকালের হিন্দু বিবাহ-বিধি অনুসারে আট বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় এবং নয় বছর বয়সে বিধবা হয়ে তিনি এলাহাবাদে কর্মরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সেকালের নব্যশিক্ষিত বাঙালীর মতো নৃত্যকালীর বড়দাও উদারমতাবলম্বী ছিলেন। বালবিধবা ভগিনীর পুনর্বিবাহে তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু সামাজিক নিগ্রহের আশঙ্কায় সে-ইচ্ছা প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। যাই হোক্, ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত বিরোধের ফলে নৃত্যকালীর পক্ষে সেই সংসারে বাস করা আর সম্ভব হলো না। শেষ পর্যন্ত তিনি এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এসে শিবনাথ শাস্ত্রীর সংসারে কন্যাস্থানীয়ারূপে আশ্রয় লাভ করলেন। শাস্ত্রীমহাশয় ও তাঁর সহধর্মিণীর ইচ্ছানুসারে স্থির হয় যে, বিপিনচন্দ্র নতুন কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলেই তাঁদের পোষ্যকন্যা নৃত্যকালীর পাণিগ্রহণ করবেন।

পণ্ডিত শিবনাথ তখন প্রচারকার্যোপলক্ষে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের উদ্যোগ করছেন। পূর্ব ব্যবস্থানুসারে তিনি তাঁর পোষ্যকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বড়োদিনের ছুটিতে বোম্বে গেলেন। বিপিনচন্দ্র বাঙ্গালোর থেকে বোম্বে চলে এলেন। সেখানে শুভপরিণয় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আত্মস্মৃতিতে বিপিনচন্দ্র বলেছেন যে তাঁর বিবাহ-ই বোম্বেতে ব্রাহ্মমতে প্রথম বিবাহ, যদিও বর ও কন্যার কেউ-ই বোম্বেবাসী ছিল না, উভয়েই ছিল বাঙালী'।[১৩]

বাঙ্গালোরে বিপিনচন্দ্র অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন এবং বাঙ্গালোরের সামাজিক পরিবেশ তাঁর কাছে যথেষ্ট পরিমাণে হৃদ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও বাঙ্গালোরের কর্মজীবন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারলো না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটলো যাতে তাঁর আত্মসম্মান আহত হলো। স্কুলের স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে তাঁর যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, সে-সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল। তিনি ঐ চাকরিতে নিযুক্ত থাকা আর সমীচীন বলে মনে করলেন না। সুতরাং ভবিষ্যতের ভাবনা বিস্মৃত হয়েই তিনি পদত্যাগ-পত্র পেশ করলেন। এইভাবে বিপিনচন্দ্রের বাঙ্গালোরের কর্মজীবনের অবসান ঘটলো এবং তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন।

॥ বিপিনচন্দ্রের শিক্ষা-চিন্তা ॥

ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশের পর পিতার সঙ্গে যখন সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল, তখন বিপিনচন্দ্র জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-বৃত্তি গ্রহণ করেন। শিক্ষক-জীবন তাঁর দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরবর্তী জীবনে তিনি সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং রাষ্ট্রনীতি-চর্চাকেই আত্মপ্রকাশের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তা'হলেও দেশবাসীর শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে তিনি উদাসীন ছিলেন না। তিনি হয়তো রেমণ্টের মতো শিক্ষার কোনো ব্যাপক সংজ্ঞা নির্মাণ করেন নি।[১৪] রুশোর প্রাকৃতিক শিক্ষা-তত্ত্ব (ন্যাচারাল এডুকেশন থিয়োরি) বা ফ্রবেলের বিকাশ-তত্ত্বের (আনফোল্ডমেণ্ট থিয়োরি) অনুরূপ বিশেষ কোনো তত্ত্বও হয়তো তিনি রচনা করেন নি। বিপিনচন্দ্রের রচনায় ও বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ বা শ্রীঅরবিন্দের মতো বিশিষ্ট মৌলিক শিক্ষা-চিন্তার পরিচয়ও হয়তো দুর্লভ। তা' সত্ত্বেও স্বদেশীযুগে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্যতম সংগঠক-প্রচারকরূপে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং অন্যান্য রচনা থেকে তাঁর শিক্ষা-চিন্তার একটি পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

সনাতন ভারতীয় আদর্শানুসারে তিনি নৈতিক শিক্ষাকে সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি বলে বিশ্বাস করতেন। এই নৈতিক শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে—দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বিচিত্র বৈষয়িক কর্মপ্রয়াস এবং দিব্য আবেগ, এই পাঁচটির সমন্বয়ের উপর। মানুষের সমস্ত কর্ম এই পঞ্চ মাধ্যমের যৌথ অবদান। সুতরাং তাঁর মতে সর্বাগ্রে এই মাধ্যমগুলির যথোচিত অনুশীলন ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।[১৫]

ইংরেজ-প্রবর্তিত প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা বিপিনচন্দ্রের মতে চরিত্রবিকাশের অনুকূল নয়। তার প্রধান কারণ, এই শিক্ষার সঙ্গে ভারতবাসীর জাতীয় জীবন এবং জাতীয় ইতিহাসের যোগসূত্র ক্ষীণ। স্ব-সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'নিউ ইণ্ডিয়া'র প্রথম সংখ্যায় সমকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—'আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটি হচ্ছে দু'টি: (১) এ শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় নয়, এবং (২) এ শিক্ষা-ব্যবস্থা যুক্তিসিদ্ধ নয়'।[১৬] ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে 'নিউ ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশিত আরও কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি সমকালীন শিক্ষা-নীতির সমালোচনা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষায় শব্দ-জ্ঞান জন্মায় মাত্র, বস্তুজ্ঞান জন্মায় না।

বিপিনচন্দ্রের কথায়—'এই শিক্ষা মৌখিক শিক্ষা, শব্দের সঙ্গে এর যোগ আছে, বস্তুর সঙ্গে এর যোগ নেই ; এই শিক্ষা শুধু আমাদের স্মৃতিশক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করে, কখনই আমাদের মেধা বা বোধশক্তিবৃদ্ধির সহায়ক নয়……।'[১৭] তাঁর মতে ইংরেজ তার শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার সুবিধার জন্যই এই ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোশিয়েশনে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়ে শিক্ষাবিষয়ক যে সভা (এডুকেশন কন্‌ফারেন্স) করেন, সেই সভাতেই জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠার কথা এবং পরিষদের কার্যক্রম স্থিরীকৃত হয়। এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে অবিলম্বে একটি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ স্থাপন করা প্রয়োজন এবং সেই পরিষদের উদ্দেশ্য হবে 'জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং জাতীয় ধারায় সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী শিক্ষা-ব্যবস্থার সংগঠন'।

বিপিনচন্দ্রের জাতীয় শিক্ষাবিষয়ক বক্তৃতায় মুখ্যতঃ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্-নির্দিষ্ট শিক্ষা-ব্যবস্থাই প্রচার লাভ করেছে। তবে প্রচারকালে পরিষদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার সূত্রে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারাও তাঁর উক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে 'জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং জাতীয় ধারায় পরিচালিত শিক্ষাই হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা'—এই সংজ্ঞার উল্লেখ করে তিনি জানান যে ওর সঙ্গে তিনি আর একটি ধারা যুক্ত করতে চান। শিক্ষাকে অল্পাধিক পরিমাণে জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা যেতে পারে, এবং অল্পাধিক পরিমাণে জাতীয় ধারাতেও পরিচালিত করা যেতে পারে, তবু সে শিক্ষা প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা না হতে পারে। তাঁর মতে, জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মর্মে একটি কার্যকর নিষেধ আরোপিত হওয়া উচিত যে বিদেশী ভাষা কখনই শিক্ষণের মাধ্যম হতে পারবে না ; জনসাধারণের নিজস্ব মাতৃভাষাই হবে শিক্ষণের মাধ্যম। সর্বোপরি, জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে 'জাতীয় ভাগ্যের বাস্তব রূপায়ণ'।[১৮] প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখযোগ্য যে বাংলা-ভাষায় বাঙালির শিক্ষা পরিচালিত করবার দাবি বাংলাদেশে এই প্রথম নয়। 'শিক্ষার হেরফের', 'শিক্ষা-সংস্কার' প্রভৃতি শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এর পূর্বে বাংলাভাষায় বাঙালির শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেছিলেন।[১৯] স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর 'বাঙ্গালাভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধেও অনুরূপ প্রস্তাব

করেছিলেন।[২০] এই প্রবন্ধে স্বামীজী আরও ধাপ অগ্রসর হয়ে বাংলা চলিত-ভাষাকেই সাহিত্যের বাহনরূপে গ্রহণের পক্ষে জোরালো যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণের প্রস্তাবের প্রথম গৌরব যাঁরই প্রাপ্য হোক্ না কেন, জাতীয় শিক্ষা-সংস্থা গঠনের অব্যবহিত পরে বিপিনচন্দ্রের দৃঢ় কণ্ঠকে আশ্রয় করেই বাংলাদেশের এই অগ্রগামী চিন্তা সব-ভারতীয় ক্ষেত্রে অপরিমেয় গুরুত্ব লাভ করেছিল। পরবর্তী কালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ধীরে ধীরে এই নীতি অঙ্গীকার করেই উচ্চশিক্ষা বিতরণ-বিধির সংস্কার সাধন করে চলেছে।

জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণে আপত্তি জানালেও তাঁর জাতীয়তাবাদী মন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি কোনো অনীহা প্রকাশ করেনি। কারণ, তাঁর মতে 'সমস্ত জ্ঞানই ঈশ্বর-দত্ত। ইউরোপের বিজ্ঞান, দর্শন, ইউরোপের কলা-বিদ্যা ইউরোপীয় নয়। সে সমস্তই ঈশ্বর-দত্ত।...... বিদ্যার ক্ষেত্রে জাতি, বর্ণ ও দেশভেদের কোনো স্থান নেই। এ সমস্ত জিনিসের উদ্ভব ও গঠন যেখানেই হোক্ না কেন, ঈশ্বরের প্রতিটি সন্তানের তাতে জন্মগত অধিকার আছে।'[২১]

এদেশে সরকারীভাবে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে প্রাচ্যবাদী ও প্রতীচ্য-বাদীদের মধ্যে যে বিতর্কের উদ্ভব ঘটেছিল, সেই প্রসঙ্গের উত্থাপন করে প্রাচ্যবাদীদের সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য করে তিনি বলেছেন—'তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের 'ঘটত্ব' ও 'পটত্ব' শেখানো—যাতে ঘটত্ব ও পটত্বের ভেতর দিয়ে আমাদের দাসত্বকে চিরস্থায়ী করে তোলা যায়। একবার যদি আপনারা ঘটাকাশ ও পটাকাশে মনোনিবেশ করেন, তা'হলে রাজনৈতিক আকাশ সমস্ত বিঘ্নমুক্ত হয়ে যাবে।'[২২]

প্রকৃতির সূক্ষ্ম কৌশলের ফলে যেমন পুরুষে পুরুষে, নারীতে নারীতে মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যানাতীত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনি একই কারণে ভিন্ন ভিন্ন জাতি নামে পরিচিত বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐ পার্থক্যটুকুই যেমন ব্যক্তিত্ব, মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঐ পার্থক্যটুকুর নাম জাতিত্ব। এইজন্য প্রত্যেক জাতির সামাজিক কাঠামো, তার সামাজিক জীবন-চর্যা, সামাজিক অর্থনীতি অপর জাতি থেকে অনেকাংশে

পৃথক। তাই তিনি বললেন—'জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের স্বকীয় প্রবণতা, যোগ্যতা এবং জাতি হিসাবে আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেরই অনুসরণ করতে হবে'।[২৩] বিদেশী সরকারের দ্বারা এই উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হতে পারে না। তাঁরা যদি ইচ্ছাও করেন, তা'হলে এই কাজ করবার মতো যথেষ্ট জ্ঞান তাঁদের নেই। বিদেশীরা রামায়ণের একটি কাণ্ড কিংবা বেদান্তের কয়েকটি সূত্র অথবা ন্যায়শাস্ত্রের দু'একটি অধ্যায়ের অনুবাদ করে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ বলে গণ্য হতে পারেন, কিন্তু তাতে ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনার অন্তর্লোকে প্রবেশের অধিকার জন্মায় না। বিদেশীদের মনের ছাঁচ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ব্যবহারিক শিক্ষা ভিন্ন প্রকারের। তাই '···বিদেশী সরকার এবং এই সরকার নিজের দেশ থেকে যাঁদের আমদানি করেন, তাঁরা ভারতবর্ষে জাতীয় ধারায় শিক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অযোগ্য।'[২৪]

বিপিনচন্দ্রের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও অনুরূপ অনাস্থার সুর ধ্বনিত হয়েছিল। বঙ্গবিভাগ-আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর বাংলাসরকার এক গোপন সার্কুলার (কার্লাইল সার্কুলার) জারী করেন; ২২শে অক্টোবরের 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় ঐ সার্কুলারের ধারাগুলি প্রকাশিত হলে ২৭শে অক্টোবর (১০ই কার্তিক, ১৩১২) পটলডাঙ্গার মল্লিক-বাড়িতে ছাত্রদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সভাপতিরূপে ভাষণদান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেন—'গবর্মেণ্ট এদেশের অনুকূল শিক্ষা কখনও দিতে পারেন না। ইহার কারণ অক্ষমতাও হইতে পারে, অনিচ্ছাও হইতে পারে। অক্ষমতা—কেননা যেখানে হৃদয়ের যোগ না থাকে, সেখানে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না; অনিচ্ছা—কেননা গবর্মেণ্ট জানেন যে, তাঁহাদিগের সাহিত্য ও ইতিহাস প্রভৃতি হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আমাদের চিত্ত যেভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা তাঁহাদের স্বার্থের অনুকূল নহে। ······এমন অবস্থায় তাঁহাদের উপর শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া আমরা কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।'[২৫]

জাতীয় শিক্ষার ব্যাপারে এই মনোভাবের বশবর্তী হওয়ার জন্যই পরবর্তীকালে (১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে) সরকারী উদ্যোগে সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে আন্দোলন হয় এবং মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গোখেল মহাশয় যে আইনের পাণ্ডুলিপি (বিল) উপস্থাপিত করেন, বিপিনচন্দ্র তাতে সমর্থন জানাতে পারেন নি।

বিষয়টি পরিস্ফুট করবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-বিলের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে যে শিক্ষা-আইন (ইংলিশ এডুকেশন অ্যাক্ট) বিধিবদ্ধ হয় তার ফলে ইংল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই আইন এদেশের নিশ্চেষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষকে অনেকটা সচেষ্ট করে তোলে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী নীতিতে (এডুকেশন পলিসি) প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু কার্যকর কোনো ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় না। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে দেশীয় রাজ্য বরোদায় অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করে আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই সময় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতসরকারকে এই ব্যাপারে সক্রিয় হবার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। তাতেও বিশেষ কোনো ফল হলো না। তখন মাননীয় গোখেল মহাশয় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ১৯শে মার্চ রাজকীয় আইন পরিষদে (ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল) একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

এই প্রস্তাবে তিনি বললেন যে দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার চেষ্টার সূচনা করা হোক এবং এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কর্মসূচী স্থির করবার জন্য অবিলম্বে সরকারী ও বে-সরকারী সদস্য নিয়োগ করে একটি মিশ্র কমিশন গঠন করা হোক্। অবশ্য যে সমস্ত অঞ্চলে বিদ্যালয়ে যাওয়ার যোগ্য ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, সেই সমস্ত অঞ্চলেই বাধ্যতা-মূলক শিক্ষাকে অবৈতনিক করবার প্রস্তাব করা হলো। মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার কথা বলা হলো না। গোখেলজী স্পষ্টই বললেন—'আমি ছেলেদের ক্ষেত্রেই বাধ্যতার সুপারিশ করছি, মেয়েদের ক্ষেত্রে নয়।'[২৬] নতুন শিক্ষাপ্রবর্তনের অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের সুবিধার জন্য তিনি প্রয়োজন হলে নতুন কর ধার্য করবার জন্য সুপারিশ করলেন। তাঁর সুপরিকল্পিত ভাষণে গোখেল মহাশয় ইংল্যাণ্ডে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যে আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনের অনুরূপ একটি আইন প্রণয়ন করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর স্ব স্ব এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব করলেন। প্রসঙ্গতঃ নানা দেশে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যান উল্লেখ করে তিনি অকপট ভাষায় বললেন—'এইটাই হবে আমার মতে যথেষ্ট সতর্ক পন্থা। বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা প্রবর্তন করলে কোনো কোনো মহলে বিরূপতা সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে,

একথা স্মরণে রেখে এবং এদেশে বৃটিশ সরকারের অবস্থাগত অসুবিধার কথা বিবেচনা করে, যেভাবেই হোক্ শুরুতে সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বাধ্যতা-আরোপ অবশ্যই পরিহার করতে হবে।'[২৭] নিজের প্রস্তাবের বাস্তব উপযোগিতা সম্পর্কে গোখেল মহাশয়ের নিজের অন্তরেই যেন কিছু পরিমাণ দ্বিধা ও সংশয় ছিল। সরকারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সুবিবেচনার আশ্বাসলাভের পর অবশ্য এই প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়।

যাই হোক্, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ যথাক্রমে এলাহাবাদ এবং নাগপুর অধিবেশনে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। তা' সত্ত্বেও যখন বিশেষ কোনো ফল হলো না, তখন মাননীয় গোখেল মহাশয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ পুনর্বার রাজকীয় আইন-পরিষদে একটি বে-সরকারী বিল উত্থাপন করলেন। প্রাদেশিক সরকার-সমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং কিছুসংখ্যক স্থানীয় বে-সরকারী সংস্থার অভিমত আহ্বান করা হলো। এক বছর পরে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ বিলটি আলোচনার জন্য উত্থাপিত হলো। কিন্তু দু'দিন বিতর্কের পর বিলটি পরিত্যক্ত হয়ে গেল। সমস্ত সরকারী সদস্য এবং কিছুসংখ্যক বেসরকারী জমিদার-সদস্য বিলটির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। ইতিমধ্যে অবশ্য বাধ্যতামূলকতার তীব্রতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে বিলের মধ্যে নানা প্রকারের রক্ষা-কবচ সংযোজিত হয়েছিল।

সংবাদপত্র যদি সমকালীন জনমতের বাহক হয়, তা'হলে বলা যায় যে শুরু থেকেই বাংলাদেশের জনমত মাননীয় গোখেল মহাশয়-প্রস্তাবিত সার্বজনীন শিক্ষা-বিলের প্রতি তেমন অনুকূল ছিল না। এই বিলের উপর প্রথমবার যে বিতর্ক হয় সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনায় ঐ বিতর্ককে 'বিশুদ্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ অব্যবহার্য প্রকৃতির' (পিওরলি অ্যাকাডেমিক ক্যারেক্টার) বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে—'…শুধু সভার কার্যাবলীতে অংশগ্রহণকারী সরকারী এবং বে-সরকারী সদস্যরাই নন, স্বয়ং মিস্টার গোখেলেরও মূল বিষয় সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয় না'।[২৮] কারণ, বৃত্তিজীবী মানুষের সন্তানেরা চার বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষায় যে যোগ্যতা অর্জন করবে তার সাহায্যে চাকরি তো পাবেই না, বরং শিক্ষিতম্মন্যতার ফলে নিজস্ব বৃত্তিকে অসম্মানকর বলে মনে করবে। বিলটির উপর দ্বিতীয়বার বিতর্কের সময়

তদানীন্তন শিক্ষা-সদস্য (এডুকেশন মেম্বার) মন্তব্য করেন যে, বিলটি রক্ষা-কবচে পরিপূর্ণ; রক্ষাকবচে এমন পরিপূর্ণ যে অনেকের কাছেই এটি অপ্রচলিত বিধি (ডেড্‌লেটার) বলে গণ্য হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন আইন-প্রণেতা হিসাবে ঐ বিলকে অবশ্যই বাতিল করাই বিধেয়। অমৃতবাজার পত্রিকা শিক্ষা-সদস্য স্যার হেরকোর্ট বাটলারের উক্তি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেন—'মিস্টার গোখেলের যদি জনশিক্ষার শখ থাকতে পারে, তা' হলে আমরাও বলবো যে আমাদেরও দেশের অভ্যন্তরে লক্ষ লক্ষ লোকের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের উন্নতি-বিধানের একটা নিজস্ব শখ আছে।'[২৯] তদানীন্তন পরিবেশে সম্ভবত জনশিক্ষা অপেক্ষা জনস্বাস্থ্যই বেসরকারী বিবেচনায় অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল।

বাধ্যতামূলক এই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে বিপিনচন্দ্র 'জবরদস্তির লেখাপড়া' আখ্যা দিয়েছিলেন। বিদেশের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত এবং বিদেশী সরকারের উদ্যোগে পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার অন্যতম সংগঠক এবং প্রধান প্রচারক বিপিনচন্দ্র তাই সমর্থন জানাতে পারেন নি। 'শিক্ষা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা', 'জবরদস্তির লেখাপড়া' এবং 'লোকশিক্ষা ও সমাজপ্রকৃতি' শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর চিন্তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি প্রস্তাবিত সার্বজনীন শিক্ষার তিনটি সম্ভাব্য কুফলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

'শিক্ষা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—'একদল স্বদেশ-হিতৈষী দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্য তাঁহারা রাজপুরুষদিগের শরণাপন্ন হইয়া রাজবিধানের দ্বারা দেশের লোককে জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।......এই চেষ্টার পশ্চাতে একটা অসত্য লুকাইয়া আছে। সর্বাগ্রে সেই অসত্যটাকে টানিয়া বাহির করা আবশ্যক।......আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বই জন ক, খ, পড়িতে পারেন না, সুতরাং তাঁহারা অশিক্ষিত। বিলাতের শতকরা নিরানব্বই জনের বেশী লোকে এ, বি, সি, পড়িতে পারেন, অতএব তাঁরা শিক্ষিত। এই একটা অসদ্‌যুক্তি এই সাধুচেষ্টার অন্তরালে দাঁড়াইয়া ...।'[৩০] আমাদের দেশে বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে লোকশিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ...দিন ছিল না। বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন ইংরেজরা হয়তো সংবাদপত্র পাঠ করে

দেশের খবরাখবর রাখতে পারেন, কিন্তু ঐ শিক্ষার বলে তাঁরা কখনই দেশের সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না। বিপিনচন্দ্রের মতে তাই '…বর্ণপরিচয়েই যে শিক্ষালাভ হয় তা' নয়। সমকালীন ইংরেজী সাহিত্যের মানের অধোগতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ইংল্যাণ্ডে প্রবর্তিত সার্বজনীন শিক্ষাকেই তিনি এর কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। পূর্বে সাহিত্য ছিল সাধনার বিষয়। সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের ফলে পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক অক্ষম লেখকও অর্থ-আয়ের লোভে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এর ফলে সাহিত্যের মান অবনত হচ্ছে। এটি, তাঁর মতে, ওদেশে সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের অন্যতম কুফল। তাই ঐ প্রবন্ধে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন—'আমাদের দেশে বিলাতী ছাঁচে জনসাধারণের মধ্যে জোর করিয়া বর্ণপরিচয়-প্রচারের চেষ্টা হইলে যে অন্যবিধ ফল উৎপন্ন হইবে, সে আশারই বা কোনো কারণ আছে কি ?'

সম্ভাব্য দ্বিতীয় কুফল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 'জবরদস্তির লেখাপড়া' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে ইংরেজী সভ্যতার মূলমন্ত্র হচ্ছে—স্বত্ব বা 'রাইটস্'। ওদেশে সার্বজনীন শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণকে স্ব স্ব স্বত্ব বা রাইট্স সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। "আর রাইটস্-এর নিয়মাধীন সমাজের প্রকৃতিই 'চাচা আপন বাঁচা'। প্রতিযোগিতাই এ সমাজের বিবর্তনের মূলসূত্র। এখানে সকলেই সকলের উপর চড়িবার জন্য ব্যস্ত।"[৩১] স্বার্থপরতাই প্রতিযোগিতার জনক। বিলাতী ছাঁচের সার্বজনীন শিক্ষা স্বত্ব-চেতনা ও প্রতিযোগিতার মনোভাবকে একান্তভাবে প্রশ্রয় দিয়ে যদি স্বার্থপরতাকে উগ্র করে তোলে তা'হলে পরিবার-বদ্ধ এই প্রাচীন সমাজে ভাঙন অনিবার্য। কারণ, উগ্র স্বার্থপরতা নয়, নম্র পরার্থপরতাই পারিবারিক এবং সামাজিক সংহতির ধারক। আত্যন্তিক অধিকারবোধ ইউরোপের সমাজের পক্ষে সুফলপ্রসূ হয়নি। তাই ঐ প্রবন্ধেই স্বদেশহিতৈষী বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠে আশঙ্কার উৎকণ্ঠিত প্রকাশ—'আর আমরাও কি শিক্ষা-বিস্তারের নামে, দেশোন্নতির দোহাই দিয়া, এই সাংঘাতিক ব্যবস্থাকে দেশে প্রচলিত করিয়া যে সমাজ চিরদিন জগতে পরার্থপরতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আছে, তাহার বুকে এই আত্মঘাতী স্বার্থানুসন্ধানকে প্রতিষ্ঠিত করিব ?'

লোক-শিক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'লোক-

শিক্ষা ও সমাজ-প্রকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন—'লোক-শিক্ষার সঙ্গে সমাজ-বিবর্তনের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। যে সকল শক্তির সংঘর্ষণে বা সমবায়ে সমাজ-জীবন বিবর্তিত হইয়া থাকে, লোক-চরিত্রের শক্তি তন্মধ্যে সর্বপ্রধান।··· এইজন্য কোনও সমাজে কোনও অভিনব লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্বে এই নূতন ব্যবস্থার সঙ্গে সেই সমাজের পুরাতন প্রকৃতির কতটা সামঞ্জস্য ও সঙ্গতিসাধন সম্ভব, ইহা ভালো করিয়া তলাইয়া দেখা আবশ্যক'।[৩২] প্রস্তাবিত সার্বজনীন শিক্ষা-বিলে বিপিনচন্দ্র এই অপরিহার্য বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব লক্ষ্য করেছেন। তিনি আলোচনা-প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, য়ুরোপের সমাজগঠনের ও সামাজিক বিবর্তনের মূলে যেমন প্রতিযোগিতা বা কম্পিটিশন, তেমন ভারতের সমাজ-গঠনের ও সামাজিক বিবর্তনের মূলে সাহচর্য বা কো-অপারেশন বিদ্যমান রয়েছে। এমন নিঃস্ব হয়েও এই জাতিটা যে এখনও বেঁচে আছে, এই সাহচর্য-প্রতিষ্ঠিত সমাজগঠনই তার মুখ্য কারণ। প্রস্তাবিত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত হলে এই সমাজগঠনের মূলেই কুঠারাঘাত করা হবে বলে তাঁর আশঙ্কা। এর অবশ্যম্ভাবী কুফল— '···আমাদের যে একান্নবর্তী পরিবারে আমাদের সমাজের ও সভ্যতার পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা, সেই একান্নবর্তী পরিবারগুলি একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবে।' সেইজন্য প্রকৃত শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী হয়েও তাঁকে বলতে হয়েছে—'···আর এই আশঙ্কাতেই শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখেলের এই সংস্কার-চেষ্টার প্রতিরোধ হওয়া দেশের এক প্রকারের জীবন-মরণের কথা বলিয়া মনে করি'।

॥ নারী-শিক্ষা ॥

নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিপিনচন্দ্রের অভিমত ছিল প্রগতিমূলক। নারীকে শিক্ষাদান সম্পর্কে তাঁর দ্বিমত তো ছিলই না, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাও পুরুষের মতো নারীর পক্ষেও সমান প্রয়োজনীয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর নিজের ভাষায় 'আমাদের মতে পুরুষের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষার যতখানি প্রয়োজন, নারীর পক্ষেও উচ্চতর শিক্ষার ততখানি প্রয়োজন।'···'আমাদের মেয়েদের জন্য উচ্চতর অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করে তাদের উপযুক্ত পত্নীরূপে গড়ে তুলবার আন্তরিক চেষ্টা, বর্তমান পরিস্থিতিতে, বাল্য-বিবাহের কুপ্রথাকে

চিরস্থায়ী করবার নামান্তর মাত্র।'[৩৩] নারীদের উচ্চশিক্ষা পত্নীত্ব এবং মাতৃত্বের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, পারিবারিক জীবনে এবং এমনকি নারীদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও হানিকর—এই ধরনের যুক্তি উত্থাপন করে একশ্রেণীর তার্কিক সে সময় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকারের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতেন। বিপিনচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। আর একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—'নারীর মুখ্য ক্ষেত্র সর্বদাই যে তার পরিবার, এতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু তার দৃষ্টি যদি নিজের ঘরের দেয়ালের বাইরে না যায়,……তা' হলে উপযুক্ত মাত্রাজ্ঞান এবং নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তার পারিবারিক জীবনই রুদ্ধ এবং পঙ্গু হয়ে গিয়ে প্রকৃত মূল্য, সৌন্দর্য এবং উচ্চ ভাব হারিয়ে ফেলবে।'[৩৪] উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে নারীর স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনার কথাও তিনি স্বীকার করেন নি। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে না, এমন শহুরে মেয়েদের স্বাস্থ্যও তেমন ভালো না। তাঁর মতে, নাগরিক জীবনে যে কড়া জেনানা-পর্দানশিনতা রক্ষা করা হয়, সেইটাই সাধারণভাবে অভিজাত ঘরের মেয়েদের স্বাস্থ্যহানির কারণ। তিনি বলেন 'যদি ছেলেদের কলেজের মতো মেয়েদের কলেজেও উপযুক্ত ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থা করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরতা মহিলাদের প্রতিদিন মুক্ত বাতাসে অঙ্গসঞ্চালনের জন্য পর্যাপ্ত স্থানের ব্যবস্থা করা হয়, তা'হলে তাঁদের যে শারীরিক উন্নতি হবে তা' সমগ্র জাতির পক্ষে নিশ্চিতভাবে লাভজনক হবে।'

সূত্র-নির্দেশ

(১) সত্তর বৎসর : বিপিনচন্দ্র পাল, কলকাতা, ১৯৬২ পৃঃ ১৯৫

(২) ঐ ঐ পৃঃ ১২১

(৩) —Memories of My Life and Times : B. C. Pal Vol. I. P. 220.

(৪) সত্তর বৎসর : পৃঃ ২২০—২১

(৫) ঐ পৃঃ ২২৩—২৪

(৬) ঐ পৃঃ ২২৮

(৭) —Memories of My Life and Times, Vol. I. pp. 327—28.

(৮) 'ত্যাজ্যপুত্র'—সাহিত্য ও সাধনা, ২য় খণ্ড : বিপিনচন্দ্র পাল, ১৯৬০, পৃঃ ১০৮—০৯।

(৯) ঐ ঐ পৃঃ ১০৯

(১০) 'Short as it was, my first stepping-stone to public life, and I shall always be grateful to Providence and those who were His instruments in securing my post as Headmaster of a High English School :— Memories of My Life and Times, Vol. I. P. 363.

(১১) 'Memories of My Life and Times', Vol. I, pp. 373—74.

(১২) Ibid, P. 385.

(১৩) Ibid, P. 397.

(১৪) 'Education means that process of development in which consists the passage of a human being from infancy to maturity, the process whereby he gradually adapts himself in various ways to his physical, social and spiritual environment—'The Principles of Education : T. Raymont, P. 4.

(১৫) The Soul of India : B. C. Pal. 4th Edn 1958, pp 172--173

(১৬) 'The fundamental defects of our present system of educations are two namely,—(1) that it is not a national, and (2) that it is not a rational system...।' New India, 12th August, 1901

(১৭) '...This education has been verbal education, it has no reference to things but words, it has developed our memory but never our sense or understanding......' —National Education. (১৯০৭) খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত মাদ্রাজ-বক্তৃতা : Swadeshi and Swaraj : B. C. Pal, 1954, p. 256.

(১৮) '...It should have for its object the realisation of national destiny'.— National Education : Swadeshi and Swaraj. B. C. Pal, P. 252.

(১৯) (ক) 'শিক্ষার হেরফের' : সাধনা পৌষ, ১২৯৯ (১৮৯৩) 'শিক্ষা' : রবীন্দ্ররচনাবলী ১২শ খণ্ড,

(খ) 'শিক্ষা-সংস্কার' : ভাণ্ডার আষাঢ়, ১৩১৩ (১৯০৬)। 'শিক্ষা' রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড।

(২০) 'বাঙ্গালা ভাষা', ১৯০০। 'ভাববার কথা' : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ষষ্ঠ খণ্ড, জন্ম-শতবর্ষ সং, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৫—৩৭।

(২১) —'Boycott' (১৯০৭) খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত মাদ্রাজ বক্তৃতা--Swadeshi and Swaraj : B. C. Pal, P. 235.

(২২) Ibid, P. 259.

(২৩) Ibid, P. 253

(২৪) Ibid, P . 254

(২৫) গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৩৫৮), ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৬২৫

(২৬) 'I advocate compulsion in the case of boys and not of girls.'— Gokhale's speech, A. B. Patrika, March 19, 1910

(২৭) 'This would in my opinion be a sufficiently cautious procedure. In view of the unpopularity which compulsion was likely to evoke among certain se tions and special difficulties attaching to the position of the British Government in this country, direct compulsion by the State must be avoided at any rate to start with'— Gokhale's speech, A. B. Patrika, March 19, 1910

(২৮) '... not only those official and non-official members who took part in the proceedings, but even Mr. Gokhale himself seemed to have no quite definite idea about the subject'.— Primary Education Debate in the Supreme Council' (Editorial) : A. B. Patrika, March 21, 1910

(২৯) 'If Mr. Gokhale has his hobby in the education of the masses, we have also a hobby of our own in ameliorating the insanitary condition of the hundreds of millions in the interior'.—'The Education Bill Lost' (Editorial) : A. B. Patrika, March 20, 1012.

(৩০) 'শিক্ষা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা' : বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১৩১৮ : ১৯১২ ।

(৩১) 'জবরদস্তির লেখাপড়া' : বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গদর্শন—চৈত্র,১৩১৮ : ১৯১২

(৩২) 'লোকশিক্ষা ও সমাজ-প্রকৃতি' বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গদর্শন—পৌষ, ১৩১৯ : ১৯১৩

(৩৩) '··· we hold that higher education is needed as much for men as it is needed for women...'. '...To stop higher, that is university education for our girls, and yet to seek honestly to make them good wives would mean, under existing circumstances, nothing but perpetuation of the evil custom of child-marriage'. —'The University Education of Women I : New India, June 2, 1902.

(৩৪) 'The women's sphere, no doubt is, and will always be, mainly her family ; but if her vision goes not outside the walls of her own house,......then her family life itself will remain stinted and crippled and will lose its value and beauty and grandeur, for want of proper proportions and right perspectives'—The University Education of Women II : New India, June 5, 1902

তৃতীয় অধ্যায়

॥ ধর্মক্ষেত্রে ॥

(Rapier)

বাঙ্গালোরের শিক্ষক-জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের ভাবী কর্ম-জীবনের প্রস্তুতি-পর্বের প্রথম ভাগের সমাপ্তি ঘটে এবং দ্বিতীয় ভাগের সূচনা হয়। এই ভাগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো,—সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বৃত্তি-ভোগীরূপে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বিলাত-গমন এবং বিলাত থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে আমেরিকা-যাত্রা। কিন্তু ১৮৮৩ থেকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ—এই পনের বছরের ইতিবৃত্তও তাঁর জীবন-কাহিনীতে একেবারে অনুল্লেখনীয় নয়। এই সময়ের মধ্যে তাঁর কর্ম-প্রয়াস নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। এই সময়ের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে যা' তাঁর ভাবী জীবন-ভাগ্যের পক্ষে অল্পাধিক পরিমাণে অপরিহার্য।

এই সময়ের মধ্যে তিনি কলকাতার 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' (ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন'-এর পরিবর্তিত নাম) পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে (সাব্ এডিটর) কাজ করেন (১৮৮৩-৮৪), সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত ক্ষুদ্রায়ত বাংলা মাসিক 'আলোচনা'র সম্পাদক না হলেও সম্পাদকীয় কর্ম ও দায়িত্বের মুখ্য অংশ বহন করেন। তারপর লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদকের পদে যোগদান করেন (১৮৮৭-৮৮); লাহোর থেকে কলকাতায় ফিরে এসে কিছুকাল পরে তিনি 'আশা' নামে একখানি মাসিক এবং 'কৌমুদী' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করেন (১৮৯২-৯৩)।

এই সময়ের মধ্যে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন (১৮৮৬); মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে (১৮৮৭) কংগ্রেস-মঞ্চ থেকে অস্ত্রআইন-রদের পক্ষে বক্তৃতা করেন; ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে কুলি-সমস্যা প্রসঙ্গে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

সাংবাদিকতা এবং রাজনীতি-চর্চার পাশাপাশি এই সময়ে তিনি সাহিত্য-সাধনাতেও আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকাতেও তাঁর লেখা

প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়-সীমার মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের নাম : 'শোভনা' (উপন্যাস)—১৮৮৪ ; 'ভারতসীমান্তে রুশ'—১৮৮৫ ; 'ভারতেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া' (জীবনী)—১৮৮৭ ; 'সখা-সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন' (জীবনী)—১৮৮৭ ; 'সুবোধিনী' (নীতিশিক্ষা বিষয়ক)—১৮৯২ ; ভক্তিসাধন' (থিওডোর পার্কার রচিত ধর্মোপদেশাবলীর বাংলা অনুবাদসংগ্রহ)—১৮৯৪।

সাংবাদিকতা, রাজনীতি এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রের সাধনা ও অবদানের কথা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে যথাযথভাবে আলোচিত হবে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

বিপিনচন্দ্র তখন অত্যন্ত অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। তখন তিনি তিনটি শিশুসন্তানের পিতা। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রথমা কন্যা জন্মগ্রহণ করে ; দ্বিতীয়া কন্যার জন্ম হয় ১৮৮৪-র নভেম্বরে। প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করে ১৮৮৫-র নভেম্বরে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়নের সহ-সম্পাদকের কাজের জন্য মাসিক ৭০ টাকা ভাতা পেতেন। আর 'ভারত-মিহির' পত্রিকায় লেখা দিয়ে গড়ে মাসে ২০ থেকে ২৫ টাকা অতিরিক্ত আয় করতেন। একটি ক্রম-বর্ধমান পরিবারের ব্যয়নির্বাহের পক্ষে এই আয় যথেষ্ট ছিল না। এর মধ্যে ১৮৮৪-র শেষভাগে বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়নের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর আয়ের মুখ্য পথটাই বন্ধ হয়ে গেল। এই দুঃসময়ে তাঁর কয়েকজন শ্রীহট্টবাসী বন্ধু স্বেচ্ছায় সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁরা ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁরা অর্থপ্রদায়ী অতিথিরূপে বিপিনচন্দ্রের পরিবার-ভুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি সানন্দে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কারণ, এই ব্যবস্থা তাঁর দুরূহ আর্থিক সংগ্রামে সাময়িক স্বস্তির সন্ধান এনে দিল।

১৮৮৫-র আগস্ট মাসে বিপিনচন্দ্রের দশমাস বয়স্কা দ্বিতীয়া কন্যা গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসকেরা অন্ত্রের যক্ষ্মারোগ সন্দেহ করে জলবায়ু পরিবর্তনের বিধান দিলেন। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কলকাতার বাইরে কোনো স্বাস্থ্যনিবাসে যাবার আর্থিক সামর্থ্য তখন তাঁর ছিল না। লেডী অবলা বসুর পিতা বাবু দুর্গামোহন দাস তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং দুঃসময়ে বারংবার তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দুর্গামোহনবাবু এই সংবাদ জানতে পেরে বিপিনচন্দ্রকে সপরিবারে তাঁর ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে বাস করবার

পরিবার-পরিজন-পরিবৃত বিপিনচন্দ্র (বয়স ৩০)

জন্য আহ্বান জানালেন। এই সামান্য স্থান-পরিবর্তনেই শিশু-কন্যাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো। এই বাড়িতেই তাঁর প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। জাতাশৌচের সময় উত্তীর্ণ হলে তিনি বৌবাজারে পঞ্চাননতলা লেনের বাসায় ফিরে আসবার উদ্যোগ করছেন, এখন সময় তাঁদের গ্রামের একটি যুবকের সঙ্গে দেখা হলো। সে সদ্য দেশের বাড়ি থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছে। তার মুখ থেকে বিপিনচন্দ্র শুনলেন যে পিতা দীর্ঘদিন পরে পুত্রের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন এবং দেখা হলে জানাতে বলেছেন যে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। এই মৌখিক সংবাদটুকু শুনেই বিপিনচন্দ্রের মনে হলো যে এতদিন পরে অভিমানী পিতা মনে মনে পুত্রের সাক্ষাৎ কামনা করছেন অথচ সে কথা মুখ ফুটে সরাসরি পুত্রকে জানাতে পারছেন না। হয়তো পুত্রকে তিনি ফিরে পেতে চান। সমস্ত কথা শুনে দুর্গামোহনবাবুও এইরকম মন্তব্য করলেন এবং অবিলম্বে পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। এতেও সমস্যা দেখা দিল। সদ্য-প্রসূতি স্ত্রী এবং শিশু-পুত্রটিকে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে যাওয়া প্রয়োজন এবং দেশের বাড়িতে যেতে হলে যে পথ-খরচা লাগে তা'ও সংগ্রহ করা প্রয়োজন। পিতৃপ্রতিম দুর্গামোহনবাবু এই সমস্ত অসুবিধার কথা একেবারেই গ্রাহ্য করলেন না। স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের তিনি নিজের কাছে রেখে বিপিনচন্দ্রকে প্রয়োজনীয় পথ-খরচা দিতে স্বীকৃত হলেন।

এইভাবে প্রায় নয় বছর পরে বিপিনচন্দ্র পিতৃ-সন্দর্শনে গেলেন। পিতা-পুত্রে সাক্ষাতের পর পিতা পুত্রকে অবিলম্বে কলকাতায় গিয়ে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের দেশের বাড়িতে আনবার জন্য আদেশ করলেন। স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হয়ে পড়ছে, সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা আর নিজের পক্ষে সম্ভব নয়; পিতার ইচ্ছা, এবার পুত্র এসে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির ভার গ্রহণ করুক। পিতার আদেশ শিরোধার্য করে বিপিনচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলেন এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বড়ো-দিনের কাছাকাছি সময়ে স্ত্রী, দুই কন্যা এবং সদ্যোজাত শিশু-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে দেশের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। কলকাতায় তাঁর কিছু দেনা ছিল। দুর্গামোহনবাবু তা' পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

দীর্ঘকাল পরে আবার তিনি পৈল গ্রামের পুরানো বাড়িতে ফিরে এলেন। শৈশব ও কৈশোরের অজস্র মধুর স্মৃতি-বিজড়িত, স্নেহময়ী মায়ের বিচিত্র পবিত্র স্মৃতি-মুখরিত পৈল গ্রামের বাড়ি। কিন্তু স্মৃতিচারণের আনন্দ অঙ্কুরেই বিনষ্ট

হয়ে গেল। যেদিন বাড়িতে পৌছলেন, তার পরদিন তাঁর স্ত্রী কলেরারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। দু'সপ্তাহ যাবৎ মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম চলতে লাগলো। বন্ধু সুন্দরীমোহন যথাসাধ্য চিকিৎসা করে চললেন। ব্যাধি এমন কঠিন আকার ধারণ করলো যে এক সময় সকলেই তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করলেন। চিকিৎসকের নির্দেশে রোগিণীকে মুরগীর যূষ খাওয়ানোর ব্যবস্থা হলো। স্বধর্মনিষ্ঠ পিতা সমস্ত গোঁড়ামি ভুলে গিয়ে বিধর্মী পুত্রবধূর অসুস্থ শয্যার পাশে বসে নিজের হাতে সেই পথ্য পুত্রবধূর মুখে ঢেলে দিতে লাগলেন। পিতৃ-স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র মন্তব্য করেছেন—'বাংলাদেশের একজন বৃদ্ধ প্রাচীনপন্থী হিন্দুর পক্ষে এ কাজ কম ব্যাপার ছিল না'।[১]

ধীরে ধীরে সঙ্কট কেটে গেল, বিপিনচন্দ্রের পত্নী সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু যেভাবেই হোক, এই কাল ব্যাধির বীজাণু পিতার দেহে সংক্রামিত হলো। দৃশ্যতঃ ব্যাধি ভীষণ আকার ধারণ না করলেও তিনি মনে মনে যেন বুঝতে পারলেন যে তাঁর মৃত্যুকাল আসন্ন। কাল বিলম্ব না করে তিনি গ্রাম্য প্রধানদের ডাকিয়ে এনে তাঁদের উপস্থিতিতে একটা নতুন 'উইল' লিপিবদ্ধ করলেন। এই উইলে তাঁর সম্পত্তির একটা নির্দিষ্ট অংশ বিপিনচন্দ্রের বিমাতা ও ভগিনীকে দান করলেন। বিপিনচন্দ্র হলেন এই উইলের অছি (এক্‌জিকিউটর)। বাকী সম্পত্তির আইনানুগ উত্তরাধিকারী হলেন বিপিনচন্দ্র। পুত্র ধর্মান্তর গ্রহণ করলে পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। পিতৃশ্রাদ্ধে অনধিকারী পুত্র হিন্দু আইন অনুসারে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারেও অনধিকারী। কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উইলের ব্যাপারে প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে হিন্দু আইনের এই বিধানের বদল হয়ে যায়। সুতরাং নতুন উইলে বিপিনচন্দ্রের কথা পৃথকভাবে উল্লেখের প্রয়োজন হলো না। উইল স্বাক্ষরিত হবার পর তিনি তাঁর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনেকটা কৈফিয়তের সুরেই সর্বসমক্ষে বললেন যে দশ বছর যাবৎ তিনি পুত্রের মুখ দর্শন করেন নি। পূর্বেকার উইলে তিনি পুত্রকে সম্পত্তির সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর পুত্র 'হারামজাদা' নয়। সে নিজে যা ধর্ম বলে বিশ্বাস করেছে, নির্ভীক চিত্তে তার শরণ নিয়েছে। মুখে একরকম প্রচার করে এবং কাজে অন্য রকম আচরণ করে সে পিতার ধর্ম নষ্ট করেনি। তিনি আরও জানালেন যে, তাঁর ধারণা, তাঁর মৃত্যুর পর হয়তো অনেকে তাঁর সম্পত্তির লোভে এগিয়ে আসবে। কিন্তু

বিপিনের ধর্মমত যা'ই হোক্, একমাত্র সে ব্যতীত আর কেউ তাঁর স্ত্রী ও কন্যার সম্মানরক্ষার জন্য উৎকণ্ঠা বোধ করবে না। এইজন্যই তিনি বিপিনকে ডাকিয়ে নিয়ে এসেছেন।

এই কথাগুলি বলবার পর তাঁর দু'চোখ মুদ্রিত হয়ে এলো, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর চৈতন্য ফিরে এলো না। পরদিন দুপুরবেলা যখন অল্প সময়ের জন্য চৈতন্য ফিরে এলো, তখন তিনি চেয়ে দেখেন, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা দু'জনেই তাঁর শয্যাপাশে বসে রয়েছেন। তাঁদের দিকে চেয়ে তিনি বললেন—'তোমরা দু'জনেই এখানে। তা' হলে বৌমার পথ্যের ব্যবস্থা করছে কে? এই কথা ক'টি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁর দু'চোখ মুদ্রিত হয়ে গেল। পরদিন (২৪শে জানুয়ারি, ১৮৮৬) সকালে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করলেন। পিতা-পুত্রে পুনর্মিলনের পর ইহজাগতিক সমস্ত কর্তব্যের ভার পুত্রের উপর অর্পণ করে পিতা ইহজগৎ থেকে চির-বিদায় গ্রহণ করলেন।

পিতার মৃত্যু-প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'আমার পিতার মৃত্যু আমার অন্তর্জীবনে একটা বিপুল শূন্যতার সৃষ্টি করলো এবং বহির্জীবনে একটি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করলো।'[২] পিতার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পারিবারিক বন্ধন থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বিচ্ছিন্ন হলেও স্নেহময় পিতার অদৃশ্য দৃষ্টি তাঁর প্রতি সদা জাগ্রত হয়ে আছে—এই বিশ্বাস সমস্ত দুঃখ-বেদনায় মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করেছে। তিনি মনে মনে জানতেন যে চরম দুর্দিনে পিতার কাছ থেকে আর্থিক বা অন্যবিধ সাহায্যলাভে কখনই বঞ্চিত হবেন না। পিতার মৃত্যু তাঁর মনের মধ্যে লালিত বিশ্বাসের সেই মহীরূহকে উন্মূলিত করে দিল।

ব্রাহ্ম এবং জাত্যন্তরিত বলে বিপিনচন্দ্র পিতার শবদেহ স্পর্শ বা শ্মশানকৃত্যে যোগদান কোনোটাই করতে পারলেন না। তাঁর বিমাতাই চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন, নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো তিনি অদূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। লৌকিকভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও এবার তিনি হিন্দু সন্তানের মতোই অশৌচ-বিধি পালন করলেন। দশ বছর আগে মাতৃবিয়োগের পর যে অশৌচ-বিধি পালনের বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, দশ বছর পরে পিতৃ-বিয়োগের পর সেই বিধি পালনের কৃচ্ছ্রসাধন তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলেন। তিনি হিন্দু-প্রথা অনুসারে এক মাস যাবৎ অশৌচ পালন করে চললেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, মাতৃবিয়োগ ও পিতৃবিয়োগের মধ্যে যে দশ বছরের

ব্যবধান সেই দশ বছরে হিন্দুশাস্ত্রবিহিত পারলৌকিক ক্রিয়ার কঠোরতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও মহান্ আদর্শ ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো এবং পিতৃবিয়োগের পর তিনি স্বেচ্ছায় সে সমস্ত বিধি অঙ্গীকার করে নিলেন।[৩]

পিতৃশ্রাদ্ধের পর বিপিনচন্দ্র আর গ্রামের পৈতৃক বাড়িতে ফিরে গেলেন না। স্বগ্রাম থেকে তিন মাইল দূরবর্তী মহকুমা শহর হবিগঞ্জেই বাস করতে লাগলেন। সেখানে থেকেই পৈতৃক জমিদারি তদারকির কাজ শুরু হলো। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মনে হতে লাগলো গ্রাম্য জমিদারের ভূমিকা তাঁর স্বভাবের অনুকূল নয়। বরং এ কাজ তাঁর ধর্মীয় প্রত্যয় এবং সামাজিক আদর্শের বিরোধী। প্রজার কাছ থেকে প্রাপ্য কর আদায় করতে গিয়ে অচিরেই তিনি আবিষ্কার করলেন যে কিছু পরিমাণে বেআইনী ক্রিয়া-কলাপের আশ্রয় না নিয়ে গ্রাম্য জমিদারের কর্তব্য পালন করা অসম্ভব। ফলে ক্রমশঃ তিনি এই কাজের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে উঠতে লাগলেন।

এই সময় লোক্যাল বোর্ডের একটি নির্বাচনের ব্যাপারে হবিগঞ্জের মহকুমা-শাসকের (এস্. ডি. ও.) সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিল। ঐ নির্বাচনে তিনি নিজে ছিলেন একজন প্রার্থী। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন নিকটবর্তী একজন ধনী জমিদার। মহকুমা-শাসক প্রায় প্রকাশ্যেই তাঁর বিরোধিতা করে জমিদারের পক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন। ফলত, সেই নির্বাচনে বিপিনচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী জয়ী হলেন। মহকুমা-শাসকের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ জানালেন। ফলে মহকুমা-শাসক এবং তাঁর মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হলো।

বিপিনচন্দ্রের পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হবিগঞ্জ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হয়; বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি বিপিনচন্দ্রকে ঐ পদ প্রদান করেন এবং তিনি সানন্দে তা' গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়টি ছিল সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত (এডেড্) বিদ্যালয়। প্রচলিত নিয়মানুসারে, এই ধরনের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের উচ্চ পদসমূহের নিয়োগের ক্ষমতা পরিচালক সমিতির থাকলেও, সেই সমস্ত নিয়োগে শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ আবশ্যিক ছিল। বিপিনচন্দ্রের নিয়োগ স্থানীয় মহকুমা-শাসকের মনঃপূত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ সম্ভব হলো না।

এই অবিচার বিপিনচন্দ্রের মনে গভীর ক্ষোভের উদ্রেক করলো। সরকারী হঠকারিতার প্রত্যুত্তরদানের উদ্দেশ্যে তিনি অবিলম্বে নিজেই একটি উচ্চ ইংরেজী

বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। শ্রীহট্ট এবং শিলং থেকে ব্রাহ্ম-বন্ধুরা বিদ্যালয় পরিচালনায় সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলেন। পিতৃ-স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তার নামকরণও করা হয় তাঁর পিতার নামে। এইজন্য তাঁর ব্যয় হয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই বিদ্যালয় মাত্র এক শিক্ষাবর্ষের বেশী অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারলো না। এই অসাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে বিপিনচন্দ্র মন্তব্য করেছেন —'আমি ব্যর্থতার বেদনাবোধ মনে নিয়ে এই অসমসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হই। হবিগঞ্জের পুরানো বিদ্যালয়টি ধ্বংস করার সংকল্প মনে নিয়েই আমি এই কাজে অগ্রসর হয়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে আমি অচিরেই উপলব্ধি করলাম যে, আমার অসাফল্যের প্রকৃত কারণ আমার বিদ্বেষ-পরায়ণ মনোভাব—যে মনোভাবের তাড়নায় আমি এই বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলাম।'[৪]

এর পর হবিগঞ্জে বসবাসের বাসনা তাঁর মন থেকে তিরোহিত হলো। হবিগঞ্জে বাস করতে না পারলে পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করাও সম্ভব নয়। তাই শেষপর্যন্ত স্বাভাবিক মূল্যের প্রায় অর্ধেক মূল্যে তিনি পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে ফেললেন। মৃত্যুর সময় বিপিনচন্দ্রের পিতা সুদে আসলে প্রায় চৌদ্দহাজার টাকার ঋণ রেখে যান। সম্পত্তি বিক্রির পর তিনি যাবতীয় পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করলেন এবং অবশিষ্ট অর্থ সম্বল করে চিরদিনের জন্য হবিগঞ্জ পরিত্যাগ করে আবার ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে কলকাতায় ফিরে এলেন।

কলকাতায় ফিরে এসে বিপিনচন্দ্রের পক্ষে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পুরানো সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন-সাধন সম্ভব হলো না। প্রায় এক বছর যাবৎ জমিদারি বিক্রয়-লব্ধ অর্থের সঞ্চয়-ভাণ্ডার থেকে জীবনযাত্রানির্বাহের ব্যয় বহন করতে হলো। কর্মহীন অবস্থায় এই সময় তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপাত্ররূপে নানা স্থানে বক্তৃতাদান ও প্রচারের কাজ করে বেড়াতে লাগলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে তিনি সহ-সম্পাদকরূপে লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় যোগদান করেন এবং ১৮৮৮-র আগস্ট মাসে সেই কাজ পরিত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন। এর অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর পুত্র নিরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্রের অন্তর্জীবনে নীরব পরিবর্তনের সূচনা হয়।

পিতা এবং পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেন, তখন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর চেতনা স্পষ্ট ছিল না। লাহোর থেকে ফিরে আসবার পরেই আমিত্বের অতিরিক্ত একটা শক্তিরূপে ঈশ্বর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি তাঁর মনে জাগ্রত হলো। এই ঈশ্বর নিজে অদৃশ্য থেকে যেন তাঁর জীবন ও সমস্ত কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত করছেন। তিনি নিজের জীবনকে এক পথে পরিচালিত করতে চান কিন্তু নিয়ন্ত্রণাতীত পরিস্থিতি যেন তাকে ভিন্ন পথে টেনে নিয়ে যায়। প্রথম যৌবনে ঈশ্বর এবং জাগতিক রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে তিনি দ্বৈতবাদী হয়ে উঠেছিলেন। পরম সত্তা বা 'আদি কারণ' এক নয়, দুই—ঈশ্বর এবং পদার্থ, এই ধারণা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তখন সেই ধারণা ধীরে ধীরে অপসৃয়মান হয়ে উঠলো। একজন ঈশ্বর ব্যতীত ঈশ্বর নেই এবং জগতে ও মানুষের জীবনে যা' কিছু ঘটে সমস্তই সেই এক সর্বগত বিধাতার নির্দেশে ঘটে—বিপিনচন্দ্রের মন ধীরে ধীরে এই প্রত্যয়ে উপনীত হলো। তিনি বলেছেন যে, এই সময় থেকে তার অন্তরে প্রকৃতপক্ষে নবীন আধ্যাত্মিক আকূতির সূচনা হলো। এই আধ্যাত্মিক আকূতি অনুসরণ করেই ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

এই সময়ের মধ্যে তাঁর প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। নয় বছরের জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে অতর্কিত বিচ্ছেদ জগৎ ও জীবনগত রহস্যের মর্মসন্ধানে বিপিনচন্দ্রকে ব্যাকুল করে তুললো। এই গভীর শোকের দিনে তাঁর সান্ত্বনার সঙ্গী হলেন এমার্সন এবং টেনিসন। বিশেষতঃ এমার্সনের 'কমপেনসেশন' শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আশাবাদী মন নতুন আশার আলোর সন্ধান পেল।[৫] জীবনে শুধু হরণই নেই, পূরণও আছে এবং হরণ-পূরণের মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেন—এই বিশ্বাসের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হলেন। এ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের মন্তব্য : 'জীবন এবং ঈশ্বর সম্পর্কে অদ্বৈতবাদী দর্শনের দিকে আমার উপলব্ধি আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্বেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল, এখন এমার্সন এবং টেনিসনের শিক্ষা থেকে তা' নতুন শক্তি ও সমর্থন আহরণ করলো। ক্রমশ আমি বদ্ধমূল অদ্বৈতবাদী হয়ে উঠলাম।'[৬]

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিপিনচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ ঘটে। ঐ বছরের আগস্ট মাসে তিনি 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী'র (বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরী তথা পূর্বতন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রাক্‌রূপ) গ্রন্থাগারিক ও সম্পাদকের পদে

নিয়োগ লাভ করেন। বৃটিশাধিকারের পর কলকাতায় স্থাপিত সাধারণ গ্রন্থাগার-সমূহের মধ্যে এই গ্রন্থাগার ছিল প্রাচীনতম। কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মতো মনীষীরাও এই গ্রন্থাগারে বসেই সাহিত্য এবং দর্শন বিষয়ে অধ্যয়ন ও জ্ঞান আহবণ করতেন। বিপিনচন্দ্রের যোগদানের অব্যবহিত পূর্বে এই গ্রন্থাগারটি পুনর্বিন্যস্ত হয়। এই পদের বেতন ছিল তখন বার্ষিক দশটাকা হারে বৃদ্ধি সহ 'একশ' থেকে দু'শ' টাকা। তখনকার দিনে এই বেতনের হার আকর্ষণীয় ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপিনচন্দ্র ভিন্ন দু'টি কারণে এই পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রথমতঃ, এই সুসজ্জিত গ্রন্থাগারের অমূল্য গ্রন্থরাজির সংসর্গে আত্মানুশীলনের সুযোগ লাভ; দ্বিতীয়তঃ, এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগের সূত্রে সমকালীন ইউরোপীয় সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। কারণ, সে সময় এই গ্রন্থাগার ছিল বৃটিশ এবং ভারতীয় বিদ্যানুরাগীদের সাধারণ মিলন-কেন্দ্র।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। বিপিনচন্দ্রের পক্ষে ঘটনাচক্রে ঐ পদে বেশীদিন টিকে থাকা সম্ভবপর হলো না। এই গ্রন্থাগারের একটি পরিচালক-সমিতি ছিল বারো জন সদস্য নিয়ে গঠিত। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ লি নামে জনৈক ইংরেজ আই. সি. এস্. ছিলেন সেই সমিতির সভাপতি। মিঃ লি বিপিনচন্দ্রের প্রতি সদয় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করতেন। কিন্তু সমিতির ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে অনেকেই গ্রন্থাগারিক ও সম্পাদকের উপর ব্যক্তিগত প্রভুত্ববিস্তারের চেষ্টা করতেন। বিশেষতঃ একজন সদস্যের আচরণে বিপিনচন্দ্র নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এই ব্যাপারে কয়েকজন সদস্য ক্ষুব্ধ হলেন। ফলে পদত্যাগ করা ব্যতীত আর কোনো গত্যন্তর রইলো না।

এই ঘটনার পর মিঃ লি বিপিনচন্দ্রকে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির লাইসেন্স ইন্‌সপেক্টরের এক অস্থায়ী পদে নিযুক্ত করলেন। ১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে কিছুকাল যাবৎ এই পদে কাজ করবার পর তিনি এখানেও পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। কর্মজীবনের এই অস্থিরতার কারণ সম্পর্কে আত্মজীবনীতে তিনি মন্তব্য করেছেন —'সাহিত্য ও প্রচারকার্যের প্রতি আমার জীবনব্যাপী দুর্বার আকর্ষণ আমাকে অচিরেই, লোক যাকে ঐহিক কর্ম বলে, সেই ধরনের সমস্ত ঐহিক কর্ম পরিত্যাগে এবং একজন সাধারণ প্রচারক রূপে ব্রাহ্ম-সমাজের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগে বাধ্য করলো'।[৭]

বিপিনচন্দ্রের জীবনে নতুন আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর জগৎ ও জীবনগত রহস্যভেদের জন্য তাঁর হৃদয়ে ব্যাকুলতা জাগে। প্রথমে তিনি এমার্সনের রচনার মধ্যে সান্ত্বনার বাণী সন্ধান করেন। এমার্সনই প্রথম তাঁকে অদ্বৈতবাদী ভাবধারার (মনিজম্) প্রতি আকৃষ্ট করেন। এই ভাবধারার পূর্ণতর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তিনি দেখতে পান উপনিষদ্, এবং বেদান্তসূত্রের মধ্যে। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ থেকে অবসরগ্রহণের পর বিপিনচন্দ্র এই সমস্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেন। এর মধ্যে অবশ্য তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছেন এবং ভগবদ্গীতার একটি বাংলা টীকা রচনাও শুরু করেছিলেন। কিন্তু সে কাজ অবশ্য অসমাপ্তই রয়ে গিয়েছিল। টীকা রচনা সম্পূর্ণ করতে না পারলেও এই সূত্রে তিনি গীতা-রহস্যের মধ্যে অবগাহন করবার সুযোগ লাভ করেন এবং আত্মার অবিনশ্বরতা সম্পর্কে একটি স্থির প্রত্যয়ে উপনীত হন। গীতার পর উপনিষদ্ এবং উপনিষদের পর তিনি বেদান্তসূত্র পাঠ করেন। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কৃত উপনিষদের সংস্করণ এবং পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত বেদান্তসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশে তাঁর প্রথম পথপ্রদর্শক হয়েছিল। সমগ্র বেদান্তসূত্র গ্রন্থখানি পাঠ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি বলেছেন—'কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথম যে কয়েকটি সূত্র পাঠ করি, তার ফলে আমার মস্তিষ্ক এবং মনের কাঠামোটি পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে যায়, আমার সামনে জ্ঞানের এক নতুন রাজ্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং আমার বাংলা ও ইংরেজী রচনার মধ্যে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়।'[৮] এই সময় প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ তাঁর অন্তর্জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রসঙ্গ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে হিন্দু ভাবধারার যে পুনরুজ্জীবন ঘটে সেই পুনরুজ্জীবনের কথা এবং সেই সূত্রে সেই পুনরুজ্জীবন-আন্দোলনের মধ্যমণি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঊনবিংশ শতকের শেষপাদে হিন্দু বাংলার ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পুনর্গঠনের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয় এবং অবিস্মরণীয় নাম। প্রকৃতপক্ষে রামমোহনে যার সূচনা, রামকৃষ্ণে তার সার্থকতা। রামমোহন যে ধর্ম-সমন্বয় বা সার্বজনীন ধর্মের স্বপ্ন দেখেছিলেন, রামকৃষ্ণদেব যেন সেই স্বপ্নের মূর্ত

বিগ্রহরূপে অবিভূত হয়েছিলেন। স্বকীয় উপলব্ধির আলোকে তিনি যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করলেন, তাকে স্বভাবসিদ্ধ সহজ ভঙ্গিতে বাঙ্ময় করে তুলে বললেন—'যত মত, তত পথ'। রামমোহন নিরাকার ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য বলে বিধান দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেব আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে সাকার নিরাকার উভয়কেই সত্য বলে ঘোষণা করলেন এবং স্বকীয় জীবন-সাধনায় খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত, বৈষ্ণব—সর্ব ধর্মের মর্মগত সত্যকে অঙ্গীকার করে নিলেন। ধর্মীয় সাধনার ইতিহাসে সম্ভবত অন্য কোনো সাধকের জীবনে এমন সংস্কারমুক্ত প্রগতি-পরায়ণ মতবাদ মূর্ত হয়ে ওঠেনি।

ব্রাহ্ম সাধকেরা ছিলেন মুখ্যত যুক্তিমার্গের পথিক। রামকৃষ্ণ হলেন মুখ্যত ভক্তি-মার্গের পথিক। কোমলে-কঠিনে-গড়া বাংলার মাটিতে যুক্তিবাদ এবং ভক্তিবাদ—উভয় 'বাদ'-ই প্রশ্রয় লাভ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু জনজীবনের প্রত্যয়-ভূমিতে ভক্তিবাদ যতখানি মূল প্রসারিত করে নিতে পেরেছে, যুক্তিবাদ তা' পারেনি। তা' ছাড়া মানুষ তো শুধু মস্তিষ্কজীবী নয়, সে হৃদয়জীবীও বটে। তাই তার জীবনে যেমন যুক্তি বা বুদ্ধি-বিচারের স্থান আছে, তেমনি আছে আবেগ ও কল্পনাজাত প্রবৃত্তি বা ভক্তির স্থান। ব্রাহ্ম-নেতারা ভক্তির দিকটাকে উপেক্ষা করে যুক্তিসর্বস্ব হয়ে উঠবার ফলে তাঁদের মতবাদ জনজীবনে মূল প্রসারিত করতে পারলো না। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাহ্ম-মতবাদের এই অপূর্ণতার দিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন—'সাড়ম্বর ধর্মীয় আচার এবং পূজার্চনায় অভ্যস্ত হিন্দুর মনে ব্রাহ্ম সমাজ একটা শূন্যতার সৃষ্টি করলো। এখান থেকেই গোলযোগের উৎপত্তি। একই সঙ্গে ঈশ্বরের তুরীয় অথচ স্বকীয় স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনার অবতারণা কখনই সাধারণ মানুষের মন পরিতৃপ্ত করতে পারে না'।[৯]

ফলে ব্রাহ্ম মতবাদ ক্রমশঃ ইংরেজি-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের একাংশের তত্ত্ব-চর্চার বিষয়ে পরিণত হতে লাগলো। রামকৃষ্ণদেব ছিলেন ভক্তিমার্গের পথিক। তিনি তত্ত্বের তুষারকে আবেগ ও অনুভূতির উত্তাপে বিগলিত করে সহজ জীবন-প্রবাহের মধ্যে মিশিয়ে দিলেন। এখানেই হিন্দু ভাবধারার পুনরুজ্জীবনের ঐতিহাসিক সার্থকতা।

ব্রাহ্ম ভাবধারার এই অপূর্ণতা যে সমস্ত ব্রাহ্ম নেতাদের কাছে ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে আচার্য কেশবচন্দ্র সেন এবং একদা তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি কেশবচন্দ্র সেন অষ্টম ও নবম দশকে ধর্মক্ষেত্রে যে কর্মসূচী গ্রহণ করেন তার মধ্যেই পুরাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ বা আপসের লক্ষণ বর্তমান ছিল। নগর-সংকীর্তনের প্রবর্তন, বৈষ্ণব ধর্মের দিকে অনুরাগ, রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ, অবতার তত্ত্বে বিশ্বাস ও পরিশেষে ভক্তিমূলক 'নব বিধানের' প্রবর্তন ইত্যাদি ঘটনা এর প্রমাণ।"[১০] বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরবর্তীকালে ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সাধনায় দীক্ষিত হন এবং এর ফলে কিছুকালের মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায়। বাল্য ও কৈশোরে বৈষ্ণব আবহাওয়ার মধ্যে লালিত বিপিনচন্দ্র তরুণ যৌবনে ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করলেও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্পর্শে এসে আবার নতুনভাবে বৈষ্ণব সাধনার দিকে আকৃষ্ট হলেন।

বিজয়কৃষ্ণের কাছে দীক্ষাগ্রহণ তাঁর ব্রাহ্ম প্রত্যয়সমূহকে ক্ষুণ্ণ করলো না। এই দীক্ষাগ্রহণ তাঁর বহিরঙ্গ জীবনচর্যায় তেমন কোনো পরিবর্তন আনলো না বটে, কিন্তু অন্তরঙ্গ জীবনে তিনি ধীরে ধীরে লক্ষণীয় পরিবর্তন অনুভব করতে লাগলেন। তথাকথিত ঐহিক কর্ম তিনি পূর্বেই পরিত্যাগ করেছিলেন। এখন থেকে দৈনন্দিন জীবনের একটি বড়ো অংশ তিনি শাস্ত্রপাঠ, স্তোত্র-আবৃত্তি এবং গুরুর সান্নিধ্যলাভে নিয়োগ করলেন। তিনি আহার্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করলেন এবং প্রায়ই স্বপাকে একবেলা নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করা শুরু করলেন। কোনোদিন রাত্রিবেলা ক্ষুধাবোধ করলে দোকান থেকে 'পুরি' আনিয়ে তাই খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে লাগলেন। এই ধরনের সংযত জীবনচর্যা তাঁর মনোজীবনে আর এক রূপান্তরের সূচনা করলো। এই সময় বিপিনচন্দ্র পূর্ণ অহিংসা পালনে উদ্যোগী হলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, কোনো জীবন্ত প্রাণীকে বধ করবেন না—তা' সে ছারপোকাই হোক্, পিঁপড়েই হোক্ অথবা অন্য কোনো বহুপদী প্রাণীই হোক্। তখন তিনি একটি একতলা বাড়িতে বাস করতেন ; সে বাড়ি ছিল বহু দংশক কীটের আবাসস্থল। যে মুহূর্তে তিনি মনে প্রাণে স্থির করলেন যে কাউকে তিনি আঘাত করবেন না, তখন থেকে তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে তারাও আর তাঁকে অথবা তাঁর পরিবারের কাউকে দংশন করছে না। এই অভাবিতপূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—'কিন্তু এমনভাবে এই অহিংসার অনুশীলন করতে হবে যাতে অহিংসা অনুশীলনকারী বা অনুশীলনকারিণীর কায়িক ও মানসিক সত্তার অর্থাৎ স্নায়বিক প্রকৃতির অঙ্গ হয়ে

ওঠে। এই অহিংসা তথাকথিত নন্-ভায়োলেন্স অপেক্ষা নিঃসন্দেহে অতিরিক্ত কিছু।'[১১] এই সময় থেকে তিনি সর্বপ্রকারের প্রতিযোগিতা পরিহার করে চলবার চেষ্টা শুরু করলেন। কারণ তাঁর মনে হলো যে প্রতিযোগিতা হিংসারই প্রকারভেদ। এই একটি চিন্তা ও চেতনার প্রেরণায় তাঁর সঞ্চয়-স্পৃহা দমিত হলো। কেউ সাহায্য-প্রার্থী হয়ে উপস্থিত হলে আগামী দিনের নিজস্ব প্রয়োজনের কথা স্মরণ করে তাকে বিমুখ করা অন্যায় বলে মনে হতে লাগলো। আর্থিক বা যে কোনো প্রতিযেগিতাই যে ঈশ্বর ও মানবতার দরবারে পাপ বলে গণ্য হবার যোগ্য—এই সময় থেকে তিনি এই স্থির প্রত্যয়ে উপনীত হলেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে সর্বদা এই নীতি তিনি জীবনচর্যায় সমানভাবে অনুসরণ করতে পারেন নি, তবে এই প্রত্যয় তাঁর অন্তরে চিরজাগরূক রয়ে গেছে। তিনি বলেছেন—এ সমস্তই অবশ্য এমার্সনের সেই উক্তির সত্যতা প্রতিপাদন যে আমাদের প্রত্যয় অনিত্য কিন্তু আমাদের পাপ-প্রবণতা অভ্যাসগত।'[১২] তাঁর অন্তর্জীবনের বিবর্তনে গুরুদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীব অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা তিনি বারংবার নানা প্রসঙ্গে পরম শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করেছেন। বিপিনচন্দ্র জানিয়েছেন যে, গুরুব কৃপাতেই তাঁর অন্তরে প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি সম্পর্কে নতুন অর্থবোধের উন্মেষ হয়। দীক্ষাগ্রহণের পর থেকে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর বা তারও বেশী কাল যাবৎ সেই অর্থ ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরে প্রকাশমান হয়ে আসছে। তাঁর মতে এইটাই হচ্ছে গুরুর কৃপাবলের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর অবদান।[১৩]

বিশ্বজগৎ যাহারে মাগিছে ঃ

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্ম-সমাজের বৃত্তিধারী রূপে বিলাত যাত্রা করলেন। অক্সফোর্ডের নিউ ম্যানচেস্টার কলেজে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচার-কর্মীদের দুই বছরের শিক্ষাগ্রহণের জন্য ব্রিটিশ য়্যাণ্ড ফরেন ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এই বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের তিনটি শাখার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি এই বৃত্তিধারীদের নির্বাচন করতেন। প্রথম বছরের নির্বাচন লাভ করেন প্রমথলাল সেন নামে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের জনৈক আত্মীয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যিনি দ্বিতীয়বারের নির্বাচন লাভ করেন, যে কোনো কারণে হোক্, তাঁর পক্ষে এই বৃত্তি নিয়ে বিলাত যাওয়া সম্ভবপর হয় না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় বছরের নির্বাচনে বিপিনচন্দ্র এই বৃত্তি লাভ করেন।

ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বৃত্তিধারীদের ইংল্যাণ্ডে বাসকালীন প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করতেন কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ এবং যাতায়াতের জন্য অর্থ বৃত্তিধারীকেই সংগ্রহ করতে হতো। প্রয়োজনীয় অর্থ বিপিনচন্দ্রের সঞ্চিত ছিল না। ফলে শিলচর, শিলং প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করে তাঁকে এই অর্থ সংগ্রহ করতে হলো।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর বিপিনচন্দ্র বোম্বাই অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর ছিল বোম্বাই থেকে জাহাজে বিলাত-যাত্রার নির্ধারিত দিন। বোম্বাই থেকে তাঁর সহযাত্রী হলেন মনীষী হরিনাথ দে। হরিনাথ তখন অক্সফোর্ডে অধ্যয়নরত। গ্রীষ্মাবকাশে তিনি রায়পুরে আত্মীয়-স্বজনের কাছে এসেছিলেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন।

লণ্ডনে পৌছবার পর বিপিনচন্দ্র ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক ব্যবস্থিত হোটেলে গিয়ে উঠলেন। লণ্ডনে তাঁর দু'জন পুরানো বন্ধু ছিলেন। ওঁদের সঙ্গে তাঁর ভারতবর্ষেই পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেছিল। ওঁদের একজন হলেন সুপরিচিত মাদকনিবারণী কর্মী (টেম্পারেন্স ওয়ার্কার) এবং উদারনৈতিক রাজনীতিবিদ্ মিঃ ডব্লিউ. এস. কেইন এবং অপরজন তাঁর সেক্রেটারী মিঃ গ্রাব্। মিঃ কেইনের নির্দেশে মিঃ গ্রাব্ হোটেলে এসে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং লণ্ডনের দৃশ্যাবলী দর্শন কিংবা জিনিসপত্র কেনাকাটার ব্যাপারে যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় তা'হলে সানন্দে সে সাহায্যদানে প্রস্তুত তা'ও জানালেন। বিপিনচন্দ্র দু'তিনদিন লণ্ডনে থেকে অক্সফোর্ডের অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজ আবাসিক কলেজ ছিল না। শিক্ষার্থীদের কলেজের বাইরে অনুমোদিত কোনো বোর্ডিং বা পরিবারে বাস করতে হতো। প্রমথলাল সেনের শিক্ষাগ্রহণ তখন সদ্য শেষ হয়েছে। তিনি যে-পরিবারে বাস করতেন, সেই পরিবারের কর্ত্রী মিসেস্ ক্যাম্পবেলের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিপিনচন্দ্র ঐ পরিবারেই বসবাস করা স্থির করলেন।

বিপিনচন্দ্র ১৮৯৮-র অক্টোবর থেকে ১৮৯৯-র জুন পর্যন্ত মাত্র একটি শিক্ষা-বর্ষ ম্যানচেস্টার কলেজে শিক্ষার্থিরূপে অতিবাহিত করেন। এই সময় প্রায় প্রতি সপ্তাহ-শেষেই তিনি বিভিন্ন একত্ববাদী (ইউনিটেরিয়ান) প্রচার-মঞ্চ থেকে প্রচার-

মূলক বক্তৃতা দান করে বেড়ান। কারলিস্‌লে (Carlisle) একত্ববাদী ভজনালয়ের ভারপ্রাপ্ত যাজক রেভারেণ্ড মিঃ ট্রেভার্স তখন নিউ ম্যানচেস্টার কলেজে দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করছিলেন। বড়োদিনের ছুটিতে তিনি বিপিনচন্দ্রকে তাঁর প্রচার-মঞ্চে আহ্বান জানালেন। বিপিনচন্দ্রের ধর্ম-সম্পর্কিত বক্তৃতার বিবরণ ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন ইউনিটেরিয়ান অ্যাসেসিয়েশনেপ মুখপত্রে একাশিত হলো। এর ফলে ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের সবত্র একত্ববাদী কেন্দ্র থেকে তাঁর প্রচার ও বক্তৃতাদানের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়ে গেল। বক্তৃতার জন্য তিনি এক গিনি করে দক্ষিণা পেতেন এবং কথনও কথনও দক্ষিণা বাদে অক্সফোর্ড থেকে যাতায়াতের ট্রেন-ভাড়া। এ সম্পর্কে তিনি আত্মজীবনীতে মন্তব্য করেছেন—'যদিও এই আর্থিক সাহায্য আমার পক্ষে উপেক্ষণীয় ছিল না, কারণ ইংলণ্ডে যা' আয় হতো এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা দিয়ে যা পেতাম, তাই দিয়ে কলকাতায় আমার পরিবার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতে হতো। তবু এই সূত্রে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং মধ্যবিত্ত ইংরেজ সমাজ সম্পর্কে যে ব্যাপক এবং অন্তরঙ্গ জ্ঞান লাভ করি তা'ও ছিল অত্যন্ত মূল্যবান।'[১৪] সাহিত্য কিংবা জীবনকাহিনী পাঠের মাধ্যমে যে কোনো জাতির সম্যক পরিচয় লাভ করা যায় না—এই সত্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ইংরেজী উপন্যাসের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় ছিল। কিন্তু ইংরেজ-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসবার পূর্বে উপন্যাসে বর্ণিত দৃশ্যাবলী বা চরিত্রসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেননি বলেই তাঁর ধারণা হলো।

অক্সফোর্ডে বসবাসকালে একটা বিষয় প্রথমে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। অক্সফোর্ডের বিখ্যাত ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-সংস্কৃতির নিম্নমান লক্ষ্য করে তিনি বিস্মিত হলেন। তাঁর মনে হলো যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দশজন ছাত্রের পাশাপাশি কলকাতা কিংবা ভারতীয় যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের দশজনকে দাঁড় করিয়ে যদি উভয় দলের তুলনা করা যায়, তা' হলে দেখা যাবে যে অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে শেষোক্ত দলের ছাত্ররা পূর্বোক্ত দলের তুলনায় ন্যূন বলে বিবেচিত হবে না। কিন্তু দশ বছর পরে যদি আবার এই দু'দলের তুলনা করা যায়, তা' হলে দেখা যাবে যে দুই দলের মধ্যে অনেক পার্থক্য রচিত হয়েছে। ইংরেজ স্নাতক বিদ্যায় বুদ্ধিতে ভারতীয় স্নাতকদের অনেক উপরে। এই পার্থক্যের কারণ, উভয় দলের পরবর্তী

জীবনের পৃথক পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'এই ঘটনা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং এই ঘটনা থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক সংস্কারের প্রতি আমার জীবনব্যাপী আনুগত্য নতুন শক্তি ও প্রেরণা লাভ করে'।[১৫]

এই সময় মিঃ কেইন তাঁর জন্য অনেকগুলি বক্তৃতার বন্দোবস্ত করে দেন। ১৮৯৮-এর বড়োদিনের ছুটিতে এবং ১৮৯৯-এর ইস্টারের ছুটিতে বিপিনচন্দ্র মিঃ কেইনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স এবং স্কটল্যাণ্ডের নানা স্থানে মাদকনিবারণী সভায় বক্তৃতা করে বেড়ালেন। যাতায়াতের খরচ এবং হোটেলখরচ বাদেও মিঃ কেইন তাঁর প্রতিটি সভায় বক্তৃতাদানের জন্য যথোপযুক্ত দক্ষিণার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

এই ধরনের সভাসমিতিতে যোগদানের কয়েকটি বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা বিপিনচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মাদকনিবারণী প্রচারকার্যের প্রথম পর্বে একবার তিনি মিঃ কেইনের সঙ্গে গ্লাসগোতে গেছেন। তখন স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় মাদকনিবারণী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান চলছিল। গ্লাসগো শহরের বৃহত্তম সভাগৃহে এই অধিবেশন আয়োজিত হয়েছিল। স্কটল্যাণ্ডের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রায় তিন হাজার নরনারী এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। বক্তৃতা দানের জন্য বিপিনচন্দ্র সভামঞ্চে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। এই ধরনের স্বাগত সম্ভাষণলাভ তাঁর জীবনে এই প্রথম। বক্তৃতা শেষ হবার পর শ্রোতৃবৃন্দ কয়েক মিনিট যাবৎ হর্ষধ্বনি করে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন; একজন 'ফর হি ইজ্ এ জলি গুড ফেলো'—এই সুপরিচিত ইংরেজী গানটি গাইতে শুরু করলো এবং উপস্থিত নরনারী উঠে দাঁড়িয়ে মেঝেতে পা ফেলে ফেলে গানের তাল রেখে চললো। বিপিনচন্দ্র এই ঘটনায় এত অভিভূত হয়েছিলেন যে দীর্ঘকাল পরে অতীত স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে বলেছেন যে স্কটল্যাণ্ডবাসীদের আতিথেয়তা সম্পর্কে তাঁর এই প্রথম অভিজ্ঞতা; যতদিন তিনি বাঁচবেন ততদিন স্মরণে রাখবেন। এর পর তিনি গ্লাসগো এবং তার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্থানে বক্তৃতাদানের জন্য আহ্বান পেলেন। কিন্তু আহ্বায়কেরা যখন জানতে পারলেন যে তিনি খৃষ্টান নন, তখন তাঁদের আন্তরিকতার উত্তাপ যেন কিছু পরিমাণে কমে গেল।

লণ্ডনে এক মাদকনিবারণী সভায় দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে একই মঞ্চ থেকে তিনি বক্তৃতাদানের গৌরব লাভ করেন। তিনি ছিলেন শেষ বক্তা। সভাগৃহ ছিল জনতায় পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষে মাদক প্রচলনের ব্যাপারে তিনি স্থানীয় মানুষের মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বক্তৃতায় দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেন। তারপর শেষ আবেদন জানিয়ে বলেন—'যদি তোমরা তোমাদের নিজের দেশের মতো আমাদের শাসন-ভার আমাদের হাতে দিতে না পারো, তা' হলে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলছি, যে কু-অভ্যাস থেকে তোমরা নিজেরা এত ভুগছ, সেই কু-অভ্যাসের হাত থেকে আত্মরক্ষার অধিকারটা আমাদের দান করো'।[১৬] এই আকুল আবেদন উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন।

বিপিনচন্দ্র দু'বছরের জন্য বৃত্তি নিয়ে বিলাত-গিয়েছিলেন। কিন্তু এক বছর অন্তে তিনি ঐ বৃত্তি বর্জনের জন্য মনস্থির করলেন। আরও এক বছর যাবৎ বৃত্তি গ্রহণের অর্থ ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একশ' পাউণ্ডের অপব্যয় এবং নিজের জীবনের বারোটি মাস সময়েরও অপচয়। কারণ, বৃত্তি থেকে মুক্ত হতে পারলে ঐ সময় তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারের কাজে এবং ভারতবর্ষের স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কিত বাস্তব সমস্যার চিন্তায় আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। একত্ববাদী জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি এযাবৎ ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ প্রচারের কিছু সুযোগ লাভ করেছেন, কিন্তু দেশের জন্য রাজনৈতিক কাজ করবার তেমন সুযোগ পাননি। এই সমস্ত বিবেচনা করে তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন এবং তা' যথারীতি গৃহীত হলো। বিপিনচন্দ্র ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাস থেকে ইংল্যাণ্ডে স্বাধীনভাবে প্রচারকার্য পরিচালনার সুযোগ লাভ করলেন।

বিপিনচন্দ্র যখন অক্সফোর্ডে যান, তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বুয়র যুদ্ধ বেধে ওঠে। যুদ্ধের প্রথম দিকে বৃটিশ শক্তিকে ট্রান্সভালে বারংবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। প্রত্যেকটি বিপর্যয় বৃটিশ জনসাধারণের মনে উত্তেজনায় উত্তাপ বৃদ্ধি করতে থাকে এবং সারা দেশব্যাপী মানুষের মনে প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হয়ে ওঠে। যে ভাবেই হোক্, বুয়রদের ধ্বংস করতেই হবে। লণ্ডনের নিভৃত বাসভবনে বসে বিপিনচন্দ্র বুয়রযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের ঘাত-প্রতিঘাতগুলি বিশ্লেষণ করতে থাকেন। দু'টি ছোট প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র দেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে বিশ্বব্যাপ্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করছে।

আর ওদিকে বৃটিশকে স্বকীয় শক্তিতে অপারগ হয়ে সমুদ্রপারের অধিকৃত দেশসমূহ থেকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকারের সামরিক সাহায্য ভিক্ষা করতে হচ্ছে। বিপিনচন্দ্রের সমবেদনা অজ্ঞাতসারে সংগ্রামী বুয়রদের প্রতি প্রসারিত হয়ে যায়।

যুদ্ধ যখন সর্বাপেক্ষা সঙ্কটজনক পর্যায়ে উপনীত, বিপিনচন্দ্র তখন মিঃ কেইনের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডে উপস্থিত। একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি সভার শেষে মিঃ কেইনের সঙ্গে তিনি পায়ে হেঁটে গ্লাসগোর হোটেলে ফিরে আসছেন। এমন সময় এক জরুরী তারবার্তায় জনৈক দুঃসাহসী স্কচ সেনানায়কের পতনের সংবাদ ঘোষিত হলো। এই যুদ্ধের প্রতি কখনও মিঃ কেইনের সমর্থন ছিল না, অথচ এই যুদ্ধে বৃটিশের বিপর্যয়ের ঘটনায় তিনি মনে মনে বিমর্ষ হয়ে পড়ছিলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নির্বাক কণ্ঠে বিপিনচন্দ্রের পাশাপাশি হেঁটে আসছিলেন। এবার সহসা বলে উঠলেন যে তাঁরা উদারপন্থীরা (লিবারেলস্) এই যুদ্ধের বিরোধী। ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে এই যুদ্ধের তাঁরা নিন্দাবাদও করেছেন। কিন্তু এখন যে ভাবেই হোক্, যুদ্ধে তাঁদের জয়লাভ করতেই হবে। তিনি আরও বললেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ করে ক্ষমতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে কখনই তাঁরা বুয়রদের হৃত স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবেন না। তাঁরা, উদারপন্থীরা স্বচ্ছন্দে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র দু'টিকে গ্রাস করবেন। এই পথ-চল্‌তি কথাবার্তার ভিতর দিয়ে একদিকে বৃটিশ রাজনীতির প্রকৃতি এবং তাঁর সহযাত্রীর অন্তরাত্মার পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। এই ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'আমাদের বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ে রাজনীতিকেরা নীতি ও অধ্যাত্মচেতনার দিক থেকে অনুন্নত স্তরের মানুষ।'[১৭] বিপিনচন্দ্র যখন ইংল্যাণ্ডে যান, তখন ভারতীয় সমস্যাবলীর প্রতি বৃটিশ জনসাধারণ এবং বৃটিশ সাময়িক পত্রসমূহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া শুরু হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক প্রচার পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের উদ্যোগে তখন 'বৃটিশ কমিটি' স্থাপিত হয়ে গেছে। মিঃ হিউম, স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন, মিঃ উইলিয়াম ডিগবি, শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজী ছিলেন এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত সভ্য। সরকারী চাকুরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত রমেশ দত্ত মহাশয়ও ছিলেন এই কমিটির অন্যতম সভ্য। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আনন্দমোহন বসু মহাশয় তাঁর পুরানো বিশ্ববিদ্যালয় কেম্ব্রিজে কিছুকাল বসবাসের জন্য বিলাতে যান। বৃটিশ কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত কয়েকটি জনসভায় আহূত হয়ে আনন্দমোহন ভারতীয় সমস্যাবলীর উপর বক্তৃতা দান করেন। আনন্দমোহনের

বক্তৃতা বৃটিশ জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিলাতের বিখ্যাত 'টাইমস্' পত্রিকাতেও ঐ বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়।

ম্যান্‌চেস্টার নিউ কলেজে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি নিয়ে বিপিনচন্দ্র যখন বিলাত যান, তখন তাঁর কংগ্রেসী বন্ধুরা আশা করেছিলেন যে তিনি দেশের রাজনৈতিক সমস্যা প্রচারের জন্য কিছু সময় ও সুযোগ নিয়োগ করবেন। এই উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মহাশয় তাঁর জন্য কিছু অর্থসংগ্রহও করে দিয়েছিলেন। সুতরাং বিলাতে থাকাকালীন কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক কাজে আত্মনিয়োগ তাঁর নৈতিক কর্তব্যের অঙ্গীভূত ছিল বলা চলে।

বিপিনচন্দ্রের ম্যান্‌চেস্টার নিউ কলেজে যোগদানের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লর্ড কার্জন বড়োলাটের পদের দায়িত্ব-ভার গ্রহণের জন্য ভারতবর্ষ অভিমুখে রওনা হন। লর্ড কার্জনের সম্মানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিদায়-সংবর্ধনা-সভার সংবাদ প্রায় প্রতিদিন ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। বিপিনচন্দ্র এই সময় ভারতবর্ষের কয়েকটি সমস্যার প্রতি ভাবী বড়োলাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে 'ম্যান্‌চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় দু'খানি বিস্তৃত পত্র প্রকাশ করেন। পত্র দু'খানি ইংল্যাণ্ডে কারও কারও মনোযোগ আকৃষ্ট করলো কিন্তু ভারতবর্ষে কিছুসংখ্যক কংগ্রেসী রাজনীতিকেরা এতে বিচলিত হলেন। কারণ, ঐ পত্রে তিনি বলেছিলেন যে কংগ্রেস শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে, জনসাধারণের প্রকৃত মুখপাত্র কংগ্রেস নয়। সুতরাং সরকার এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, উভয়ের কাছেই প্রধান সমস্যা—কে দেশের অগণিত জনগণের শুভেচ্ছা অর্জন করতে সক্ষম হবে; কারণ এই অশিক্ষিত নিরুদ্যম জনসাধারণের সমর্থনের উপরেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করছে। প্রকৃতপক্ষে বিপিনচন্দ্রের পত্র ছিল আবেদনমূলক। কংগ্রেস যাতে প্রচার-পদ্ধতির পরিবর্তন করে সেইজন্য কংগ্রেসের কাছে আবেদন। আবার সরকার যাতে সাধারণ মানুষের কায়িক, মানসিক এবং নৈতিক প্রয়োজন পূরণের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেন সেইজন্য সরকারের কাছে আবেদন। বিপিনচন্দ্রের ধারণা, তাঁর পত্রের মর্মার্থ অল্প পরিমাণে হলেও ভারতের বড়োলাটরূপে লর্ড কার্জনের প্রশাসনিক নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি সাত বছর বড়োলাটরূপে ভারতবর্ষে ছিলেন। বিপিনচন্দ্রের মতে, এই সময়ের মধ্যে লর্ড কার্জন ইংরেজি-শিক্ষিত ভারতবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন কিন্তু জীবন-

যাত্রার সর্বক্ষেত্রে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের শুভেচ্ছা অর্জনের জন্য সচেষ্ট রয়ে গেছেন।[১৮]

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মিঃ কেইনের মাধ্যমে নিউ ইয়র্কের জাতীয় মাদক-নিবারণী সঙ্ঘের (ন্যাশনাল টেম্পারেন্স অ্যাসোসিয়েশন অব্ নিউ ইয়র্ক) কাছ থেকে বিপিনচন্দ্র তিনমাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দানের আমন্ত্রণ পেলেন। তাঁরা আমেরিকায় বাসকালীন তাঁর সমস্ত ব্যয় বহন করবেন এবং একশ' পাউণ্ড দক্ষিণা দেবেন জানালেন। বিপিনচন্দ্র সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। স্থির হলো, সপ্তাহের শেষভাগ তিনি আমেরিকার একত্ববাদীদের মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকার্যের জন্য নিয়োজিত করবেন। বিপিনচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন মুখ্যতঃ শিক্ষার্থী রূপে ; তাই বাগ্মীর ভূমিকা এবং আচার্যের ভূমিকা সেখানে ছিল গৌণ ; কিন্তু ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় যাত্রা করলেন মুখ্যতঃ বাগ্মী এবং আচার্য রূপেই, তাই আমেরিকা থেকে যখন তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন, তখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত বাগ্মী এবং স্থিতপ্রজ্ঞ আচার্য।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিকালে লিভারপুল বন্দর থেকে জাহাজে চেপে বিপিনচন্দ্র নিউ ইয়র্ক অভিমুখে রওনা হলেন। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলেন জাহাজ আয়ার্ল্যাণ্ডের কুইনস্‌টাউন বন্দরে নোঙর করে রয়েছে। দ্বিপ্রাহরিক আহারান্তে যখন তিনি ডেকে ফিরে এলেন তখন জাহাজ আবার নোঙর তুলে মহাসাগর পাড়ি দিতে শুরু করলো। উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করে জাহাজ হেলেদুলে এগিয়ে চলছে। প্রথম প্রথম তাঁর বেশ ভালোই লাগলো। কিন্তু বিকালের দিকেই তিনি সমুদ্রপীড়ায় (সি সিকনেস্) আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। কোনমতে নিজের ঘরে গিয়ে তিনি শয্যাগ্রহণ করলেন, আমেরিকার মাটির গন্ধ পাবার পূর্বে আর সে শয্যা ত্যাগ করতে পারলেন না। কুইনস্‌টাউন থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত প্রায় আট দিন আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে নিঃসঙ্গ বন্দীর মতো কেটে গেল। নিউ ইয়র্কে পৌঁছবার দু'দিন আগে জাহাজের কেবিনে শুয়ে থেকেই এক অভাবিতপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। বিপিনচন্দ্রের নিজের ভাষায়—'বিবেকানন্দের যশ তখন আমেরিকা ছাইয়া পড়িয়াছে। অনেক মার্কিন স্ত্রীপুরুষে তাঁহার বেদান্তের শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে, কেহ বা তাঁহার শিষ্যত্ব পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে। এ সকল লোকে

ভারতের প্রাচীন সাধনার প্রতি সরল শ্রদ্ধালু হইয়া ভারতবর্ষের লোকদিগকেও তাহাদের গুরুধামের লোক ভাবিয়া অত্যন্ত স্নেহমর্যাদার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে।...একদিন প্রাতঃকালে আমার কেবিনের খানসামা এক থালা বাদাম, কিস্‌মিস্, পেস্তা, আঙ্গুর, মনাক্কা এবং মনে হয় যেন গোটা দুই তিন আপেলও আনিয়া আমাকে দিল। জাহাজের একটি মহিলা-যাত্রী এই উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন কহিল। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে বিবেকানন্দকে তিনি গুরুর মতন ভক্তি করেন। এই বিবেকানন্দের একজন স্বদেশী এই জাহাজে আছেন শুনিয়া অবধি তিনি তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন।...আমি কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার উপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রেরণ করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া খানসামা কহিল যে, ভদ্রমহিলাটি আমাকে একবার কেবিনের দরজা দিয়া হাতখানা বাড়াইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি দেখিতে চান, আমার হাতেই তাঁহার উপহার পৌঁছিয়াছে কি না। এবারে বুঝিলাম যে এখনও দুনিয়ায় শ্বেতেতর বর্ণের মর্যাদা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।'[১৯] আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র এইভাবে প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলেন। অথচ তখনও পর্যন্ত স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটেনি।

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকরূপে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রথমে বিলাতে যান ; তারপর কেশবচন্দ্রের অনুগামী রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিলাত এবং আমেরিকা উভয় স্থান পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু এঁরা দু'জনেই ছিলেন নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সন্তান, স্বদেশের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে এঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল না। বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বে শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, এঁরা যে বাণী প্রচার করেন তা' ছিল প্রকৃতপক্ষে সুসংস্কৃত একত্ববাদী খৃষ্টধর্মের বাণী। কেশবচন্দ্র এবং প্রতাপচন্দ্র নিজেরাই হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গ উঠলে তার পক্ষ সমর্থনে অনেকটা সঙ্কোচ বোধ করতেন। ওদেশের লোকেরও ধারণা ছিল যে হিন্দুধর্মের মধ্যে উন্নত নৈতিকতা বা গভীর আধ্যাত্মিকতা বলে কিছু নেই। হিন্দুধর্ম মানেই পৌত্তলিকতা, বহু দেবতায় বিশ্বাস এবং জাতিভেদ-প্রথার সমষ্টি। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে নির্ভীক চিত্তে বজ্রকণ্ঠে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ইংরেজ ও আমেরিকাবাসীদের বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। শিকাগো

শহরে আয়োজিত ধর্ম-মহাসম্মেলনে (পার্লামেণ্ট অব্ রিলিজিয়নস্—১৮৯৩) ভারতের এই অপরিচিত সন্ন্যাসী পাশ্চাত্যবাসী, বিশেষতঃ আমেরিকাবাসীদের মনে ঝটিকাবর্তের সৃষ্টি করলেন। হিন্দুধর্মের মর্ম-বাণীর প্রতি প্রতীচ্যবাসীদের শ্রদ্ধা জাগ্রত হলো। স্বামীজীর প্রতীচী-বিজয়ের শুভফল ভারতবর্ষেও অনুভূত হলো। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'স্বজাতির ধর্মের দক্ষ রক্ষক এবং শক্তিমান প্রবক্তারূপে তাঁর বিস্ময়কর সাফল্য অবিলম্বে ভারতবাসীর মনে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে আমাদের সদ্যোজাত জাতীয়তাবোধে নতুন শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করলো। এইটাই ছিল প্রকৃতপক্ষে বিদেশে আমাদের প্রথম প্রচার'।[২০]

নিউ ইয়র্কের জাতীয় মাদক-নিবারণী সঙ্ঘ একটি পারিবারিক হোটেলে বিপিনচন্দ্রের বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিপিনচন্দ্রের মতে এই পারিবারিক হোটেল বস্তুটি মার্কিন সভ্যতার নিজস্ব সৃষ্টি। নিজেরা পৃথকভাবে সংসার পেতে বাস করতে গেলে যে সমস্ত ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হয়, এখানে তা' সহ্য করবার দরকার হয় না। এখানে প্রয়োজন অনুযায়ী দুই তিন বা চারখানি ঘর ভাড়া নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করা যায়। ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ, আহারাদির ব্যবস্থার ভার হোটেলের অধ্যক্ষ (ম্যানেজার) এবং তাঁর নিম্নস্থ কর্মচারীদের উপর থাকে। এইজন্য মার্কিনের অনেক মধ্যবিত্ত লোক এই ধরনের পারিবারিক হোটেলে বাস করতেন। 'মার্কিনে চারিমাস' নামীয় গ্রন্থে বিপিনচন্দ্র তাঁর মার্কিনভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। এই গ্রন্থে আশ্রিত রচনাসমূহ ১৩২৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গবাণী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। মার্কিনী পারিবারিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—মার্কিন-পুরুষেরা একদিকে যেমন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অর্থ-উপার্জনেই ব্যস্ত রহেন, সেইরূপ অন্যদিকে তাঁহাদের গৃহিণীরা গৃহকর্মের নিরবচ্ছিন্ন ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দিবসের অধিকাংশ সময়েই জ্ঞানালোচনায়, ললিতকলার অনুশীলনে, সমাজহিতব্রতে অতিবাহিত করেন। ফলে ইহা দাঁড়াইয়াছে যে, মার্কিন-রমণীরা একটা উদার সাধনার অধিকারী হইয়া কোনও কোনও দিকে নারী-চরিত্রের অসাধারণ বিকাশসাধন করিতে পারিয়াছেন'।[২১]

বিপিনচন্দ্র যখন হোটেলে গিয়ে পৌছলেন তখন বেলা প্রায় একটা। হোটেলের অধ্যক্ষ তাঁকে 'স্বাগতম্' জানাতে এসেই বললেন যে হোটেলের একজন বহুদিনের বাসিন্দা তাঁর জাহাজ আসবার সংবাদ পাবার সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে

সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। বিপিনচন্দ্র নিজের ঘরে না গিয়ে প্রথমেই সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভদ্রলোক তখন হোটেলের পাঠ-কক্ষে অপেক্ষমান। বিপিনচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করতেই তিনি আসন ছেড়ে এগিয়ে এসে সাগ্রহে করমর্দন করে আবেগতপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—'স্যার, আপনি এক বিরাট দেশ থেকে এসেছেন। বিধাতার নির্দেশে জগতের শিক্ষাদাতার স্থান আপনারাই গ্রহণ করবেন। কিন্তু যতদিন না জগতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাদের সমকক্ষ হতে পারছেন, ততদিন পর্যন্ত আপনারা আপনাদের বিধাতৃনির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করতে পারবেন না।'[২২] নিউ ইয়র্কে পদার্পণ করবার পর এই ভদ্রলোকের সঙ্গেই তাঁর প্রথম পরিচয়। ভদ্রলোকের সাদর সম্ভাষণে তাঁর হৃদয় যুগপৎ আনন্দ ও বেদনায় আলোড়িত হয়ে উঠলো। জগতের আচার্যপদে ভারতবর্ষকে বরণ করে নিতে বিদেশীর পক্ষে বাধা নেই কিন্তু দ্বিধা আছে, কারণ ভারতবর্ষ যে পরাধীন। মার্কিন প্রবাসের প্রথম দিনে এই অপরিচিত বিদেশীর কণ্ঠনিঃসৃত কথাগুলি বিপিনচন্দ্রের মনে এক অভাবিতপূর্ব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। তাঁর নিজের ভাষায়: 'নিউ ইয়র্কের এই হোটেলের পাঠাগারে এই মার্কিন বন্ধুর এই অপ্রত্যাশিত সংবর্ধনার মধ্যেই মনে হয় আমার অজ্ঞাতসারে সেই মাঘের অপরাহ্ণে আমার অন্তরে আমার নূতন সত্য স্বাদেশিকতার জন্ম হয়। তখন হইতেই আমি বুঝিলাম,······যতদিন না ভারতের রাষ্ট্রীয় দাসত্ব ঘুচিয়াছে এবং আমরা চারিদিকের স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ জাতিসকলের মাঝখানে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি ততদিন আমাদের যাহা দিবার আছে, জগতের লোকে তাহা গ্রহণ করিবে না।'

ন্যাশন্যাল টেম্পারেন্স সোসাইটির আমন্ত্রণেই বিপিনচন্দ্র আমেরিকায় যাবার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু এই সোসাইটির পক্ষ থেকে বক্তৃতা দান করেই তিনি আমেরিকা প্রবাসের সমস্ত সময় ব্যয় করেননি। তার অন্যতম কারণ, এই সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত যে সমস্ত সভা-সমিতিতে তিনি বক্তৃতা করেন, তার অধিকাংশ স্থানেই মার্কিন সমাজের শিক্ষিত এবং উচ্চশ্রেণীর লোকের সঙ্গে তেমন আলাপ পরিচয়ের সুবিধা হয় নি। একমাত্র বোস্টন শহরে অনুষ্ঠিত দু'তিনটি সভায় সমাজের সমস্ত শ্রেণীর লোক সমবেত হয়েছিলেন। তাই অবসরসময়ে তিনি নানা সভা-সমিতিতে যোগদান করতেন। এই সম্পর্কে তাঁর

বক্তব্য : 'এইরূপে ন্যাশন্যাল টেম্পারেন্স সোসাইটির সাহায্যে মার্কিন সমাজের ও সভ্যতার যে পরিচয় আমি পাই নাই, নিজের অধ্যবসায়ে ও চেষ্টায় তাহা কিয়ৎপরিমাণে পাইয়াছিলাম।'

মার্কিন প্রবাসকালে বিপিনচন্দ্র অজস্র সভা-সমিতিতে কোথাও বক্তা রূপে কোথাও শ্রোতা রূপে যোগদান করেছিলেন, অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

একবার বোস্টন শহরের 'ট্রেমণ্ট টেম্পল' নামক সুবৃহৎ সভাগৃহে বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রায় আট নয় হাজার পুরুষ-নারী সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও ছিলেন। জনৈক ধর্মযাজক তাঁকে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বললেন যে, তাঁদের খৃষ্টানদেশের এমন দুর্ভাগ্য হয়েছে যে একজন ভারতবাসীর কাছ থেকে তাঁদেরকে মিতাচার সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করতে হচ্ছে।

ধর্মযাজকের এই উক্তিতে বিপিনচন্দ্রের সাজাত্যাভিমান আহত হলো। প্রতিবাদে গর্জন করে উঠলো স্বদেশ-প্রাণ বাগ্মীর বজ্রকণ্ঠ। তিনি বললেন—'আমেরিকার তো কথাই নেই, যে য়ুরোপ থেকে আমেরিকার জন্ম সেই য়ুরোপের লোকেরা যখন পশুর মতো বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো, সভ্যতার ক, খ, পর্যন্ত মক্স করতে আরম্ভ করেনি, তখন আমি যে দেশ থেকে এসেছি সে দেশের লোকে সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। সেই প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকাধিকারীরূপে আপনাদের এই সদ্যোজাত শিশু-সভ্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি যখন আপনাদের অভিমান ও স্পর্ধার অভিনয় দেখি তখন আমার অবমাননা বোধ হয় না। এই বালক-স্বভাব-সুলভ স্পর্ধা দেখে মনে মনে আনন্দ উপভোগ করি।' তারপর মাদকনিবারণের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি আরও বললেন—'বর্বর মাত্রেই সুরাপান করে। তিন হাজার বছর পূর্বে সুদূর অতীতে আমরা যখন বর্বর ছিলাম, তখন আমরা আমাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে সুরা নিবেদন করতাম এবং নিজেরা যথেচ্ছ পান করতাম। কিন্তু ক্রমে যখন আমাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান বাড়তে লাগলো তখন সুরাপানের অপকারিতা অনুভব করে আমাদের পিতৃপুরুষেরা একে মহাপাতকরূপে বর্জন করেছিলেন। ফলত, ইংরেজ আমাদের দেশে আসবার পূর্বে আমাদের সমাজে উচ্চতর স্তরে সুরাপান নিবারণের জন্য কোনও চেষ্টা করা অনাবশ্যক ছিল। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র

সেন বিলাতে ৩০ বছর পূর্বে তাঁর অনেক বক্তৃতায় বলতেন, ইংরেজ যেদিন তার নূতন সভ্যতার সুসমাচার প্রচার করতে এক হাতে বাইবেল ও আর এক হাতে ব্রাণ্ডীর বোতল নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ালো, সেদিন থেকে আমাদের মধ্যেও ক্রমশঃ সুরাপান নিবারণের চেষ্টা করা প্রয়োজন হয়ে উঠলো। তখন থেকে আমাদের সমাজেও একটা সুরা-সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সত্য। কিন্তু আমি যখন এখানকার সুরাপান নিবারণের বক্তৃতামঞ্চ থেকে আপনাদের কাছে বক্তৃতা করতে দাঁড়াই তখন আমি আমার প্রাচীন সভ্যতার নামেই এই সমস্ত কথা বলি।'[২৩] স্বামী বিবেকানন্দের পর বিপিনচন্দ্রই দ্বিতীয় ভারতবাসী, যিনি পরাধীন দেশের মানুষ হয়েও মার্কিনের মাটিতে দাঁড়িয়ে অর্বাচীন মার্কিনী তথা য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রগল্‌ভতার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত করেন।

একদিন প্রভাতী সংবাদপত্রের একটি বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানতে পারলেন যে লাটসিয়াম থিয়েটারে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক লেমান সাহেব 'রামায়ণ ও মহাভারত' সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। কৌতূহলপরবশ হয়ে তিনি একখানি টিকিট কিনে বক্তৃতা শুনতে গেলেন। এই বক্তৃতা শুনতে গিয়ে তিনি নিউ ইয়র্কের বার্নাড ক্লাবে নিমন্ত্রিত হলেন এবং এই নিমন্ত্রণের সূত্রেই নিউ ইয়র্কের এবং বোস্টনের সমাজের শিক্ষিত পুরুষ এবং ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন।

বার্নাড ক্লাবটি ছিল মহিলাদের ক্লাব। শুধু নিউ ইয়র্ক নয়, বোস্টন এবং অন্যান্য শহরের মহিলারাও এই ক্লাবের সভ্যা ছিলেন। এখানে বক্তৃতা করতে এসে অনেকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে একজন ভদ্রমহিলার কথা তিনি বিশেষভাবে স্মরণে রেখেছেন। তিনি হলেন মিসেস্ ওলি বুল। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দর প্রচারকার্যে মিসেস্ বুল ছিলেন প্রধান সহায়িকা। তিনি আগের বছর স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন। সম্ভবত, কলকাতায় এসে তিনি বিপিনচন্দ্রের নাম শোনেন। তখন বিপিনচন্দ্র ছিলেন বিলাতে। বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হবার সঙ্গেসঙ্গেই মিসেস্ বুল তাঁকে একদিন নিজের বাড়িতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

এই আমন্ত্রণরক্ষার উপলক্ষে মিসেস্ বুলের বাড়িতে বিপিনচন্দ্র যে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তা'হলো মিস্ নোবলের (ভগিনী নিবেদিতা) সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের নাটকীয় অভিজ্ঞতা। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—"সে অদ্ভুত পরিচয়।

আমাদের ফলিত জ্যোতিষে মানুষের মধ্যে একটা 'গণ' নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, কেহ দেবগণ, কেহ বা নরগণ, কেহ বা রাক্ষসগণ। নিবেদিতার কোন্ 'গণ' ছিল জানি না, আমারই বা কি 'গণ' সে কথাও মনে নাই। কিন্তু আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হইলেই সেই প্রথম দিন অবধি যেরূপ দৈবদুর্ঘটনা ঘটিত, তাহাতে নিবেদিতার দেবগণ এবং আমার রাক্ষসগণ এ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। কারণ, দেখা হইলেই একটা-না-একটা ঝগড়া পাকাইয়া উঠিত। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ঝগড়ার দরুন উভয়ের মধ্যে কাহারও মনে এক মুহূর্তের জন্যও বোধহয় কোন বৈবিতার লেশমাত্র জাগে নাই।···নিবেদিতা স্বদেশী আন্দোলনের সময় কলিকাতায় ছিলেন। আমার 'নিউ ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিলে তিনি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েন এবং কিছুদিন প্রতি সপ্তাহে তাহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। সেই প্রবন্ধগুলিই পরে 'ওয়েব অব্ ইণ্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ···স্বর্গীয় পি. মিত্র মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে নিবেদিতা আমার কথা উঠিলেই বলিতেন, 'পালের দাঁতগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি ? ঐ দাত দেখিলেই মনে হয় তাহার ভিতর বাঘ লুকাইয়া আছে।"

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ হয় এবং প্রত্যেকবারই কোনো-না-কোনো প্রসঙ্গে, বিশেষতঃ স্বামীজীর প্রসঙ্গ নিয়ে উভয়ের মধ্যে তর্ক-যুদ্ধ চলে। কারণ, তেজস্বিনী নারী তাঁর গুরু সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বিরূপ কথা শুনতে প্রস্তুত নন। এই সমস্ত ঘটনার কিছুদিন পরে বোস্টনে 'কংগ্রেস অব্ রিলিজিয়নস্'-এর বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে অনেক তত্ত্বজিজ্ঞাসু মনীষী এই কংগ্রেসে উপস্থিত হলেন। ভগিনী নিবেদিতাও এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। এই কংগ্রেসের অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের জন্য আহূত হন। এই বক্তৃতা ভগিনী নিবেদিতার মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন —'আমি যখন বক্তৃতা করিতেছিলাম তখন ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তার গৌরব-কাহিনী শুনিয়া নিবেদিতার দেহ-মন-প্রাণ সকল গরবে ভারী হইয়া উঠিতেছিল। আমি যে ব্রাহ্ম-সমাজের লোক নিবেদিতা তখন তাহা ভুলিয়া গেলেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার গুরুনিন্দা করিয়াছি বলিয়া আমার উপরে যে রাগ হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি পর্যন্ত তাঁহার মনে রহিল না। ···নিবেদিতা ভারতবর্ষকে যেরূপ ভালবাসিতেন, ভারতবাসীও ততটা ভালবাসিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

মিসেস্ বুলের বাড়িতে আমরা উভয়ে পরস্পরের প্রতিপক্ষ রূপে মিলিয়াছিলাম। এই কংগ্রেস অব রিলিজিয়নস্-এর অধিবেশনে ভারতের পাদপীঠে দাঁড়াইয়া আমরা উভয়ে এমন এক সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইলাম, যাহা শত মতভেদ সত্ত্বেও চিরদিন অটুট ছিল'।

আমেরিকায় যাবার পর বিপিনচন্দ্র নিউ ইয়র্ক, বোস্টন, শিকাগো, মিড্ভিল, লুইভিল্, সেণ্ট লুই প্রভৃতি মার্কিন সভ্যতার প্রায় সকল কেন্দ্র থেকেই বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। একমাত্র ওয়াশিংটনেই তখনও পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতার কোনো ব্যবস্থা হয় নি। অথচ আমেরিকায় গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী, মার্কিনের রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রস্থল ওয়াশিংটন না দেখেই দেশে ফিরে আসতে হবে—এই কথা ভেবে বিপিনচন্দ্র মনে মনে দুঃখ বোধ করলেন। অনাহূত অবস্থায় ওয়াশিংটন ভ্রমণে যেতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন তা'-ও তাঁর সঙ্গতির বাইরে।

নিউ ইয়র্কের হোটেলে বসবাসকালে জনৈকা অশীতিপরা বৃদ্ধা অন্ধ সাহিত্য-সেবিকা এবং তার মধ্যবয়স্কা সেক্রেটারী মিস্ এলফিন্. ই ফক্সের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। যতদিন তাঁরা নিউ ইয়র্ক হোটেলে ছিলেন, ততদিন সস্নেহ সেবায় এবং আন্তরিক আদর-আপ্যায়নে তাঁরা বিদেশী অতিথির প্রবাস-জীবনের নিঃসঙ্গতার বেদনা অনেকাংশে লাঘব করেছিলেন। মাস দু'য়েক পরে ভদ্রমহিলারা নিউ ইয়র্ক পরিত্যাগ করে ওয়াশিংটনে চলে যান। অতীতের স্নেহমধুর সম্পর্কের কথা স্মরণ করে বিপিনচন্দ্র পত্রযোগে ওঁদেরকে জানালেন যে তাঁর দেশে ফিরে যাবার সময় আসন্নপ্রায়, ওয়াশিংটন দর্শনের সুযোগ তিনি পেলেন না, সুতরাং তাঁদের সঙ্গে আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই। একজন বিশিষ্ট বিদেশীকে আমেরিকায় গিয়ে ওয়াশিংটন-দর্শন না করেই দেশে ফিরে যেতে হচ্ছে—এই সংবাদে সেই অন্ধ সাহিত্যসেবিকা ও তাঁর সঙ্গিনীর স্বদেশাভিমান আহত হলো। কারণ ওয়াশিংটন, আমেরিকাবাসীমাত্রেরই গৌরবের বস্তু। কয়েকদিনের মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে তারযোগে সংবাদ পেলেন যে ওশাশিংটনের ফিল্হারমনিক্ সোসাইটির উদ্যোগে ওখানে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিপিনচন্দ্র তখন বোস্টনে ছিলেন। তার পরেই তিনি ওয়াশিংটন অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। কর্নেল ব্লাউণ্ট নামে ওয়াশিংটনের জনৈক অতিসম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়িতে তাঁর আতিথ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কর্নেল ব্লাউণ্ট তখন শহরে ছিলেন না, মিসেস্ ব্লাউণ্টই তাঁর আতিথ্যের ভার গ্রহণ করলেন।

এইভাবে ওয়াশিংটন-দর্শনের সুযোগলাভে তিনি উল্লসিত হলেন, সন্দেহ নেই; কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ধরনের অভাবনীয় ব্যবস্থা কেমন করে সম্ভব হলো' তা জানবার জন্য তাঁর মনে অদম্য কৌতূহলের উদ্রেক হলো। তাঁর অনুরোধে মিস্ ফক্স তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াসের বিস্ময়কর কাহিনী বিস্তৃতভাবে বিবৃত করলেন।[২৪]

নির্ধারিত দিনে তিনি যথাসময়ে সভাঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঘরটি আয়তনে খুব বড়ো না হলেও আগ্রহী নরনারীতে পূর্ণ ছিল। ওয়াশিংটন সমাজের অনেক মনীষী সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ওয়াশিংটনের মনীষী-সমাজ ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার প্রতি তেমন শ্রদ্ধাবান নন—বিপিনচন্দ্র জানতেন। তিনি একথাও জানতেন যে ভারতীয় দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কে মার্কিন চিন্তানায়কদের ধারণা বহুলাংশে ডক্টর হ্যারিসের মতের দ্বারা প্রভাবিত। ডক্টর হ্যারিস স্ব-সম্পাদিত 'জার্নাল অব্ স্পেকুলেটিভ ফিলজফি' পত্রিকায় বরাবর ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাকে গ্রীক এবং খৃষ্টীয় দার্শনিক চিন্তা অপেক্ষা নিম্নস্তরের বলে প্রচার করে এসেছেন—প্রসঙ্গত সে-কথাও তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি মনে মনে স্থির করলেন যে ওয়াশিংটন-বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা সম্পর্কিত ডক্টর হ্যারিসের মতবাদের একটা উপযুক্ত প্রতিবাদ ধ্বনিত করবেন। তিনি বলেছেন—'ডাঃ হ্যারিস শঙ্কর-বেদান্তের মায়াবাদের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিয়া আমাদের দেশের দার্শনিক চিন্তার অসারতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই মায়াবাদ বিশ্ব-সমস্যার কোনো মীমাংসাই করিতে পারে না, কেবল সৃষ্টি-সমস্যাকে একটা কথা দিয়া ধামাচাপা দিতে চাহে। মোটামুটি ইহাই ডাঃ হ্যারিসের সমালোচনার মূল সূত্র ছিল। আমার বক্তৃতাতে আমি এই সমালোচনার ভুলভ্রান্তি দেখাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলাম।' বিপিনচন্দ্র বুঝেছিলেন যে শঙ্কর-সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে ভারতীয় বেদান্তদর্শনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যগ্রহণ পাশ্চাত্য দার্শনিকের পক্ষে সহজ ছিল না। তাই তিনি তাঁর বক্তৃতায় মুখ্যতঃ রামানুজ-সিদ্ধান্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ভিত্তি করে বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হন এবং এইভাবে বেদান্ত-দর্শনের ব্যবহারিক দিকটি পাশ্চাত্য শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে পরিস্ফুট করে তোলেন।

বক্তৃতার পর বৃদ্ধ ডক্টর হ্যারিস বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পরদিন বিপিনচন্দ্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সে এক

স্মরণীয় সাক্ষাৎকার। বিপিনচন্দ্র তাঁর ঘরে প্রবেশ করা মাত্র সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বিনয়াপ্লুত কণ্ঠে বললেন—'আমরা পশ্চিমে তোমাদের দর্শনের মায়ার কথাই শুনিয়াছি। শঙ্কর-বেদান্তের কথাই যা একটু-আধটু জানি। এরই পাশে পাশে যে আর একটা বিশাল ও গভীর চিন্তাধারা বহিয়া গিয়াছে তার কোন খোঁজ পাই নাই। এইজন্য আমি এই ক'বছর ধরিয়া ভারতবর্ষের দর্শনের অযথা সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি, তোমরা আমাকে মার্জনা করিও'।

ওয়াশিংটনে থাকবার সময় মিস্ ফক্সের ব্যবস্থাপনায় বিপিনচন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ম্যাক্‌কিন্‌লের সঙ্গেও সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। তবে সে সাক্ষাতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় কিছুই ছিল না।

ওয়াশিংটন থেকে বিপিনচন্দ্র পশ্চিম আমেরিকা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে আবার বোস্টনে ফিরে এলেন। সেই বছর বোস্টনে আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পঞ্চসপ্ততিতম বার্ষিক উৎসব অত্যন্ত সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, রাশিয়া এবং জাপান থেকে প্রখ্যাত একত্ববাদীরা (ইউনিটেরিয়ানস্) বোস্টনের উৎসবে যোগদান করেন। এদেশ থেকে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। এই উৎসবে বিপিনচন্দ্রকে কোনো বক্তৃতা দিতে হয়নি। শুধু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বক্তৃতার মঙ্গলাচরণ করতে হয়েছিল তাঁকে।

এই সময় বোস্টনের আরও কতকগুলি সভাসমিতির বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আর একটি সভায় বিপিনচন্দ্রকে বক্তৃতা দিতে হয়। আমেরিকায় এইটিই তাঁর শেষ বক্তৃতা। যে সভার অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা দেন তার নাম ছিল 'ম্যাসাচুসেটস্ মর‍্যাল এডুকেশন সোসাইটি'। একজন ভদ্রমহিলা অধিবেশনে সভানেত্রীর আসন দখল করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হবার অল্পক্ষণ পরেই একজন বৃদ্ধ খৃষ্টান পাদরি বক্তৃতা করতে উঠলেন। বক্তৃতার মধ্যে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বললেন—'ভারতবর্ষের লোকেরা গোরুর লেজ চুম্বন করাকেই ধর্ম বলে মনে করে। তারা পবিত্রতালাভের জন্য গোবর খেয়ে থাকে। গোরুর মাংসের চেয়ে গোবর খাওয়াটা তারা ভালো বলে মনে করে।'[২৫] পাদরি সাহেব তাঁর বক্তৃতায় অন্য ধর্মকে আক্রমণ করে আরও অনেক কথা বলেন। বিপিনচন্দ্র জানিয়েছেন যে পাদরি সাহেবের বক্তৃতার

স্বর এত অদ্ভুদাব ছিল যে লোকে দলে দলে সভাঘর ত্যাগ করে বাইরে চলে গেল।

পাদরি সাহেবের পর বিপিনচন্দ্রের পালা এলো। তিনিই ছিলেন সেই অধিবেশনের শেষ বক্তা। পাদরি সাহেবের বক্তৃতা বিপিনচন্দ্রের ভারতীয়ত্বে রূঢ় আঘাত হেনেছিল। সে আঘাতের যোগ্য প্রত্যুত্তরদানের দৃঢ়সঙ্কল্প মনে নিয়ে তিনি মঞ্চপ্রান্তে গিয়ে দাড়ালেন। পাদরি সাহেবের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিবাদে নির্ভীক বাগ্মী বিপিনচন্দ্রের বজ্রকণ্ঠ বহ্নি-বাণী উদ্গীরণ শুরু করলো। তিনি বললেন—'মাননীয়া সভানেত্রী, সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের চোখে অধার্মিক (হীদেন)। যে খৃষ্টান নয়, সে-ই আপনাদের বিচারে অধার্মিক। কিন্তু আমি যে খৃষ্টান নই, একথা বলতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করি না। দু'বছর আগে আমি যখন দেশের মাটি ছেড়ে আসি, তখন হয়তো খৃষ্টান শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে একথা স্বীকার করতে কিছু সঙ্কোচবোধ করতাম।··· কিন্তু এখন আমি যে খৃষ্টান নই একথা বলতে বরং গর্ব বোধ করি। তবে এই সমস্ত কথা বলবার উদ্দেশ্যে আমি এ সভায় আসিনি। কিন্তু ঈশ্বর এরকম বিধান দেন, লোকে (পূর্ববর্তী বক্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) অন্যরকম ঘটায়।' এই কথাগুলি বলতে বলতে তিনি লক্ষ্য করলেন, যাঁরা কিছুক্ষণ আগে সভাঘর ছেড়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা আবার ঘরের মধ্যে ফিরে আসছেন এবং করতালি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। তখন তিনি পাদরি সাহেবের উক্তির জবাব দেওয়া শুরু করলেন। পাদরি সাহেব বলেছিলেন, খৃষ্টধর্মের বাইরে নীতিশিক্ষার কোন প্রকার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। বিপিনচন্দ্র সেই উক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—'যে ধর্ম বলে মানুষের জন্ম পাপে সে ধর্ম নীতির মূল ছেদন করে দেয়। ···মানুষের জন্ম পাপে ও পরিণামে অনন্ত নরক—এ সমস্ত মতবাদ সভ্যসমাজ পরিত্যাগ করেছেন।··সভ্য লোকে এ সমস্ত নীতিবিগর্হিত মতবাদে আর বিশ্বাস করে না। যাক্ সে সব কথা। নীতিশিক্ষা দেওয়া তোমাদের সভার উদ্দেশ্য। কিন্তু তোমাদের নীতিশিক্ষার কথা আমি যখনই দেখি ও ভাবি, তখনই বিভ্রান্ত হয়ে যাই। আমি বুঝে উঠতে পারি না, তোমরা দেবতা না নীরেট বোকা। তোমাদের ঈশ্বর বলেছিলেন, আলোক হোক্, আর অমনি আলো ফুটে উঠেছিল —বাইবেলে একথা আছে। তোমাদের পাদরিরা বলেন, সাধু হও, আর অমনি তোমরা সাধু হয়ে ওঠ;' সংযমী হও, আর অমনি তোমাদের সংযম ফুটে ওঠে।

এ যদি সত্য হয়, তবে তোমরা মানুষ নও, দেবতা। আর এ যদি সত্য না হয় তা'লে তোমরা নীরেট বোকা। কত ধানে কত চাল কিছুই বোঝ না।[২৬] এর পর তিনি খৃষ্টধর্মের পুঁথিগত নীতিকথার প্রচার এবং খৃষ্টানদের আচরণগত বৈষম্যের নানাভাবে উল্লেখ করেন। কিন্তু স্ব-ধর্ম ও স্ব-সমাজের জীবনাচরণরীতির প্রতি বিধর্মীর আক্রমণ সত্ত্বেও বিধর্মী বক্তার প্রতি শ্রোতৃমণ্ডলীর বিরূপতা প্রকাশ পেল না। সেদিন আমেরিকাবাসীর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সভ্যমানবসুলভ সৌজন্যবোধ এবং সহিষ্ণুতা বিপিনচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। অনেক কাল পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অতীতের সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি অকপট চিত্তে ব্যক্ত করে গেছেন। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'তারপর দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে আমি তাহাদের সভ্যতা ও সাধনার উপরে এমন তীব্র আক্রমণ করিলাম অথচ কেউ রাগ করিল না, কেউ বিরক্ত হইল না, কেউ সভাস্থল ছাড়িয়া গেল না, বরঞ্চ মুহুর্মুহু করতালিধ্বনি করিয়া আমার কথায় সায় দিতে লাগিল। এইরূপ মানসিক উদারতা আমেরিকা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় কি না সন্দেহ।'[২৭] এই সভার অধিবেশন বসেছিল সকালে। সভাভঙ্গের পরবিপিনচন্দ্র হোটেলে ফিরে এসে মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে বাইরে বেরিয়ে দেখতে পেলেন তাঁর সমস্ত বক্তৃতাটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে গেছে।

এর পর তিনি কয়েকদিন মাত্র বোস্টনে ছিলেন। সেই ক'দিনে তিনি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত বক্তৃতার প্রসঙ্গ উল্লেখে আমেরিকার নানা স্থান থেকে পাঠক-পাঠিকার অনেক পত্র পেতে থাকেন। কেউ বা ধন্যবাদ জানিয়েছেন; আবার কেউ বা খৃষ্টীয় নীতি ও সভ্যতার পক্ষসমর্থনের চেষ্টা করেছেন। এই সঙ্গে তিনি অন্যান্য স্থান থেকে বক্তৃতাদানের জন্য নিমন্ত্রণপত্রও পেলেন। কিন্তু আর কোন নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠলো না; কারণ, তখন দেশে ফিরে আসবার জন্য জাহাজের টিকিট সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। এর চার পাঁচ দিনের মধ্যেই বিপিনচন্দ্র নিউ ইয়র্ক থেকে জাহাজে চেপে লিভারপুল অভিমুখে যাত্রা করলেন।

সূত্র-নির্দেশ

(১) Memories of My Life and Times, Vol. I : P. 454

(২) Memories of My Life and Times : B. C. Pal, Vol. II, Calcutta, 1951. P. 1.

(৩) 'But the ten years that had intervened between my mother's and father's death, had slowly revealed to me the meaning and lofty idealism of these Hindu disciplines'.—Ibid, P. 3.

(৪) 'I launched this enterprise out of pique. I was determined in doing this to destory the old School at Habiganj. Looking back upon that experience I soon came to realise it that the real cause of my failure was the malicious motive that had instigated me in starting this School.'—Ibid P. 11.

(৫) Compensation শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় Emerson বলেছেন—'And yet the Compensations of calamity are made apparent to the understanding also, after long intervals of time.......The death of a dear friend, wife, brother, lover, which seemed nothing but privation, somewhat later assures the aspect of a guide or genius ; for it commonly operates revolutions in our way of life,......breaks up a wanted occupation, or a household, or a style of living, and allows the formation of new ones more friendly to the growth of character',—The selected writings of Ralph Waldo Emerson, edited by Brooks Atkinson, New York, 1965. P. 189.

(৬) Memories of My Life and Times, Vol. II, P. 105.

(৭) 'My life-long passion for writing and preaching soon forced me to give up what people called all secular work and devote myself entirely to the mission work of the Brahmo Samaj as a lay preacher'.—Ibid, P, 124.

(৮) Ibid. P. 135.

(৯) 'The Brahmo Samaj created a void in the mind of the Hindus used to gorgeous rites and liturgies. Here is its trouble. An introduction of philosophical disquistion about transcedental yet personal nature of Godhood cannot satisfy the minds of common men'.—'Swami

Vivekananda : Dr. Bhupendra Nath Dutta, 1st Edn., Cal., 1954, P. 163.

(১০) 'জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ঃ হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০, পৃঃ ১২৩।

(১১) Memories of My Life and Times, Vol. II, P. 211.

(১২) "All this, however, is a verification of the saying of Emerson that while 'our faith is transitory, our sin is habitual"—Ibid, P. 213

(১৩) Ibid, P. 213.

(১৪) Memories of My Life and Times. Vol. II, Pp. 227-28.

(১৫) Ibid, P. 229.

(১৬) Ibid, P. 250.

(১৭) 'The Politicians in the present stage of our evolution are an undeveloped race morally and spiritually.'—Ibid, P. 257.

(১৮) Ibid, Pp. 269-70.

(১৯) 'মার্কিনে চারিমাস' : বিপিনচন্দ্র পাল, কলকাতা, ১ম সং, ১৩৬২, পৃঃ ৪—৫।

(২০) 'His wonderful success as a powerful orator and defender of the religion of his people had immediately a remarkable repercussion in India lending a new force and inspiration to the infant national consciousness among us. This was practically our first foreign mission'—Memories of My Life and Times, Vol. II, Pp. 274-75.

(২১) মার্কিনে চারিমাস : বিপিনচন্দ্র পাল, ১৩৬২ পৃ' ৭।

(২২) 'You come from a great country, Sir, you are destined to be the teachers of the world. But you cannot fulfil this destiny until you are able to look the world horizontally into the face'.—'মার্কিনে চারিমাস' থেকে উদ্ধৃত ; পৃঃ ১০।

(২৩) বিপিনচন্দ্র পাল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৬—২৮ (ভাষার কথ্যরূপ লেখককৃত)

(২৪) 'মার্কিনে চারিমাস', পৃঃ ৮৬—৯৩।

(২৫) মার্কিনে চারিমাস : পৃঃ ১০৪ (ভাষার কথ্যরূপ লেখককৃত)

(২৬) মার্কিনে চারিমাস : পৃঃ ১০৫—০৬। (ইংরেজী অংশের বঙ্গানুবাদ এবং বাংলা অংশের কথ্যরূপ লেখককৃত)

(২৭) মার্কিনে চারিমাস : পৃঃ ১০৮।

চতুর্থ অধ্যায়

কর্মক্ষেত্রে

(Pen is mightier than the sword)

বিংশ শতাব্দীর উষা-লগ্নে যে নব্য স্বাদেশিকতা ও যৌগিক জাতীয়তার ভাবধারা বঙ্গের গাঙ্গেয় প্রবাহ থেকে উদ্গত হয়ে অচিরে সমগ্র ভারতভূমিকে পরিপ্লাবিত করেছিল, মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন তার অন্যতম এবং মুখ্যতম উদ্ভাবক, বাহক এবং প্রচারক। সমকালীন যুববঙ্গের কাছে তিনি ছিলেন বিপ্লবী ভাব-গঙ্গার ভাগীরথ এবং নব্য রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ নবীন ভারতের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান রূপকার। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিপিনচন্দ্রের বহ্নিবর্ষী লেখনী এবং কম্বুকণ্ঠকে অবলম্বন করেই স্বদেশী ও স্বরাজের বাণী বাংলা কথা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল। 'মসি অসি অপেক্ষা শক্তিধর'—এই প্রবাদ-বাক্য বিপিনচন্দ্রের জীবনে যে পরিমাণে সত্য হয়ে উঠেছিল, একমাত্র অরবিন্দ ঘোষ ব্যতীত তাঁর সমকালীন অন্য কোনো স্বদেশসেবীর জীবনে সে পরিমাণে সত্য হয়ে ওঠে নি।

বিপিনচন্দ্র ছিলেন বাগ্মী, রাষ্ট্রনায়ক এবং নবীন ভারতে নব্য জাতীয়তা-বাদের প্রধান প্রবক্তা,—এ-ই হচ্ছে তাঁর মুখ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য পরিচয়। এই পরিচয় তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিককে অনেক পরিমাণে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বহুমুখী প্রতিভার ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা অপ্রত্যাশিত নয়। সে যা'ই হোক্, বিপিনচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাধনার সামগ্রিক মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে তাঁর সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বও সমকালীন সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কোনোক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর স্বকীয়তার স্বাক্ষর সমুজ্জ্বল। আরও গভীরভাবে তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাঁর রাষ্ট্রনীতি, সাংবাদিকতা এবং সাহিত্য-চর্চার নেপথ্য উৎস হচ্ছে—আধ্যাত্মিক চেতনোদ্দীপ্ত মানব-প্রেমিকতার সাধনা। এই ভাবগত স্তরে বালগঙ্গাধর তিলক, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একই মঞ্চে তাঁর নির্বিরোধ সহাবস্থান।

বিপিনচন্দ্রের সাংবাদিক-সত্তাকে তাঁর দেশনায়ক-সত্তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-ভাবে পরিচায়িত করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, তাঁর সাংবাদিকতা ছিল 'গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী'র মতো দেশসেবারই নামান্তর। তা' সত্ত্বেও সাংবাদিকরূপে তিনি ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় উত্তরকালের জন্য রেখে গেছেন, তা' যথাসম্ভব পরিস্ফুট করবার উদ্দেশ্যে বর্তমান অধ্যায়ের প্রথমেই বিপিনচন্দ্রের সাংবাদিক কীর্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সাংবাদিক ঃ

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শ্রীহট্ট শহরে 'পরিদর্শক' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। শহরের নব্যশিক্ষিত তরুণ-সম্প্রদায় ছিলেন এই পত্রিকা-প্রকাশের উদ্যোক্তা। এর পূর্বে 'শ্রীহট্ট-প্রকাশ' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা শ্রীহট্ট শহরে প্রচলিত ছিল। এক সময় শ্রীহট্ট-প্রকাশ বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু কটক একাডেমির কর্ম ত্যাগ করে বিপিনচন্দ্র যখন শ্রীহট্টে যান, তখন এই পত্রিকা মৃতকল্প দশায় উপনীত। তা'ছাড়া নতুন দিনের চিন্তা ও ভাবধারাকে বাঙ্ময় করে তুলবার নৈতিক সামর্থ্যও তখন এই পত্রিকার ছিল না। এইজন্য শ্রীহট্টের তরুণসম্প্রদায় ২,৫০০ টাকা আদায়ী মূলধন সম্বল করে একটি হস্ত-চালিত মুদ্রণযন্ত্র এবং প্রয়োজনীয় টাইপ ও আনুষঙ্গিক উপকরণ কলকাতা থেকে কিনে এনে এই পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

বিপিনচন্দ্র তখন শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় রত। 'পরিদর্শক'-এর পরিচালকবর্গ কর্তৃক আহূত হয়ে তিনি এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন। এই সময় থেকে শিক্ষকতার পাশাপাশি তাঁর জীবনে সাংবাদিকতা-চর্চারও সূচনা হলো। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্বাধীন দায়িত্ব-ভার গ্রহণ তাঁর জীবনে এই প্রথম। এই সময় মফঃস্বল শহর ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত ভারত-মিহির' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক সমকালীন বাংলা পত্র-পত্রিকাসমূহের মধ্যে যথেষ্ট বিশিষ্টতা অর্জন করে। 'পরিদর্শক' সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য কিছু জানা যায় না। তবে বিপিনচন্দ্র জানিয়েছেন—"ময়মনসিংহের 'ভারত-মিহির' পত্রিকার মতো শ্রীহট্টের 'পরিদর্শক' পত্রিকাও প্রায় জন্ম-লগ্ন থেকেই জনসাধারণের

দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শুধু শ্রীহট্ট জেলা কেন, প্রায় সমগ্র বাংলা প্রদেশের শিক্ষিত জনমত প্রকাশের অন্যতম শক্তিশালী বাহন হয়ে ওঠে।"[১] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে 'পরিদর্শক' অর্থপ্রদায়ী সংস্থা ছিল না এবং এর সম্পাদকীয় কর্মের জন্য তিনি কোনো অর্থ পেতেন না। শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্‌বৃত্ত অর্থ থেকে তিনি যৎসামান্য পারিশ্রমিক পেতেন। তার দ্বারা দু'বেলা অন্নসংস্থান করাও কঠিন ছিল। ফলে তখন এমন অনেকদিন গেছে, যেদিন একবেলা হয়তো অনাহারে কাটাতে হয়েছে।[২] তা' সত্ত্বেও তাঁর উদ্যম শিথিল হয় নি। 'পরিদর্শক' সম্পাদনাকালেই তিনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আত্ম-নির্ভরতা অর্জন করেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শেষে বিপিনচন্দ্র বাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন। অবিলম্বে অর্থ আয় করা প্রয়োজন। অথচ আয়কর কোনো কাজ সেই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। দুর্গামোহনের দুই পুত্র সতীশরঞ্জন এবং যতীশরঞ্জন পিতার ইচ্ছানুসারে তখন বিলাতে গিয়ে আই. সি. এস্. পরীক্ষায় প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। পিতৃপ্রতিম দুর্গামোহনবাবু বিপিনচন্দ্রের আর্থিক অনটনের কথা চিন্তা করে সার্বক্ষণিক গৃহশিক্ষকরূপে সতীশরঞ্জন ও যতীশরঞ্জনের শিক্ষার দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিলেন। এই সূত্রে অর্জিত অর্থই হলো তখন তাঁর জীবিকার একমাত্র উপায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এঁরা দু'জনেই উত্তর-জীবনে প্রভূত প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছিলেন।

জীবিকার চেয়ে জীবনের দাবি চিরদিনই বিপিনচন্দ্রের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। জীবনের দাবিপূরণের জন্যই তিনি এই সময় অবৈতনিকভাবে 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকার সম্পাদকের সহকারী রূপে যোগদান করলেন। পরে অবশ্য সহ-সম্পাদকীয় কর্মের জন্য এই পত্রিকা থেকে তাঁর জন্য মাসিক ৭০ টাকা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন ছিল সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপত্র 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন'-এর নামান্তরিত রূপ। ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন বাবু দুর্গামোহন দাশ এবং আনন্দমোহন বসুর অর্থানুকূল্যে প্রথম প্রকাশ লাভ করে। কিছুকাল পরে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মানুষেরা মনে করতে থাকেন যে এই পত্রিকা যথেষ্ট পরিমাণে 'ধর্মীয়' এবং 'আধ্যাত্মিক' নয়। সুতরাং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপত্র রূপে এই পত্রিকার অস্তিত্ব রক্ষা অপ্রয়োজনীয়। স্বয়ং আনন্দমোহনও এই ধারণার অনুকূলে মত

প্রকাশ করেন। তখন ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন নামান্তর গ্রহণ করে অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করে। দুর্গামোহনবাবুর অনুজ ভুবনমোহন দাশ হন বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়নের সম্পাদক। এই পত্রিকার সান্নিধ্যে এসেই বিপিনচন্দ্র ইংরেজী সাংবাদিকতায় নিয়মিত শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বলেছেন 'যদিও ভুবনমোহন ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক, তা' হলেও এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে আমি এর প্রধান লেখকরূপে গণ্য হই এবং সম্পাদকীয় দায়িত্ব না পেলেও ধীরে ধীরে সম্পাদকীয় কর্মের ভার আমার উপরেই ন্যস্ত হয়।'[৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্প অঙ্গীকার করে নানাবিধ পত্র-পত্রিকার উদ্ভব হয়। তখন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের স্বর্ণযুগ। ব্রাহ্ম-সমাজের যুক্তিবাদকে বিপরীত যুক্তিধারার সাহায্যে খণ্ডনের চেষ্টা চলছে। এই পুনরুজ্জীবন-আন্দোলনের মুখপত্র রূপে আবির্ভূত হলো অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত মাসিক পত্র 'নবজীবন' (প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১২৯১ : ১৮৮৪) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্যোগে প্রকাশিত মাসিক পত্র 'প্রচার' (প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১২৯১ : ১৮৮৪)।[৪] ওদিকে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি জনপ্রিয় বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বঙ্গবাসী'-কে (প্রথম প্রকাশ—২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ : ১৮৮১) ব্রাহ্ম-আদর্শ বিরোধী আন্দোলনের বাহনরূপে ব্যবহার করা শুরু করলেন। 'প্রচার'-এর পৃষ্ঠায় হিন্দুর প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের সর্বাধুনিক চিন্তাধারাসম্মত বঙ্কিম-কৃত ব্যাখ্যান প্রকাশিত হতে লাগলো। এই অবস্থায় আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কয়েকজন তরুণ মিলিত হয়ে 'আলোচনা' নামে (প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৮০৬ শক : ভাদ্র, ১২৯১ : ১৮৮৪) একখানি ক্ষুদ্রায়ত মাসিক পত্র প্রকাশ করলেন। গগনচন্দ্র হোম হলেন এর সম্পাদক। গগনচন্দ্র লিখেছেন—"সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন 'প্রচার' মাসিক পত্র সম্পাদন করিতেছিলেন, তখন বন্ধুবর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নেতৃত্বে আমরাও 'আলোচনা' প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই পত্রিকার পরিচালনা-ভার ছিল আমার উপর"।[৫]

বিপিনচন্দ্র 'আলোচনা'র বিঘোষিত সম্পাদক না হলেও তাঁরই নেতৃত্বে প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদকীয় আসনের অধিকাংশ কাজকর্মের দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবে তাঁর উপরেই ন্যস্ত হয়েছিল। 'আলোচনা' দীর্ঘজীবী হতে

পারেনি। তবে যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন ব্রাহ্ম প্রগতিপরায়ণতা ও যুক্তিবাদের জয়-পতাকাকে উড্ডীন করে রেখেছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'সাবিত্রী গ্রন্থাগার'-এর বার্ষিক অধিবেশনে (২৮শে বৈশাখ, ১২৯২) 'নবজীবন'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ উচিত কি না' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। বিপিনচন্দ্র সেই সভায় অক্ষয়বাবুর যুক্তি খণ্ডন করে বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে বক্তৃতা করে অনুকূল জনমত সৃষ্টি করেন। বিপিনচন্দ্রের এই বক্তৃতার মর্মকথা 'আলোচনা' পত্রিকায় (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০৫-৩২৬) প্রকাশিত হয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। বিপিনচন্দ্রের সাংবাদিকতা-চর্চাতেও সাময়িকভাবে ছেদ পড়ে। প্রায় তিন বছর পরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সহ-সম্পাদকের পদ লাভ করলেন। সর্দার দয়াল সিং মাঝিথিয়ার অর্থানুকূল্যে কয়েক বছর আগে ইংরেজী সাপ্তাহিক রূপে ট্রিবিউন আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে পরামর্শদাতা ছিলেন লাহোরের বাঙালী সমাজের তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—বাবু প্রতুলচন্দ্র ব্যানার্জি, বাবু কালীপ্রসন্ন রায় এবং বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। সর্দার দয়াল সিং সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দমোহনের পরম অনুরক্ত ছিলেন এবং সে সময় তাঁকে ব্রাহ্ম-সমাজের একজন সভ্য বলে গণ্য করা হতো। সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দমোহনের সুপারিশে শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক রূপে লাহোরে গেলেন। এই সময় থেকে প্রতি সপ্তাহে ট্রিবিউনের তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হতে থাকে। একজন সম্পাদকের পক্ষে এই ধরনের পত্রিকার সমগ্র দায়িত্ববহন সম্ভব নয় বলে কর্তৃপক্ষ সম্পাদকীয় কর্মের জন্য আর একজন উপযুক্ত লোকের সন্ধান করেন। এই সময় বিপিনচন্দ্র সহ-সম্পাদকের পদে নিয়োগ লাভ করেন। এইভাবে আবার ইংরেজী সাংবাদিকতার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হলো। বিপিনচন্দ্র ট্রিবিউনে সহ-সম্পাদক রূপে যোগদানের কিছুদিন পরেই সম্পাদক শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ছুটিতে গেলেন। তখন থেকে বিপিনচন্দ্রের উপরেই সম্পাদকীয় কর্মের ভার ন্যস্ত হলো। আর দু'জন সহ-সম্পাদক হলেন তাঁর সহযোগী। পাঁচমাস যাবৎ স্বাধীনভাবে তিনি ট্রিবিউন পত্রিকা পরিচালনা

করেন। লেখার নেশায় আবিষ্ট হয়ে বিপিনচন্দ্র একমাত্র সংবাদ-স্তম্ভগুলি বাদে এই পত্রিকার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত লেখাই নিজে লিখতে শুরু করলেন। এতে তাঁর সহ-সম্পাদক দু'জন স্বভাবতঃই মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন। কারণ, সম্পাদক একাই সমস্ত লেখার সুযোগ গ্রাস করে বসলে সহ-সম্পাদকদের সাহিত্য-পিপাসা বা সাংবাদিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার আর সুযোগ থাকে না।

শীতলাকান্ত ছুটি থেকে ফিরে এসেই ট্রিবিউন সংক্রান্ত কাজ-কর্মের পুনর্বণ্টন করলেন। বিপিনচন্দ্রের উপর শেষ প্রুফ সংশোধন এবং দৈনন্দিন আদায় তদারকির ভার ন্যস্ত হলো। প্রথমতঃ, এই কাজ ঠিক সহ-সম্পাদকের দায়িত্বের অন্তর্গত নয়। দ্বিতীয়তঃ, যিনি পাঁচ মাস যাবৎ সম্পাদকীয় লেখনী পরিচালনা করে এসেছেন, তাঁকে লেখনী ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা অপমানেরই নামান্তর। বিপিনচন্দ্র সম্পাদকের এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে না পেরে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করলেন। এই সংবাদ জানতে পেরে 'ট্রিবিউন'-এর অন্যতম শুভানুধ্যায়ী প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত ব্যাপার শুনে তাঁকে সর্দার দয়াল সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। পরদিন সকালেই সর্দার সাহেবের কাছ থেকে একখানি অনুরোধ-পত্র এলো। স্বাভাবিক সৌজন্য-বশে তখন তিনি সাক্ষাৎ করতে গেলেন। সর্দার সাহেব অবিলম্বে তাঁর ক্ষোভের প্রতিকার করবার আশ্বাস দিয়ে তাঁকে পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু সে আশ্বাসেও তিনি সম্মত হতে পারলেন না। এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'কোনো পত্র-পত্রিকার মালিক এইভাবে সম্পাদকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করুন, এ আমি কখনই পছন্দ করতে পারিনি, যদিও এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ আমার অনুকূলেই হতো।'[৬] যিনি তাঁর পদত্যাগের কারণ, তাঁর ব্যবহারের যোগ্য প্রত্যুত্তর দানের সুযোগ এত সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের স্বার্থে তা' ব্যবহার করলেন না। স্বাধীনচেতা সাংবাদিক নিজের সাংবাদিক-জীবন বলি দিয়েও সহযোগী-সাংবাদিকের সম্মান রক্ষা করলেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বিপিনচন্দ্র লাহোর থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন। এই সময় থেকে প্রায় চার বছর যাবৎ সাংবাদিকতার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ

সংযোগ ছিল না। এই সময়ের মধ্যে তাঁর অন্তর্জীবনে একটা অধ্যাত্মমুখী পরিবর্তনের সূচনা হয়। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চাকরি ত্যাগের পর তাঁর মনে হতে থাকে যে অর্থের বিনিময়ে তিনি আর কোনো কাজ করবেন না। সাধারণ ভৃত্যের কাজ থেকে শুরু করে উচ্চতর বিদ্যাবুদ্ধির কাজ এবং সাহিত্যের কাজ পর্যন্ত সর্বপ্রকারের কাজ করবার সাধারণ যোগ্যতা তাঁর ছিল। তবু তাঁর নিজের ধারণায় এই সমস্ত কাজের মধ্যে বলা এবং লেখার কাজেই তাঁর সর্বাধিক যোগ্যতা ছিল। তাই তিনি স্থির করলেন যে তখন থেকে অর্থ-চিন্তা ঈশ্বরে অর্পণ করে তিনি সাহিত্য-চর্চায় এবং প্রচার ও বক্তৃতার কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবেন।[৭]

মন যখন এই ধরনের চিন্তায় আলোড়িত, সেই সময় তিনি প্রথমে 'আশা' নামে একখানি বাংলা মাসিক পত্রিকা (প্রথম প্রকাশ ১১ই মাঘ, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩ : ১৮৯২) এবং কিছুদিন পরে 'কৌমুদী' নামে একখানি বাংলা পাক্ষিক পত্র (প্রথম প্রকাশ ২৩শে শ্রাবণ ১৩০১ : ১৮৯৪) প্রকাশ করলেন। এই দুইখানি পত্রিকারই উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্ম-সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন-সাধন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের গণতান্ত্রিক সংবিধান তখন একটি সরকারী ব্রাহ্ম আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিমুখে, যার ফলে সমাজের মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতার বিকাশ এবং সভ্যদের মধ্যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনযাপন গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। তা' ছাড়া ব্রাহ্ম-সমাজ অন্য ধর্ম থেকে পৃথক এবং পবিত্রতর একটি নতুন ধর্মস্থাপনের কথা চিন্তা করছিল। অথচ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য এই ধরনের ছিল না। কারণ, রাজা রামমোহন ব্রাহ্ম-মতবাদের মাধ্যমে প্রচলিত ধর্মমতসমূহের একটি যুক্তিসিদ্ধ সমন্বয়সাধনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই অবস্থায় সমাজের ধর্মতত্ত্ব ও নিয়মানুবর্তিতার পুনর্বিচার এবং পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হয়ে পড়লো।

'আশা' দীর্ঘজীবী হয়নি। তবে যে কয়মাস এর অস্তিত্ব ছিল, ততদিন এই পত্রিকা সমাজের সংবিধানের সীমাবদ্ধতা ও অনিষ্টকর দিক সম্পর্কিত আলোচনায় মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছিল। 'আশা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি শ্লেষাত্মক মন্তব্যের কথা বিপিনচন্দ্র তাঁর ইংরেজী আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। সমাজের কার্যনির্বাহক সমিতির সর্বগ্রাসী প্রভুত্ববিস্তারের দিকে ইঙ্গিত করে রাস্কিনের 'বারোজন মূর্খে একজন বিজ্ঞ তৈরী হয় না' এই বিখ্যাত সূক্তি অবলম্বন করে আশা লিখেছিল 'বারোজন রামে একজন রামমোহন তৈরী হয় না'।[৮]

'কৌমুদী' পত্রিকাও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। "কৌমুদী রাজা রামমোহনের বিশ্বজনীনতার প্রচারে গুরুত্ব আরোপ করেছিল, যদিও সেই বিশ্বজনীনতা জাতীয়তার সঙ্গে সম্পর্ক-বর্জিত ছিল না।"[১০]

বিংশ শতাব্দীর সূচনা-কাল বিপিনচন্দ্রেরও বৃহত্তর কর্মজীবনের সূচনা-কাল। এই শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই সাংবাদিক ও দেশনায়করূপে তাঁর প্রতিভা পূর্ণ-প্রভায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। এই পর্বে বিপিনচন্দ্রের সাংবাদিক-সত্তা এবং দেশনায়ক-সত্তা এমনভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল যে উভয় সত্তাকে বিচ্ছিন্নভাবে পরিস্ফুট করা কঠিন।

ইংল্যাণ্ড আমেরিকা পরিভ্রমণ করে বিপিনচন্দ্র যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন তিনি যেন অনেকাংশে নতুন মানুষ। মার্কিনের মাটিতে পদার্পণের প্রথম দিনের অপরাহ্নে নিউ ইয়র্কের হোটেলের পাঠাগারে সেই যে ভারত-ভক্ত অজ্ঞাতনামা মার্কিন ভদ্রলোক বিপিনচন্দ্রের কানে স্বাধীনতার মোহন মন্ত্র শুনিয়েছিলেন, সেই মন্ত্র তাঁর অন্তরে অভাবিত-পূর্ব পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। তিনি বলেছেন—'আর আমিও আধুনিক ভারতের সকল সাধনের পূর্ববৃত্ত সাধন যে জাতীয় স্বাধীনতালাভ, এ কথাটা সমুদয় জ্ঞান এবং সমুদয় ভাব দিয়া ধরিতে পারি নাই। মার্কিন প্রবাসের এইটাই হইল আমার সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ লাভের বিষয়'।[১১] এতদিন সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং ধর্মীয় প্রচার তাঁর কাছে মুখ্য সাধনার বিষয় ছিল; রাষ্ট্রনীতি-চর্চার স্থান ছিল গৌণ। এখন থেকে রাষ্ট্রনীতি-চর্চা তাঁর সাধনায় মুখ্য স্থান অধিকার করলো। তিনি অনুভব করলেন যে মানুষ হিসাবে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসন পেতে হলে, যে দেশের মানুষ তিনি, সর্বাগ্রে সেই দেশকে স্বাধীন করা প্রয়োজন। আর স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা-নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীকে এক জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা অপরিহার্য।

এইভাবে নবীন ভারত গঠনের স্বপ্ন বুকে নিয়েই ভূমিষ্ঠ হলো বিপিনচন্দ্র-সম্পাদিত বিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'নিউ ইণ্ডিয়া'। 'নিউ ইণ্ডিয়ার' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট। বিপিনচন্দ্র এর সম্পাদক হলেও এই পত্রিকা-পরিচালনায় দাশ-পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠতাত দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যরঞ্জন দাশ ছিলেন এই পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। চিত্তরঞ্জনও অন্যতম ডিরেক্টররূপে

এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[১২] 'আধুনিক চিন্তাধারা ও জীবনচর্যার পর্যালোচনা এবং সাপ্তাহিক লিখিত বিবরণী'—(উইকলি রেকর্ড য়্যাণ্ড রিভিউ অব্ মডার্ন থট্ য়্যাণ্ড লাইফ) এ-ই হলো নিউ ইণ্ডিয়ার বহিরঙ্গ পরিচয়। আর তার অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য আভাসিত হলো 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামের নীচে মুদ্রিত 'ঈশ্বর, মানবতা এবং স্বদেশের জন্য'—এই কথা ক'টির মধ্যে।[১৩] নিউ ইণ্ডিয়ার স্রষ্টা বিপিনচন্দ্রের সমগ্র সাধন-জীবন পর্যালোচনা করলেও দেখা যায়, একই সাধ্য বস্তু তাঁর কাছে স্বদেশ, বিশ্ব এবং ঈশ্বর—এই ত্রি-মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। তাঁর স্বদেশ-চেতনা বিশ্ব বা মানবতার ভাবনায় অবসিত হয়েছে এবং বিশ্ব-ভাবনা ভাগবত ধারণায় লীন হয়ে গেছে।

নিউ ইণ্ডিয়ার প্রথম সংখ্যায় তাঁর স্বপ্নের ভারতের বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত করতে গিয়ে তিনি বললেন—'এই নবীন ভারত শুধু হিন্দু-ভারত নয়, যদিও হিন্দুরা প্রশ্নাতীত ভাবে এর আদি উপাদান, শুধু মুসলিম-ভারত নয়, যদিও তাঁদের অবদানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; শুধু বৃটিশ-ভারতও নয়, যদিও তাঁরাই এখন রাজনৈতিক দিক থেকে এদেশের প্রভু; বর্তমান ভারতীয় সম্প্রদায়ের তিনটি উপশাখা যে তিনটি মহান্ বিশ্ব-সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে, সেই তিনটি সভ্যতা এদেশের বির্বতনের আনুক্রমিক স্তরসমূহে যে সমস্ত বিচিত্র এবং মূল্যবান উপকরণ দান করেছে, এই নবীন ভারত হচ্ছে সেই সমস্ত বিচিত্র ও মূল্যবান উপকরণে গঠিত ভারত।'[১৪] পত্রিকার আদর্শ ও তাৎপর্যের বিশদ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বললেন—'এর দৃষ্টিভঙ্গী—প্রকৃতিগতভাবে তীব্র জাতীয়তাবাদী, কারণ এর মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মননশক্তিসঞ্জাত অবদান-সমূহের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা প্রকাশিত; এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষায় স্পষ্টরূপে সার্বজনীন, কারণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যা' কিছু মহত্তম এবং মধুরতম, সে সমস্ত কিছুরই নাগাল পাবার অভিলাষ এর আছে।'[১৫] তারপর তৎকালীন ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহের মধ্যে গুরুত্বের দিক থেকে অর্থনৈতিক সমস্যাকে প্রথম এবং শিক্ষা-সমস্যাকে দ্বিতীয় স্থান দান করে বললেন—'যদিও নবীন ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো সমস্যাই, তা' সে রাজনৈতিক হোক, আর সামাজিক কিংবা ধর্মীয়ই হোক, উপেক্ষিত হবে না; তা' হলেও আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত সমস্যা সম্পর্কে অধ্যবসায়শীল আন্দোলনকেই আমরা আমাদের বিশেষত্ব করে তুলতে ইচ্ছুক।'[১৬]

'নিউ ইণ্ডিয়া'র প্রথম দু'বছরে (১৯০১-০২) এই পত্রিকার স্তম্ভে অনেকগুলি স্ব-রচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে বিপিনচন্দ্র উপরি-উক্ত 'বিশেষত্ব' সৃষ্টির অঙ্গীকার পালন করেছিলেন।[১৭] প্রবন্ধগুলি মুখ্যতঃ সমালোচনামূলক হলেও শিক্ষাসংক্রান্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সংস্কার ও সংগঠনের যে সমস্ত সূত্র নির্দেশ করেছিলেন তা' তাঁর দূরদৃষ্টি এবং মননগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয়বাহী। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখযোগ্য যে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে দু'টি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। প্রথমতঃ, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন বড়োলাট লর্ড কার্জনের উদ্যোগে সর্বস্তরের শিক্ষার উন্নতিবিধানের জন্য সিমলায় শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা-সভা (এডুকেশনাল কন্‌ফারেন্স) অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি-সংশোধনের উদ্দেশ্যে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ্ কমিশন) নিযুক্ত হয়।

মুখ্যতঃ সাংস্কৃতিক প্রচার-পত্রিকা রূপে জন্মগ্রহণ করলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে 'নিউ ইণ্ডিয়া' ধীরে ধীরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচারের শক্তিশালী মুখপত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের সেক্রেটারী মিঃ রিজ্‌লী-স্বাক্ষরিত বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব (রিজলী-লেটার) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশ, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গবাসীর ক্ষোভ প্রশমনের উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গ-সফরে যান। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকেই 'নিউ ইণ্ডিয়া'র স্তম্ভে প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। ১৯০৪-এর ৭ই জানুয়ারি প্রকাশিত 'দি পার্টিশন অব বেঙ্গল' শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধেই বিপিনচন্দ্র বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রবল জনমতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে যেন অনেকটা ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্যে বললেন—'...যদিও এই ধরনের অসন্তোষের আপাততঃ তেমন গুরুত্ব নেই, তা'হলেও এর পুঞ্জীভূত ফল এমন আকার ধারণ করতে পারে যে একদিন সরকারের পক্ষে তা' প্রশমন বা দমন করা অত্যন্ত কঠিন হবে।'[১৮] বিপিনচন্দ্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী একদা বাস্তবে সত্য হয়ে উঠেছিল। প্রবল বিরোধী জনমতের চাপেই ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইংরেজি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করে ছয় বছর পরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে 'নিউ ইণ্ডিয়া'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা এবং 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রকাশের পূর্বে বিপিনচন্দ্রের 'নিউ ইণ্ডিয়া' এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সান্ধ্য দৈনিক 'সন্ধ্যা' (১৯০৪) বাংলাদেশে নব্য জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনে, রাজনৈতিক জাগরণে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী বাঙালীর সামনে নতুন নতুন কর্মপন্থা নির্দেশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রকাশের কয়েক মাস আগে প্রকাশিত (মার্চ ১৯০৬) বাংলা সাপ্তাহিক পত্র 'যুগান্তর'-এর কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তবে 'যুগান্তর' নিউ ইণ্ডিয়া বা সন্ধ্যার মতো নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাসী ছিল না। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের জন্য পূর্ণ স্বরাজলাভ ছিল এর লক্ষ্য। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে 'যুগান্তর' নামটি তাঁর মনোনীত। দেবব্রত বসুর সঙ্গে আলোচনা করে এই নাম নির্ধারিত হয়। তিনি বলেছেন—"এই নামটি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে ধার লওয়া হয়।...শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল। ...কাগজ সম্বন্ধে আমাদের মাথার উপরে ছিলেন—অরবিন্দ ঘোষ, দেউস্কর এবং অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী।"

যা'ই হোক্, উপরি-উক্ত কাল-সীমার মধ্যে বিপিনচন্দ্রের অজস্র স্ব-রচিত প্রবন্ধ 'নিউ ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশিত হয়। সেগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে :

(ক) টেস্ট অব্ প্যাট্রিয়টিজম্ (স্বদেশপ্রেমিকতার পরীক্ষা) ... ১৭ই জুলাই, ১৯০২

(খ) কম্পোজিট প্যাট্রিয়টিজম্—লর্ড কার্জনস্ ভিউ (যৌগিক স্বদেশ-প্রেমিকতা—লর্ড কার্জনের অভিমত) ... ১৯০২

(গ) কম্পোজিট প্যাট্রিয়টিজম্—দি ন্যাশনালিস্ট ভিউ (যৌগিক স্বদেশ-প্রেমিকতা—জাতীয়তাবাদী অভিমত) ... ২৭শে মে, ১৯০৫

(ঘ) দি নিউ প্যাট্রিয়টিজম্ (নতুন স্বদেশ-প্রেমিকতা) ... ৮ই এপ্রিল, ১৯০৫

(ঙ) লয়্যাল প্যাট্রিয়টিজম্ (রাজভক্ত স্বদেশ-প্রেমিকতা) …২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০।
(চ) এজিটেশন অর্ অরগ্যানাইজেশন (আন্দোলন অথবা সংগঠন) … ২৯শে জুলাই, ১৯০।
(ছ) লাভ, লজিক য়্যাণ্ড পলিটিক্স্ (প্রেম, যুক্তি এবং রাজনীতি) … ৬ই অক্টোবর, ১৯০।
(জ) দি শিবাজী ফেস্টিভাল—(শিবাজী উৎসব-২) … ২৬শে জুন, ১৯০২
(ঝ) ন্যাশনাল সঙ্‌স্- (জাতীয় সঙ্গীত-২) … ১৯শে মার্চ, ১৯০৩

বিষয়বস্তু উপস্থাপনার আকর্ষণীয়তায়, ভাষাভঙ্গির প্রাঞ্জলতায় এবং চিন্তার স্বচ্ছতা ও দূরদর্শিতায় প্রবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে উচ্চাঙ্গের রচনা রূপে গণ্য হবার যোগ্য।[১৯]

রবীন্দ্রনাথ এক সময় 'নিউ ইণ্ডিয়া'র একজন নিয়মিত পাঠক ছিলেন। সমস্ত ব্যাপারে নিউ ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত মতামতের সঙ্গে হয়তো তিনি একমত হতে পারেন নি।[২০] তা' হলেও এই পত্রিকার সংবাদিক উৎকর্ষ সম্পর্কে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "—'নিয়ু ইণ্ডিয়া' ইংরেজি কাগজখানি আমরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করি। ইহার রচনায় পাঠক ভুলাইবার বাঁধাবুলি ও সহজ কৌশলগুলি দেখি না। সম্পাদক যে-সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে রস অথচ গাম্ভীর্য আছে, তাহাতে বলের অভাব নাই অথচ পদে পদে সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার লেখা সাময়িক সংবাদের তুচ্ছতাকে অনেকদূর ছাড়াইয়া মাথা তুলিয়া থাকে।"[২১] রবীন্দ্রনাথের এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যে সাময়িক পত্রের সাধারণ দুর্বলতা এবং বিপিনচন্দ্রের সাংবাদিকতায় সেই দুর্বলতার অনুপস্থিতির কথা অকপট ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। বিপিনচন্দ্রের সাংবাদিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিচারই সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ বিচার। রবীন্দ্র-কথিত গুণাবলীর বলেই বিপিনচন্দ্রের সাময়িক বিষয় সংক্রান্ত রচনাও সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে উঠেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিক্ষরাযুগে সুস্পষ্ট মতভেদ ও পথভেদের ফলে কংগ্রেসী রাজনীতি 'নরমপন্থী' (মডারেটিস্ট) এবং 'গরমপন্থী' (এক্সট্রিমিস্ট) নামে দু'টি পৃথক শিবিরে ভাগ হয়ে গেল।[২২] নতুন উপদল 'গরমপন্থী'দের আদর্শ ও নীতি সর্বভারতীয় স্তরে প্রচারের জন্য একখানি ইংরেজী দৈনিকের প্রয়োজন অনুভূত

হলো। সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী', মতিলালের 'অমৃতবাজার পত্রিকা', কালীপ্রসন্নর 'হিতবাদী' প্রভৃতি নরমপন্থীদের শক্তিশালী মুখপত্ররূপে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু গরমপন্থীদের তেমন কোনো মুখপত্র ছিল না। 'নিউ ইণ্ডিয়া'-র পক্ষেও সেই প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব ছিল না। গরমপন্থী দলের সর্বাধিনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল (বাংলাদেশের রাজনীতিতে তখনও অরবিন্দ ঘোষের আত্মপ্রকাশ ঘটেনি) নিজেই এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন।

"এই সময় বিপিনচন্দ্র কাহাকেও একপ্রকার না জানাইয়া পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। কালীঘাটের শ্রীহরিদাস হালদার ও শ্রীহট্টের শ্রীক্ষেত্রমোহন সিংহ দুইজনে ৪৫০ টাকা দিলেন। পত্রিকা ছাপাইবার ভার নিলেন তদানীন্তন 'প্রদীপ' পত্রিকার ও ক্লাসিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্তী। প্রেসের অফিস ছিল তদানীন্তন কর্পোরেশন স্ট্রীটের উপর ; ওয়েলেস্‌লী স্ট্রীট ও লোয়ার সার্কুলার রোডের মধ্যস্থলে বাড়িটি অবস্থিত ছিল। বিহারীলালের সঙ্গে ব্যবস্থা হইল যে তিনি দৈনিক বিক্রয়ের আয় হইতে ছাপার ব্যয় আদায় করিবেন।"[২৩] এইভাবেই গরমপন্থীদের বিখ্যাত মুখপত্র 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার জন্ম হলো। শ্রীঅরবিন্দ জানিয়েছেন, "হরিদাস হালদার প্রদত্ত ৫০০ টাকা পকেটে নিয়ে বিপিন পাল 'বন্দে মাতরম্' প্রকাশ শুরু করেন। তিনি সহকারী সম্পাদকরূপে (য়্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটর) আমার সাহায্য দাবি করেন এবং আমি তা' দিতে সম্মত হই"।[২৪] স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম জন্মবার্ষিকী দিনে (৭ই আগস্ট, ১৯০৬) 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার প্রকাশের দিন নির্ধারিত হয়। কিন্তু সুরমা উপত্যকা সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে যোগদানের জন্য বিপিনচন্দ্রের পক্ষে ৭ই আগস্ট কলকাতায় থাকা সম্ভব না হওয়ায় একদিন পূর্বে অর্থাৎ ৬ই আগস্ট 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার মূলমন্ত্র ছিল—'ইণ্ডিয়া ফর ইণ্ডিয়ানস্'। রবীন্দ্র-জীবনীকারের ভাষায়—"'ইণ্ডিয়া ফর ইণ্ডিয়ানস্' হইতেছে মহাত্মাজীর 'কুইট ইণ্ডিয়া' মন্ত্রের অগ্রবাণী।" স্ব-সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকার প্রথম সংখ্যার একখণ্ড সঙ্গে নিয়ে ৬ই আগস্ট প্রাতেই তিনি শ্রীহট্ট অভিমুখে রওনা হন।[২৫]

বিপিনচন্দ্র পাল এবং অরবিন্দ ঘোষ ব্যতীত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বিজয় চ্যাটার্জি প্রমুখ শক্তিমান্ লেখকবৃন্দ 'বন্দে মাতরম্-এর লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

'বন্দে মাতরম্' ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের আগস্ট থেকে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় দু'বছর দু'মাস তিন সপ্তাহকাল জীবিত ছিল। এই সময়-সীমাকে শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম স্তর— ১৯০৬-এর ৬ই আগস্ট থেকে ১৮ই অক্টোবর। এই স্তরে বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন প্রধান সম্পাদক। দ্বিতীয় স্তরের বিস্তৃতি ১৯০৬-এর অক্টোবরের মধ্যভাগ থেকে ১৯০৮-এর ৩০শে এপ্রিল। এই স্তরে অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন প্রধান সম্পাদক। তৃতীয় স্তর—১৯০৮-এর মে মাস থেকে ১৯০৮-এর ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত।[২৬] ১৯০৮-এর ২রা মে অরবিন্দ ঘোষ মুরারিপুকুর বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হন। এই সময় বিপিনচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পাদকীয় গোষ্ঠীতে যোগদানের জন্য আহূত হন। সুতরাং 'বন্দে মাতরম্'-এর তৃতীয় স্তরেও বিপিনচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৬-এর ডিসেম্বরের শেষভাগে একদিনের জন্য অরবিন্দের নাম প্রধান সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁর আপত্তির জন্য আর কখনও তাঁর নাম প্রধান বা অ-প্রধান সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হয়নি।[২৭] শ্রীঅরবিন্দও জানিয়েছেন—'আমি তখন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় সারপেণ্টাইন লেনে শ্বশুরালয়ে ছিলাম, কী ঘটেছিল তার সংবাদ রাখতাম না। ওঁরা আমার বিনা অনুমতিতে সম্পাদকরূপে আমার নাম প্রকাশ করেন। আমি অনেকটা রূঢ় ভাষাতেই এ বিষয়ে সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলে আমার নাম-প্রকাশ বন্ধ করি।'[২৮]

বিপিনচন্দ্র এবং অরবিন্দ—যিনিই যখন সম্পাদক থাকুন না কেন, 'বন্দে মাতরম্' যে চিন্তার ঐশ্বর্যে ও প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতায় উচ্চাঙ্গের পত্রিকারূপে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে চলতে পেরেছিল, তাতে বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ উভয়ের অবদানই প্রায় সমানভাবে স্মরণীয়। বিপিনচন্দ্রই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স নীতির আদি প্রবক্তা, অরবিন্দই এ কথা স্বীকার করেছেন।[২৯] আবার বিপিনচন্দ্র-প্রচারিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতিকে ১৯০৭-এর ৯ই এপ্রিল থেকে ২৩শে এপ্রিল তারিখের মধ্যে 'বন্দে মাতরমে' লিখিত প্রবন্ধমালায় অরবিন্দ দার্শনিক তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা পরিচালনায় অরবিন্দের অবদানের কথা উল্লেখ করে বিপিনচন্দ্র অকুণ্ঠ ভাষায় বলেছেন—'শুরু থেকেই এই অধিনায়কের হাত এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এর নির্ভীক মনোভাব, বলিষ্ঠ চিন্তাধারা, স্পষ্ট ধারণা-সমূহ, এবং শুদ্ধ ও শক্তিশালী রচনাশৈলী, দাহকর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং মার্জিত

রসিকতাকে দেশের ভারতীয় বা ইঙ্গ-ভারতীয় কোনো পত্রিকার পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না।—এই পত্রিকা দেশের মধ্যে একটা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। একে যিনি যতই ভয় করুন বা ঘৃণা করুন, একে উপেক্ষা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবং অরবিন্দ ছিলেন এই নতুন পত্রিকার কেন্দ্রীয় পুরুষ, এর অগ্রনায়ক আত্মা।'[৩০]

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বিপিনচন্দ্র নব্য জাতীয়তাবাদ এবং সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জাতির অনুসরণীয় কর্ম-পন্থা প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা ও আসাম প্রদেশের নানা স্থান পরিভ্রমণ করে বক্তৃতা দান করেন। তাঁর অনুপস্থিতিকালে অরবিন্দই অন্যান্য সহযোগীদের সাহচর্যে 'বন্দে মাতরম্' পরিচালনা করেন। তা' হলেও এই বছরের আগস্ট থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিপিনচন্দ্রই ছিলেন 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রধান সম্পাদক। তাই এই সময়ের মধ্যে তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ 'বন্দে মাতরম্'-এ প্রকাশিত হয়। সেগুলির মধ্যে 'দি শেল য়্যাণ্ড দি সিড্' (খোলা ও বীজ—১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৬) এবং 'দি সিডিশন বগি' (রাজদ্রোহের জুজু—৯ই অক্টোবর, ১৯০৬) বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। জাতীয় কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী বিপিনচন্দ্র দেখলেন যে কংগ্রেসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরই অতিরিক্ত প্রাধান্য। কংগ্রেসকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে কংগ্রেসে সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ একান্তভাবে প্রয়োজন। বিশ্বস্ত সেবকের মতো অনেকটা আত্মজিজ্ঞাসার সুরে তাই তিনি 'দি শেল য়্যাণ্ড দি সিড্' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন—'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ কি মূলতঃ গণতান্ত্রিক আদর্শ অথবা এই প্রতিষ্ঠান শুধু বর্তমান বিদেশী শ্বেত আমলাতন্ত্রের পরিবর্তে দেশী উপাদানে গঠিত পিঙ্গলবর্ণ আমলাতন্ত্রের পত্তনের জন্য কাজ করে যেতে চায় —আগামী অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত এবং বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য মিস্টার মর্লির কাছে নতুন আবেদন-পত্র দাখিল সংক্রান্ত বর্তমান আন্দোলন দেশের সামনে এই প্রশ্নই উত্থাপন করেছে।'[৩১] ঐ প্রবন্ধে তিনি আরও বললেন যে কংগ্রেসকে যদি গতিশীল প্রতিষ্ঠানের মতো, সক্রিয় সভার মতো কাজ করতে হয়, তা' হলে কায়েমী স্বার্থের 'চক্রগুলি' অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হবে। কারণ গণতান্ত্রিক চেতনার বিবর্তনের প্রথম স্তরে এই চক্রগুলি আবরণীর মতো গণতন্ত্রের বীজের সংরক্ষণে সহায়তা করেছে, কিন্তু একটা সময় আসে

যখন এই বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য চক্রসমূহ খণ্ডখণ্ডভাবে চূর্ণ করা প্রয়োজন হয়।"৩২

ঊনবিংশ শতাব্দীর কংগ্রেসীরা বিশ্বাস করতেন যে বৃটিশের স্বাভাবিক ঔদার্য এবং ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমেই একদা দেশের মুক্তি ঘটবে। 'দি সিডিশন বগি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এই বিশ্বাসের অসারতাকে স্পষ্ট করে তোলেন এবং শেষে মন্তব্য করেন যে এই '...পুরানো ধারণা এবং পুরানো মনোভাব নাশের জন্য দেশের লোক দায়ী নয়, প্রকৃতপক্ষে সরকারই বিশেষভাবে দায়ী; এবং শাসকবর্গ নিজেরাই এই রাজদ্রোহের প্রকৃত স্রষ্টা।'৩৩

দৈনিক পত্রিকার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সম্পাদকের ব্যক্তিগত উপস্থিতি বিশেষভাবে প্রয়োজন অথচ বিপিনচন্দ্র তখন প্রচার-কার্যে এত ব্যস্ত যে নিয়মিত-ভাবে তাঁর পক্ষে কলকাতায় থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সম্পাদক হলেও 'বন্দে মাতরম্'-এর কাজে সম্পূর্ণভাবে মনোনিয়োগ করতে পারছিলেন না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিপিনচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে অরবিন্দই ছিলেন এই পত্রিকার মধ্যমণি। তা' সত্ত্বেও অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যুগ্ম-সম্পাদকরূপে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁর নাম সরকারীভাবে 'বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এর আগে থেকে 'বন্দে মাতরম্' পরিচালনার ব্যাপারে সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর মতভেদ দেখা দিতে থাকে। 'বন্দে মাতরম্' অল্পদিনের মধ্যেই উচ্চাঙ্গের পত্রিকারূপে পরিগণিত হলেও তার আর্থিক অবস্থা আদৌ ভালো ছিল না। ১৮ই অক্টোবর গরমপন্থীদের এক সভায় এই উদ্দেশ্যে একটি জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং স্থির হয় ১লা নভেম্বর ২/১, ক্রীক রো থেকে পরিবর্ধিত আকারে পত্রিকা প্রকাশিত হবে। প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখযোগ্য যে প্রথম দু'মাস 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা 'সন্ধ্যা'র কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হতো। ৮ই অক্টোবর বন্দে মাতরম্'-এর কার্যালয় ২০০নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

পূর্বোক্ত সভায় এ-ও স্থির হয় যে পত্রিকার উপরে আর সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হবে না এবং পত্রিকায় পাঠ্য-বিষয় ও বিজ্ঞাপন পাশাপাশি মুদ্রিত হবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্র প্রবল আপত্তি উত্থাপন করলেন। কারণ, তাঁর মতে এতে পত্রিকার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। এছাড়া

'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর কোনো কোনো সভ্যের বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ছিল ; বিপিনচন্দ্রের সেটা অভিপ্রেত ছিল না।[৩৪] এই সমস্ত কারণে বিপিনচন্দ্র অক্টোবরের শেষভাগ থেকে বন্দে মাতরম্-এর কার্যালয়ে আসা বন্ধ করেন। প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মতভেদ সত্ত্বেও ১লা নভেম্বর ২/১, ক্রীক রো থেকে বন্দে মাতরম্ নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ করে এবং সম্পাদকরূপে কারও নামই আর পত্রিকার উপর মুদ্রিত হয়নি। যাই হোক্, মতানৈক্যের মিটমাট না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

'বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের সম্পর্কচ্ছেদের কারণ সম্পর্কে মতভেদ বিদ্যমান। হেমেন্দ্রপ্রসাদ অবশ্য বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের সমর্থন বা রাজনৈতিক কারণে গুপ্তহত্যার প্রশ্রয়দানজনিত মতভেদকে বিপিনচন্দ্রের বন্দে মাতরম্-এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কারণ বলে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি তাঁর 'কংগ্রেস' নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি ডিমক্রাট' পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদের কারণ সম্পর্কে লেখেন: "আমি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'বন্দে মাতরম্' পত্রের প্রধান সম্পাদক ছিলাম। 'পাইওনীয়ার' তখন 'সোনার বাংলা' নামক একখানি গোপনে প্রচারিত পুস্তিকার সন্ধান পায়েন। পুস্তিকায় কি ছিল, সে কথা আজ আর আমার মনে নাই—তবে মনে আছে, তাহাতে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে কোনরূপ গুপ্তহত্যা সমর্থিত হইয়াছিল। আমি এই গুপ্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ নিন্দা করি এবং বলি, ইহা কাপুরুষোচিত—ইহাতে জাতীয় দলের অনুষ্ঠানের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইতে পারে। আমাদের 'বন্দে মাতরম্'-এর লোকদের মধ্যে ইহাতে অসন্তোষের উদ্ভব হয়। পরিচালকদিগের মধ্যে আমাকে সরাইবার জন্য ষড়যন্ত্র হয়। একজন লোক আমাকে বলেন, আমাদের দলের কেহ কেহ যখন এইরূপ মতের সমর্থন করেন, তখন গুপ্ত অনুষ্ঠান সম্বন্ধে 'বন্দে মাতরম্'-এ ঐরূপ মত প্রকাশ করা আমার কর্তব্য হয় নাই। উত্তরে আমি বলি, যতদিন সম্পাদকের দায়িত্ব আমার থাকিবে, ততদিন আমি যাহা ভাল ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিব, তাহা ব্যতীত আর কোন কাজের জন্য আমি কাহাকেও 'বন্দে মাতরম্' ব্যবহার করিতে দিব না। আমি আমার মতেই অবিচলিত ছিলাম ; কিন্তু আজ একথা বলিলে দোষ হইবে

না যে, 'বন্দে মাতরম্'-এর সহিত আমার সম্বন্ধচ্ছেদের তাহাই কারণ। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'বন্দে মাতরম্'-এর সহিত আমার সম্বন্ধ বিচ্ছেদের এই গুপ্ত ইতিহাস কলিকাতায় আমার কতিপয় বন্ধু জানিতেন।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বিপিনচন্দ্রের এই উক্তি উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে বিপিনচন্দ্র যে গুপ্ত অনুষ্ঠানের অর্থাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নরহত্যার নিন্দা করেছেন তা' 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় কোনোদিন সমর্থিত হয়নি। তিনি বলেছেন—"বন্দে-মাতরম্-এর প্রচার অত্যন্ত অধিক ছিল কিন্তু টাকার অভাব কোনদিন ঘুচে নাই……এই সময় বিজ্ঞাপন-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক আমেরিকানকে পত্রের বিজ্ঞাপন সাজাইবার ভার দেওয়া হয় এবং তিনি প্রবন্ধাদির সঙ্গে একই পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা করেন। ৩১শে অক্টোবর বিপিনবাবু কৃষ্ণকুমার গুপ্ত, রজতনাথ রায় ও বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া অফিসে আসিয়া বলেন, এই ব্যবস্থায় পত্রের সম্ভ্রমহানি হইবে। কিন্তু ইহাতে অধিক অর্থাগম হইবে বলিয়া অন্য সকল পরিচালক এই ব্যবস্থাই বহাল রাখিতে চাহেন। বিপিনবাবু ইহাতে বিরক্ত হইয়া 'বন্দে মাতরম্'-এর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন।"[৩৫]

কারণ যা'ই হোক্, স্ব-প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ নিঃসন্দেহে একটি মর্মন্তুদ ঘটনা। কিন্তু সাময়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিবেকের সঙ্গে অন্যায় আপস করা যাঁর স্বভাব-বিরোধী, তাঁর পক্ষে বিবেকের মর্যাদা রক্ষার জন্য যে কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। 'বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘটনাকে তাই তিনি নির্বাক বেদনায় মনে মনে মেনে নিলেন।

অরবিন্দ ঘোষের অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতির সময়ে তাঁর অগোচরে বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। নইলে 'শ্রীঅরবিন্দ এই সম্পর্কচ্ছেদে সম্মতি দিতেন না; তিনি পালের গুণাবলীকে বন্দে মাতরম্-এর পক্ষে সম্পদ বলে মনে করতেন—কারণ, পাল ছিলেন…সম্ভবতঃ দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তি——'।[৩৬]

১৯০৮-এর ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরে মিসেস্ এবং মিস্ কেনেডি বোমার আঘাতে নিহত হন। পরদিন এই সংবাদ প্রকাশিত হলে কলকাতায় ব্যাপক ধরপাকড় এবং বেপরোয়া পুলিসী অত্যাচার শুরু হয়। মানিকতলা বাগানের বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে অরবিন্দের যোগাযোগ আছে সন্দেহ করে পুলিস তাঁকে ২রা মে গ্রেপ্তার করে। সেই রাত্রেই হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী

বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে 'বন্দে মাতরম্'-এ যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। বিপিনচন্দ্র জাতীয় কর্তব্য মনে করে সানন্দে এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্ব-প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করেন। সেই দিন থেকে বিলাতযাত্রার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আবার 'বন্দে মাতর'ম্-এর মধ্যমণিরূপে এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

বৈপ্লবিক গুপ্তহত্যার প্রতি বিপিনচন্দ্রের কোনোদিনই সমর্থন ছিল না। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকাতেও এই ধরনের কাজ সমর্থিত হয়নি। 'বন্দে মাতরম্'-এ যোগদানের পরেই বিপিনচন্দ্র নিজস্ব অভিমত এবং পত্রিকার ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে লিখলেন: "মজঃফরপুরের বোমা আক্রমণের ঘটনাকে 'বন্দে মাতরম্'-এর দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি-উদ্ভূত অন্যায়ের অন্যতম সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক দৃষ্টান্ত বলে মনে করে। এই পত্রিকা প্রকৃতপক্ষে ঝুঁকি নিয়েও নিঃসঙ্কোচে আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে জানিয়ে দিয়েছে যে অসন্তোষের শক্তিকে গুপ্তপথে পরিচালিত করাই হবে তাঁদের দমনমূলক নীতির অপরিহার্য পরিণাম।"[৩৭]

'বন্দে মাতরম্'-এর শেষ পর্যায়ে বিপিনচন্দ্রের যে সমস্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেগুলির মধ্যে ১৯০৮-এর জুন মাসে প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। প্রবন্ধ তিনটির নাম যথাক্রমে—(১) দি ডিউটি অব্ দি ইণ্ডিয়ান পাবলিসিস্ট (ভারতীয় প্রচারকের কর্তব্য); (২) দি বেড-রক অব্ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম্—১ (ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি-প্রস্তর—১); (৩) দি বেড-রক অব্ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম্—২ (ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিপ্রস্তর—২)। সমকালীন সমস্যার সময়োচিত পর্যালোচনা সাংবাদিকতার অন্যতম ধর্ম। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটির মধ্যে সাময়িকতার স্পর্শ আছে। কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রবন্ধে সমসাময়িক নতুন আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় আদর্শবাদের অপূর্ব ব্যাখ্যান ও অভিব্যক্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিপিনচন্দ্রের এই ধরনের অনেক সাংবাদিকসুলভ রচনা স্থায়িত্বগুণে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

'নিউ ইণ্ডিয়া' এবং 'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পাদনাকালেই বিপিনচন্দ্রের সাংবাদিক সত্তা চরম স্ফূর্তি লাভ করেছিল। যে সত্যনিষ্ঠা, ধর্মবোধ, সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং আপসবিহীন সংগ্রামী মনোভাবের উপাদানে বিপিনচন্দ্রের

ব্যক্তিত্ব গঠিত,—সে ব্যক্তিত্ব তাঁর সাংবাদিক জীবনেও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। পরবর্তীকালেও তিনি অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছেন এবং সম্পাদনা করেছেন ; সর্বত্রই একই ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল রয়ে গেছে। সাংবাদিক বিপিনচন্দ্র যেন এক ও অভিন্ন।

১৯০৮-এর আগস্ট মাসে বিপিনচন্দ্র দ্বিতীয়বারের জন্য বিলাতযাত্রা করেন। ১৯০৯-এর মার্চ মাসেই তিনি 'স্বরাজ' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র লণ্ডন থেকে প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার বিঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল—'বিশ্বজনীন মানবতার বিবর্তনে প্রয়োজনীয় উপাদানরূপে জাতীয়তাবাদের সাধারণ দার্শনিক তত্ত্বের' উপস্থাপনা।[৩৮] কিন্তু বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারা তখন বিবর্তনের অভিমুখে। তাই 'স্বরাজ'-এর সুর ছিল অনেকটা নরমপন্থী। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়া' এবং বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট', এই দু'খানি পত্রিকার মধ্যে অবস্থিত হয়ে 'স্বরাজ' চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে, কিছুকাল পরেই 'স্বরাজ'-এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।[৩৯]

১৯১১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিপিনচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান স্টুডেণ্ট' নামে আর একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি ঘোষণা করেন: 'এই পত্রিকা ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত আলোচনা সযত্নে পরিহার করে চলবে। কারণ, এ বিষয়ে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও মতভেদ বিদ্যমান। ছাত্রের কর্তব্য হচ্ছে, ভাবাবেগ এবং পক্ষপাতের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে যুক্তির আলোকে প্রত্যেক সমস্যা সম্পর্কে অধ্যয়ন, অনুসন্ধান এবং সম্যক জ্ঞান অর্জন।[৪০] কিন্তু এই পত্রিকাও বেশীদিন অস্তিত্ব রক্ষা করে উঠতে পারেনি। প্রধানতঃ আর্থিক সঙ্গতির অভাবেই এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিপিনচন্দ্র লণ্ডন থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে আসবার দেড় বছর কালের মধ্যেই তিনি 'হিন্দু রিভিউ' নামে একখানি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা স্ব-সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। ১৯১২-র শেষভাগে তিনি কালীঘাট রোডের বাসাবাড়ি ছেড়ে ৫৫/সি, শাঁখারিপাড়া রোডে নতুন বাসায় উঠে আসেন। এই বাড়ি থেকেই ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর

'হিন্দু রিভিউ' পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।[৪১] 'হিন্দু রিভিউ' দেড় বছর কাল জীবিত ছিল।

সংক্ষেপে 'হিন্দু রিভিউ'-এর সম্পাদক-বিঘোষিত লক্ষ্য ছিল: "আদর্শগত ভাবে—১. হিন্দু জাতীয়তাবাদ, ২. সংযুক্ত আন্তর্জাতিকতাবাদ, ৩. বিশ্বজনীন যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের পক্ষসমর্থন; আর বাস্তবগতভাবে—১. হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যমূলক প্রকৃতি ও প্রতিভার সংরক্ষণ, ২. বর্তমান ভারতবর্ষের যৌগিক জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত অন্যান্য বিশ্ব-সংস্কৃতির আন্তরিক ও সশ্রদ্ধ অধ্যয়নের উন্নতিবিধান এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ফলপ্রসূ সহযোগিতার মনোভাবের অনুশীলন, ৩. বৃটিশ সাম্রাজ্য নামক বর্তমান সঙ্ঘের জন্য ক্রমশঃ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান নির্মাণের মাধ্যমে বৃটিশ জাতির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা। তবে সেই সঙ্ঘ হবে রাষ্ট্র-সমবায়ের মতো, যার মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ড এবং অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশের সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং মিশর গ্রেট বৃটেনের সমান অংশীদার হবে; ৪. বিশ্বজনীন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অগ্রগতি বিধান। এককথায়, 'হিন্দু রিভিউয়ের আদর্শ হচ্ছে—'ঈশ্বর, মানবতা এবং মাতৃভূমি'।[৪২] বিপিনচন্দ্রের 'নিউ ইণ্ডিয়া'র মূল লক্ষ্যও ছিল অনুরূপ, অর্থাৎ 'ঈশ্বর, মানবতা এবং পিতৃভূমি'। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'নিউ ইণ্ডিয়া'র সঙ্গে 'হিন্দু রিভিউ-এর আদর্শগত পার্থক্যও লক্ষণীয়। 'নিউ ইণ্ডিয়া'র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—নবীন ভারতে যৌগিক জাতীয়তা-বাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। আর 'হিন্দু রিভিউ-এর মুখ্য আদর্শ হলো,—হিন্দু জাতীয়তাবাদকে অঙ্গীকার করে আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বজনীন মানবতার মহাসম্মেলনের বাণী প্রচার। এই সময় বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, হিন্দু রিভিউ-এর সম্পাদকীয় আদর্শের মধ্যে সেই পরিবর্তমান চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। বিপিনচন্দ্রের পরবর্তী সাংবাদিক জীবন এই ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বিস্তীর্ণ আন্তর্জাতিকতাবাদের কষ্টিপাথরেই তিনি দেশের সমস্ত সমস্যা, সংগ্রাম ও সমাধানের পথ বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এখানেও সমন্বয়ের সাধক বিপিন-চন্দ্রের সমন্বয়ী ভাবনার পরিচয় স্পষ্ট।

'হিন্দু রিভিউ'-এর সীমিত আয়ুষ্কালের মধ্যে বিপিনচন্দ্রের অনেকগুলি প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেগুলির মধ্যে পরবর্তী প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে:

(১) হিন্দু ন্যাশনালিজম্ : হোয়াট্ ইট্ স্ট্যাণ্ডস্ ফর (হিন্দু জাতীয়তাবাদ : এর লক্ষ্য)।

(২) দি পজিটিভ ভ্যালু অব্ ন্যাশনালিজম্ (জাতীয়তাবাদের যথার্থ মূল্য)।

(৩) ন্যাশনাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অর ইম্পিরিয়াল ফেডারেশন (জাতীয় স্বাধীনতা অথবা রাজকীয় রাষ্ট্র-সমবায়)।

(৪) ক্রাইম্ য়্যাণ্ড কর্ম (অপরাধ এবং কর্ম)।

(৫) প্যান ইসলামিজম্ য়্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম্ (সর্ব-ইসলামবাদ এবং ভারতীয় জাতীয়তা)।

(৬) মাইথলজিক্যাল হিন্দুইজম্ : সরস্বতী (পৌরাণিক হিন্দুধর্ম : সরস্বতী)।

(৭) স্বামী বিবেকানন্দ : দি ম্যান (স্বামী বিবেকানন্দ : ব্যক্তি)।

(৮) রবীন্দ্রনাথ টেগোর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

পত্রিকার প্রয়োজন-পূরণের জন্য রচিত হলেও এই প্রবন্ধগুলি চিন্তার-স্বচ্ছতায়, ভাবনার ঐশ্বর্যে এবং প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতা ও অকপটতায় সাংবাদিকতার ঊর্ধ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।[৪৩]

'হিন্দু ন্যাশনালিজম্' প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র দেখান যে ভারতবাসীর কাম্য 'স্বাধীনতা' আর য়ুরোপীয় 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' এক জিনিস নয়। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স নঙর্থক ; ওর বাংলা প্রতিশব্দ হওয়া উচিত 'অনধীনতা'। কিন্তু 'স্বাধীনতা'র অর্থ শুধু পর-শাসন, পর-নিয়ন্ত্রণ বা পর-নির্ভরতা থেকে মুক্তি নয় ; স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে—আত্ম-সংযম, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আত্ম-নির্ভরতা। হিন্দু জাতীয়তাবাদ এই স্বাধীনতার পূজারী।

'দি পজিটিভ ভ্যালু অব্ ন্যাশনালিজম্' প্রবন্ধে তিনি বলেন যে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ মহত্তর হলেও জাতীয়তাবাদেরও একটি বিশিষ্ট ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। জাতীয় আদর্শ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আনুগত্যবোধের মাধ্যমেই মানুষ স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। তারপর সে পরবর্তী ঊর্ধ্বস্তরে উন্নীত হবার অধিকার অর্জন করে বিশ্বের জাতিপুঞ্জের অন্যতমরূপে বিশ্বমানবের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়।

'ক্রাইম য়্যাণ্ড কর্ম' প্রবন্ধে তিনি অপরাধমূলক ক্রিয়া-কলাপের বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক উৎস সম্পর্কে জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা করে অপরাধনিবারণে প্রতিহিংসা-

মূলক শাস্তিব্যবস্থা অপেক্ষা সহানুভূতিমূলক সংশোধনী ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

'প্যান-ইসলামিজম্ য়্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম্' প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র ঐতিহাসিক পটভূমিকায় প্যান-ইসলামবাদের মনস্তাত্ত্বিক উৎস বিশ্লেষণ করে একদিকে যেমন ঐশ্লামিক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের গুণগান করেছেন, অন্যদিকে তেমনি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে প্যান-ইসলামবাদী প্রচার যে ভয়াবহ হতে পারে, সে সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্‌ব্যক্তার মতো সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন। কারণ, তাঁর মতে প্যান-ঐশ্লামিক আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক উৎস ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক।

এর পর বিপিনচন্দ্র নিজে আর কোনো পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেননি। জীবিকার তাগিদে তিনি অপর কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা পরিচালিত সাপ্তাহিক, দৈনিক বা মাসিক পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকের কাজ করেছেন। কিন্তু যখনই জীবনের সঙ্গে জীবিকার সঙ্ঘর্ষ ঘটেছে, তখনই জীবিকার বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে। তিনি ভবিষ্যতের ভয়-ভাবনা উপেক্ষা করে সেই পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র এলাহাবাদে 'দি ডিমক্র্যাট' নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক এবং 'দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' নামে একখানি ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদনা করেন। তখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী এবং খিলাফত সমস্যায় সমগ্র ভারতবাসীর মন আন্দোলিত। বিপিনচন্দ্র মতিলাল নেহেরু পরিচালিত 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকায় 'নন্-কোঅপারেশন আওয়ার লাস্ট চান্স্' শিরোনামায় ধারাবাহিকভাবে দশটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুচ্ছে তিনি মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত 'অসহযোগ আন্দোলন'-এর প্রাথমিক মূলনীতি সমর্থন করেন। কিন্তু পরে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর রূপায়ণ-নীতি নিয়ে মতিলালের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন।

'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পূর্বে বিপিনচন্দ্র কলকাতা থেকে মতিলাল নেহেরুর কাছে যে পত্র লেখেন (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২০) সে পত্রখানি একদিকে যেমন তাঁর নির্লোভ সাংবাদিকতা এবং নির্ভীক স্বদেশপ্রাণতার পরিচয়বাহী, তেমন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দূরদর্শী বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক দলিলরূপে গণ্য হবার যোগ্য।

সন্ত-সমাপ্ত কংগ্রেসের বিশেষ কলকাতা অধিবেশনে (৪ঠা—৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২০) গৃহীত অসহযোগ আন্দোলন বিষয়ক প্রস্তাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিপিনচন্দ্র ঐ পত্রে নেহেরুজীকে জানান যে একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই মতভেদ রয়েছে, সে হচ্ছে 'কাউন্সিল বয়কট'। কিন্তু তার সমর্থন বা বিরোধিতা কোনোটাই না করে তিনি পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন। অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সমর্থন আছে। আসল প্রশ্ন সেখানে নয়। আসল প্রশ্ন হচ্ছে—খিলাফত কমিটির দ্বারা জাতীয়তাবাদী নীতি নির্ধারণের প্রশ্ন এবং সেখানেই তাঁর প্রবল আপত্তি। কারণ, দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি প্যান-ঐশ্লামিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে আসছেন এবং অল্পকাল পূর্বে তিনি নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে খিলাফত প্যান-ঐশ্লামিক প্রচারের একটা আবরণমাত্র। তাই তাঁর বিশ্বাস, খিলাফত আন্দোলনের মধ্যে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা নিহিত। তিনি সবিনয়ে একথাও উল্লেখ করলেন যে জনাব সৌকত আলী গান্ধীজীকে নিজেদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছেন। হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য সব সময়েই কাম্য। কিন্তু বিগত কংগ্রেসের বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে (সাব্‌জেক্টস্ কমিটি) গান্ধীজীর উক্তির মধ্যে যে স্বরাজলাভের চেয়ে, পাঞ্জাবের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার চেয়েও খিলাফত অগ্রাধিকার লাভ করেছে—এজন্য তিনি দুঃখিত। এই অবস্থায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হতে তিনি শঙ্কা বোধ করছেন। সমগ্র পরিস্থিতিকে বিপিনচন্দ্র যেভাবে অনুভব করেছিলেন তা' অকপটে ব্যক্ত করে তিনি এই অবস্থায় 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্টের' নীতি কী হবে তা নেহেরুজীর কাছে জানতে চাইলেন। যদি মতের মিল না হয় এবং তিনি 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' পত্রিকার সম্পাদনার ভার ত্যাগ করতে বাধ্য হন তা' হলে, তিনি দুঃখের সঙ্গেই জানালেন যে ক্ষতি তাঁরই হবে বেশী। কারণ, 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার পর দীর্ঘদিন পরে তিনি আবার স্বকীয় চিন্তাধারা প্রকাশের একটি ব্যাপক মাধ্যম লাভ করেছিলেন। তবে সম্পাদকীয় দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্টের' জন্য তিনি স্বাধীন লেখা দিতে যে কুণ্ঠিত হবেন না—এ কথাও জানিয়ে পত্র শেষ করেন।[৪৪]

এর পর বিপিনচন্দ্র ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক 'লিবার্টি'র সম্পাদকরূপে কাজ করেন। ১৯২১-এর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির (বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স্) বরিশাল অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী সমর্থনের ব্যাপার নিয়ে অসহযোগ-

সমর্থকদের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় বিপিনচন্দ্র তাঁর সহযোগীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হন। বরিশাল থেকে কলকাতায় ফিরে আসবার পর 'লিবার্টি'র সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।[৪৫]

'লিবার্টি'র পর সাংবাদিকরূপে বিপিনচন্দ্রের শেষ উল্লেখযোগ্য অবদান—বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক 'বেঙ্গলী'র সম্পাদনা। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন 'বেঙ্গলী'র তৎকালীন সম্পাদক পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে বিপিনচন্দ্র 'সম্পাদক-প্রধান' (এডিটর-ইন্-চিফ)-রূপে 'বেঙ্গলী'র ভার গ্রহণ করেন এবং ১৯২৫-এর ১৩ই মে পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৪ই মে থেকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মহাশয় পুনর্বার 'বেঙ্গলী'র সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন।

'বেঙ্গলী'র সম্পাদক-প্রধান পদে যোগদানের পর ১৯২৪-এর ১৭ই জুনের প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি বিপিনচন্দ্রের স্বনামাঙ্কিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। 'টু মাই রিডার্স' (আমার পাঠকবর্গের প্রতি) শীর্ষক সেই প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র ভারতবাসীর সাধ্য 'স্বরাজ'-এর প্রকৃতি, সেই স্বরাজলাভের উপায় সম্পর্কে 'বেঙ্গলী'-পত্রিকার চিরাচরিত নীতি, জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতার মধ্যে নির্বিরোধ সম্পর্ক, প্রতিরোধের পরিবর্তে পুনর্মিলনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয়ে স্বকীয় অভিমত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন।

১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯২৫) 'সোনার বাংলা' মাসিকপত্রের (নব পর্যায়ে) প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ডক্টর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রও সম্পাদকরূপে 'সোনার বাংলা'র সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম সংখ্যায় 'সোনার বাংলা' শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র লেখেন—"সোনার বাংলা' এখনও আমাদের স্বপ্নের বস্তু হইয়া আছে। এই স্বপ্নকে সত্য করিতে গেলে একান্তভাবে দৈবের উপর সকল ছাড়িয়া না দিয়া পুরুষকারকেও আশ্রয় করিতে হইবে। এই পথে দেশকে লওয়াইবার জন্যই এই 'সোনার বাংলা' (নব পর্যায়)-এর প্রচার।…এইজন্যই অবসর থাক বা না থাক, শরীরে দিক বা না দিক, গোপালবাবুর সঙ্গে 'সোনার বাংলা' (নব পর্যায়) সম্পাদকের জোয়াল মাথা নোয়াইয়া ঘাড়ে লইতে বাধ্য হইয়াছি। তাঁহার সঙ্গে স্বল্পবিস্তর যাই করিবার অবসর এবং শক্তি পাই, তাহার ফলাফল দেবতার চরণে অর্পিত হউক।"

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের রচনা সংখ্যায় নগণ্য। বিপিনচন্দ্রের সাংবাদিক জীবনের ইতিবৃত্তে সোনার বাংলার তাই কোনো বিশিষ্ট ভূমিকা নেই।

জীবন-সায়াহ্নে ভবতোষ রায়-সম্পাদিত সাপ্তাহিক-পত্র 'হিন্দু'র ইংরেজী ক্রোড়পত্রের পরিচালনা-ভার গ্রহণ বিপিনচন্দ্রের সাংবাদিক-জীবনের শেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন ; এই বছরের মে মাসে জীবনান্ত পর্যন্ত সেই যোগ অক্ষুণ্ণ থাকে। এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সংখ্যায় 'পার্সোনাল' (ব্যক্তিগত) শিরোনামায় তিনি তাঁর মত ও পথের কথা ঘোষণা করে বলেন : "হিন্দু'র ইংরেজী স্তম্ভের মাধ্যমে আমাকে অনুগ্রহ করে সেবা ও আত্মপ্রকাশের যে নতুন সুযোগ দান করা হয়েছে, তার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।…যখন কারও কাজ ফুরিয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে তার শেষ অনিবার্যভাবে আসন্ন। 'হিন্দু' আমাকে নতুন এবং রুচিকর কাজ দিয়ে সম্ভবতঃ আমার স্বাস্থ্য ও পরমায়ু বৃদ্ধির কাজ করবে।…"

'হিন্দু'র ইংরেজী ক্রোড়পত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করতে গিয়ে আমি একথা প্রথমেই স্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে আমি কোনো সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য বা আদর্শের সঙ্গে আমার কর্মকে যুক্ত করছিনে।……আমি একজন হিন্দু এবং আমার সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির জন্য আমি গর্বিত। কিন্তু দেশে অন্যান্য সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের মানুষও আছেন যাঁরা দেশের সাধারণ জীবনধারা এবং যৌগিক সংস্কৃতির তুল্য দাবিদার। ভারতবর্ষ তাই শুধু একা হিন্দুর নয়। মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী এবং অন্যান্য সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ, যাঁরা এদেশকে বাস-ভূমিরূপে গ্রহণ করেছেন, ভারতবর্ষ সমানভাবে তাঁদের সকলের দেশ।"[৪৬] স্ব-সম্পাদিত 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিপিনচন্দ্র বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের সমবায়ে গঠিত নবীন ভারতের যে বাণী-মূর্তি কল্পনা করেছিলেন, 'হিন্দু'র ইংরেজী ক্রোড়পত্রের প্রথম সংখ্যায় উচ্চারিত এই অঙ্গীকার তার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। তিন দশকের ব্যবধান নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটালেও তাঁর নবীন ভারত সম্পর্কিত মূল ধ্যান-ধারণা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। বিপিনচন্দ্রের সাংবাদিক-সত্তা যে সুগভীর দার্শনিক প্রত্যয়ের স্বচ্ছ আলোকে সমুজ্জ্বল, এটাই তার প্রমাণ।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশের সঙ্কল্প করেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'ফ্রিডম য়্যাণ্ড ফেলোশিপ্'। কিন্তু আকস্মিক মৃত্যুর জন্য সে পত্রিকা আর প্রকাশিত হতে পারেনি।[৪৭]

॥ দেশনায়ক ॥

ব্রাহ্ম সমাজ-প্রচারিত ধর্মীয় মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেননি; একটা উন্নত উদার স্বাধীনতার আদর্শের সন্ধানেই তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেছিলেন—বিপিনচন্দ্র তাঁর বাংলা আত্মজীবনীতে একথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। আর তাঁর মতে ব্রাহ্ম-ধর্মাচার্যদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যক্তিত্বে এই স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শ সর্বাপেক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে যে একটি ক্ষুদ্র সাধকদল গড়ে ওঠে বিপিনচন্দ্র তাকে 'স্বাধীনতার সাধকদল' নামে অভিহিত করেছেন। এই সাধকদলের আদর্শে দীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমেই তাঁর প্রকাশ্যে ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ। এই দলে দীক্ষাগ্রহণের সময় শাস্ত্রী মহাশয়-রচিত যে প্রতিজ্ঞা-পত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন, তার একটি ধারা ছিল এইরকম: 'আমরা একমাত্র স্বায়ত্ত-শাসনকেই বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করি; তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের মুখ চাহিয়া এখন যে বিদেশী রাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার আইন-কানুন মানিয়া চলিব; কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য দুর্দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও এই গভর্নমেন্টের অধীনে কখনই দাসত্ব স্বীকার করিব না।' সুতরাং একথা স্পষ্ট যে পরাধীনতার জ্বালা ছাত্রজীবন থেকেই বিপিনচন্দ্রের হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলেছিল এবং এই জ্বালা নিবারণের জন্যই তিনি পিতৃপুরুষের ধর্মাদর্শ পরিত্যাগ করে নতুন ধর্মাদর্শকে জীবনে বরণ করে নিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্রের সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ তাই তাঁর দেশচর্যায় দীক্ষাগ্রহণের নামান্তর মাত্র। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি উপরি-উক্ত সাধকদলে দীক্ষিত হন এবং এই সময় থেকেই তাঁর জীবনে স্বাধীনতা-সাধনারও সূত্রপাত হয়।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনার জন্য স্মরণীয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ অনপনেয় কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস্ থেকে বিতাড়িত হন। পদচ্যুত হয়ে ভারত সরকারের রায়ের বিরুদ্ধে ভারত-সচিবের দরবারে আপিল করবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বিলাত যান। কিন্তু তাঁর আপিল গ্রাহ্য হলো না; শুধু তাই নয়, তিনি ব্যারিস্টারি পড়বার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নৈতিক অপরাধের অজুহাতে তাঁকে সে সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হলো। নিরাশ হয়ে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে এলেন।

সুরেন্দ্রনাথের প্রতি এই অবিচার শিক্ষিত দেশবাসীকে বৃটিশ ন্যায়পরায়ণতায় সন্দিহান করে তুলল। এর অল্পদিনের মধ্যে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মারকুইস্ অব্ স্যালিসবারী এক আদেশে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যোগদানের বয়ঃসীমা ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৯ বছর ধার্য করলেন। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই আদেশকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভারতীয় প্রার্থীদের সিভিল সার্ভিসে যোগদানের পথে অন্তরায় সৃষ্টির প্রয়াস বলে গ্রহণ করলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইনে উচ্চ চাকুরির ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয়দের যে সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছিল, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহারানীর ঘোষণায় তা' পুনরুচ্চারিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস য়্যাক্ট'ও তদনুসারে বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের নতুন আদেশ এই সমস্ত প্রতিশ্রুতির প্রকাশ্য অস্বীকৃতিরূপে দেখা দিল। সর্বভারতীয় স্তরে আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যে 'ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশন' বা ভারতসভা স্থাপিত হয়, সেই ভারত-সভা বৃটিশরাজের এই প্রতিক্রিয়াশীল আদেশের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে ভারত-সভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কলকাতায় এক বিশাল জনসভায় সোচ্চার প্রতিবাদ জানানো হলো। বিপিনচন্দ্র একে 'প্রথম সর্ববঙ্গীয় রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন' বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৮] এই সর্ববঙ্গীয় বিক্ষোভ প্রদর্শনকে অনুসরণ করেই নতুন সিভিল সার্ভিস নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় স্তর থেকে পার্লামেণ্টে আবেদনপত্র দাখিলের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার সূচনা হয়। এই সূত্রেই বৃটিশ রাজত্বে উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসী প্রথম জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একটি সাধারণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য একই মঞ্চে মিলিত হন। তখনও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়নি। বিপিনচন্দ্রের দেশচর্যায় দীক্ষাগ্রহণের কাল তাই সর্বভারতীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনাবিস্তারের সূচনাকালের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

এর আট বছর পরে (১৮৮৫) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় এবং বিপিনচন্দ্র ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীহট্টের প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেসের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাজে। বিপিনচন্দ্র মাদ্রাজ কংগ্রেসে উপস্থিত হন। মাদ্রাজ কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত দু'টি কারণে বিপিনচন্দ্রের জীবনীর দিক থেকে স্মরণীয়। প্রথমতঃ কংগ্রেসের এই অধিবেশনে তিনি অস্ত্র আইন রদ

(রিপিল অব্‌ দি আর্মস্‌ য়্যাক্ট) বিষয়ক প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা দান করে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। বিপিনচন্দ্রের বয়স তখন ত্রিশ বছর। এই বক্তৃতায় বিপিনচন্দ্র বৃটিশ সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করে বলেন—'আমি বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য পোষণ করি, আমার কাছে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য আমার দেশ ও জাতির প্রতি আনুগত্যের সমান। আমি বৃটিশ সরকারের প্রতি অনুগত কারণ আমার বিশ্বাস, বৃটিশ সরকার আমার জাতির মুক্তির উদ্দেশ্যে প্রেরিত ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রবিশেষ (উল্লাস-ধ্বনি); আমি বৃটিশ সরকারের প্রতি অনুগত এইজন্য যে আমি স্বায়ত্ত-শাসন ভালোবাসি। (উল্লাস-ধ্বনি); আমি বৃটিশ সরকারের প্রতি অনুগত কারণ আমি এই কংগ্রেসকে ভালোবাসি।'[৪৯] একথা স্মরণীয় যে তখনো বৃটিশ সরকারের কল্যাণজনক ভূমিকায় এদেশের শিক্ষিত জনমানসে অনাস্থার উদ্ভব হয়নি। অথচ অস্ত্র আইন প্রবর্তনের নেপথ্যে বৃটিশ সরকারের মনে ছিল সিপাহী-বিদ্রোহের স্মৃতিজাত ভীতি। অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে যদি শোষিত লাঞ্ছিত মানুষ আবার একদা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে মত্ত হয়ে ওঠে!

বিপিনচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় আইন রদের সমর্থনে কয়েকটি জোরালো যুক্তি উত্থাপন করলেন। প্রথমতঃ অস্ত্র আইন প্রবর্তনের অর্থ বৃটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় জনগণের আনুগত্যে অনাস্থা প্রকাশ; দ্বিতীয়তঃ হিংস্র বন্যবস্তুর আক্রমণ থেকে দেশবাসীর আত্মরক্ষার ক্ষমতাকে খর্ব করা; এমন কি বন্য প্রাণীর তাণ্ডব থেকে কৃষকদের শস্যসমূহ রক্ষার অধিকার হরণ করা। তৃতীয়তঃ রাশিয়ার ভারত-আক্রমণের সম্ভবনাকে সহজ করা। কারণ, যদি কখনও রাশিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পদার্পণ করে, তা' হলে তা' অস্ত্র আইনের জন্যই সম্ভব হবে। সুতরাং ভারতবাসী এবং বৃটিশ সরকার উভয়ের সুদূরপ্রসারী মঙ্গলের জন্যই অস্ত্র আইন রদ হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করলেন।

এ ছাড়া, বিপিনচন্দ্র এবং অন্যান্য তরুণ প্রতিনিধিদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে একটি গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়। কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যেভাবে অনেকটা গোপনীয়তার সঙ্গে কংগ্রেসের কর্মসূচী স্থিরীকৃত হয় তা' অনেকের মনঃপূত হয় না। তাঁরা চান যে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক কমিটি নিযুক্ত করে তার উপর কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা অর্পণ করা হোক্। নানা বাধা ও

বিরোধিতার ভিতর দিয়ে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতির অভিভাষণে মিস্টার বদরুদ্দিন তায়েবজী এই ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক কমিটি নিয়ুক্তির কথা ঘোষণা করেন। এই কমিটির নাম হয় 'সাব্‌জেক্টস্ কমিটি'। এই কমিটিতে সমস্ত ডেলিগেটদের প্রতিনিধিত্বের অবাধ অধিকার ছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সাব্‌জেক্টস্ কমিটিই কংগ্রেসের কার্য-নির্বাহক সমিতিরূপে ক্রিয়াশীল ছিল।[৫০] এই সময় 'অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি' নামে কংগ্রেসের স্থায়ী কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয় এবং সাব্‌জেক্টস্ কমিটির উপর কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় অন্যান্য কার্য নির্বাহের ভার অর্পিত হয়।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ কংগ্রেসের আদি পর্বের ইতিহাসে একটি সঙ্কটময় বছররূপে গণনীয়। কারণ, 'উচ্চপদস্থ বৃটিশ রাজকর্মচারী, মুসলমানগণ এবং এমনকি কিছু-সংখ্যক কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় সভ্য—এই ত্রি-পক্ষের চাপে এই প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিল।'[৫১] কংগ্রেস ক্রমশঃ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের কাযকলাপের বিরূপ সমালোচনা করে তাদের বিরাগভাজন হয়ে উঠল। তা'ছাড়া মাদ্রাজ কংগ্রেসে জনসাধারণের স্তরে কংগ্রেসের কর্মপ্রয়াস বিস্তারের জন্য যে নতুন পন্থা অবলম্বিত হয়, তাতেও তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কারণ, তখনও তাঁদের মন থেকে সিপাহী-বিদ্রোহের ভয়াবহ স্মৃতি একেবারে মুছে যায়নি। মিস্টার অ্যালান অকটেভিয়ান হিউম, যাঁকে জাতীয় কংগ্রেসের 'জন্মদাতা' বলা হয়, তিনি সম্ভাব্য জনজাগরণ এবং তজ্জনিত হিংসাত্মক কার্য-কলাপ রোধের প্রতিষেধক ব্যবস্থারূপেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন। মিস্টার হিউমের নিজের ভাষায়, 'আমাদের নিজেদের কার্যকলাপের ফলস্বরূপ ক্রমবর্ধমান বিপুল শক্তির প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটি রক্ষা-কবচের জরুরী প্রয়োজন হয়েছিল এবং আমাদের কংগ্রেস আন্দোলন অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ রক্ষা-কবচ সম্ভবতঃ আর কিছু হতে পারে না"।[৫২] কারণ, আন্দোলন যতক্ষণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তা নিরাপদ, কিন্তু যে মুহূর্তে তা অশিক্ষিত এবং সহজে উত্তেজনাপ্রবণ জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয় তখন কী ঘটবে বলা কঠিন। স্যার অকল্যাণ্ড কলভিন তখন ছিলেন এলাহাবাদের ছোটলাট। তিনি প্রকাশ্যে সংবাদপত্রের স্তম্ভের মাধ্যমে হিউমের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এই সূত্রে স্যার অকল্যাণ্ড এবং মিস্টার হিউমের মধ্যে একটি মতবিরোধের সৃষ্টি হলো।

ওদিকে যুক্তপ্রদেশের বুদ্ধিজীবী মুসলমানদের স্বীকৃত নেতা স্যার সৈয়দ আমেদের নেতৃত্বে একটি সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা হলো। কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে রাখাই ছিল সেই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। সেই আন্দোলন এমন শক্তিশালী হয়ে উঠল যে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর সৈয়দ বদরুদ্দিন তায়েবজী একখানি পত্রে মিস্টার হিউমকে লিখতে বাধ্য হলেন যে সঙ্গতভাবেই হোক আর অসঙ্গতভাবেই হোক, সমগ্র মুসলমানসম্প্রদায় যদি কংগ্রেসের বিরোধী হয়, তা' হলে কংগ্রেসের আন্দোলন আর প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আন্দোলন থাকে না। এই অবস্থায় তিনি প্রস্তাব করলেন যে প্রতি বছর কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান না করে সেইবারকার অধিবেশনের পর অন্ততঃ পাঁচ বছরের জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখা হোক্।[৫৩] এই সময় স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে 'মহমেডান এডুকেশনাল কন্‌ফারেন্স' নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়।

পূর্বোল্লিখিত হিউম-কলভিন বাক্-বিতণ্ডায় বিপিনচন্দ্র স্যার কলভিনের পক্ষ সমর্থন করে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে জনসাধারণের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করেন। কারণ তাঁর নিজের কথায়, 'জনসাধারণকে যথোপযুক্তভাবে শিক্ষিত এবং অগ্রগামী সামাজিক ভাবধারার অংশীদার করে তুলবার আগেই তাদেরকে কংগ্রেসের কাজে নিয়োগ করে প্রকৃত আধুনিক গণতন্ত্র গড়বার চেষ্টা ভারতবর্ষের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা—যতদূর মনে পড়ে, আমি সেই মৌলিক প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম'।[৫৪]

আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের শোচনীয় দুর্দশার কথা কিছুকাল যাবৎ দেশহিতৈষী বাঙালীর মনকে পীড়িত করে তুলেছিল। চা-বাগানের শ্রমিকেরা ভারত সরকার কর্তৃক ১৮৫৯ এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ দু'টি আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। প্রথম আইনটিও ছিল পীড়নমূলক, এতেও শ্রমিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা অনেকখানি হরণ করা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় আইনে চা-শ্রমিকদের প্রকৃতপক্ষে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়। চা-বাগানের ম্যানেজারেরা কার্যত তাদের দেহমনের উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের অধিকার লাভ করেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর সম্পাদক নরমপন্থী রাজনীতিক কৃষ্ণদাস পালও ঐ আইনকে 'এ ভেরিটেব্‌ল্ স্লেভ য়্যাক্ট' বা 'যথার্থ ক্রীতদাস আইন' বলে অভিহিত করেন। বিপিনচন্দ্র

ছিলেন শ্রীহট্ট জেলার মানুষ এবং শ্রীহট্ট ছিল চা-শিল্পের জেলা। চা-শ্রমিকদের দুর্দশার তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। তাই ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের এলাহাবাদ কংগ্রেসে বাংলা দেশের প্রতিনিধিরা যখন এ বিষয়ে সাব্‌জেকটস্ কমিটির সক্রিয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হন, তখন বিপিনচন্দ্র সাব্‌জেক্টস্ কমিটি কর্তৃক অন্যতম বিষয় সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে তার সঙ্গে 'কুলি-প্রসঙ্গ'টি যুক্ত করেন। কিন্তু সভাপতি কর্তৃক সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়।

এই বছর (১৮৮৮) বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সূচনা হয় এবং ২৫শে, ২৬শে এবং ২৭শে অক্টোবর, এই তিনদিনব্যাপী প্রথম অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল—কংগ্রেসী আন্দোলনের আদর্শে প্রাদেশিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য অনুরূপ আন্দোলন-সংগঠন। কারণ 'জাতীয় কংগ্রেস সর্বভারতীয় সম্মেলন ছিল বলে জাতীয় সমস্যার আকার ধারণ না করা পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে বিশেষ কোনো প্রদেশের সমস্যাবলীকে আলোচনায় স্থান দেওয়া সম্ভব ছিল না'।[৫৫] স্বভাবতঃই বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে আসামের চা-শ্রমিকদের সমস্যা যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্ব লাভ করলো। প্রাদেশিক সম্মেলনের এই অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র চা-বাগানের কুলিদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে একটি স্বাধীন কমিশন নিয়োগের দাবি জানিয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।[৫৬] এই অধিবেশনে তিনি ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারে পুলিসী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেও বক্তৃতা করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ কলকাতায় সিটি কলেজ হলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিপিনচন্দ্র বিনা প্রস্তুতিতে এক বক্তৃতা দান করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'রাজনৈতিক সংস্কারের ভিত্তি' (দি বেসিস্ অব্ পলিটিক্যাল রিফর্ম)। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন যে ধর্মের মতো রাজনীতির উদ্দেশ্যও হচ্ছে মানুষের বিকাশের সাহায্য করা। সমস্ত রাজনৈতিক মতবাদকেই এই সর্বগত মানদণ্ডে বিচার করে দেখা উচিত। তবে একথাও স্মরণে রাখতে হবে যে রাজনীতি আপনা থেকে উদ্ভূত হয়, একে দান করা যায় না। ফরাসী বিপ্লবের নেতারা ফরাসীদের একটি রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা দান করতে চেয়েছিলেন এবং সকলেই জানেন সেই উগ্র প্রচেষ্টার ফলাফল কী ভীষণ হয়েছে। অথচ প্রজাতন্ত্রতা আমেরিকায় আপনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কেউ দান করেনি, এবং তার সাফল্যও গৌরবজনক হয়েছে।[৫৭] রাজনীতি

দলের দ্বারা পরিচালিত হয় আর দল গঠিত হয় ব্যক্তির সমবায়ে। সুতরাং ব্যক্তিগত পরিচয়ে মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য না হলে দলগতক্ষেত্রেও সে কোনো মহান্ উদ্দেশ্যসিদ্ধির যোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। বিপিনচন্দ্র স্পষ্টই বললেন—'আমি সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের নিন্দা করি যা' আমাকে মানুষ করে তোলবার আগেই দেশপ্রেমিক করতে চায়; কারণ তাতে হৃদয়ে প্রীতি ও ঔদার্যের পরিবর্তে ঘৃণা ও কলহের প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে।'[৫৮]

আসামের চা-বাগানের কুলিদের সমস্যা দীর্ঘদিন যাবৎ বাঙালী জননেতাদের ঘোর দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। কারণ চা-শ্রমিক-নিপীড়নের পিছনে তদানীন্তন ভারত সরকারের সমর্থন ছিল। সুতরাং ঐ নিপীড়নের হাত থেকে চা-শ্রমিকদের মুক্তি দান করতে হলে তাদের পক্ষে প্রবল জনমত সংগঠন করা প্রয়োজন ছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ও ৩০শে অক্টোবর কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র আসামের কুলিদের সমস্যার উপর প্রস্তাব উত্থাপন করে বক্তৃতা করেন। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে আসাম ও অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে বর্তমানে যাতায়াতের যে সুবিধা হয়েছে, সেইদিকে এই সম্মেলন নজর রেখে মনে করে যে আসামে শ্রমিক-সরবরাহ চুক্তির ব্যাপারে ১৮৫৯-এর আইন অপ্রযোজ্য বলে ঘোষণা করা হোক্ এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের আইনটিকেও ধীরে ধীরে বাতিল করা হোক্। আসামের চা-বাগানে শ্রমিক-সরবরাহ স্বাভাবিক সরবরাহ এবং দাবির (সাপ্লাই য়্যাণ্ড ডিম্যাণ্ড) আইনানুসারেই নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।[৫৯]

হিন্দু বাল্য-বিবাহের কুফল প্রশমনের উদ্দেশ্যে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যখন বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা মেয়েদের সহবাসে সম্মতিদানের নিম্নতম বয়স বারো নির্ধারিত করে আইন প্রণয়নের চেষ্টা হয়, তখন প্রস্তাবিত এই আইনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন 'কনসেণ্ট বিল এজিটেশন' নামে পরিচিত। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুরা 'ধর্ম বিপন্ন'—এই সোরগোল তুলে প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করতে থাকেন। এমন কি সুশিক্ষিত উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারী এবং আইনজীবীরাও তাতে যোগদান করেন। বাংলাদেশে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা আন্দোলন পরিচালনা করে। বিপিনচন্দ্র এই আন্দোলনে প্রস্তাবিত আইনের স্বপক্ষে জড়িত হয়ে পড়লেন। রাজা প্যারীমোহন মুখার্জির সভাপতিত্বে এলবার্ট হলে কলকাতার নাগরিকদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিপিনচন্দ্র এই সভায় প্রস্তাবিত আইনের স্বপক্ষে বক্তৃতা দানের জন্য আহূত হন। কিন্তু বিরোধী পক্ষের বিশৃঙ্খল প্রতিবাদের জন্য মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে তিনি বেশীক্ষণ কথা বলার সুযোগ পান না। তা সত্ত্বেও এই ঘটনার পর নানা প্রকারের হুমকি, এমন কি প্রাণনাশের ভয় দেখিয়েও তাঁর কাছে বেনামী চিঠি আসতে থাকে। আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র বলেছেন যে, অথচ মনুর অনুশাসনে এবং হিন্দুর আয়ুর্বিজ্ঞানেও মেয়েদের বয়ঃসন্ধ্যোত্তর বিবাহের বিধি ও বিধান আছে। বিপিনচন্দ্রের মতে তাই বয়ঃসন্ধির পূর্বেই মেয়েদের বিবাহ দিতে হবে—এই ধারণা অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং অধঃপতনের যুগের সৃষ্টি। প্রাচীনকালে এ প্রথা অজ্ঞাত ছিল।[৬৩] শেষ পর্যন্ত প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রস্তাবিত আইন অবশ্য পাস হয়ে গিয়েছিল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিপিনচন্দ্রের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। এর পর থেকে তাঁর অন্তর্জীবনে একটা পরিবর্তনের সূচনা হতে থাকে। ঐহিক কর্মের প্রতি ধীরে ধীরে তাঁর অনীহা জন্মাতে থাকে এবং তিনি অধ্যাত্ম চিন্তায় মনোনিবেশ করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এর ফলে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের পর প্রায় দশ বছর যাবৎ বিপিনচন্দ্রকে আর ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায় না।

আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসবার পর বিপিনচন্দ্র ১৯০১ খৃষ্টাব্দে 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক স্ব-সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকার স্তম্ভের মাধ্যমে স্বাদেশিকতা এবং নব্য জাতীয়তাবাদের মন্ত্র প্রচার করে তিনি ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে নতুন মূর্তিতে আবির্ভূত হন। তখনও তাঁর মুখ্য অবলম্বন কণ্ঠ নয়, লেখনী। বিপিনচন্দ্রের এই ভূমিকার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দান করতে গিয়ে অনেক পরবর্তীকালে পট্টভি সীতারামিয়া মহাশয় বলেছিলেন—"বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, যিনি ১৯০৩—১৯০৪ থেকে তাঁর সাপ্তাহিক পত্র 'নিউ ইণ্ডিয়ার' মাধ্যমে জাতীয় পুনর্জাগরণের ব্যাপারে প্রশংসনীয় কাজ করছিলেন, তিনি সমগ্র দেশে জাতীয়তাবাদ, জাতীয় শিক্ষা এবং নবচেতনার সর্বজনস্বীকৃত প্রামাণিক প্রবক্তা হয়ে উঠলেন"।[৬১] বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠ ও লেখনী সমানভাবে সোচ্চার হয়ে উঠলো বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরবর্তী স্বদেশী যুগের উত্তেজনাময় দিনগুলিতে। স্বদেশী যুগেই তিনি অবিসংবাদিত 'দেশনায়ক'।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকার্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি সঙ্কটপূর্ণ কাল। ভারতবর্ষের জনমানসে আত্মচেতনা যত বৃদ্ধি পেতে লাগলো, সরকার ততই পশ্চাদ্‌গামী নীতি অবলম্বন করে নিজের শোষক ও শাসক-সত্তার নগ্ন রূপটি পরিস্ফুট করে তুলতে লাগলেন। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলাদেশে যে স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব হয় এবং যে আন্দোলনের ভাবধারা ভারতীয় রাজনীতির উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে, তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ 'বঙ্গভঙ্গ' হলেও সে নানা সূত্র থেকে উদ্দীপনা, শক্তি ও পথ-নির্দেশনা লাভ করেছিল। সর্বাঙ্গীণ জাতীয় অগ্রগতির ব্যাপারে শিক্ষিত জনমানসে একটি নিশ্চিত ব্যর্থতাবোধই বৃটিশ ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাসী জননেতাদের একাংশকে আবেদনের মসৃণ পথ থেকে আন্দোলনের বন্ধুর পথে আকর্ষণ করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর ঊষা-লগ্নে প্রকাশিত দু'খানি যুগান্তকারী গ্রন্থে বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে শোষিত অধিবাসীর দুঃখ-দুর্দশার চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়ে ওঠে। তথাকথিত সুশাসনের অন্তরালে বৃটিশ শাসকদের যে নির্লজ্জ শোষক সত্তাটি প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল, তা' শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে অনাবৃত হয়ে পড়ে। গ্রন্থ দু'খানি হচ্ছে—দাদাভাই নৌরজী রচিত 'পভার্টি য়্যাণ্ড আন্‌-বৃটিশ রুল ইন্‌ ইণ্ডিয়া' এবং রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া'। দু'খানি গ্রন্থই ১৯০১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত। রমেশচন্দ্রের গ্রন্থ সম্পর্কে অরবিন্দ মন্তব্য করেছিলেন—"ইকনমিক হিস্ট্রি (আর. সি. দত্তের) এবং সেই গ্রন্থে বর্ণিত ভারতের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক ও আর্থিক সম্পর্কের নিন্দনীয় কাহিনী ব্যতীত, আমাদের সন্দেহ হয়, জনমন বয়কটের জন্য প্রস্তুত হতো কি না। এই একটা দৃষ্টান্ত দেখিয়েই তাঁর সম্বন্ধে বলা চলে যে তিনি শুধু ইতিহাস লেখেননি, তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।"[৬২] এই দু'খানি গ্রন্থ এবং মিস্টার ডিগবি রচিত 'দি প্রস্পারাস বৃটিশ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থ অবলম্বন করেই সখারাম গণেশ দেউস্কর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত বাংলা গ্রন্থ 'দেশের কথা' প্রকাশ করেন। ভূমিকায় সখারাম বলেন—'এই পুস্তকপাঠে যদি অনুকূল রাজশক্তির সহিত শিল্প-বাণিজ্যোন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হয় এবং রাজনীতি-চর্চায় সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে লেখকের পরিশ্রম সার্থক হইবে'।

সখারামের গ্রন্থখানি তরুণ-মনে যথেষ্ট উত্তেজনা-সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই সময় (২২শে জুলাই, ১৯০৪) রবীন্দ্রনাথ মিনার্ভা

রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশেষ সভায় তাঁর বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রথম পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধে উত্তেজনার খোরাক ছিল না। তিনি দেশের উদীয়মান রাজনৈতিক চেতনাকে গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত করবার উদ্দেশ্যে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি খসড়া প্রকাশ করেন। কিন্তু তখন দেশবাসীর মনে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সুতরাং দেশবাসীর অধিকতর মনোযোগ তখন সেই দিকেই নিবদ্ধ।

একমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নৈরাশ্যই একটা জাতিকে দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ঘটনাচক্রে এর সঙ্গে যুক্ত হলো রাজনৈতিক অধিকার লাভের ব্যর্থতা।

নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, বিশেষতঃ সাংস্কৃতিক নব জাগরণের অনিবার্য প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশে দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার উল্লেখ্য উন্মেষ ঘটে। রাজনৈতিক অধিকার অর্জন সম্পর্কে বাঙালী ক্রমশঃ অধিকতর সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সর্বভারতীয় ঐক্যচেতনার প্রসার ত্বরান্বিত করলো বটে, কিন্তু অধিকার-অর্জনের ক্ষেত্রে তার আবেদন-নিবেদনের নীতি নব্য জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালীর মনঃপূত হলো না। কংগ্রেসের 'ভিক্ষুক-নীতি' (মেনডিকেণ্ট পলিসি) পরিহার করে স্বাবলম্বনের পথে জাতি-গঠনের আগ্রহ বাংলা দেশে প্রবলভাবে দেখা দিল। আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালী আত্ম-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হতে চাইলো। এই আত্মপ্রত্যয় গঠনে শক্তি জোগালো রামমোহন-বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দর বাণী এবং সাহস জোগালো নানা দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাস-পাঠ। আবিসিনিয়া-ইতালীর যুদ্ধে (১৮৯৬) ইউরোপীয়দের বিপর্যয়, বুয়র যুদ্ধের (১৮৯৯-১৯০২) প্রথম দিকে বুয়রদের কাছে ইংরেজদের বিপর্যয়ের সমসাময়িক ঘটনা তার আত্ম-প্রত্যয়-নির্মাণে নতুন উপাদান সরবরাহ করলো। বৃটিশ-শাসনের অচলায়তন যে অনড় নয়—এই ধারণা তাকে রঙীন আশাবাদে উদ্দীপ্ত করে তুললো।

এমন সময় (জানুয়ারি, ১৮৯৯) ভারতের বড়োলাট হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। ব্যক্তিগত জীবনে বিদ্যাবত্তায় ও বাগ্মিতায় কার্জন খ্যাতিমান হলেও কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের একজন উগ্র সমর্থক। পরাধীন জাতির মানুষের আশা-

আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি বা শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। ভারতবর্ষে এসেই তিনি বুঝতে পারলেন যে বৃটিশ ভারতে বাংলা দেশই আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় এবং রাজনৈতিক চেতনায় সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী। সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে হলে সর্বাগ্রে বাঙালীর গর্ব খর্ব করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমেই নতুন 'কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন' (১৮৯৯) পাস করালেন। মিউনিসিপ্যালিটির কার্য পরিচালনায় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে বাঙালী যে সামান্য স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার ভোগ করে আসছিল, নতুন আইনে তা' অপহৃত হলো। প্রবল বিরোধী জনমত উপেক্ষা করে কার্জন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট ভিত্তি করে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করালেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দেশবাসী বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালনায় যেটুকু স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিলেন, কার্জনের চক্রান্তে তা'-ও অপহৃত হলো। শিক্ষিত জনমনে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের আগুনে ঘৃতাহুতি দান করলো কার্জনের সমাবর্তন-ভাষণ। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যরূপে লর্ড কার্জন যে ভাষণ দান করেন, তাতে অহেতুকভাবে বাঙালী তথা ভারতবাসীর জাতীয় মর্যাদায় আঘাত দান করা হয়। কারণ, ঐ ভাষণে তিনি প্রকারান্তরে বোঝাতে চান যে সত্যবাদিতায় প্রতীচ্যবাসীদের একচেটিয়া অধিকার আর এশিয়াবাসিগণ স্বভাবগতভাবে সত্যের অপলাপকারী।[৬৩] কার্জনের এই অশালীন উক্তি জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত বাঙালী সমাজে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার করলো। 'অমৃতবাজার পত্রিকার' ১৫ই, ১৬ই এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কার্জনের সমাবর্তন-ভাষণের তীব্র সমালোচনা করা হলো। কিন্তু কার্জন এতেও ক্ষান্ত হলেন না। কৃষ্ণকুমার মিত্রের ভাষায়—

'তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণয়ন করিয়া পাঠ্যপুস্তক হইতে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস তুলিয়া দিয়াছিলেন। বে-সরকারী কলেজসমূহে আইন পড়ানো হইত, লর্ড কার্জনের প্রভাবে রিপণ কলেজ ব্যতীত আর সমস্ত কলেজে আইন অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।……লর্ড কার্জনের পরামর্শে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লর্ড কার্জন দেখিয়াছিলেন, উকিলেরাই রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা।…তাই আইন কলেজের সংখ্যা

কমাইয়া দিয়াছিলেন।'[৬৪] অদূরদর্শী ঔদ্ধত্যের জন্য কার্জনের শাসন-নীতি, বিশেষতঃ শিক্ষাবিষয়ক নীতি অচিরেই ভারতবাসী, বিশেষত বাঙালীর শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠলো। কার্জনী নীতির বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনমনে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে লাগলো।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ছিল আয়তনে ও জনসংখ্যায় ভারতবর্ষের বৃহত্তম প্রদেশ। বঙ্গ, বিহার, ছোটনাগপুর, ওড়িষ্যা এবং আসাম, এই পাঁচটি উপপ্রদেশ বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসামকে বাংলা প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র চীফ কমিশনারের অধীনে আনা হয়। এই সময় বাংলা ভাষাভাষী শ্রীহট্ট, কাছাড় এবং গোয়ালপাড়া জেলা নতুন আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলার আয়তন ক্ষুদ্রতর করবার জন্য আবার সরকারী স্তরে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়, তবে আশু কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপিত হয় ১৯০১ খৃষ্টাব্দে। মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার-রূপে স্যার এন্‌ড্রু ফ্রেজার ওড়িষ্যাকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে বড়োলাট লর্ড কার্জনও নীতিগভাবে বাংলার অঙ্গচ্ছেদ প্রয়োজন বলে স্বীকার করেন। এরপর স্যার এন্‌ড্রু ফ্রেজার বাংলার ছোটলাট হয়ে আসেন এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গবিভাগের একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করেন। সেই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করেই ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী রিজ্‌লী সাহেব ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর একখানি পত্রে অন্যান্য কিছু কিছু আঞ্চলিক পরিবর্তন সহ চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলা সরকারের কাছে প্রস্তাব করেন। এর উদ্দেশ্য হলো, পূর্বাঞ্চলিক জেলাসমূহকে কলকতার অনিষ্টকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে ন্যায্যতর ব্যবহার দান। এই পত্র ১২ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় এবং এই সংবাদ সর্বসাধারণের গোচর হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলাপ্রদেশে বিশেষত পূর্ববঙ্গে প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০৪-এর জানুয়ারি, প্রায় এই দু'মাসের মধ্যে প্রস্তাবিত সীমা-পরিবর্তনের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের প্রায় পাঁচশটি প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৬৫]

বাঙালীর, বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গবাসীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে কার্জন বিচলিত হয়ে ওঠেন। কাল বিলম্ব না করে তিনি ফেব্রুয়ারি মাসেই পূর্ববঙ্গ সফরে গেলেন। চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে তিনি কখনো প্রলোভন, কখনো ভয় দেখিয়ে পূর্ববঙ্গবাসীর প্রচ্ছন্ন সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। ময়মনসিংহে গিয়ে তিনি রিজ্‌লী পরিকল্পনার একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যান প্রকাশ করলেন। তিনি দার্জিলিং বাদে এবং মালদহ সহ সমগ্র রাজসাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগকে নতুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রস্তাব প্রকাশ করলেন। ঢাকা-বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টই বললেন যে বঙ্গবিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে 'প্রাচীন মুসলমান রাজা এবং রাজপ্রতিনিধিদের আমল থেকে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় যে একতা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, তাদের মধ্যে সেই একতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ-সৃষ্টি করা'।[৬৬] কার্জনের এই প্রচেষ্টায় সহযোগী হলেন বাংলার ছোটলাট এনড্রু ফ্রেজার এবং তদানীন্তন আসামের চীফ কমিশনার ব্যামফাইল্ডে ফুলার। ঢাকার নবাব সলিমউল্লার নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক মুসলমান বড়োলাটের মুস্লিম প্রদেশ গঠনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু প্রকাশ্যে এইভাবে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়েও কার্জন উল্লেখযোগ্য কোনো ফল লাভ করতে পারলেন না। কলকাতার টাউন হলে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় (১৮ই মার্চ, ১৯০৪) প্রবল প্রতিবাদ-ধ্বনি সোচ্চার হয়ে উঠলো। এখানে এত বিরাট জনসমাগম হয় যে উদ্বৃত্ত অভ্যাগতদের জন্য যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে টাউন হলের একতলায় একই সঙ্গে আর একটি সভার অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রস্তাবিত বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-অসন্তোষ প্রকাশ করে এই সভায় তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং স্থির হয় যে ঐ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে।

এই বঙ্গবিভাগবিরোধী আন্দোলন অনেক প্রভাবশালী ইউরোপবাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্যার হেনরী কটন ছিলেন এমনি একজন সহৃদয় ইউরোপবাসী যিনি শুরু থেকেই বঙ্গবিভাগবিরোধী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি প্রকাশ্যে বঙ্গবিভাগের সরকারী পরিকল্পনার বিরূপ সমালোচনা করলেন। মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ-সভার পর কয়েক মাস পর্যন্ত আর

তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হলো না। ঐ বছরের নভেম্বর মাস থেকে আবার নতুন উদ্যমে প্রতিবাদ-আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।

বঙ্গবিভাগের পূর্বে কার্জনেব স্বৈরতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে কলকাতায় আর একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

'সেই আন্দোলনের স্রষ্টা ও পরিচালক ছিলেন যে নির্ভীক দেশভক্ত, তিনি বাংলা দেশের অধিবাসী নহেন, তাঁহার নিবাস ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ডেরা-ইসমাইল খাঁ জেলায়। তিনি সেই জেলার এক সম্ভ্রান্ত জমিদারবংশের সন্তান, তাঁহার নাম টইলরাম গঙ্গারাম'।[৬৭]

টহলরাম ছিলেন সুবক্তা এবং ইংরেজী ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি ১৯০৫-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে কলকাতার স্কোয়ারে এবং অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত জনসভায় সহস্র সহস্র শ্রোতার সামনে কার্জনীয় কুশাসনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগলেন। বিশেষভাবে ছাত্র ও যুবসমাজ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলো। সন্ত্রস্ত সরকার পুলিস ও গুণ্ডা লেলিয়ে তাঁকে নানাভাবে নিগৃহীত করতে লাগলেন। নির্ভীক টহলরাম সমস্ত নিগ্রহ নীরবে সহ্য করে কার্জনীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুললেন, তরুণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'বয়কটের' বাণী প্রচার করলেন। তারপর যেমন উল্কার মতো তাঁর অতর্কিত আবির্ভাব ঘটেছিল, তেমনি ভাবী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়ে নিঃশব্দে তাঁর অন্তর্ধান ঘটলো। টহলরাম গঙ্গারামের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছেন—'যীশুর পূর্বে যেমন জনের আবির্ভাব হইয়াছিল, বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের পূর্বে তেমনি টহলরাম আসিয়াছিলেন'।[৬৮]

বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলনের পূর্বে বাংলার যুবমানসে সাজাত্যবোধের উদ্বোধনে একজন বাঙালী বীরাঙ্গনার অবদান অপরিমেয়। তিনি হলেন ভারতের প্রথম চারণী, 'ভারতী'-সম্পাদিকা রবীন্দ্র-ভাগিনেয়ী সরলা ঘোষাল,—বিবাহোত্তর জীবনে যিনি সরলা দেবী চৌধুরাণী নামে সর্বজনপরিচিতা হয়েছিলেন। কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি স্বদেশবাসীকে সাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। এই বীরাঙ্গনার বিদ্যাবত্তা, তেজস্বিতা এবং কর্মক্ষমতার কথা জানতে পেরে স্বামী বিবেকানন্দ এক সময় তাঁকে ভারতীয় নারী-সমাজের প্রতিনিধিরূপে ভারতীয় নারী-সমাজের ঐতিহ্য

প্রচারের জন্য প্রতীচ্য দেশে পাঠাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য নানা কারণে স্বামীজীর সে-ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

সরলাদেবী একাধিক দেশপ্রেমমূলক গান রচনা করে তাতে সুরযোজনা করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে 'অতীত গৌরব-বাহিনী মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান!'—এই প্রারম্ভিক পংক্তিবিশিষ্ট 'হিন্দুস্থান' শীর্ষক গানখানি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্যার এতুলজি দিনশ-এর ওয়াচার সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সমবেত কণ্ঠে গীত হয়ে এই গানখানি ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী হয়। সাহিত্যিক ও সাঙ্গীতিক প্রয়াস ছাড়া সাজাত্যবোধের উদ্বোধনে তাঁর অন্যান্য প্রযত্নের মধ্যে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' ও 'উদয়াদিত্য উৎসব' উদ্‌যাপন, 'বীরাষ্টমী ব্রত' পালন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' স্থাপন উল্লেখযোগ্য। এ সমস্তই স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভবের পূর্ববর্তী ঘটনা এবং এগুলির উদ্দেশ্য ছিল যুবমানসে বীরভাবের উদ্বোধন এবং দেশবাসীর মনে স্বদেশচেতনার উদ্রেক।

প্রতাপাদিত্য উৎসবের নেপথ্য প্রেরণা ছিল মহারাষ্ট্রে-প্রচলিত 'শিবাজী উৎসব'। ১৩১০ বঙ্গাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে (১১ মে, ১৯০৩) প্রতাপাদিত্য উৎসবের প্রচলন হয় এবং জানা যায়, সেদিন সরলাদেবীর নেতৃত্বে ভবানীপুর, কালীঘাট এবং বাগবাজার অঞ্চলে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সমকালীন পত্র-পত্রিকা কর্তৃক এই প্রয়াস অভিনন্দিত হয়। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা লিখেছিলেন—'মরি মরি কি দেখিলাম!···দেবী দশভুজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণা হইলেন! ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যা জাগিয়াছে, বঙ্গের গৌরবের দিন ফিরিয়াছে!' প্রতাপাদিত্য উৎসবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সমকালীন প্রখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে 'প্রতাপাদিত্য' নাটক রচনায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। উদয়াদিত্য উৎসব উদ্‌যাপিত হয় ঐ বছরেরই শ্রাবণ মাসে। এ সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বাগল মশায় মন্তব্য করে বলেছেন—'রাজপুত বালক বাদলের মতো বাঙালী বালক উদয়াদিত্যও বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দিয়াছিলেন। বঙ্গসন্তানেরা এই সকল কথা নূতন করিয়া জানিয়া স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব হইতেই আত্মগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছিল।'

দুর্গাপূজার অষ্টমীর আর এক নাম 'বীরাষ্টমী'। এই নামের মধ্যে নতুন তাৎপর্য আরোপ করে বাঙালী মায়েদের বীরমাতা হওয়ার লক্ষ্যপথে টানবার

উদ্দেশ্যে ঐ দিনটিকে তিনি জাতীয় দিবসরূপে চিহ্নিত করে বীরাষ্টমী ব্রত পালনের জন্য এক অভিনব অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রস্তুত করলেন। এই উপলক্ষে রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে প্রতাপাদিত্য সীতারাম পর্যন্ত ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বীর সন্তানদের নাম গ্রথিত করে সংস্কৃতে বন্দনা-স্তোত্র রচিত হলো। অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ হলো—ফুলচন্দনে সজ্জিত একখানি তলোয়ারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যুবকগণ কর্তৃক ঐ বন্দনা-স্তোত্র পাঠ করে তরবারিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান এবং তারপর শক্তিমন্ত্রে উদ্বোধিত করবার প্রতীকস্বরূপ মায়েদের নিজের নিজের ছেলের হাতে রাখি-বন্ধন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে রাখি-বন্ধন দেশময় ছড়িয়েছিল, তার সূচনা হয়েছিল সরলাদেবীর হাতেই। 'ভারতী'র সম্পাদিকারূপে আপন অভিজ্ঞতার বিবরণদান প্রসঙ্গে 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে তিনি বলেছেন—'যে সাহিত্যের আঙিনা ছিল কোমল আস্তরণপাতা কমলালয়া সরস্বতীর নিকুঞ্জ, তা'হলো শ্মশানবাসী রুদ্রের নর্তনভূমি, আর তার তালে তালে সকলের পা আপনিই পড়ছে—ইচ্ছে করুক বা না করুক। দলে দলে স্কুল-কলেজের ছেলেরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করলে—বয়স্কেরাও পিছিয়ে রইলেন না—···আমি তাঁদের থেকে বেছে বেছে একটি অন্তরঙ্গদল গঠন করলুম। ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ করাতুম তনু-মন-ধন দিয়ে এই ভারতের সেবা করবে। শেষে তাদের হাতে একটি রাখি বেঁধে দিতুম, তাদের আত্মনিবেদনের সাক্ষী বা ব্যাজ।···এ রাখি-গ্রহণ মাতৃভূমিব সেবা-গ্রহণের জন্য বিপদ-বরণের স্বীকৃতি।··· বছর কত পরে বঙ্গভঙ্গের দিনে এই লাল সুতোর রাখিবন্ধন দেশময় ছড়াল।'

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ছিল স্বদেশী দ্রব্যের প্রতিষ্ঠান। এর উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশজাত জিনিসের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ সৃষ্টি করা। ১৯০৪-এ অনুষ্ঠিত বোম্বাই কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে যে সমস্ত স্বদেশজাত জিনিস প্রেরিত হয়, তার উৎকর্ষ বিবেচনা করে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'কে একটি স্বর্ণপদক দান করেন। অবশ্য ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী ভাণ্ডার' স্থাপনও সমসাময়িক ঘটনা। স্বদেশী আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা-রচনায় এই সমস্ত ঘটনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

জনমতের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও কার্জনের মনোভাব অনমনীয়ই রয়ে গেল।

তিনি গোপনে গোপনে স্ব-পরিকল্পিত বঙ্গবিভাগের ব্যবস্থা পাকা করতে লাগলেন। ১৯০৫-এর ৭ই জুলাই সিমলা থেকে সরকারীভাবে প্রথম ঘোষিত হলো যে আসাম, ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং রাজসাহী বিভাগ (দার্জিলিং বাদে) নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হবে এবং সেই নবগঠিত প্রদেশের নাম হবে 'পূর্ববঙ্গ এবং আসাম'। একটি ব্যবস্থাপক সভা (লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল) এবং একটি রাজস্ব পরিষদ্ (বোর্ড অব্ রেভেনিউ) সহ একজন ছোটলাট সেই প্রদেশ শাসন করবেন। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন যে সংশোধিত পরিকল্পনাটি গোপনে রচিত হয়েছে, গোপনে আলোচিত হয়েছে, গোপনে স্থিরীকৃত হয়েছে; জনসাধারণকে এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আভাস দেওয়া হয়নি।[৬৯] এই ঘোষণা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো সমগ্র বঙ্গভূমি। নানাস্থানে অনুষ্ঠিত সভাসমিতিতে, 'দি বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রমুখ জাতীয়তাবাদী পত্রিকায় প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠলো।[৭০] 'অমৃতবাজার পত্রিকার' ১২ই জুলাই তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অতীত আন্দোলন সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রকারান্তরে দেশবাসীকে আসন্ন সর্বনাশরোধের জন্য 'প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স'-এর শরণ নেবার জন্য বলা হলো। কৃষ্ণকুমার মিত্রের সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' 'কর্তব্য নির্ধারণ' প্রসঙ্গে (১৩ই জুলাই, ১৯০৫) দেশবাসীর প্রতি বিদেশী দ্রব্য 'বয়কটের' আহ্বান জানালো। বাদ-প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলো প্রথমে মফঃস্বল, তারপর মিলিতভাবে মফঃস্বল ও কলকাতাবাসী বাঙালীর কণ্ঠ। কিন্তু সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ১৯শে জুলাই ভারত সরকার সিমলায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ২০শে জুলাই সংবাদপত্রে তা' প্রকাশিত হলো। এই সিদ্ধান্তে পূর্বোক্ত পরিকল্পনা বহাল রইল। স্থির হলো নতুন প্রদেশের রাজধানী হবে ঢাকা এবং দ্বিতীয় সদর হবে চট্টগ্রাম। নতুন প্রদেশের আয়তন হবে ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল এবং মোট জনসংখ্যা হবে তিন কোটি দশ লক্ষ। তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এক কোটি আশি লক্ষ এবং হিন্দু এক কোটি কুড়ি লক্ষ। কলকাতা হাইকোর্টের এলাকা আপাততঃ সঙ্কুচিত হবে না।[৭১]

এই ঘোষণা সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছেন—'আমরা মনে করলাম যে আমরা অপমানিত হয়েছি, অপদস্থ হয়েছি এবং প্রতারিত হয়েছি। আমরা মনে করলাম আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ বিপন্ন, কারণ, এ হচ্ছে বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংহতি ও আত্মচৈতন্যের উপর

ইচ্ছাকৃত আঘাত।'[৭২] সুরেন্দ্রনাথের এই মনোভাব সেদিন সমস্ত আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন বাঙালীর মনোভাব হয়ে উঠেছিল।

এই মনোভাবের চরম প্রকাশ ঘটলো ৭ই আগস্ট কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত অদৃষ্টপূর্ব বিশাল জনসভায়। 'অমৃতবাজার পত্রিকার' ভাষায়—'এই ঐতিহাসিক হলের এক শ' বছরের জীবনে এর পূর্বে এমন বিশাল, এমন প্রতিনিধিত্বমূলক, এমন উৎসাহী অথচ শান্ত জনসমাবেশ আর কখনও হয়নি।[৭৩] এই সভাতেই নেতৃবৃন্দ সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। এই সভাতেই বৃদ্ধ সাংবাদিক নরেন্দ্রনাথ সেন বিদেশী দ্রব্য 'বয়কট'-এর প্রস্তাব পাঠ করেন।[৭৪] সে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'স্বদেশী আন্দোলন'-এরও জন্ম হয়। এই সভাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' জাতীয়তাবাদের মন্ত্ররূপে শতসহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।[৭৫] ঐতিহাসিকের ভাষায় 'এ-ই হচ্ছে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং আধুনিক ইউরোপের জাগরণে ফরাসী বিপ্লবের যে স্থান, আমাদের জাতীয় ইতিবৃত্তে স্বদেশী আন্দোলনও সেই একই গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী'।[৭৬]

প্রতীচীর চোখে প্রাচ্য ভূখণ্ড দীর্ঘকাল যাবৎ অবজ্ঞেয় হয়ে ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম তাঁর চিকাগো বক্তৃতায় (১৮৯৩) ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতীচীর দাম্ভিক মনোভাবের যোগ্য প্রত্যুত্তর দান করেন। তার বারো বছর পরে নবীন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ তার স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতীচীর দাম্ভিকতাকে মারমুখী আহ্বান জানালো। পোর্টস্‌মাউথে জাপানের রাশিয়া-বিজয়, চীনে আমেরিকার পণ্যদ্রব্য বয়কটের সাফল্য সমগ্র প্রাচ্যবাসীর মনে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করলো। স্বদেশী আন্দোলন এই সমস্ত ঘটনা থেকে উদ্দীপনা সংগ্রহ করে দাবানলের মতো বাংলাদেশের শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো।

সিমলা থেকে ১লা সেপ্টেম্বর প্রচারিত বঙ্গবিভাগ সম্পর্কিত এক সরকারী ঘোষণাপত্র ২রা সেপ্টেম্বর কলকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো। তা' থেকে জানা গেল যে বঙ্গবিভাগ ১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে এবং নতুন প্রদেশের ছোটলাট হয়ে আসবেন আসামের চীফ্ কমিশনার মিস্টার জোসেফ ব্যামফাইল্ডে ফুলার।[৭৭]

স্বদেশী আন্দোলনের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিপিনচন্দ্রেরও নবজন্ম হলো। তাঁর সাংবাদিক সত্তা ভিন্ন করে বেরিয়ে এলো তাঁর 'দেশনায়ক'-সত্তা। লেখনীর সঙ্গে যুক্ত হলো কণ্ঠ এবং কায়িক উদ্যোগ। এ যাবৎ তিনি 'নিউ ইণ্ডিয়া'র পৃষ্ঠায় লেখনীর মাধ্যমে নব্য জাতীয়তাবাদের মন্ত্র প্রচার করে আসছিলেন। ১৯০৪-এর প্রথম থেকে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে মত প্রচার করা শুরু করেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের ন্যায়পরায়ণতায় ও বদান্যতায় তিনি তখনও আস্থা হারাতে পারেননি। অন্যান্য নরমপন্থী নেতাদের সুরের সঙ্গে তাঁর সুর ছিল বাঁধা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই সময় পর্যন্ত সমস্ত কংগ্রেসীই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইনকে এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহারানীর ঘোষণাপত্রকে তাঁদের ম্যাগনা-কার্টা বা রাজনৈতিক অধিকারের পাকা দলিল বলে মনে করতেন। বৃটিশ পার্লামেন্টের বদান্যতায় ও ন্যায়পরায়ণতায় তাঁদের সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। তাঁরা মনে করতেন যে বৃটিশ জনসাধারণ এবং বৃটিশ আইনসভার কাছে যথাযথভাবে দাবি পেশ করতে পারলেই তাঁরা সনদ আইনে এবং মহারানীর ঘোষণাপত্রে অঙ্গীকৃত অধিকার অর্জন করতে পারবেন। তাই 'কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিঃসংশয়িত ধারণা ছিল যে বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁরা আশা ও কামনা করতেন যে বৃটিশ শাসন চিরস্থায়ী হোক।'[৭৮] কংগ্রেসের এই ধরনের মনোভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ভারতবর্ষের কোনো কোনো অংশে, বিশেষভাবে বাংলাদেশে সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তির লেখনী থেকেও কংগ্রেসের বিরূপ সমালোচনা নির্গত হয়। বৃটিশ সরকারের পূর্বতন প্রতিশ্রুতি এবং পরবর্তী আচরণের মধ্যে ক্রমশঃ সঙ্গতির অভাবের প্রকাশ আশাবাদী তরুণ দেশকর্মীর একাংশকে ক্রমশঃ বৃটিশ ন্যায়পরায়ণতার প্রতি আস্থাহীন করে তোলে। ১৯০৪-এর শেষভাগ থেকে বিপিনচন্দ্রের মনোভাবও বৃটিশ শাসনের প্রতি কঠোর হতে থাকে। 'নিউ ইণ্ডিয়া'র ২১শে ডিসেম্বর-সংখ্যায় তিনি লিখলেন—'ইংল্যাণ্ড স্বেচ্ছায় ভারতবাসীকে তার দীর্ঘকালের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের সাহায্য করবে এবং যে স্বাধীন সরকারী সংস্থাসমূহকে সে নিজে যথেষ্ট মূল্যবান মনে করে, সেই ধরনের স্বাধীন সংস্থা ভারতবাসীর জন্য স্থাপন করবে—এ বিশ্বাস একদা পোষণ করা হতো, কিন্তু এখন সে আশা নির্মূল হয়েছে।'[৭৯] ঐ প্রবন্ধে তিনি এ-কথাও বললেন যে ভারতবাসীর অন্যান্য জাতির মতো স্বায়ত্তশাসনে অধিকার

আছে এবং সে একটি প্রাচীন সভ্য জাতিরূপে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে যথাযোগ্য স্থান অধিকার করতে চায়।

এই মনোভাবের বশবর্তী হয়েই বিপিনচন্দ্র বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনাময় দিনগুলিতে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রধান প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন। বাংলার রাজনীতিতে অরবিন্দ ঘোষের যোগদানের পূর্বে এইক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক ফিরিঙ্গিভয়হারী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

স্বদেশী আন্দোলন শুধু রাজনীতিক সাংবাদিকদের কাছ থেকেই প্রেরণা পায়নি। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, আইনজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, সর্বস্তরের মানুষ স্বদেশী আন্দোলনে স্ব স্ব শক্তি ও সাধ্য নিয়োগ করেছেন। আর এঁদের কর্মোদ্যোগের নেপথ্যে রয়ে গেছে বিপুল জন-সমর্থন।

নির্ধারিত দিন ১৬ই অক্টোবর সরকারীভাবে বঙ্গবিভাগ কার্যকর করা হলো। অপমানিত, শোকাহত বাঙালী সমগ্র দেশে ঐ দিনটি 'অরন্ধনের দিন' এবং 'রাখি বন্ধনের দিন'-রূপে পালন করলো। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান' গানটি গাইতে গাইতে সহস্র সহস্র লোক গঙ্গাস্নান করতে গেল। গঙ্গায় অবগাহনের সময় শতসহস্র কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো—'বন্দে মাতরম্'। গঙ্গায় শুচিস্নানের পর শুরু হলো রাখি-বন্ধনের পালা। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' গ্রন্থে এই রাখি-বন্ধন উৎসবের মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে।

বিকেলে দুই বাংলার মানুষের মিলনের প্রতীকরূপে পরিকল্পিত 'ফেডারেশন হল' বা মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হলো আপার সার্কুলার রোডের ধারে। রোগে শয্যাশায়ী শ্রদ্ধেয় নেতা আনন্দমোহন বসু 'ইন্‌ভ্যালিড চেয়ারে' বসে সভাপতিত্ব করবার জন্য সভাস্থলে এলেন। দেশবরেণ্য প্রবীণ নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আনন্দমোহনের ইংরেজী অভিভাষণ পাঠ করলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই অভিভাষণের বাংলা অনুবাদ করে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে শোনালেন।

এই সময় শহরে এবং মফঃস্বলে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ছাত্র-আন্দোলন ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। সন্ত্রস্ত সরকার রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করে এক গোপন ইস্তাহার জারী করে। এই ইস্তাহার 'কার্লাইল সার্কুলার' নামে পরিচিত। ২২শে অক্টোবরের সংবাদপত্রে এই কুখ্যাত ইস্তাহারের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিষয়বস্তু প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে গর্জন করে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে এইটাই ছিল সরকারী দমননীতির প্রথম ধাপ। ২৭শে অক্টোবর কলকাতায় পটলডাঙ্গার মল্লিকবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ছাত্রদের এক প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ৪ঠা নভেম্বর কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে কলকাতায় 'য়্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি' স্থাপিত হয়। মূলতঃ রাজনৈতিক কারণে এই সোসাইটির জন্ম হলেও 'অল্পদিনের মধ্যেই এর কর্মধারা আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রসার লাভ করে। জাতীয় শিক্ষার আদর্শকে প্রচণ্ড জাতীয় দাবিতে রূপান্তরিত করতে এই সোসাইটির কর্মীবৃন্দ বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। আর সেই দাবিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য তৎকালে সবচেয়ে বেশী অগ্রণী ছিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ডন সোসাইটি'।[৮০]

স্বদেশী-আন্দোলনের সূচনা বিপিনচন্দ্রের সামনে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বৃহত্তর ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়ে গেল। তিনি সর্বান্তঃকরণে এই নবজাত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করলেন। 'বয়কট' প্রস্তাব যখন প্রথম গৃহীত হয়, তখন বয়কটের উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁর নিজের মনেই সংশয় ছিল। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই তিনি বুঝতে পারলেন যে ঐ শব্দটি সম্পর্কে যে আপত্তিই থাক না কেন, ব্যাপারটি শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও অত্যন্ত হিতকর।[৮১] তাছাড়া 'কার্জন থিয়েটার'-এ অনুষ্ঠিত সভায় দু'হাজার মানুষের সামনে যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'যতদিন পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ না হয়, ততদিন কি আপনারা বৃটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কট করে যেতে পারবেন ?' সমস্বরে শ্রোতৃবর্গ চীৎকার করে উত্তর দিলেন—'বয়কট চিরকালের জন্য'।[৮২] জনসাধারণের রায় তিনি সোৎসাহে অঙ্গীকার করে নিলেন, কারণ, বিপিনচন্দ্রের কাছে জনতার কণ্ঠ ঈশ্বরের কণ্ঠের তুল্য ছিল।

কার্লাইল সার্কুলারের নিষেধ ভঙ্গ করে ছাত্ররা নানা স্থানে আন্দোলনে যোগ দিতে লাগলো। ফলে জরিমানা, বেত্রদণ্ড, বহিষ্কার প্রভৃতি কঠোর শাস্তির আকারে অনিবার্যভাবে রাজরোষ ছাত্রদের উপর বর্ষিত হতে লাগলো। ২৪শে নভেম্বর 'ফিল্ড য়্যাণ্ড য়্যাকাডেমি'র মাঠে জনাব আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে এক বিরাট ছাত্রসভায় ভাষণদানকালে বিপিনচন্দ্র বললেন—"তোমরা মায়ের

নামে প্রতিজ্ঞা করেছ এবার পরীক্ষা দেবে না। আবার দ্বিধা করছ কেন?… সেদিন গোলদীঘিতে যখন নিজেরা বলেছিলে, 'আমরা গোলামখানা ছাড়বো' তখন কার কথা শুনে বলেছিলে? আজ যদি এই 'রাজার মাঠে' দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে বল, 'আমরা এখানে দাঁড়ালাম, ওখানে আর যাব না, যেখানে To let লেখা হয়েছিল, সেখানে আর আমরা যাব না', দৃঢ়ভাবে একথা যদি বলতে পারো, তবে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হবেই হবে। অন্য পন্থা নাই।…পড়াশুনা ছেড়ে দল বেঁধে মুখে বল 'বন্দে মাতরম্', আর প্রাণে মায়ের অভয় নিয়ে যাও,— বরিশালে যাও, যাও মাদারিপুরে যাও, যাও ফরিদপুরে যাও। যেখানে গুর্খা গিয়েছে সেখানে যাও, যেখানে গুর্খা যায় নাই, সেখানে যাও; গিয়ে গ্রামে গ্রামে 'বন্দে মাতরম্' রব তুলে দাও।"[৮৩] বিপিনচন্দ্রের এই বক্তৃতায় বিদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থা বয়কট এবং জাতীয় অর্থাৎ স্বদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থা-প্রবর্তন গুরুত্ব লাভ করেছিল।

একটি বিশেষ রাজনৈতিক অন্যায় প্রতিবিধানের জন্য স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব হলেও এই আন্দোলনকে ভিত্তি করে জাতির চিন্তায় ও চেতনায় হলো নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার উদয়। ফলে, সংগ্রামও ধীরে ধীরে নতুন মূর্তি ধারণ করতে লাগলো। বাংলার প্রাণের স্পন্দন বাঙ্ময় হয়ে উঠলো কবি-কণ্ঠে। রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে একের পর এক বাংলার নিজস্ব সুরে গাঁথা দেশাত্ম-বোধক গান নিঃসৃত হয়ে 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) এবং 'ভাণ্ডার'-এর পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ করে তুলতে লাগলো। ১৩১২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত গান-গুলির মধ্যে নিম্নোক্ত প্রারম্ভিক পংক্তিবিশিষ্ট গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(১) আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি…।

(২) ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা…।

(৩) আমি ভয় করবো না ভয় করবো না…।

আর ১৩১২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার 'ভাণ্ডার'-এ প্রকাশিত গানগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত প্রারম্ভিক পংক্তিবিশিষ্ট গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(১) এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে…।

(২) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে…।

(৩) বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি…।

(৪) তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে…।

(৫) বাংলার মাটি, বাংলার জল···।

(৬) ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে··।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও কত কবির লেখনী থেকে যে দেশাত্মবোধক গানের কলি নির্গত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই।

১৯০৫-এর শেষভাগে বাংলার রাজনীতিতে গরমপন্থী (এক্সট্রিমিস্ট) দলের প্রাধান্য সূচিত হলো। "এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন 'ফিল্ড য়্যাণ্ড য়্যাকাডেমি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপিনচন্দ্র পাল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, রজতনাথ রায়, কৃষ্ণকুমার দত্ত, বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জি, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি। বিপিনচন্দ্র ছিলেন এই গোষ্ঠীর রাজনৈতিক নেতা"।[৮৪] এইভাবে এই বছরের শেষভাগেই নব্য রাজনৈতিক দল (নিউ পার্টি)-রূপে গরমপন্থী দলের আবির্ভাব ঘটে এবং বিপিনচন্দ্র হন তার অবিসংবাদিত অধিনায়ক।

যে মুহূর্তে তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে 'বয়কট'কে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হিতকর ভূমিকায় নিয়োজিত করা যায়, সেই মুহূর্তে তিনি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে বয়কটের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন। ১৯০৫-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'নিউ ইণ্ডিয়া'র পৃষ্ঠায় তিনি লিখলেন যে বয়কট আন্দোলন শুধু অর্থনৈতিক আন্দোলন নয়, তা' হচ্ছে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আন্দোলন; লক্ষ্য—ভারতে নাগরিক স্বাধীনতার (সিভিক অটোনমি) পত্তন।[৮৫] ৩০শে সেপ্টেম্বরের 'নিউ ইণ্ডিয়া'র পৃষ্ঠায় তিনি বয়কটের সংজ্ঞা ব্যাপকতর করে বিদেশী শাসকজাতির সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা বয়কটের কথা বললেন এবং স্বায়ত্ত-শাসনলাভকেই ভারতের রাজনৈতিক আদর্শের চরম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলেন।[৮৬] তখনও 'স্বরাজ' শব্দ এদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যে চালু হয়নি, যদিও স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হয়েছে।

স্বদেশী-আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ একে একে বাংলার মফঃস্বল-শহরগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। স্বদেশী-আন্দোলন যেখানেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, সেখানেই সরকারী রোষ নির্বিচারে নিরীহ নরনারীর উপর বর্ষিত হতে থাকে। রংপুর, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ববাংলার মফঃস্বল-শহর থেকে সরকারী নিপীড়নের সংবাদ আসতে থাকে। তবে সরকারী স্বৈরাচারের নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্তস্থল হয়েছিল বরিশাল। কারণ, বরিশাল ছিল এই আন্দোলনের বৃহত্তম

কেন্দ্র। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা প্রমুখ বরেণ্য নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিকতায় এই আন্দোলন বরিশালে প্রবল আকার ধারণ করেছিল। ১৯০৫-এর নভেম্বর থেকেই গুর্খাসৈন্য লেলিয়ে দিয়ে স্বদেশী এবং বন্দে মাতরম্-এর বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করা হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যখন স্বদেশী-আন্দোলন শুরু হয়, ভগিনী নিবেদিতা তখন অসুস্থ অবস্থায় দার্জিলিঙে ছিলেন। স্বামীজীর তিরোভাবের পর বেলুড় মঠের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সামিল করেছিলেন। স্বদেশী-আন্দোলন দমনের জন্য সরকারী নিপীড়ন এমন কঠোর আকার ধারণ করে যে অসুস্থ দেহ নিয়ে দার্জিলিঙ টাউন-হলে উপস্থিত হয়ে ভগিনী নিবেদিতা দৃপ্তকণ্ঠে ইংরেজ শাসকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন— 'ধিক আমার জন্মভূমির প্রতি!' (শেম্ অন্ মাই কাণ্ট্রি অব্ ওরিজিন!) 'যতদিন না ভারত-সন্তানদের ত্যাগ ও বীরত্ব বাংলার অপমানকর বিভেদচিহ্ন মুছে ফেলতে ইংরেজদের বাধ্য করে এবং যতদিন না ইংরেজরা আমাদের সঙ্গে সসম্মান ব্যবহার করে, ততদিন পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবো'।

১৯০৬-এর এপ্রিল মাসে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মনোনীত সভাপতি ছিলেন জনাব আবদুল রসুল এবং অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। এই উপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ গণ্যমান্য নেতৃবর্গ, বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি বরিশালে সমবেত হন। সভার পূর্বে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ করে এক আদেশ জারী করেন। এই নিষেধ অমান্য করবার জন্য পুলিস নির্বিচারে লাঠি চালনা করে। মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতার পুত্র বালক চিত্তরঞ্জনকে বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করবার অপরাধে পুলিস নির্মম-ভাবে প্রহার করতে করতে রাস্তার ধারে পুকুরের মধ্যে ফেলে দেয়। রক্তে-ভেজা ক্ষতবিক্ষত দেহেও সে বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করতে থাকে। স্বদেশপ্রাণ পিতা মনোরঞ্জন কিন্তু পুত্রের শোচনীয় দশার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ প্রকাশ না করে বলেছিলেন যে, দেশের কাজের জন্য যদি পুত্রের প্রাণ যায়, তাতেও তিনি বিচলিত হবেন না। এই সময় বরিশাল জেলা ছিল নবগঠিত প্রদেশ 'পূর্ববঙ্গ এবং আসাম'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং সেই প্রদেশের ছোটলাট ছিলেন মিঃ ফুলার।

স্বদেশী-যুগের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বরিশালের এই ঘটনা সম্পর্কে জানিয়েছেন যে তিনি ছিলেন চতুর্থ সারিতে এবং তখনও সেই সারি পুলিস কর্তৃক আক্রান্ত হয়নি। এই সময় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং মিঃ জে. চৌধুরী জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এমার্সন এবং এস পি. মিঃ কেম্পের সঙ্গে বাদানুবাদ করছিলেন। তিনি সহসা দেখতে পেলেন বিপিনচন্দ্র পাল এবং মিস্টার চৌধুরী ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস্. পি.-র টাটুঘোড়ার লাগাম ধরে রয়েছেন যাতে তাঁরা সহসা চতুর্থ সারির দিকে আর অগ্রসর হতে না পারেন। তখন তাঁর মতে বিপিনচন্দ্র ছিলেন যুব ও ছাত্রসমাজের 'পয়লানম্বর নেতা' (দি হিরো নম্বর ওয়ান)।[৮৭]

বরিশাল কনফারেন্স সম্পর্কে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য—'এই শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে বরিশাল কনফারেন্সের গুরুত্ব খুব বেশী। কেননা, এখানেই গভর্নমেন্টের অতর্কিত দমননীতির বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রথম সংঘর্ষ ও পরীক্ষা হয়।···নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রয়োগে বাংলা ১৯০৬, ১৪ই এপ্রিল সমগ্র ভারতবর্ষের গুরু'।[৮৮]

১৯০৬-এর প্রথমার্ধে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অরবিন্দ ঘোষের অতর্কিত আবির্ভাব এবং স্বদেশী-আন্দোলনের জন্য বেপরোয়া সরকারী নির্যাতন আন্দোলনে মূল লক্ষ্যের রূপান্তর ঘটালো। জনৈক ইংরেজ সমীক্ষকের ভাষায়—'বিভাগের সমস্যা পিছনে সরে গেল ; যে প্রশ্ন তখনও পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন প্রকাশ্যভাবে উত্থাপিত হয়েছে, সে প্রশ্ন—অর্থাৎ বাংলা বৃটিশ শাসনাধীনে একটি অবিভক্ত প্রদেশে পরিণত হবে কি দু'টি প্রদেশ থাকবে তা' নয়, সে প্রশ্ন হলো—বাংলা তথা ভারতবর্ষের কোথাও বৃটিশ শাসনই বলবৎ থাকবে কি না'।[৮৯] সত্যই তা'ই। দুই বাংলার ঐক্য, স্বদেশী পণ্যের প্রসার, বিদেশী দ্রব্য বয়কট, জাতীয় শিক্ষা এবং স্বাধীনতালাভ বা স্বরাজ—এই পাঁচটি বিষয় লক্ষ্যের অঙ্গীভূত করে স্বদেশী আন্দোলন অগ্রগত হলেও স্বাধীনতা-লাভ বা স্বরাজ-ই গরমপন্থী (এক্সট্রিমিস্ট) এবং চরমপন্থী (টেররিস্ট বা রিভলিউশনারী) চিন্তায় মূল লক্ষ্যের স্থান অধিকার করেছিল। আর এই নব চেতনার গুরুত্বেই বাংলার আন্দোলন সারা ভারতের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছিল এবং এরই আকর্ষণে বাংলার বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, অশ্বিনীকুমারের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিলেন মহারাষ্ট্র-কেশরী বালগঙ্গাধর তিলক এবং পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়।

স্বরাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ১৯০৬-এর ৬ই সেপ্টেম্বরের 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র একটি প্রবন্ধে তথাকথিত বৃটিশ বন্ধুদের সহানুভূতির কথা উল্লেখ করে ঐতিহাসিক ঘোষণা করে বললেন—'তাঁরা ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থার মূল বৃটিশত্ব কোনোক্রমে ক্ষুণ্ণ না করে তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে চান ; আমরা তাকে সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বায়ত্তশাসনাধীন করতে চাই।'[৯০] এর প্রায় তিনমাস পরে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলকাতা কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্থে 'স্বরাজ' দাবি করা হয়।

১৮ই সেপ্টেম্বর বন্দে মাতরম্-এ প্রকাশিত আর একটি প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র বৃটিশ-নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভের উপায় ব্যাখ্যা করে বললেন—'আমাদের উপায় হচ্ছে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, যার অর্থ ঐচ্ছিক এবং অবৈতনিক যে কোনো প্রকার সরকারী কাজ করতে অস্বীকার করবার সুসংবদ্ধ সঙ্কল্প।' কারণ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সার্থক করে তুলতে পারলে প্রচলিত শাসনযন্ত্র সহজেই বিকল হয়ে পড়বে।[৯১] ঐ প্রবন্ধে তিনি ভারতে স্বায়ত্তশাসনাধিকারকামীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আরও বললেন যে তাঁরা সশস্ত্র কার্যকলাপ এবং বেআইনী কাজের বিরোধী। তার কারণ বৃটিশের সংবেদনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নয় ; তার কারণ, বর্তমানে এ দেশের মানুষ যে পরিবেশে বাস করছে তাতে ঐ ধরনের পন্থা মূল উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে আত্মঘাতী হবে। তারপর তিনি মন্তব্য করলেন—'বাতুলাশ্রমের বাইরে এমন কেউ নেই যে ভারতবর্ষের বর্তমান অসহায় অবস্থায় নাগরিক স্বাধীনতা লাভের জন্য সশস্ত্র বা বেআইনী পন্থার কথা চিন্তা করবে বা উপদেশ দেবে।'[৯২]

বিপিনচন্দ্র-প্রচারিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে অরবিন্দ বন্দে মাতরম্-এ প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে (৯ই এপ্রিল থেকে ২৩শে এপ্রিল, ১৯০৭-এর মধ্যে প্রকাশিত) দার্শনিক তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন—একথা 'সাংবাদিক' পর্যায়ের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়েই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সংগঠক ও প্রচারক হলেও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-বিষয়ক ধারণায় উভয়ের অনৈক্য লক্ষণীয়। বিপিনচন্দ্রের ভাষায় 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অ-সক্রিয় নয়, তবে অনাক্রমণমূলক প্রতিরোধ। আমরা আমাদের অধিকারের উপর দাঁড়াতে চাই। অদ্যাপি দেশে যে আইন প্রচলিত আছে, তার সীমার মধ্যে আমাদের অবস্থান।'[৯৩] কিন্তু অরবিন্দের মতে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অবশ্য একটা সীমা আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাহিক-

বর্গের কার্যকলাপ শান্তিপূর্ণ এবং সংগ্রামের বিধির মধ্যে আবদ্ধ, ততক্ষণ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারী সযত্নে তার নিষ্ক্রিয়তার মনোভাব রক্ষা করে চলবে · ··· যদি নির্বাহিকের শাসনযন্ত্র উপস্থিত ব্যক্তিদের মাথা ভেঙে আমাদের সভা পণ্ড করা স্থির করে, তা'হলে আত্মরক্ষার অধিকার শুধু আমাদের মাথা বাঁচাবার অধিকারই দেবে না, যারা মাথা ভাঙবে তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ারও অধিকার দেবে'।[৯৪] এই ধরনের মানসিক প্রবণতার জন্যই অরবিন্দের রাজনীতি দ্বৈতধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। অরবিন্দের রাজনীতি গরম ও চরম—উভয় পন্থার সমন্বয়ে সম্পূর্ণ। 'বন্দে মাতরম্-এর অরবিন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অরবিন্দ। ১৯০৬ সনের আগস্ট মাসে ফুলার সাহেব নিরাপদে গঙ্গা পার হইয়া বিলাত রওনা হইবার পরে, আমরা বন্দে মাতরম্-এর অরবিন্দকে পাই। তার পূর্বে নয়। আর ১৯০৬ মে-জুন-জুলাই—আমরা ফুলারবধের ও রংপুর প্রথম ডাকাতির সর্বময় নেতারূপে অরবিন্দকে পাই'।[৯৫] প্রতিরোধের শ্রেণীবিভাগ করতে যিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা বলছেন, আক্রমণাত্মক প্রতিরোধের কথা বলছেন, তিনিই আবার বলছেন—'আমাদের ভাব হচ্ছে রাজনৈতিক বেদান্তবাদ। পরশাসনমুক্ত এক ও অবিভাজ্য ভারতবর্ষ হচ্ছে সেই দিব্য উপলব্ধি যার দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি—মুক্তিই আমাদের লক্ষ্য'।[৯৬] রাজনৈতিক পন্থায় পার্থক্য থাকলেও অরবিন্দের মতো বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনাও ছিল আধ্যাত্মিকতার সুরে অনুরণিত। স্বদেশী যুগের নতুন আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র বন্দে মাতরম্-এ লিখেছিলেন—'এ আন্দোলন শুধু অর্থনৈতিক আন্দোলন নয়' যদিও দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য এ আন্দোলন প্রকাশ্যভাবে সচেষ্ট। এ শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, যদিও পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ এর বলিষ্ঠভাবে বিঘোষিত লক্ষ্য। এ হচ্ছে তীব্র আধ্যাত্মিক আন্দোলন ; শুধু অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়ন অথবা রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ এর উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় পৌরুষ ও নারীত্বের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি।'[৯৭] এই দিক লক্ষ্য করেই মিস্টার নেভিনসন মন্তব্য করেছিলেন—'পুণার গরমপন্থীদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের নিজের এবং বাংলার অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের উক্তির তুলনা করলে দেখা যায় শেষোক্তদের উক্তির মধ্যে একটা ধর্মীয় সুর, একটা আধ্যাত্মিক সমুন্নতির ভাব আছে, যা' এদের বৈশিষ্ট্য'।[৯৮]

গণ-আন্দোলনের প্রবল ধাক্কায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্ধত নায়ক লর্ড কার্জন ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে আগেই বিদায় নিয়েছিলেন। ১৯০৫-এর ২১শে আগস্ট, বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার পূর্বেই, ইংল্যাণ্ড থেকে রয়টারের মারফত জানতে পারা যায় যে কার্জনের পদত্যাগপত্র বৃটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং লর্ড মিণ্টো তাঁর স্থলে ভারতের নতুন ভাইসরয় নিযুক্ত হয়েছেন। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে তিনি অবসর গ্রহণ করেন নভেম্বরে এবং লর্ড মিণ্টো সেই সময় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন। লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যাপারে ফুলার সাহেবের মতানৈক্য হওয়ায় ফুলার সাহেবকেও ১৯০৬-এর আগস্ট মাসে বিদায় নিতে হলো। বাংলাদেশের রাজনৈতিক রঙ্গভূমি থেকে স্বৈরাচারী প্রাদেশিক শাসক ফুলারের অতর্কিত বিদায়গ্রহণ জাতীয়তাবাদীদের মনে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করলো।

এই পটভূমিকায় স্বাধীনতা, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা এবং বয়কটের মন্ত্র প্রচার করবার জন্য বিপিনচন্দ্র ৬ই আগস্ট 'বন্দে মাতরম্'-এর সদ্য-প্রকাশিত প্রথম সংখ্যা হাতে নিয়ে কলকাতা থেকে শ্রীহট্ট যাত্রা করলেন। প্রায় দু'সপ্তাহকাল শ্রীহট্টে কাটিয়ে তিনি ২০শে আগস্ট থেকে ৯ই ডিসেম্বরের মধ্যে কুমিল্লা, শিলচর, মাহেশপুর (যশোহর), চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা এবং পুরুলিয়া পর্যটন করেন। এর মধ্যে অক্টোবর-নভেম্বরে কিছুদিনের জন্য তিনি কলকাতায় এসেছিলেন।

'পাল ছিলেন অগ্নি-আহারী ও অগ্নি-উদ্গারী'।[৯৯] তাঁর বাগ্মিতা ছিল উদ্দীপক রসায়নের মতো তেজস্কর; তা' সহজেই নিরাশ ও নির্জীবকে নতুন উদ্দীপনায় মত্ত করে তুলতে পারতো। বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতা জনমনে কী পরিমাণ সাড়া জাগিয়েছিল তা' সমসাময়িক পুলিস-রিপোর্ট এবং গোপনীয় আই. বি. রেকর্ড থেকে জানতে পারা যায়। সমসাময়িক পুলিস-রিপোর্ট থেকে জানা যায় 'বিপিনচন্দ্রই ছিলেন ভ্রাম্যমাণ রাজদ্রোহী বক্তাদের মধ্যে প্রধান, তাঁর মতো আর কেউ সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনকে উত্তেজিত করতে পারেনি।'[১০০] পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের বিপিনচন্দ্র পাল সংক্রান্ত গোপনীয় ফাইলে বলা হয়েছে—'জেলাগুলি যখন শান্ত হয়ে আসে, বয়কট থেমে যায়, এবং আন্দোলন মুমূর্ষু হয়ে পড়ে তখনই বিপিনচন্দ্র পাল অথবা আবদুল গফুরকে, বিশেষ করে বিপিনচন্দ্র পালকে, উত্তেজনা জাগিয়ে তোলবার জন্য পাঠানো হয়। তিনি ভালো বক্তা, শ্রোতৃবৃন্দকে মতানুবর্তী করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। তিনি

যেখানেই যান, সেখান হতে চলে আসবার পর সেই জায়গায় তাঁর প্রভাব অন্যান্য আন্দোলনকারীদের চেয়ে ঢের বেশী অনুভব করা যায়'।[১০১]

১৯০৬-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বিপিনচন্দ্র পর্যটন-অন্তে কলকাতায় ফিরে এলেন। এই মাসের শেষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বাবিংশতম কংগ্রেসে 'বয়কট'-এর ব্যাপকতর প্রয়োগ নিয়ে তাঁকে মহামতি গোখেলের সঙ্গে বাক্-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হলো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বয়কট প্রথমে বিদেশী কাপড়, বিদেশী নুন ও চিনি এবং বিদেশী এনামেলের জিনিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছিল। পরে ইংরেজী পণ্য, ইংরেজী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ইংরেজের আদালত এবং ইংরেজের শাসন-ব্যবস্থা বয়কটের আওতায় আসে। কলকাতা কংগ্রেসে বয়কট সম্পর্কে যে গ্রহীতব্য প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তাতে বাংলাদেশে পরিচালিত বয়কট আন্দোলনকে সমর্থন জানানো হয় কিন্তু বয়কটের ক্ষেত্র এবং সর্বভারতীয় স্তরে বয়কটের প্রয়োগ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ থাকে না। বিপিনচন্দ্র ঐ প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গ এবং আসাম প্রদেশে বয়কটের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বৃটিশ পণ্যবর্জন এবং বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সর্বপ্রকার মানদেয় (অনারারী) সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঐ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন।[১০২] কিন্তু মহামতি গোখেল বিপিনচন্দ্রের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন—'বাংলা দেশের দুর্দশা এবং যন্ত্রণায় আমরা বাংলার পাশে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু যে পথে আমরা যেতেও পারি বা নাও যেতে পারি তেমন পথে যেন বাংলা আমাদের টেনে নিয়ে না যায়।'[১০৩]

বয়কট এবং স্বদেশী—কোনোটিই স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি নয়। অনেকদিন আগে থেকেই ভারতবাসীর মনে এ দু'টি ভাবের উদয় হয়েছিল। তবে স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে এই দু'টি ভাব সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছিল। স্বদেশী-আন্দোলনের পন্থা ছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সেরা হাতিয়ার ছিল বয়কট। কিন্তু এই বয়কটের স্বরূপ ও রীতিসম্পর্কে সমকালীন নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐকমত ছিল না। বয়কটকে বিপিনচন্দ্র জনমনে 'পরাজয়' সম্পর্কিত চেতনা এবং 'স্বরাজ' সম্পর্কিত আকাঙ্ক্ষা উদ্রেকের মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।[১০৪] তিলক বয়কটকে 'রাজনৈতিক যোগ' আখ্যা দিয়ে গীতার সুরে সুর মিলিয়ে (স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ) বলেছিলেন যে যোগের মতো বয়কটেও এই ধর্মের অল্পও মহৎ ভয় থেকে ত্রাণ

করে।[১০৫] শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—'ক্ষত্রিয়ের নীতিবোধ যুদ্ধের সময় সশস্ত্র আঘাত সমর্থন করে এবং বয়কট হচ্ছে যুদ্ধ। বোস্টন বন্দরে বৃটিশ চা নিক্ষেপের জন্য যেমন আমেরিকানদের উপর কেউ দোষারোপ করে না, একই নৈতিক কারণে ভারতবর্ষে অনুরূপ কার্যকলাপের অনুষ্ঠানকেও তেমনি কেউ নিন্দা করতে পারে না। আইন, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলার দিক থেকে একাজ নিন্দনীয় হতে পারে কিন্তু রাজনৈতিক নীতিবোধের দিক থেকে নয়'।[১০৬]

রাজনৈতিক নেতা না হয়েও কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন স্বদেশী-আন্দোলনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্ব-রচিত গানে ও প্রবন্ধে যেভাবে বাঙ্ময় করে তুলেছিলেন, সে-কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু 'স্বদেশী'র প্রধান প্রবক্তা হয়েও তিনি বয়কটকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। বয়কটকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন সংগ্রামের একটা শক্তিমান অস্ত্ররূপে গণ্য করছেন, তখন নির্ভীক কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ বললেন—"আমি আপনাদের কাছে স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, বাঙালীর মুখে 'বয়কট' শব্দের আস্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি। আমাদের পক্ষে এমন সঙ্কোচজনক কথা আর ন'ই। বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ। আমরা নিজের মঙ্গলসাধনের উপলক্ষে নিজের ভালো করিলাম না, আজ পরের মন্দ করিবার উৎসাহেই নিজের ভালো করিতে বসিয়াছি, এ কথা মুখে উচ্চারণ করিবার নহে।······আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দেশে স্বদেশী উদ্যোগ আজ যে এমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বয়কট তাহার প্রাণ নহে। একটা তুচ্ছ কলহের ভাব কখনই দেশের অন্তঃকরণকে এমন করিয়া টানিতে পারিত না। এই যে স্বদেশী উদ্যোগের আহ্বান মাত্রে দেশ এক মুহূর্তে সাড়া দিয়াছে, কার্জনের সঙ্গে আড়ি তাহার কারণ হইতেই পারে না; জগতে কার্জন এত বড় লোক নহে,···'[১০৭] বয়কটের মধ্যে যে অভাবাত্মক দিক ছিল, সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের সংগঠনমূলক মনোভাব তাকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। তা' ছাড়া তাঁর সিদ্ধান্ত দরদী কবির সিদ্ধান্ত, আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধিকামী রাজনীতিকের সিদ্ধান্ত নয়। অবশ্য একথাও স্মরণীয় যে বিপিনচন্দ্রও নির্বিচারে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের পক্ষপাতী ছিলেন না। বিদেশী দ্রব্যের নামে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, অস্ত্রশস্ত্র, রেলওয়ে, ট্রাম, ইংরেজী পুস্তকাদি কিংবা বৈদ্যুতিক আলো বয়কটের তিনি বিরোধী ছিলেন। কারণ, তা' হলে তাঁর মতে ভারতবাসীকে আবার বর্বরতার যুগে ফিরে যেতে হবে।[১০৮]

কলকাতা কংগ্রেসেই নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের মধ্যে বিচ্ছেদ প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। অবশ্য এর এক বছর আগে (১৯০৫) বারাণসী কংগ্রেসেই উভয়পন্থীদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও উপায়গত বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। হোমী মোদী লিখেছেন—'দাক্ষিণাত্য ও বাংলা নতুন বাণী প্রচারের দু'টি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই দু'টি কেন্দ্র থেকেই মিস্টার বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রের সেই ঝঞ্ঝাপ্রিয় মানুষ বালগঙ্গাধর তিলকের প্রেরণাধীনে ক্রমবর্ধমান তরুণ এবং আক্রমণমূলক মনোভাবাপন্ন রাজনীতিকেরা পত্র-পত্রিকা ও মঞ্চের মারফত সেই নতুন বাণী প্রচার করতে থাকে'।[১০৯] এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়। ১৯০৫-এর বারাণসী কংগ্রেসের ১৩নং গৃহীত প্রস্তাবে বাংলার বয়কট আন্দোলন সমর্থিত হয়। লালাজী এই অধিবেশনে কংগ্রেসের পুরানো ভিক্ষুক-নীতির (মেণ্ডিকেণ্ট পলিসি) বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানান। এই কংগ্রেসেই তিনি প্রথম কংগ্রেসমঞ্চ থেকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করেন। তিনি বলেন—'যে পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বৈধ, সম্পূর্ণভাবে আইনসঙ্গত এবং সম্পূর্ণভাবে সমর্থনীয়, সে হচ্ছে—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পদ্ধতি।'[১১০] এইভাবেই বাংলা ও মহারাষ্ট্রের চিন্তাধারার সঙ্গে পাঞ্জাবের চিন্তাধারার সাযুজ্য ঘটে এবং 'লাল-বাল-পাল'-এই ত্রয়ী নাম পূর্ণ স্বরাজকামী ভারতবাসীর কাছে জপমন্ত্র হয়ে ওঠে। এই সময় (১৯০৫) লালাজীর বয়স ৪০, তিলকজীর বয়স ৪৯ এবং বিপিনচন্দ্রের বয়স ৪৭। কলকাতা কংগ্রেসে (১৯০৬) সভাপতির অভিভাষণে দাদাভাই নৌরজী আবেগময় মুহূর্তে যে 'স্বরাজ'-এর কথা উল্লেখ করেন, কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবে তা' ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনরূপে উল্লিখিত হয়। কিন্তু গরমপন্থীদের তা' মনঃপূত হয় না। তাঁরা 'স্বরাজ' অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থন করেন।

গরমপন্থীরা নিজেদের 'জাতীয়তাবাদী' বলে পরিচালিত করা পছন্দ করতেন। যাই হোক, গরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদী-ব্যাখ্যাত এই স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের বাণী বহন করেই বিপিনচন্দ্র ১৯০৭-এর প্রথমার্ধ ব্যাপক প্রচার-পর্যটনে অতিবাহিত করেন। জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে তিনি রংপুর, দিনাজপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, শিলচর, বদরপুর, কটক, ভিজাগাপটম্, ভিজিয়ানাগ্রাম, কোকনদ, রাজামুন্দ্রি, মাদ্রাজ এবং তারপর কলকাতা হয়ে জুন মাসে যশোহর

পর্যটন করেন।[১১১] যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই তিনি স্বদেশী-আন্দোলনের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে স্বরাজলাভের জন্য দেশের মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

এই ভ্রমণ-সূচীর অন্তর্গত তাঁর মাদ্রাজ-ভ্রমণই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১লা মে (১৯০৭) বিপিনচন্দ্র বিপুল গণ-অভ্যর্থনার মধ্যে মাদ্রাজে উপস্থিত হন। ২রা মে থেকে ৯ই মের মধ্যে তিনি পাঁচটি বক্তৃতা দান করেন।[১১২] 'দি নিউ মুভমেণ্ট' (নতুন আন্দোলন) শীর্ষক প্রথম বক্তৃতাটি শ্রীসুব্রামনিয়া আয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত। এই বক্তৃতায় বিপিনচন্দ্র বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় উদ্ভূত নতুন আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি ও সাফল্য এবং স্বদেশী ও স্বরাজের আদর্শ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে জনসাধারণকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে আহ্বান জানান। নতুন আন্দোলন যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, মূলতঃ আধ্যাত্মিক আন্দোলন, সে কথাও আলোচনা প্রসঙ্গে পরিস্ফুট করে তোলেন। অন্যান্য বক্তৃতাগুলির মধ্যে তিনি স্বরাজের বাণী, স্বরাজলাভের উপায়, বয়কট অথবা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রকৃতি ও পদ্ধতি, জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায় হৃদয়গ্রাহী বাক্‌ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। বিপিনচন্দ্র এই সমস্ত বক্তৃতায় 'স্বরাজ'কে পূর্ণস্বাধীনতা অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতের জন-জাগরণে বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতা কী অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিল, কয়েকটি ঘটনা থেকে তার প্রমাণ মেলে। শ্রীবৈকুণ্ঠম্ থেকে আর. সুব্বিয়ার নামে জনৈক দক্ষিণ ভারতবাসী বন্দে মাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ১৯০৭-এর ২৩শে ডিসেম্বর একখানি পত্র লেখেন। তাতে তিনি জানান যে বিপিনচন্দ্রের হৃদয়স্পর্শী মাদ্রাজ-বক্তৃতার পরেই দক্ষিণ ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং তাঁরা, যাঁরা সুদূরতম দক্ষিণ জেলার অধিবাসী, তাঁরাও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা আত্মস্থ করা শুরু করেছেন। শুধু তা'ই নয়, ইতিমধ্যে তাঁরা একটি জাতীয়তাবাদী দলও তৈরী করেছেন এবং গরমপন্থীদের সমর্থনের জন্য সেই জাতীয়তাবাদীদের তাঁরা সুরাটে পাঠিয়েছিলেন।[১১৩] নতুন আন্দোলনের ভাবধারা প্রচারে অধিনায়কের ভূমিকা গ্রহণের জন্য বিদেশী সরকার বিপিনচন্দ্রকে 'আর্চ সিডিশনিস্ট' বা ধূর্ত রাজদ্রোহী নামে চিহ্নিত করেন এবং ১৯১৮-র 'সিডিশন কমিটি রিপোর্টে' বলা হয় যে বিপিনচন্দ্রের মাদ্রাজ-বক্তৃতার পরেই দক্ষিণ ভারতে রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপ

সহসা বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আদালতে বেশ কয়েকটি বিচার অনুষ্ঠিত হয়।

মাদ্রাজে আরও কয়েকটি স্থানে বক্তৃতা দানের জন্য তাঁর কাছে আহ্বান এসেছিল। কিন্তু সহসা ১০ই মে ভারতীয় সংবাদপত্রে লালা লাজপত রায়ের নির্বাসনের সংবাদ প্রকাশিত হলো। বিপিনচন্দ্র বাকী কর্মসূচী বাতিল করে কলকাতায় ফিরে এলেন। বাংলাদেশে যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন তিনি দিগ্বিজয়ী বীর।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, লালাজীর প্রতি নির্বাসনদণ্ডাদেশ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের প্রতি সরকারী দমননীতি প্রয়োগের একটি নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যে আইনে এই দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়, সে হচ্ছে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন আইন। মারাঠা যুদ্ধের সময় এই আইনের জন্ম হয় এবং এই আইনের বলে সরকার যে কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে রাজবন্দী করে রাখতে পারতেন। স্পষ্টতই এই আইন স্থানীয় অবাধ্য শাসকপ্রধানদের শাস্তিবিধানের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল। 'কিন্তু প্রায় এক শতাব্দীকালের সুদীর্ঘ ব্যবধানে সরকার তাঁদের অস্ত্রাগার থেকে এই মরিচা-ধরা অস্ত্র সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য বের করে আনলেন।'[১১৪] ১৯০৮-এর ডিসেম্বর মাসে এই আইনে অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ নয়জন বিশিষ্ট বাঙালী নেতার প্রতি নির্বাসন দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। অথচ এদের কেউই সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

বিপিনচন্দ্র কলকাতায় ফিরে আসবার দু'সপ্তাহের মধ্যেই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ২৫শে মে কলকতায় অনুষ্ঠিত শক্তি-উৎসবে বক্তৃতাদানকালে তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে প্রতি অমাবস্যার রাত্রিতে রক্ষাকালী পূজা করে রক্ষাকালীর সামনে ১০৮টি শ্বেত ছাগল বলিদানের জন্য উপদেশ দেন। বিপিনচন্দ্রের এই বক্তৃতার জন্য সে সময় বেশ খানিকটা আন্দোলন ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। 'য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ শ্বেত ছাগলের অর্থ য়ুরোপীয় ধরিয়া বিপিনচন্দ্রের দণ্ড প্রার্থনা করেন।'[১১৫]

এর অল্পদিন পরেই বন্দে মাতরম্ ফৌজদারী মামলার সূচনা হয়। সেই মামলায় জড়িত হয়ে স্বেচ্ছায় কারাবরণের ফলে বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়। ১৯০৭-এর মধ্যভাগ থেকে সরকার

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে দেশীয় সংবাদপত্র-দলনে তৎপর হয়ে উঠলেন। সরকারী রোষের প্রথম বলি হলো 'যুগান্তর' পত্রিকা, দ্বিতীয় বলি 'বন্দে মাতরম্'। ২৭শে জুনের বন্দে মাতরম্-এ প্রকাশিত 'পলিটিক্স ফর ইণ্ডিয়ানস্' (ভারতবাসীদের জন্য রাজনীতি) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ এবং ২৬শে জুলাই-এর বন্দে মাতরম্-এ 'যুগান্তর'-পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি রাজদ্রোহ-মূলক প্রবন্ধের অনুবাদ পুনঃপ্রকাশের অপরাধে ১৬ই আগস্ট বন্দে মাতরম্-এর নামবিহীন সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা প্রকাশিত হলো। যুগান্তরে প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধের জন্য 'যুগান্তর' পত্রিকার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছিল। অরবিন্দ গ্রেপ্তার হয়ে জামিনে খালাস হয়ে এলেন। ১৯শে এবং ২১শে আগস্ট যথাক্রমে বন্দে মাতরম্-এর কার্যাধ্যক্ষ হেমচন্দ্র বাগচী এবং মুদ্রাকর অপূর্বকৃষ্ণ বসুর বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা জারী হলো। এই ব্যাপারে উদ্ভূত ফৌজদারী মামলার প্রথম শুনানির দিন ধার্য হলো ২৬শে আগস্ট। বন্দে মাতরম্ অফিসে খানাতল্লাসির সময় ২৬শে মে তারিখ-সম্বলিত বন্দে-মাতরম্-এর সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লেখা বিপিনচন্দ্র-স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পুলিসের হস্তগত হলো। এই সূত্র ধরে পত্রখানি সনাক্ত করবার জন্য বিপিনচন্দ্রকেও চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার কিংস্ফোর্ডের আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষ্যদানের আদেশ হলো।

আদালতের দরজা খোলা হবার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট ছাত্রদল আদালত-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলো। আদালতের ঘরে ও বারান্দায় যাদের জায়গা হলো না, তারা পার্শ্ববর্তী রাস্তার উপর পায়চারি করতে লাগলো। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় পুলিস আগে থেকেই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে ইউরোপীয় পুলিস ছিল সংখ্যায় পর্যাপ্ত। বেলা প্রায় ১১টার সময় বিপিনচন্দ্র সাক্ষীদের প্রতীক্ষালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে অভিযুক্তেরা পুলিস-প্রহরাধীনে বন্ধুবান্ধবসহ উপস্থিত ছিলেন। একজন ইউরোপীয় কনস্টেবল বিপিনচন্দ্রকে ঐ ঘর থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি অনড় রইলেন। কিছুসংখ্যক ছাত্র কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এগিয়ে যেতেই পুলিস চাপ দিয়ে পিছনে হটিয়ে দিল এবং এর ফলে কয়েকজন ছাত্র আহত হলো। এই সময় একজন ছাত্র বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করে উঠলো; সঙ্গে সঙ্গে পুলিস প্রবল শক্তিতে ছাত্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের আক্রমণ করে বসলো।[১১৬]

সময়মতো বিপিনচন্দ্রের ডাক পড়লো। তিনি শপথ নেবার আগেই বলে উঠলেন—'এই মামলার কাজে শপথ গ্রহণ করায় বা অন্য কোনভাবে অংশ গ্রহণ করায় আমার বিবেকসম্মত আপত্তি আছে'।[১১৭] হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন—'এই ফৌজদারী মামলা শুরু হওয়ার সময় থেকেই আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এসেছি যে এই ধরনের কাজ অন্যায় এবং জনসাধারণের স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর'।[১১৮] মামলার দ্বিতীয় দিনে তিনি একইভাবে আদালতের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭৮ ও ১৭৯ ধারানুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার (কনটেম্পট্ অব্ কোর্ট) অভিযোগ এনে তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার আর. এ. এন্ সিংহের আদালতে তাঁর বিচারের ব্যবস্থা হলো। মিস্টার হিউম সরকারপক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনা করেন এবং আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এবং রজত রায়। আদালত-অবমাননার এই মোকদ্দমায় বিপিনচন্দ্র নির্ভীকচিত্তে জবাব দিতে উঠে বলেছিলেন—'ফলাফল যাই ঘটুক তার জন্য আমি পরোয়া করি না। আইনের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যার উপর আমি দাঁড়াইনি ; আমি দাঁড়িয়েছি আমার অধিকারের উপর, যে অধিকার প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার এবং সেই অধিকারের বলে বলছি—আমার বিবেক এর বিরুদ্ধে এবং আমার বিবেক এই ধরনের অন্যায় ফৌজদারী মামলায় সাহায্য করতে আমাকে জোরালো ভাষায় নিষেধ করছে। এর জন্য যদি আমার শাস্তি হয়, বেশ, তা'ই হোক'।[১১৯]

মামলায় বিপিনচন্দ্র দোষী সাব্যস্ত হলেন এবং ১০ই সেপ্টেম্বর মামলার শেষ দিনে তাঁর প্রতি ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হলো। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় লিখলেন—'আমাদের বিপিনচন্দ্র কাল জেলে গেছেন। যাঁর নাম উচ্চারণ করলে সারা ভারত সাড়া দিয়ে ওঠে, যাঁর নব্য রাজনীতির ব্যাখ্যানে হিন্দুস্থানের জাতিসমূহ মুগ্ধ—সেই বিপিনচন্দ্রকে ওরা কাল জেলে পাঠিয়েছে। বিপিনচন্দ্রের এই কারাবরণ ইতিহাসে লিখিত থাকবে, পুরুষ-পুরুষানুক্রমে নর-নারীর হৃদয়ে মুদ্রিত থাকবে।'

২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯০৭) অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' মামলায় মুক্তিলাভ করলেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর গ্রীয়ার পার্কে এক সভা হলো। সভার উদ্দেশ্য ছিল—বিপিনচন্দ্র যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করে অরবিন্দের মোকদ্দমায় সাক্ষ্য না দিয়ে জেলে

গেছেন, তার জন্য তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা। প্রায় বারো হাজার লোক এই সভায় সমবেত হয়েছিল। এই সভার সভাপতি ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। সভা আরম্ভ হবার অনেক পরে তিনি এলেন এবং এসে বললেন যে যদিও তিনি বিপিন পালের কারাবাসের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করতে এসেছেন, তবু বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক মতের সঙ্গে তাঁর ঐক্য নেই। এই কথা ক'টি বলেই তিনি কৃষ্ণকুমার মিত্রকে সভাপতি করে সভাস্থল পরিত্যাগ করলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বন্দে মাতরম্ পত্রিকায় মন্তব্য করা হলো : 'আমি বিপিনকে সমাহিত করবার জন্য এসেছি, তার প্রশংসা করবার জন্য নয়— বুধবারে পার্শিবাগানে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রায় এই কথাই বলা যেত। আমরা গভীর ভাবে ভাবছি যে বাংলাদেশের নেতার সেদিন গ্রীয়ার পার্কের বক্তৃতায় উপলক্ষের গুরুত্ব অনুভূত হলো না। যে বারো হাজার লোক তাঁর চারিপাশে সমবেত হয়েছিল, তারা তাঁর উক্তির মধ্যে এমন একটা মনোভাবের প্রকাশ আশা করেছিল, যে মনোভাবের দ্বারা বিপিনচন্দ্র পাল সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন'।[১২০] এই বক্তৃতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ও মন্তব্য করেছেন—'সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতায় অনেকে বিরক্ত হয়েন। বক্তৃতাটি শোভন হয় নাই। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ অন্য স্থানেও এইরূপে হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন'।[১২১]

প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে এবং পরে বক্সার জেলে কারাবাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ করে ১৯০৮-এর ৯ই মার্চ বিপিনচন্দ্র মুক্তি লাভ করলেন। জনজীবন থেকে দূরে নির্জনবাসের সময় তাঁর অন্তর্জীবনে একটি লক্ষণীয় বিবর্তন সংঘটিত হয়। কারাগারের বিজনকক্ষে বসে তিনি ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করেন। ধ্যানী অন্তর্দৃষ্টির আকস্মিক দীপ্তিতে তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে ভাগবত ইচ্ছার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন। ভারতের স্বরাজ-সাধনা যে বিচ্ছিন্ন একটি মানবগোষ্ঠীর হিতসাধনের মধ্যেই নিঃশেষযোগ্য নয়, তা' যে 'জগদ্ধিতায়', কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তাঁর এই বাণী-লাভ ঘটে। কারামুক্তির পর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে (১০ই মার্চ, ১৯০৮) তিনি যে ভাষণ দান করেন তাতে তিনি সমকালীন সংগ্রামের লক্ষ্য যে শুধু 'এমান্সিপেশান অব্ ইণ্ডিয়া' (ভারতের বন্ধন-মোচন) নয়, 'স্যালভেশন অব্ হিউম্যানিটি'ও (মানবতার মুক্তি) যে তার অন্তর্ভুক্ত, তা' স্পষ্টতঃ ঘোষণা করেন।[১২২]

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ (১৯০৬)

আলিপুর বোমার মামলা থেকে সম্ভ-মুক্তিলাভের পর অরবিন্দ উত্তরপাড়া ধর্মরক্ষিণী সভা কর্তৃক আয়োজিত সভায় যে ভাষণ দেন, তাতে বিপিনচন্দ্রের এই বাণী-লাভের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন—'বিপিনচন্দ্র পাল যখন জেল থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তিনি একটি বাণী বহন করে আনেন এবং সে বাণী ছিল দিব্য-প্রেরণালব্ধ বাণী।······বিপিনচন্দ্র বক্সার জেলে যে বাণী লাভ করেন, ঈশ্বর আলিপুরে আমাকে সেই বাণী প্রদান করেন।'[১২৩] এই কারাবাসের সময়েই বিপিনচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'য়্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অব্ হিন্দুইজম্' এবং 'জেলের খাতা'র পাণ্ডুলিপি রচনা করেন।

১০ই মার্চের প্রভাতী সংবাদপত্রে প্রচারিত হলো যে বিপিনচন্দ্র সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় হাওড়ায় এসে পৌছুবেন। কলকাতাবাসীর অন্তরে যে আবেগ রুদ্ধ হয়ে ছিল, বিপিনচন্দ্রের অভ্যর্থনার জন্য হাওড়া স্টেশনে স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশের মধ্যে তা' মুক্তিলাভ করলো। কত লোক স্টেশনে সমবেত হয়েছিল তা' বলা কঠিন। 'এক লাখ হতে পারে, দু'লাখ হতে পারে, এমনকি তিন লাখও হতে পারে। মনে হয়; সমস্ত পুরুষ কলকাতা যেন বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল'।[১২৪] বিপিনচন্দ্র যে ট্রেনে আসছিলেন, তার ইঞ্জিনখানি দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র কণ্ঠ থেকে উত্থিত 'বন্দে মাতরম্' এবং 'বিপিনচন্দ্র কী জয়' ধ্বনিতে স্টেশন-প্রাঙ্গণ কম্পমান হয়ে উঠলো। প্লাটফরমে এসে ট্রেন থামবার সঙ্গে সঙ্গে 'বিপিনচন্দ্র অভ্যর্থনা-সমিতি'র পক্ষ থেকে মতিলাল ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরও কয়েকজন সভ্য ট্রেনের কামরায় উঠে বিপিনচন্দ্রকে আলিঙ্গন করে তাঁকে মাল্যভূষিত করলেন। সমবেত বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী মানুষের বিশাল মিশ্র জনতার প্রত্যেকে তখন এই দেশনায়কের দর্শনলাভের জন্য উৎসুক।

বিপিনচন্দ্রকে পুরোভাগে নিয়ে অবিরাম মিছিল হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড, বিডন স্ট্রীট, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ঘুরে ঘুরে কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে থামলো। সেখানে স্বাগত সংবর্ধনার উত্তরে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বিনীত ভাষণ দান করলেন। সেই ভাষণে সুরেন্দ্রনাথকে পূর্বতন গুরুরূপে উল্লেখ করে তাঁর অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। এখানে একটি কৌতূহলজনক ঘটনা ঘটে। জনৈক ইউরোপীয় পুলিসের লোককে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে করমর্দন করতে দেখা যায়। এখানকার অভাবনীয় দৃশ্য তাকে এমন অভিভূত করেছিল

যে সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিপিনচন্দ্রের গাড়ির কাছে আসে এবং তারপর তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে মৃদুকণ্ঠে বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করতে করতে চলে যায়।[১২৫] যে মঙ্গলবারে (১০ই মার্চ, ১৯০৮) বিপিনচন্দ্র কলকাতায় ফিরে আসেন, তার পরবর্তী রবিবারে দরিদ্র-নারায়ণ-ভোজন উৎসব হয়।

শুধু কলকাতা শহরই নয়, বাংলা দেশের নানা স্থানে, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, বরোদা প্রভৃতি স্থানেও বিপিনচন্দ্রের কারামুক্তি উপলক্ষে আনন্দ-প্রকাশের জন্য ৯ই মার্চ দেওয়ালীর মতো আলোকসজ্জা করে এবং বাজি পুড়িয়ে শুভদিনরূপে উদ্‌যাপিত হয়।

বিপিনচন্দ্রের কারামুক্তি উপলক্ষে অরবিন্দ ঘোষ বন্দে মাতরম্-এ লেখেন—'আমরা আজ বিপিনচন্দ্র পালকে নয়, ঈশ্বর-দত্ত বাণীর প্রবক্তাকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাচ্ছি, মানুষটিকে নয়, জাতীয়তাবাদের বাণীর মূর্তিমান কণ্ঠকে।... তাঁকে স্বাগতম্, বারংবার স্বাগতম্।[১২৬]

১৯০৮-এর ২৮শে মার্চ প্রস্তাবিত ফেডারেশন হলের প্রাঙ্গণে মতিলাল ঘোষের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সংবর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমকালীন অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সে সভায় উপস্থিত হন। সভাপতি তাঁর ভাষণে জাতীয় আন্দোলনে বিপিনচন্দ্রের বহুমুখী অবদানের কথা উল্লেখ করে বিপিনচন্দ্রকে জন-সাধারণের পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার টাকার একটি তোড়া দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বিপিনচন্দ্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য সে টাকা নিতে অস্বীকার করে বলেন—'আমি অর্ধ-গৃহী, অর্ধ-সন্ন্যাসী। কাল কি হবে সেজন্য আজ সঞ্চয় করি না। আমি দেশমাতার পায়ে নিজেকে অর্ঘ্য দিয়ে ধন্য হয়েছি।...আমার বিবেকে বাধছে বলে, এ অর্থ আমি গ্রহণ করতে পারবো না। আমার এ প্রত্যাখ্যান বন্ধুমহলে মার্জনীয় হবে সে আশা রাখি বলেই, শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাদের দেওয়া এই প্রীতি-উপহার আপনাদের হাতে প্রত্যর্পণ করছি। তবে এমন কোনো কাজ যদি দেশের সামনে উপস্থিত হয় এবং আপনারা মনে করেন আপনাদের এই সেবক সেই কাজ করার উপযুক্ত, তখন আপনাদের অনুজ্ঞামতো এই অর্থ আমার দ্বারা ব্যয়িত হবে'।[১২৭]

এর কিছুকাল পরে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার কথা প্রচারের জন্য তাঁর দ্বিতীয়বার বিলাত যাবার সময় এই টাকা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

বিপিনচন্দ্রের কারামুক্তি সেদিন বাঙালীর মনে কী উল্লাস সৃষ্টি করেছিল,

'সন্ধ্যা' পত্রিকায় প্রকাশিত কবি কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত-রচিত 'বিপিনের কারামুক্তি' শীর্ষক কবিতাটি তার একটি আন্তরিক প্রমাণ :

'সাজ্ তোরা সাজ্—পর আভরণ, বরণের ডালা তুলে নে করে'—
ডাকিয়া ভারতী কহিলা পুলকে,—'বিপিন আমার আসে যে ঘরে!'
'ওরে কোথা তোরা, নিয়ে আয় ত্বরা চন্দনের থালা, ফুলের সাজি,
মাতৃ-আশীর্বাদ দে আমার হাতে, ঘরে তুলি তারে আশীষে আজি!
ছ'টি মাস ধরি কোল-ছাড়া মোর, এতদিন বাছা আঁখি-আড়াল—
জয়ন্তকুমার বৃদ্ধ দানবের কারাগারে, হায়, কাটাল কাল!
তোরা কি ভাবিস্ প্রতিফলে এর ধর্মের সাধনা বিফল হবে?—
অন্যায়েরে সেবি' অত্যাচার-পথে কে কোথায় হয় সফল কবে?

* * *

আয় হাতে লয়ে আশীষের ভার, পদ আগুলিয়া দাঁড়ায়ে রই!
ঘরে ঘরে কর্ মুক্তির উৎসব, বিপিনে বরিয়া বিজয়ী হই![১২৮]

১৯০৮-এর ২রা মে অরবিন্দ ঘোষ মুরারিপুকুর বোমার মামলায় আবার গ্রেপ্তার হলেন। এই সময় 'বন্দে মাতরম্' পরিচালক-গোষ্ঠীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে বিপিনচন্দ্র অরবিন্দের অনুপস্থিতিতে আবার স্ব-প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন। সে প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ের সাংবাদিক পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই সময় থেকে বিলাতযাত্রার পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রধানতঃ বন্দে মাতরম্-এর সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং তারই ফাঁকে প্রচার-পর্যটন উপলক্ষে বাংলাদেশের দু'একটি স্থান পরিভ্রমণ করেন।

১৯০৮-এর আগস্ট মাসে বিলাতযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের জীবনের আর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। তখন বিদেশে বসে কিছুসংখ্যক ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক দেশের জন্য কাজ করছিলেন। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা নামে জনৈক ভারতীয় বিপ্লবী-কর্মী তখন ইউরোপে। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান সোসিয়লজিস্ট'-এর তিনি সম্পাদক। 'দেশভক্ত সভা'র পক্ষ থেকে তিনি বিপিনচন্দ্রকে বছরে ১০০০ টাকার বিনিময়ে পঁয়তাল্লিশটি বক্তৃতা-দানের জন্য আহ্বান জানান এবং অঙ্গীকৃত অর্থের একটা অংশ বিলাতযাত্রার পূর্বে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন।[১২৯] সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি

বিবেচনা করে বিপিনচন্দ্র বিলাতে ভারতের পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে এই আহ্বান গ্রহণ করেন এবং এই সূত্রে দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা করেন।

বিপিনচন্দ্রের বিলাতযাত্রার পটভূমিকাটি সংক্ষেপে আলোচনার দাবি রাখে। ১৯০৭-এর ডিসেম্বরের শেষে অনুষ্ঠিত সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। বিরোধের মূল কারণ ছিল অভীষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যের প্রকৃতি-নির্ধারণ এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার পন্থা-নির্ণয়ের মধ্যে নিহিত। এই দু'টি বিষয়ে উভয়পন্থীদের মধ্যে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হলো না। ফলে জাতীয়তাবাদীরা অর্থাৎ গরমপন্থীরা সাত বছরের (১৯০৮ থেকে ১৯১৪) জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন। 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সেই সমস্ত রাজভক্ত নরমপন্থীদের সংস্থায় পরিণত হলো, যাঁরা ভারতে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের অসুবিধাজনক কোনো পন্থা গ্রহণ করবেন না বলে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন'।[১৩০] সুরাট কংগ্রেস যখন অনুষ্ঠিত হয়, বিপিনচন্দ্র তখন বক্সার জেলে। কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তিনি একমত হতে না পারলেও তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। সুরাট কংগ্রেসে প্রাচীনপন্থী ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে এই শোচনীয় সম্পর্কচ্ছেদ বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের মুষ্টি দৃঢ় করে তুললো। তারা নির্মম হাতে নতুনভাবে দমননীতি প্রয়োগে বদ্ধপরিকর হলো। ১৯০৭-এর 'দি সিডিশ্যাস মিটিংস্ য়্যাক্ট' (রাজদ্রোহমূলক সভা-দমন আইন)-এর পর ১৯০৮-এ 'দি এক্সপ্লসিভ সাবস্ট্যানসেস্ য়্যাক্ট' (বিস্ফোরক দ্রব্য-ব্যবহারনিরোধক আইন) এবং 'দি নিউজ পেপারস্ (ইন্‌সাইট্‌মেণ্ট টু অফেনসেস্) য়্যাক্ট' (অপরাধে উস্কানিদান-দমনমূলক সংবাদপত্র আইন) পাস হলো। শেষোক্ত আইনের নিষ্পেষণে জুলাই মাসে জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'যুগান্তর'-এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। ১৯০৮-এর মাঝামাঝি সময়ে সরকার-বিরোধী আন্দোলনের দায়ে তিলক গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে তাঁর ছয় বছরের দীপান্তরের আদেশ হলো। পরে অবশ্য প্রবল গণ-আন্দোলনের চাপে তিলকের দীপান্তরের সাজা বিনাশ্রম কারাদণ্ডের সাজায় পরিণত করতে সরকার বাধ্য হন। অরবিন্দ তখন মুরারিপুকুর বোমার মামলায় বিচারাধীন বন্দী। সরকারের নির্লজ্জ নিপীড়ন-নীতি তরুণ-সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসবাদের দিকে টেনে নিয়ে গেল। বিপিনচন্দ্র-রবীন্দ্র-অরবিন্দের সম্মিলিত সাধনায় যে আন্দোলন নৈতিক সংগ্রামের সু-উচ্চ ভাবগত স্তরে উন্নীত হয়েছিল, নির্মম সরকারী নিষ্পেষণে তা' স্থূল কায়িক স্তরে অবনমিত

হলো। রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল কবি-মন তৎকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে আর সংযোগ রক্ষা করতে পারলো না। তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন। তা' ছাড়া তখন সরকারী তরফ থেকে বিপিনচন্দ্রকে দ্বীপান্তরিত করার জন্য একটা চক্রান্তও চলছিল।[১৩১] এই পরিস্থিতিতেই তিনি বিলাতযাত্রা করেন।

বিপিনচন্দ্র যখন বিলাতে তখন সরকারী নিষ্পেষণ ব্যাপকতর আকার ধারণ করে। 'যুগান্তর'-এর পর অপর দু'খানি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'বন্দে মাতরম্' এবং 'সন্ধ্যা'র প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০৭-এর ডিসেম্বরে 'দি ক্রিমিনাল ল (য়্যামেণ্ডমেণ্ট) য়্যাক্ট' পাস করে সরকার কলকাতা ও ঢাকার বিপ্লবপন্থী 'অনুশীলন সমিতি'কে বেআইনী ঘোষণা করে। পরে বরিশালের 'স্বদেশবান্ধব সমিতি', ময়মনসিংহের 'সুহৃদ সমিতি' প্রভৃতি সংস্থাও বেআইনী ঘোষিত হয়। ১৯০৮-এর ডিসেম্বরে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ নয়জন বিশিষ্ট বাঙালী নেতার প্রতি নির্বাসন-দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়; সে কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই অবস্থায় আন্দোলন প্রকাশ্য ক্ষেত্র থেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করলো।

স্বল্পকালব্যাপী (১৯০৫-০৮) স্বদেশী-আন্দোলন এইভাবে দৃশ্যত ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু কোনো নীতি-নিষ্ঠ আন্দোলনই সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় না। স্বদেশী-আন্দোলনও তা' হয়নি। কারণ, এর ভিত্তি স্থাপিত ছিল সু-উচ্চ এবং পরিশীলিত নীতিবোধের উপর। বিপিনচন্দ্র ছিলেন স্বদেশী-আন্দোলনের রাজনৈতিক দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ তার চারণ-কবি এবং শ্রীঅরবিন্দ তার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

স্বদেশী-আন্দোলনে অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। শ্রীঅরবিন্দের অবদান সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'জাতীয়তাবাদ—কারও কারও কাছে বড়ো জোর একটা বুদ্ধির বিষয়, কারও কারও কাছে কমপক্ষে রাজনৈতিক ধুয়া বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়, কিন্তু অরবিন্দর কাছে জাতীয়তাবাদ ছিল আত্মার মহত্তম আবেগের বিষয়'।[১৩২] রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'…কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এই নব্য জাতীয়তাবাদেরই অন্যতম স্রষ্টা'।[১৩৩] শুধু তা'ই নয়, এরও প্রায় চার বছর আগে, তিনি মন্তব্য করেছিলেন—'বাংলার নব্য স্বাদেশিকতার স্তোত্র-সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান গুণ এবং পরিমাণ উভয় দিক থেকেই প্রথম ও সর্বোত্তম স্থানের অধিকারী…'।[১৩৪]

স্বদেশী আন্দোলন দৃশ্যত স্বল্পকালস্থায়ী হলেও ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে তার ভূমিকা যে নগণ্য ছিল না, পরবর্তীকালের ইতিহাসের সাক্ষ্য এবং ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়—'১৯০৫-এর ছোট্ট গাঙ্ নানা স্রোতোধারায় পুষ্ট হয়ে ১৯১৯ থেকে বেগবতী নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র-সঙ্গমে পৌঁছেছিল'।[১৩৫] আর একজন বিদেশী ঐতিহাসিক মিস্টার এ. আই. লেভকভস্কির অনুরূপ মন্তব্যও এ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য : '১৯০৫-০৮-এর দেশব্যাপী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গ পরাজয়ে পর্যুদস্ত হলো। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পরবর্তী সংগ্রামের জন্য সে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেল।......১৯০৫ থেকে ১৯০৮-এর শেষ পর্যন্ত সময়ে ভারতের জনগণ স্বাধীনতার জন্য যে সক্রিয় এবং সজ্ঞান রাজনৈতিক গণ-সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তা'ই—ধন্যবাদ তাদের বীরোচিত প্রয়াসকে, এই শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ভারতসৃষ্টির মধ্যে সার্থক হয়ে উঠলো'।[১৩৬]

বিপিনচন্দ্র ১৯০৮ থেকে ১৯১১-র মধ্যে তিন বছর কাল বিলাতে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রথমে 'স্বরাজ', পরে 'ইণ্ডিয়ান স্টুডেণ্ট' নামে দু'খানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গ 'সাংবাদিক' পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে তিনি বৃটিশজাতির উন্নত ও উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ এবং জাগতিক শক্তিসমূহের গতি ও প্রকৃতি গভীরভাবে অনুধাবনের অবসর পান। এই সময় তিনি নানা স্থানে অনেকগুলি বক্তৃতায় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তাগর্ভ আলোচনা করেন। 'দি ইণ্ডিয়ান সিচুয়েশন য়্যাণ্ড দি বৃটিশ স্টেটস্‌ম্যানশিপ' শীর্ষক (ভারতীয় পরিস্থিতি এবং বৃটিশ রাষ্ট্রনীতি) কেম্ব্রিজে প্রদত্ত বক্তৃতা (ডিসেম্বর ৫, ১৯০৮) এবং 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম্' (ভারতীয় জাতীয়তাবাদ) শীর্ষক ইণ্ডিয়া হাউসে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতা (ডিসেম্বর ১৮, ১৯ এবং ২১, ১৯০৮) শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।[১৩৭]

তিনি এক নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারা গড়ে তোলেন। এই চিন্তাধারা অবশ্য তাঁর পূর্ব-প্রচারিত জাতীয়তাবাদের আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়, তবে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিকতার অভিমুখী। বিপিনচন্দ্রের এই

বিলাত প্রবাস-বাস একটি নতুন পথে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। এই সময় তিনি অনুভব করেন যে কোনো জাতির পক্ষে জগতের অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। জাতীয়তাকে বিশ্বমানবতার সঙ্গে যুক্ত করতে হলে ভারতের রাজনৈতিক সাধনাকে নতুন সাধনোপায় অবলম্বন করতে হবে। এইভাবেই তাঁর চিন্তায় নতুন 'ফেডারেল আইডিয়াল' বা সম্মিলিত রাষ্ট্রাদর্শের উদ্ভব ঘটে। এ প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ের পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।

প্রধানত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার উদ্যোগে বিলাতে গেলেও শ্যামজীর সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের সম্পর্ক রক্ষা বেশী দিন সম্ভব হলো না। কারণ, রাজনৈতিক পন্থায় শ্যামজী ছিলেন সন্ত্রাসবাদী অর্থাৎ রাজনৈতিক কারণে গুপ্তহত্যার পক্ষপাতী, আর বিপিনচন্দ্র ছিলেন এর ঘোরতর বিরোধী; তাঁর পন্থা ছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। ক্যাক্সটন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় (ডিসেম্বর ২২, ১৯১০) বিপিনচন্দ্র সন্ত্রাসবাদীদের বোমা-তত্ত্বের সমালোচনা করলেন, যদিও দেশের মুক্তি-সংগ্রামে তাদের আত্মদানের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে তিনি কুণ্ঠিত হলেন না। তিনি নিজেকে গরমপন্থী বলে চিহ্নিত করলেন, সন্ত্রাসবাদী অর্থে বিপ্লবী বলে নয়, এবং স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত ভারতের সংগ্রাম চলতে থাকবে বলে ঘোষণা করলেন।[১৩৮]

এই সমস্ত কারণে যে অর্থানুকূল্যের উপর নির্ভর করে তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন তা' বন্ধ হয়ে গেল। বিপিনচন্দ্র ১৯১১-এর সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন ত্যাগ করে দেশের দিকে রওনা হলেন। বিলাতে বাসকালে স্ব-সম্পাদিত পাক্ষিক পত্র 'স্বরাজে' তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন; নাম 'দি ইটিঅলজি অব্ বম্' (বোমার কারণ নির্ণয়)। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধের জন্য গৃহীত নির্বিচার সরকারী দমননীতিই যে ভারতবাসীকে বোমার পথে ঠেলে দিয়েছে—বিপিনচন্দ্র এই প্রবন্ধে সেই প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করেন। ভারতীয় পুলিস ঐ প্রবন্ধের মধ্যে রাজদ্রোহের গন্ধ পায় এবং তিনি বোম্বেতে পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং বিচারে তাঁর এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বিপিনচন্দ্র যখন বিলাত যান, তখন কলকাতায় তাঁর বাসা ছিল ভবানীপুরে ১৪১/২, রসা রোডে। এই জায়গাটি ছিল বর্তমান চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল

প্রাঙ্গণের পাশে। বাসাটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনীপতি শরৎচন্দ্র সেন মশায়ের চেষ্টায় সংগৃহীত হয়। ১৯১১-র শেষভাগে বিলাত থেকে এসে তিনি কালিঘাট রোডে ক্ষেত্র ঘোষ নামক জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীর দোতলায় একখানি ঘরে বাসা নিয়ে ওঠেন। বিপিনচন্দ্রের আর্থিক সঙ্গতি কোনোদিনই সচ্ছল ছিল না; ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয়ের তিনি ছিলেন বিরোধী। ফলে বিলাতযাত্রার সময় পরিবার প্রতিপালনের জন্য কোনো আর্থিক ব্যবস্থা তিনি করে যেতে পারেন নি। তাঁর বিলাতবাসের সময় তাঁর ভাবশিষ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং কৃষ্ণকুমার দত্ত মশায় বিপিনচন্দ্রের পরিবার প্রতি-পালনের জন্য মাসিক ১০০ টাকা করে সাহায্য করতেন।[১৩৯]

বিপিনচন্দ্র যখন দেশে ফিরে এলেন তখন স্বদেশী আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে অবসিত হয়ে গেছে; বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় একটি অভাবিতপূর্ব স্তব্ধতা বিরাজমান। এর কিছুকাল পূর্বে প্রদত্ত অরবিন্দের বিখ্যাত উত্তরপাড়া-ভাষণে এই পরিস্থিতির সুন্দর আভাস ফুটে উঠেছিল। তিনি বলে-ছিলেন, যখন তিনি জেলে যান তখন সারা দেশ বন্দে মাতরম্-ধ্বনিতে মুখর, সারা দেশ একটা নতুন জাতির জন্ম-মুহূর্তের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। জেল থেকে বেরিয়ে এসেও তিনি সেই ধ্বনি শুনবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দেখতে পেলেন, মুখরতার পরিবর্তে দেশে একটা মূক স্তব্ধতা বিরাজমান। দেশের মানুষ যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে। তারা কোন্ পথে চলবে, কী করবে কিছুই স্থির করে উঠতে পারছে না। তিনি নিজেও বুঝতে পারছেন না কোন্ পথে যাবেন, কী করবেন।[১৪০]

এই অবস্থায় সক্রিয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠ যে পরিমাণে নিষ্ক্রিয় হলো, লেখনী সেই পরিমাণে সক্রিয় হয়ে উঠলো। স্ব-সম্পাদিত 'হিন্দু রিভিউ' পত্রিকায় অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়ক রচনা প্রকাশ বাদে তিনি অনতিকাল-পূর্বে উদ্ভাবিত নতুন রাষ্ট্রতত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যান প্রচার করা শুরু করলেন। এই সময় থেকে বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকাতে তাঁর নানা বিষয়ক প্রবন্ধাদিও পূর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে প্রকাশিত হতে লাগলো। কারণ, 'তাঁর যা' সর্বাপেক্ষা বড়ো বৈশিষ্ট্য এবং লেখক ও বক্তারূপে যা' তাঁর শক্তির উৎস ছিল, তা' হচ্ছে তাঁর চিন্তাশক্তি। চিন্তা করা ছিল তাঁর কাছে স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার'।[১৪১]

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে 'হোম রুল লীগ' স্থাপিত হয়। প্রথমে (২৩শে

এপ্রিল, ১৯১৬) লোকমান্য তিলক তাঁর 'হোমরুল লীগ' আরম্ভ করেন। এর প্রায় সাড়ে চার মাস পরে (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৬) মিসেস্ অ্যানি বেসাণ্টের হোম রুল লীগ স্থাপিত হয়। তিলক তাঁর হোমরুল লীগের জন্য মোটামুটিভাবে কংগ্রেসের মতাদর্শই গ্রহণ করেছিলেন।[১৪২]

বিপিনচন্দ্র লোকমান্য তিলকের সঙ্গে হোমরুল আন্দোলনে যোগদান করলেন এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সম্মিলিত অধিবেশনে পুনরায় তিলকের সঙ্গে কংগ্রেসে প্রবেশ করলেন। সুরাট-বিচ্ছেদের দীর্ঘ নয় বছর পরে জাতীয়তাবাদীরা এবং প্রবীণ নরমপন্থীরা একই কংগ্রেসের মঞ্চে পুনর্মিলিত হয়ে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দান করলেন। এই কংগ্রেসেই হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যের স্মারকরূপে লক্ষ্ণৌ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য 'কংগ্রেস-লীগ স্কীম' গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন (১৯১৭) অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন—'সম্মিলিত কংগ্রেস অধিবেশনের এক বৎসর মধ্যেই কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদীর সংখ্যা বাড়িয়া গেল। কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলিকাতায় এবং রাষ্ট্রাধিনায়িকা হন শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট। এই সভানেত্রী নির্বাচন লইয়াই নরম দল ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিরোধ হয়, তবে শেষাশেষি জাতীয় দলই জয়ী হন এবং নরম দল আস্তে আস্তে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতেই সরিয়া পড়েন।'[১৪৩]

শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে ভারতবাসীর ক্রমবর্ধমান দাবির কথা এবং যুদ্ধের সময় ভারতবাসী যে বৃটেনকে অনুগতভাবে সাহায্য করেছে, সেই কথা বিবেচনা করে তদানীন্তন ভারতসচিব মিস্টার এডউইন মণ্টেগু ১৯১৭-র ২০শে আগস্ট কমন্সসভায় ঘোষণা করেন যে এখন থেকে 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের অখণ্ড অংশরূপে ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল সরকারের (রেস্‌পনসিব্‌ল গভর্নমেণ্ট) ক্রমশঃ বাস্তব রূপায়ণ' হবে সম্রাটের সরকারের নীতি।[১৪৪]

উদ্দীপনাময় পরিবেশে উপরি-উক্ত কংগ্রেসের অধিবেশন ২৬শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে তিন দিন যাবৎ চলে। যথারীতি ভারত-সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে অধিবেশনের কাজ শুরু হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সংক্রান্ত আইনেই (গভর্নমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট) একটি সময়-সীমা নির্দিষ্ট করবার জন্য দাবি জানানো হয়। এই প্রস্তাব উত্থাপন

করেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, সমর্থন করেন মহম্মদ আলি জিন্না এবং তারপর বিপিনচন্দ্র পাল ও বালগঙ্গাধর তিলক। এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বিপিনচন্দ্র বলেন যে লক্ষ্নৌ পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ছিল প্রচলিত সরকারের বিরোধিতা করা এবং যদি পারা যায় তা'হলে বাধা সৃষ্টি করতে করতে ক্রমশঃ সরকারের অস্তিত্ব অচল করে তোলা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বাধা দিয়ে বলে ওঠেন—'না, না'।[১৪৫] স্বদেশী যুগে নিরস্ত্র প্রতিরোধের প্রথম এবং অন্যতম প্রধান প্রবক্তার কণ্ঠে সেই একই নীতি, একই পদ্ধতির উচ্চারণ। নিরস্ত্র প্রতিরোধের লক্ষ্যও ছিল অসহযোগিতার মাধ্যমে সরকারকে অচল করে তোলা। বিপিনচন্দ্র এই সময় (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১৭) কয়েকটি বক্তৃতায় বৃটিশ সরকার-প্রস্তাবিত দায়িত্বশীল সরকার গঠনসংক্রান্ত পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষিত প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকারের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য দেশবাসীর কাছে পরিস্ফুট করে তোলেন।[১৪৬] তিনি বলেন যে দায়িত্বশীল সরকার তাকেই বলা যায়, যে সরকার তার কার্যকলাপের জন্য দেশের জনসাধারণের কাছে দায়ী থাকে। যতদিন পর্যন্ত বঙ্গীয় সরকার তার কার্যকলাপের জন্য বঙ্গের জনসাধারণের কাছে দায়ী না হয়ে ভারত সরকারের কাছে দায়ী থাকবে, যতদিন ভারত সরকার তার কার্যকলাপের জন্য ভারতবাসীর কাছে দায়ী না হয়ে ভারতসচিবের কাছে দায়ী থাকবে, যতদিন পর্যন্ত ভারতসচিব তাঁর কার্যকলাপের জন্য ভারতবাসীর কাছে দায়ী না হয়ে মন্ত্রিসভা ও বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত দেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—একথা মনে করা সম্ভব নয়।

ভারতবাসীকে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অধিকার প্রদানের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর মানুষেরা তখন আন্দোলনে রত। সেই আন্দোলন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মিসেস্ বেসান্টের হোমরুল লীগ পূর্বেই প্রতিনিধিবর্গ প্রেরণ করেছিল। ১৯১৭-র বার্ষিক অধিবেশনে তিলকের হোমরুল লীগও অবিলম্বে প্রতিনিধিস্থানীয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এক উৎসাহী প্রতিনিধিদলকে বিলাতে প্রেরণ করবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে প্রস্তাব গ্রহণ করলো। এই প্রস্তাবানুসারে মিস্টার জোসেফ ব্যাপ্টিস্টা প্রচার-অভিযান পরিচালনার জন্য জুলাই মাসে বিলাতে গেলেন। এর পর তিলক নিজেই এক দল প্রতিনিধি সঙ্গে নিয়ে বিলাত যাওয়া স্থির করলেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিলকের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি বিলাত অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেই প্রতিনিধিদলে রইলেন তিলক, খপর্দে, করন্দিকর কেলকার এবং বিপিনচন্দ্র পাল। ২৭শে মার্চ তাঁরা বিলাত যাবার পথে বোম্বাই থেকে কলম্বো অভিমুখে রওনা হলেন। কলম্বোর ভারতীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে তিলক এবং তাঁর সঙ্গীবৃন্দ সাদর অভ্যর্থনা লাভ করলেন। কিন্তু কলম্বোতে পৌছবার অল্পকালের মধ্যে তাঁরা জানতে পারলেন যে তাঁদের পাসপোর্ট বাতিল হয়ে গেছে; সুতরাং তাঁরা ইংলণ্ডে যেতে পারবেন না। প্রায় দু'মাস পরে (৮ই জুন, ১৯১৮) তিলক অবশ্য ভ্যালেণ্টাইন চিরলের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা পরিচালনা করবার জন্য বিলাত যাবার অনুমতি পেলেন, তবে শর্ত রইল যে বিলাতবাসকালে তাঁকে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিরত থাকতে হবে।[১৪৭]

উপরি-উক্ত কারণে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্রের বিলাত যাওয়া হলো না। ইতিমধ্যে (এপ্রিল, ১৯১৮) ভারতের সাংবিধানিক সংস্কার (ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল রিফর্মস্) বিষয়ক মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ভারতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হলো। বিভিন্ন রাজনৈতিক মত ও পথের মানুষের মনে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এক শ্রেণীর মানুষ মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে বর্জনের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করলেন। আর একদল বিনা বিবাদে ঐ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু কংগ্রেস মধ্যপন্থা অবলম্বন করে যথোপযুক্ত সমালোচনার মাধ্যমে ঐ পরিকল্পনা ভারতীয় জনমতের কাছে অধিকতর গ্রহণীয় করে তোলা স্থির করলো। এই উদ্দেশ্যে বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে (২৯ আগস্ট —১লা সেপ্টেম্বর. ১৯১৮) অনুষ্ঠিত হলো। এই অধিবেশনে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হলো; তার মধ্যে ৬নং প্রস্তাব হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রস্তাবে কংগ্রেস-লীগ স্কীমের একটি পরিমার্জিত রূপ গ্রহণ করে তাকেই প্রকৃতপক্ষে ভারতের জনগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সংস্কার-পরিকল্পনা বলে ঘোষণা করা হলো। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যাঁরা এই প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে মতিলাল নেহেরু, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, মিসেস্ বেসাণ্ট এবং এম্. আর. জয়াকরের নাম উল্লেখযোগ্য। বিপিনচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় প্রথমে ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু মতানৈক্য প্রকাশ করেন, তবে শেষ পর্যন্ত একতার মনোভাব নিয়ে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[১৪৮]

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলের অধিনেতারূপে বিপিনচন্দ্র পরবর্তী বছর বিলাত যাত্রা করেন। ১৯১৯-এর ৩০শে জুলাই বিলাতযাত্রার উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করবার অব্যবহিত পূর্বে কলকাতায় 'বঙ্গীয় জনসভা'র উদ্যোগে এক বিদায়-সংবর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত বি কে. লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বি. চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত এন্ সি. সেন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ উপস্থিত থাকেন।

আসামের শ্রীযুক্ত বরদলৈকে সঙ্গে নিয়ে বিপিনচন্দ্র যখন সভা-গৃহে উপস্থিত হন, তখন সমবেত সামাজিকবৃন্দ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তারপর বঙ্গীয় জনসভার সম্পাদক শ্রী নিশীথ সেন তাঁকে মাল্যভূষিত করেন। এই সভায় প্রথমে মৌলানা আক্রাম খাঁ, তারপর শ্রীযুক্ত বি. চক্রবর্তী দেশনায়ক বিপিনচন্দ্রের আন্তরিক দেশপ্রেম এবং তাঁর নেতৃত্ব-শক্তির প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করে বক্তৃতা দেন। এর পর শ্রোতৃমণ্ডলীর উল্লাসধ্বনির মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বিপিনচন্দ্র ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে বলেন যে, বিলাতে গিয়ে তাঁর প্রথম কাজ হবে—পাঞ্জাবে যা ঘটে গেছে অর্থাৎ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা সম্পর্কে বৃটিশ জনসাধারণকে অবহিত করা। তিনি বৃটিশ জনসাধারণকে জানিয়ে দেবেন যে যতদিন পর্যন্ত পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিবিধান না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভারতবাসী লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে যোগদান করে অহেতুক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে সময় নষ্ট করতে অনিচ্ছুক। এই ভাষণে তিনি আরও বলেন যে বিলাতে গিয়ে তাঁর দ্বিতীয় কাজ হবে—লর্ড সিংহ সম্প্রতি ভারতবাসীকে তার নারীজাতি সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তনের জন্য অহেতুক উপদেশ দিয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তার তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারণ করা। কারণ ভারতবাসী নারীকে মাতৃত্বের পবিত্র প্রতিমূর্তি মনে করে তার দৈবী সত্তায় বিশ্বাসী। লর্ড সিংহের উপদেশে ভারতবাসী কখনই নারী-সম্পর্কিত বৃটিশ ধারণার সঙ্গে তার ধারণার পরিবর্তন করতে প্রস্তুত নয়। তিনি স্পষ্টই বলেন যে লর্ড সিংহ কি ভুলে গেছেন যে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'ম্যারেড ওমেনস্ য়্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হবার পূর্বে ইংরেজ মহিলারা পুরুষদের কাছে অস্থাবর সম্পত্তির সামিল ছিলেন?[১৪৯]

বিপিনচন্দ্রের অধিনায়কত্বে কংগ্রেস প্রতিনিধিদল ৩০শে জুলাই কলকাতা

ত্যাগ করেন। এই দলকে সংবর্ধনা জানাবার উদ্দেশ্যে ৪ঠা আগস্ট (১৯১৯) বোম্বাই শহরেও একটি সংবর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। বোম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, সর্বভারতীয় এবং ভারতীয় হোমরুল লীগ এবং ন্যাশনাল ইউনিয়নের সম্মিলিত উদ্যোগে আহূত সেই সভায় সভাপতি ছিলেন শ্রী এম. আর. জয়াকর। সেই সভার ভাষণদান-প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র বিলাতযাত্রার উদ্দেশ্যের সাফল্য সম্পর্কে তেমন নিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করতে না পারলেও, একথা জোর দিয়ে বলেন যে এইভাবে ক্রমাগত ভারতবর্ষ থেকে দলে দলে কর্মী পাঠিয়ে বিলাতে ভারতের অনুকূলে জনমত গঠনের চেষ্টা করে যেতে হবে। তা' হলে, তিনি আশা করেন যে, সভ্যতার জননী ভারতবর্ষের আর্ত আবেদনে আধুনিক সভ্যতার মূর্তিমান বিগ্রহ ইংলণ্ড কখনই সাড়া না দিয়ে পারবে না।[১৫০]

গ্রেট বৃটেন এবং তার মিত্রশক্তির নাটকীয় জয়ের সূচনা করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) তখন অতর্কিত অবসান ঘটেছে। এই সময় বিলাতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র এক অভিনব অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের মতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের দু'টি অঙ্গ ছিল; একটি স্বায়ত্তশাসিত, অপরটি পর-শাসিত। ভারতবর্ষ ছিল শেষোক্ত অঙ্গের অন্তর্গত। স্বায়ত্তশাসিত অঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পর-শাসিত অঙ্গের উন্নতিবিধান ('শোষণ' শব্দের সাম্রাজ্যবাদী প্রতিশব্দ) অপরিহার্য। ভারতবর্ষের স্বল্পমূল্যের শ্রম সাম্রাজ্যবাদীদের একটি প্রলোভনের বিষয় ছিল। তা'ছাড়া ভারতবর্ষ ছিল বৃটেনের পণ্যবিক্রয়ের পক্ষে উৎকৃষ্ট বাজার। বিপিনচন্দ্র অনুভব করলেন যে শুধু বৃটেন নয়, তার স্বয়ংশাসিত উপনিবেশগুলিও যাতে সুশৃঙ্খলভাবে ভারতবর্ষকে শোষণ করতে পারে, এমনভাবেই অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারিত হবে।

বিলাতে বাসকালে তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে ইউরোপে শ্রম-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য সমান সুযোগের দ্বার অবারিত করবার দাবি নিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। দেশে ফিরে এসে বিপিনচন্দ্র কলেজ স্কোয়ারে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় (১৪ই ডিসেম্বর, ১৯১৯) 'দি ওয়ার্লড সিচুয়েশন য়্যাণ্ড আওয়ারশেলভস্' (বিশ্বপরিস্থিতি এবং আমরা)

পর্যায়ে একটি ভাষণ দান করেন।[১৫১] এই ভাষণে তিনি ইংল্যাণ্ডে এবং ইউরোপে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে, তার একটি প্রাঞ্জল বাক্-চিত্র উপস্থাপিত করে দেশবাসীকে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে আগ্রহী হবার জন্য আহ্বান জানান।

যুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইউরোপে যে 'কংগ্রেস অব্ ইণ্টার-ন্যাশনাল ব্রাদারহুড' স্থাপিত হয়, বিপিনচন্দ্রের বিলাতে থাকাকালে (সেপ্টেম্বর, ১৯১৯) তার অধিবেশন বসে। বিপিনচন্দ্র কংগ্রেস ডেপুটেশনের সভ্যরূপে তিলক, খপর্দে, ভি. পি. মাধব রাও, প্যাটেল, রঙ্গস্বামী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সেই অধিবেশনে যোগদান করেন। তখনই তাঁর মনে হয় যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও যদি একটি 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ ইউনিভার্সাল পিস য়্যাণ্ড ইণ্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড' গঠন করে উপরি-উক্ত ইণ্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করা যায় এবং তার বার্ষিক অধিবেশনে ভারতবর্ষ থেকে বিশ্বস্ত মুখপাত্র প্রেরণ করা যায়, তা' হলে বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষের ভূমিকা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। বিপিনচন্দ্র তাঁর ভাষণে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বলেন যে যদি এই ধরনের কাউন্সিল গঠন করা স্থির হয়, তা' হলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সেই কাউন্সিলের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করবার জন্য আহ্বান জানাবার প্রস্তাব করবেন। এই সভায় তিনি একথাও সগর্বে ঘোষণা করেন যে ইতিপূর্বে বিশ্বের চিন্তানায়কদের স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক শান্তি এবং যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের যে ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আনাতোল ফ্রান্স, হেনরী বারবুসি, নরম্যাল এঙ্গেল, এলেন কয়, জর্জ ব্রানডিস্, বার্নাড শ', এইচ্. জি ওয়েলস্, সেলমা লাগেরলফ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরও যুক্ত হয়েছে দেখে তিনি গর্বিত।[১৫২]

এইবারকার বিলাতভ্রমণের অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় বিপিনচন্দ্র 'দি নিউ ইকনমিক মিনেস্ টু ইণ্ডিয়া' নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। রাজনৈতিক বন্ধন-রজ্জুকে দৃঢ়তর করবার উদ্দেশ্যে বিদেশী সরকার কীভাবে অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খলে ভারতবাসীকে আবদ্ধ করবার ষড়যন্ত্র করছে তা' তিনি এই গ্রন্থে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং এই সম্ভাবিত বিপদ থেকে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে ভারতবাসীকে কয়েকটি পন্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। প্রথমতঃ, ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য সংগঠন স্থাপন। তিনি বলেন যে, ভারতে জীবনযাত্রা-নির্বাহের

মান অনুসারে ভারতীয় ও বৃটিশ শ্রমিকদের জন্য সমহারে পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ভারতীয় ও বৃটিশ শ্রমিকদের জন্য কাজের সময় সমান করতে হবে। ত'হলে সস্তা ভারতীয় শ্রমের শোষণ নিবারিত হবে। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বাধ শোষণ নিবারণের জন্য তিনি বলেন যে সমস্ত উদ্‌বৃত্ত মুনাফা করধার্য করে রাজকোষে জমা করতে হবে। এইভাবে সংগ্রাম করে যদি ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য বর্ধিত হারে মজুরির এবং হ্রস্বতর কাজের সময়ের ব্যবস্থা কার্যকর করা যায় এবং কর ধার্য করে সর্বপ্রকার উদ্‌বৃত্ত মুনাফা রাজকোষে সংগ্রহ করে সেই অর্থ ভারতীয় জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তা'হলে, তিনি মনে করেন যে ভারতের পক্ষে বৃটিশ তথা বিশ্ব-শ্রমিকসঙ্ঘের সঙ্গে সহজেই যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের দেশের পুঁজিবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে সক্রিয় না হলে বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণী কখনও ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না। অথচ তাঁর মতে—বর্তমান অক্ষম রাজনৈতিক অবস্থায় এবং অসহায় অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বৃটিশ শ্রমিকদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে বলিষ্ঠ এবং আপসবিহীন সন্ধি-স্থাপনের মধ্যেই আমাদের নিরাপত্তার একমাত্র সম্ভাবনা নিহিত।[১৫৩] তাঁর ধারণা, এই ধরনের সন্ধিস্থাপন করতে পারলে তা' শুধু অর্থনৈতিক নিরাপত্তাই নয়, রাজনৈতিক মুক্তির পক্ষেও অনুকূল হবে।

শ্রমিক-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শ্রমিক-সংগঠনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা বর্তমানকালে সর্ববাদীসম্মত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মিস্টার এন. এম. যোশী প্রথম সর্বভারতীয় স্তরে 'ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' স্থাপন করেন এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ট্রেড ইউনিয়ন আইনে কতকাংশে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপকে বিধিসম্মত করা হয়।[১৫৪] বিপিনচন্দ্রের অগ্রগামী চিন্তা এর আগেই ভারতে শ্রমিক সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল।

ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধানের প্রসঙ্গও বিপিনচন্দ্রের মনোযোগ এড়াতে পারেনি। ভারতীয় জনগণের স্থায়ী দারিদ্র্য ও দুর্দশার অন্যতম কারণ কৃষিকার্যের উপর আত্যন্তিক নির্ভরতা। কৃষির উপর অত্যধিক চাপের লাঘব করবার উদ্দেশ্যে তিনি এই উৎপাদনমূলক শিল্পকর্ম প্রবর্তনের আশু প্রয়োজনীয়তার কথাও এই গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের অনুকরণে যন্ত্রচালিত শিল্পের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের

বিরুদ্ধে তিনি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেন। কারণ যন্ত্রের নিয়োগের ফলে প্রতি কুড়ি জন কর্মরত ব্যক্তির মধ্যে দশজনের কর্মচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকে। বিপিনচন্দ্রের নিজের কথায়—'পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত শ্রম-হ্রাসকারক যন্ত্রসমূহ প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের উপবাসকারক হয়ে ওঠে।'[১৫৫] ভারতবর্ষের মূল সমস্যার সমাধান হচ্ছে, কৃষির উপর নির্ভরশীল অগণিত জনগণের জন্য বিকল্প কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা। ইউরোপীয়দের অনুকরণে যান্ত্রিকতার সাহায্যে উৎপাদনমূলক দেশীয় শিল্পসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করে সে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই তিনি স্পষ্টই বললেন যে, যতদূর দেখা যাচ্ছে তাতে বর্তমান ইউরোপীয় শিল্প-পদ্ধতির অনুকরণ বা তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মত্ত প্রচেষ্টার মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয়, বরং ঐ ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে শক্ত হাতে লড়াই করার মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ নিহিত।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রমুখ অন্যান্য ভারতীয় মনীষীবৃন্দও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে অনুরূপ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বছর। এই বছরের ১লা আগস্ট লোকমান্য তিলক পরলোক গমন করেন। তিলকের পরলোকগমনে ভারতবর্ষ যেমন তার স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন নির্ভীক এবং বিশ্বস্ত সেনাপতিকে হারালো, তেমন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বিরোধী বিদায় গ্রহণ করলেন। কারণ এই দিনেই অসহযোগ আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক-ভাবে উদ্বোধন হয়।[১৫৬]

এর একমাস তিন দিন পরে (৪ঠা-৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২০) কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে গান্ধীজী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রথম তাঁর ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে খিলাফত সমস্যা প্রথম স্থান অধিকার করে, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা; এবং প্রস্তাবে বলা হয়, এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিকার এবং স্বরাজ্য স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতবাসীর পক্ষে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন-নীতি সমর্থন ও গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নেই।[১৫৭]

৭ই সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনদাশ

(সাবজেক্টস্ কমিটি) গান্ধীজীর প্রস্তাব প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তখন গান্ধীজী খিলাফত সংক্রান্ত বিস্তৃত কর্মসূচীর ব্যাখ্যা ও আলোচনা করে ঘোষণা করেন যে, তাঁর শর্তানুযায়ী অসহযোগ আন্দোলন কার্যকর করা হলে ভারতবাসীর পক্ষে এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ করা সম্ভব হবে।[১৫৮]

এই প্রস্তাবের উপর তীব্র বিতর্ক ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। কয়েকজনের বক্তৃতার পর বিপিনচন্দ্র একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ সংশোধনী প্রস্তাবে তিনি বলেন যে ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগের বিবরণ পেশ করবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে একটি দৌত্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে সেই দৌত্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হোক, এর সঙ্গে সঙ্গে অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসনের দাবিও পেশ করা হোক্। যদি প্রধানমন্ত্রী দৌত্য গ্রহণ না করেন অথবা ১৯১৯-এর রিফর্মস্ য়্যাক্ট (মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত) পরিবর্তিত করে ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দানের উপযুক্ত পন্থা গ্রহণে অসম্মত হন, তা' হলেই এই ধরনের সক্রিয় অসহযোগ-নীতি গৃহীত হবে—একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হোক্। তা'হলে বৃটিশ জনসাধারণ সংশয়াতীতরূপে বুঝতে পারবে যে ভারতবর্ষকে আর অধীন রাজ্যরূপে শাসন করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক কমিটির মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ বিবেচনার জন্য দেশবাসীর কাছে সুপারিশ করা হোক্ এবং এর স্বপক্ষে প্রস্তুতিমূলক প্রচার পরিচালনা করা হোক্।[১৫৯] বিপিনচন্দ্রের এই সংশোধনী প্রস্তাব যে সমস্ত নেতা সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মহম্মদ আলি জিন্না, ব্যাপ্টিস্টা, জয়াকর, সত্যমূর্তি, মালব্যজী এবং চিত্তরঞ্জন দাশের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৬০] সুদীর্ঘ আলোচনা এবং বাদানুবাদের পর অবশ্য মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব গৃহীত হয়ে যায়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই (১০ই সেপ্টেম্বর) বিপিনচন্দ্র মতিলাল নেহরু-পৃষ্ঠপোষিত 'ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন—সে-কথা 'সাংবাদিক' পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে।[১৬১]

কলকাতা কংগ্রেসের কয়েকমাস পরে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রাচীন কংগ্রেস-নেতা মিস্টার বিজয়রাঘবারারিয়ারের সভাপতিত্বে নাগপুরে কংগ্রেসের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে অসহযোগ সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবাবলী সমর্থনের জন্য উত্থাপিত হবার কথা। সকলেই অনুমান করেছিলেন

যে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজী এবং অসহযোগের বিরোধীদের মধ্যে নতুনভাবে শক্তির পরীক্ষা হবে। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থকদের পক্ষে যোগদান করায় অতর্কিতভাবে পরিস্থিতির মোড় ঘুরে গেল। যে চিত্তরঞ্জন কয়েক মাস পূর্বে কলকাতা কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন, নাগপুর কংগ্রেসে সেই চিত্তরঞ্জন নিজেই অসহযোগের প্রস্তাব সমর্থনের জন্য উত্থাপন করলেন। দলগত নিয়মানু-বর্তিতার জন্য বিপিনচন্দ্র সে প্রস্তাবে প্রকাশ্যে মৌখিক সমর্থন জানালেও ব্যাপারটি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেননি। দেশবন্ধু-শিষ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর বিখ্যাত 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই ঘটনার উপর স্বচ্ছ আলোকপাত করেছেন।[১৬২]

বিগত তিন মাসের মধ্যে এই আন্দোলন সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে যে মতানৈক্য, বাদানুবাদ এবং এমনকি চিন্তায়, কথায় ও কাজে হিংস মনোভাব প্রশ্রয় পেয়েছিল, তার উল্লেখ করে গান্ধীজী আবার বললেন যে, জনসাধারণ যদি চিন্তায় কথায় ও কাজে এই ধরনের মনোভাব বর্জন করতে পারেন, তা' হলে স্বরাজ্য লাভ করতে এক বছর কেন, নয় মাসেরও প্রয়োজন হবে না।[১৬৩] স্বরাজ-লাভের আশ্বাস দিয়ে গান্ধীজী দেশবাসীকে শুধু অসহযোগেই আহ্বান জানালেন না, তিনি ঐ উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে চরকা কেটে সুতো তৈরী করতেও নির্দেশ দিলেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় অসহযোগের প্রস্তাবে সমর্থন জানালেও বিপিনচন্দ্রের যুক্তিপ্রবণ মন গান্ধীজীর এইভাবে এক বছরের মধ্যে স্বরাজলাভের আশ্বাসকে অলীক আশ্বাস বলেই গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে গান্ধীজী-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর মতান্তরের অন্যতম কারণের বীজ এখানেই উপ্ত হয়েছিল। সেই বীজ তাঁর ভাবনার ভূমিতে অঙ্কুরিত হয়ে অনমনীয় তরুরূপে আত্মপ্রকাশ করলো তিনমাস পরে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ থেকে ২৭শে মার্চ বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। বরিশাল-গৌরব অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান। প্রায় ২৫০ জন মহিলা-প্রতিনিধি সহ প্রায় ২০০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। বেলা

আড়াইটার সময় সম্মেলনের মনোনীত সভাপতি বিপিনচন্দ্রকে শোভাযাত্রা সহকারে সভাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত করা হলো। প্রথমে সংস্কৃতে রচিত একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত এবং তারপর 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের পর সভার কাজ শুরু হলো। এই সভায় মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিত হবার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে তাঁর অনুপস্থিতির জন্য নৈরাশ্য প্রকাশ করে অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান বাংলা ভাষায় তাঁর ভাষণ পাঠ করলেন। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত তারপর এই সম্মেলনের সভাপতিত্বের জন্য বিপিনচন্দ্র পালের নাম প্রস্তাব করলেন। সে প্রস্তাব সমর্থন করলেন শ্রীযুক্ত বি. কে. লাহিড়ী। তখন অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত পাল এবং শ্রীযুক্তা পালকে মাল্যভূষিত করলেন। এরপর সভাপতি প্রায় দু'ঘণ্টা যাবৎ বাংলা ভাষায় তাঁর ভাষণ দান করলেন।[১৬৪] এই সম্মেলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা স্মরণ করতে গিয়ে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মশায় বলেছেন—'প্রথম অসহযোগমূলক প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন সেই স্বদেশী-যুগ-প্রসিদ্ধ বরিশাল শহরে হইয়াছিল,......এই সম্মিলনী অনেক কারণে ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এখানেই বিপিনবাবুর চিত্তরঞ্জনের সংস্রব ত্যাগ, এখানেই চিত্তরঞ্জনের প্রাণস্পর্শী অসহযোগ-ব্যাখ্যা, এখানেই সমগ্র উকিলবর্গের ব্যবসা-ত্যাগের সঙ্কল্প, আর এখানেই প্রথম বঙ্গভাষায় সভার প্রস্তাবসকল লিপিবদ্ধ হয়'।[১৬৫]

বিপিনচন্দ্র তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে প্রথমে ১৯০৬ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের কর্মধারা সংক্ষেপে বিবৃত করে স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও উপায়ের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও উপায়ের সাদৃশ্যের দিকটি উল্লেখ করেন। তারপর অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেও তার বিস্তৃত কর্মসূচীর সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যের কারণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন।

এই ভাষণে তিনি ভাবী ভারতীয় সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি খসড়া জনসমক্ষে উপস্থাপিত করেন এবং আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজকে 'গণতান্ত্রিক স্বরাজ' নামে চিহ্নিত করে তার লক্ষ্যের একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেন ও প্রসঙ্গতঃ নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন। 'তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম জাতীয় নেতা যিনি স্বরাজের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দাবি করেন।'[১৬৬] তিনি বলেন যে প্রশাসনিক যন্ত্র কখনই এককেন্দ্রিক (ইউনিটারি) প্রকৃতির হতে পারে না। কারণ, এক-কেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কখনই প্রকৃত গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের বিকাশের একমাত্র পন্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (ফেডারেশন)। এইজন্য প্রদেশগুলিকে

যথাসম্ভব ভাষাগত ঐক্যের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করতে হবে। তারা হবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক অঙ্গ। জেলাসমূহ হবে প্রাদেশিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অঙ্গ এবং স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম্য-সম্প্রদায়গুলি জেলান্তরের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অঙ্গ হবে। এই গ্রামীণ ভিত্তির উপরেই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সৌধ গঠিত হবে।

কিন্তু বিপিনচন্দ্রের এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যুক্তিগর্ভ ভাষণ সেদিনকার সমবেত প্রতিনিধিদের মনঃপূত তো হলোই না, বরং তীব্র বিরূপতার সৃষ্টি করলো। স্বরাজের বাস্তববাদী ব্যাখ্যা অপেক্ষা স্বরাজের অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যাই সেদিন সমবেত জন-মণ্ডলীকে তৃপ্ত করলো। পরের দিন (২৬শে মার্চ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নাগপুর কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজ ও অসহযোগের প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করে বললেন—"এখনও পর্যন্ত লোকে স্বরাজের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেনি।...এর জন্য চাই তপস্যা বা আত্মার অনুশীলন। এর জন্য চাই গভীর ধ্যান, স্বরাজের কোনো বহিরঙ্গ পরিকল্পনা থেকে এ আসতে পারে না। সুতরাং এখন যেন কেউ স্বরাজের আদর্শের সঙ্গে 'গণতান্ত্রিক' বা 'স্বৈরতান্ত্রিক' প্রভৃতি বিশেষক শব্দ যোগ না করেন। এখন আর স্বরাজের আকৃতি সম্পর্কে যুক্তিজালের বাক্-চাতুরি শুনে কোনো লাভ নেই।"[১৬৭] যাঁরা এই অভিমতের সঙ্গে এক হতে পারবেন না, তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন—'তাঁদের অবশ্যই নিঃসঙ্গভাবে জগতের মাঝখানে দাঁড়াতে হবে; তাঁরা যেন শুধু নিজের উপরেই নির্ভর করেন, অন্য কারও উপরে নয়।[১৬৮] চিত্তরঞ্জনের সমগ্র উক্তিটি, বিশেষতঃ শেষের কথাগুলি স্পষ্টতঃ বিপিনচন্দ্রের উদ্দেশ্যেই উদ্দিষ্ট হয়েছিল। সমবেত জনমণ্ডলী 'ঠিক ঠিক' (হিয়ার হিয়ার) ধ্বনি করে সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আবেগ-দীপ্ত ভাষণকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং সত্যই এর পর থেকে বিপিনচন্দ্র নিঃসঙ্গ নায়কে পরিণত হয়েছিলেন। অথচ নাগপুর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন নিজেই বিষয়-নির্বাচনী-সমিতির কাছে আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজকে 'গণতান্ত্রিক' বিশেষণে বিশেষিত করবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। মহাত্মাজীর আপত্তির জন্য ঐ সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে নি।[১৬৯] এই দিনের অধিবেশনে অবশ্য মহাত্মা গান্ধী-প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে গেল।

এক বছরের মধ্যে স্বরাজলাভের আশ্বাসের অবাস্তবতা ব্যাখ্যা করে বিপিনচন্দ্র কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে ঐ ধরনের অসম্ভব সম্ভব হতে পারে তা'ও প্রথম দিনের সভাপতির ভাষণে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। কিন্তু ইন্দ্রজাল-

মোহিত জনমণ্ডলী সেদিন বিপিনচন্দ্রের যুক্তিজালের প্রতি দৃক্‌পাত করা প্রয়োজন মনে করেনি।[১৭০] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহাত্মা গান্ধীর আত্মিক শক্তি ও ভারতের অভূতপূর্ব জনজাগরণে তাঁর অননুকরণীয় ভূমিকার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পোষণ করা সত্ত্বেও বরিশাল সম্মেলনের মাসপাঁচেক পরে রবীন্দ্রনাথও ঐ ধরনের আশ্বাসকে যুক্তিসিদ্ধ বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'অতি সত্বর অতি দুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগছে। এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস।……কোনো একটা বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা অদূরবর্তী কোনো একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তারিখে স্বরাজ লাভ হবে, একথা যখন অতি সহজেই দেশের অধিকাংশ লোক বিনা তর্কে স্বীকার করে নিলে এবং গদাহাতে তর্ক নিরস্ত করতে প্রবৃত্ত হলো অর্থাৎ নিজের বুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জন দিলে এবং অন্যের বুদ্ধির স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হলো, তখন সেটাই কি একটা বিষম ভাবনার কথা হলো না?'[১৭১] কারণ, তাঁর মতে 'স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য, তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই।'[১৭২] খিলাফতের ব্যর্থতা সম্পর্কে আরও প্রায় দু'বছর পরে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন—'খিলাফতের ঠেকো-দেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাকলে কোনো উপায়েই স্থূলে সংশোধন হতে পারে না।'[১৭৩] ইতিহাস বিপিনচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কাকেই সত্যে পরিণত করেছে। ভারতবর্ষ খিলাফত এবং চরকা-নির্ভর অসহযোগ আন্দোলনে সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিয়েছিল। তা' সত্ত্বেও স্বাধীনলাভের জন্য তাকে নয় মাস নয়, এক বছর নয়, প্রায় সুদীর্ঘ সাতাশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

পরের দিন (২৭শে মার্চ) বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের শেষ অধিবেশন বেলা ২টা নাগাদ শুরু হয়ে সভাপতির সমাপ্তি-ভাষণের পর রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ সারা হলো। সভাপতির প্রতি ধন্যবাদজ্ঞাপক ভোটের উত্তরে দাঁড়িয়ে এই অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র বলেন—'আপনারা চেয়েছিলেন ইন্দ্রজাল। আমি দিতে চেয়েছিলাম যুক্তিজাল। কিন্তু উত্তেজিত জনমনে যুক্তিজাল বিস্বাদ লাগে। আপনারা চেয়েছিলেন মন্ত্র। কিন্তু আমি তো ঋষি নই, তাই মন্ত্র দিতে অপারগ। আমি মরজগতের একজন সাধারণ মানুষ, যে কখনো অপ্রত্যাশিতভাবে, কখনো

আপন চিন্তা এবং বহিরঙ্গ পরিবেশের বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছে, যে কখনো অর্ধ-সত্যের অন্ধকারে সত্যকে হাতড়ে বেড়িয়েছে, কখনো নিজের শিক্ষা-দীক্ষা এবং মেধা-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার দরুন মিথ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এবং এইভাবেই আমি সারাজীবন ধরে মনের পর্দায় ঘা মেরে মেরে তাতে সুর বাঁধবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু যখন সত্য আমার জানা আছে, তখন অর্ধ-সত্য প্রচার করিনি ; আমি কখনও জনগণকে অন্ধভাবে কোনো বিশ্বাসের মধ্যে পরিচালিত করতে চেষ্টা করিনি।......আমি কখনও আশা করিনি যে আপনারা সকলেই সর্ববিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন। সে রকম ঐক্য সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।...কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমার স্বরাজের স্বরূপ উপস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসবে। আর সেই প্রতিবাদ এলো তাঁর কাছ থেকে, যিনি বাংলা দেশের বর্তমান আন্দোলনের নেতা ; এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা।......আমার পক্ষে অন্ততঃ তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা ছাড়া ভিন্নতর ইচ্ছা থাকতে পারে না। যে প্রবণতা আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে ভয়ঙ্কর, তার বিরুদ্ধে এই ধরনের বাস্তব প্রতিবাদ জানানো আমার বিবেকের দাবি'।[১৭৪]

এই ভাষণদানের সময় একবার তিনি প্রবল বাধার সম্মুখীন হন এবং সভামঞ্চ ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু অনেকের অনুরোধে তিনি সভামঞ্চে থাকতে বাধ্য হন। বিরূপ জনমণ্ডলীর চীৎকারে যখন ভাষণদান বন্ধ করে তিনি আসনে বসে পড়েন, তখন তাঁর কণ্ঠে তিনবার 'রুদ্র, রুদ্র, রুদ্র' শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করে চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মশায় বিপিনচন্দ্রের মৃত্যুর নবম বার্ষিকী উপলক্ষে মন্তব্য করেছিলেন—'একজন ভক্তের হৃদয়-নিংড়ানো বেদনাঘন আবেদন কি ধ্বংসের দেবতার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছিল? যে জনগণ নির্বোধের মতো তাদের বিগ্রহকে ভেঙে ফেলেছিল, রুদ্র দেবতার উগ্র রোষ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে চলেছে এবং তারা সমস্ত দিক থেকে নিগ্রহ ভোগ করছে।'[১৭৫]

বিবেকের দাবিতে একদিন যিনি 'বন্দে মাতরম্'-মামলায় অরবিন্দর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে আদালত অবমাননার দায়ে কারাবরণ করেছিলেন, সেই বিবেকের দাবিতেই তিনি ইন্দ্রজাল-বশ জনমনের অন্ধ প্রবণতার বিরুদ্ধে এককভাবে নির্ভীক অভিমত প্রকাশ করে বাকী জীবনের জন্য প্রায় নিঃসঙ্গ

একাকিত্ব বরণ করে নিলেন। সভাপতির সমাপ্তি-ভাষণের শেষ কথাগুলি স্বাভাবিকভাবেই চিত্তরঞ্জনের প্রতি উদ্দিষ্ট। এই ঘটনার পরেই দীর্ঘকালের অনুজ-প্রতিম সুহৃদ এবং পরম স্নেহভাজন ভাব-শিষ্য চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের চির-বিচ্ছেদ ঘটে গেল। রাজনৈতিক স্তরে যা'ই হোক্, এই ধরনের ঘটনা ব্যক্তিগত স্তরে নিঃসন্দেহে গভীরভাবে বেদনাবহ। বিপিনচন্দ্রও এ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। ১৯২৫-এর ১৬ই জুন বিকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জিলিং-এ পরলোকগমন করেন। সেইদিন সন্ধ্যায় দেশবন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র লেখেন—'ভারতবর্ষের কাছে তিনি ছিলেন একজন জনসাধারণের মানুষ। বিশ বছর যাবৎ আমার কাছে তিনি ছিলেন সোদরপ্রতিম বা পুত্রপ্রতিম; আমার ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধু এবং জনজীবনে বিশ্বস্ত সঙ্গী।······গত পাঁচ বছর যাবৎ লোকে আমাকে তাঁর প্রকাশ্য উক্তি ও নীতি-সমূহের নির্মম সমালোচক এবং অভ্রান্ত বিরোধী বলেই জানে। কিন্তু তারা জানে না, যখন তাঁর বিরুদ্ধে তীব্রতম মন্তব্য প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি, তখন প্রায় আক্ষরিকভাবে আমাকে হৃদয়ের রক্তে আমার লেখনী ডুবিয়ে নিতে হয়েছে। বিশ বছরের মেলামেশা এবং জনজীবনে যুগ্ম অংশীদারিত্বের স্মৃতি এই সন্ধ্যায় আমার মনে এসে এমনভাবে ভিড় করছে যে এই মুহূর্তে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের পরিমাপ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব।'[১৭৬]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের এই বরিশাল অধিবেশনের পর শুধু দেশবন্ধু দাশের সঙ্গেই তাঁর চির-বিচ্ছেদ ঘটে গেল, তা' নয়; কংগ্রেসের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ ঘটলো এবং জনজীবনের সঙ্গেও দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়ে গেল। কিন্তু তাই বলে তিনি কংগ্রেস-বিরোধী কোনো পৃথক দলগঠনের চেষ্টা করেন নি। এর পর বিপিনচন্দ্র আরও এগারো বছর জীবিত ছিলেন এবং আমৃত্যু সক্রিয় জীবন যাপন করে গেছেন কিন্তু জনজীবনের সঙ্গে অতীত সম্পর্কের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়নি। যুগ-দেবতার সত্তার উপর যখন হুজুগ-দেবতা ভর করেন, তখন এমনি ভাবেই বিচারবুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে সত্য উপেক্ষিত হয়, ন্যায়ের অবমাননা ঘটে।

বরিশালে সম্মেলনের পর বিপিনচন্দ্র কী পরিমাণে দেশবাসীর বিরাগের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন, পরবর্তী বিবরণটি থেকে তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়:

"বরিশাল সম্মেলনের পর তিনি কলকাতায় ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে কলকাতার প্রধান জাতীয় সংবাদপত্রগুলির পরিপূর্ণ অসহযোগিতার সূত্রপাত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র তিনি অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। এই সময়, যতটা মনে পড়ে, কলকাতায় 'লিবার্টি' নামে একখানি ইংরেজী দৈনিক প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। বিপিনচন্দ্র ছিলেন তার সম্পাদক। বরিশাল সম্মেলনের পর তার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি মহাশয় বিপিনচন্দ্রের স্থলে লিবার্টির সম্পাদক হন।

কলকাতায় শুধু রাজনৈতিক সভাসমিতি নয়, সাহিত্যিক এবং ধর্মীয় সভাসমিতিতেও যাতে তিনি কিছু বলতে না পারেন, তার জন্য চেষ্টা হয়। ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত এইরূপ একটি সাহিত্য-সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। যতদূর মনে পড়ে বিজয়চন্দ্র মজুমদার ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। ঐ সভায় বিপিনচন্দ্র বক্তৃতার জন্য আহূত হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সভায় তাঁকে কিছু বলবার সুযোগ দেওয়া হলে সভা ভেঙ্গে দেওয়া হবে, এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়। ব্রাহ্ম-সম্মেলন সমাজে এই সময় তাঁর একটি ব্যাখ্যানের ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনি উপস্থিত হলে তাঁকে কোনো কথা বলতে দেওয়া হয় না। সভা শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়।

এই সময় দেশে রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলন সম্পর্কে যেসব মতামত বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল, বিপিনচন্দ্র সেগুলি অবলম্বন করে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন। লেখাগুলি 'হোয়াট ইণ্ডিয়া থিংকস্' নামে ইংলিশম্যানে প্রকাশিত হতে থাকে। এতে বলা হয়, বিপিনচন্দ্র বিদেশী কাগজের ভাড়াটিয়া লেখক।

বিপিনচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র নিরঞ্জন পাল তখন বিলাতে। নিরঞ্জন পাল নামে অন্য একজন যুবক ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসে চাকরি পান। তাঁর বিরোধীরা এঁকে বিপিনচন্দ্রের পুত্র বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু এই নিরঞ্জন পাল বিপিনচন্দ্রের পুত্র ছিলেন না। আমার নামেও কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে আমি এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেয়েছি। আমি অবশ্য কোনোদিন কোনো সরকারী কাজ পাইনি। এইভাবে, আমি যতটা জানি, বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী বলে এদেশের সমস্ত কাগজে বা সভাসমিতিতে তাঁর মতামত প্রকাশের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য কোনো বড়ো দেশব্যাপী

আন্দোলনের বিরোধিতা করলে, যিনি বিরোধিতা করেন, তাঁর ভাগ্যে এইরকমই ঘটে। এর জন্য বিপিনচন্দ্রকে কোনোদিন কোনো অনুযোগ করতে শুনিনি।"[১৭৭]

বিবেকের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে জীবন-সায়াহ্নে তিনি বন্ধু, অনুরক্ত ও সহযোগীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হলেও দেশসেবার আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। দেশের এক প্রভাবশালী অংশ তাঁকে উপেক্ষা করলেও দেশকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। এই অবস্থায় সাধারণতঃ লোকে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু তিনি তা করেননি। অজস্র দুঃখ-দারিদ্র্য-লাঞ্ছনার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও হৃদয় থেকে স্বতোৎসারিত সেবা তিনি নিজস্ব উপায়ে দেশের জন্য প্রসারিত করে গেছেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিধানসভার (ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ য়্যাসেম্লি) জন্য যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কলকাতা অ-মুসলমান নির্বাচন-কেন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী প্রার্থীরূপে বিপিনচন্দ্র সেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন কংগ্রেস-প্রার্থী নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। এই নির্বাচনে বিপিনচন্দ্র ১০৬৮টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন এবং তাঁর প্রতিপক্ষ নির্মলচন্দ্র চন্দ্র পান ৫৬১টি ভোট। ৬১টি ভোট বাতিল হয়ে যায়।[১৭৮] ২৪শে নভেম্বর চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষরে এই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়।[১৭৯] ভোটদানের অব্যবহিত পূর্বে নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মশায়ের পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শিথিল হলেও দেশবাসীর মনে বিপিনচন্দ্রের প্রতি আস্থা যে একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি, এই নির্বাচন তার সাক্ষ্য বহন করে।

১৯১৯-এর ভারত শাসন আইন (গভর্নমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট) অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা সম্পূর্ণভাবে পুনর্বিন্যস্ত হয়ে দ্বি-কক্ষ (বাই-ক্যামেরাল) সভায় রূপান্তরিত হয়; একটি বিধানসভা (লেজিসলেটিভ য়্যাসেম্লি) অপরটি রাজ্য-পরিষদ্ (কাউন্সিল অব্ স্টেট)। বিধানসভার সভ্য-সংখ্যা প্রথমে ১৪০, তারপর বৃদ্ধি করে ১৪৫ নির্ধারিত হয়। এর মধ্যে নির্বাচনযোগ্য সংখ্যা ছিল ১০৫, মনোনীত সরকারী সভ্যের সংখ্যা ২৬ এবং মনোনীত বে-সরকারী সভ্যের সংখ্যা ১৪। রাজ্য-পরিষদের পরমায়ু ছিল পাঁচ বছর এবং বিধানসভার পরমায়ু তিন বছর।

উপরি-উক্ত নির্বাচনে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদীরা ৫৫টি ভোট পান। কিন্তু তাঁদের সুসংবদ্ধ দল ছিল না ; তাই দলের টিকিট নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে স্বরাজ্যদল জাতীয়তাবাদীদের চেয়ে সংখ্যায় কম হলেও দিল্লীর বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রূপে স্বীকৃতি পেতে চেষ্টা করেন।[১৮০] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ছিলেন এই স্বরাজ্যদলের (১৯২৩) অন্তর্ভুক্ত।

স্বরাজ্যদলের উদ্দেশ্য ছিল স্বরাজলাভের জন্য বিধানসভার ভিতরে থেকে সরকারী কাজে নির্বিচারে ক্রমাগত বাধা দান করে সরকার অচল করে দেওয়া। তাঁরা ছিলেন পূর্ণ অসহযোগিতার পক্ষপাতী। কিন্তু স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদীরা এর সমর্থক ছিলেন না। তাঁরাও পূর্ণ স্বরাজলাভের জন্য সমানভাবে আগ্রহী হলেও যেহেতু তাঁরা 'অসহযোগী' ছিলেন না, সেইজন্য নির্বিচারে বাধা সৃষ্টি তাঁদের অনভিপ্রেত ছিল। তা' ছাড়া, তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারেও এই ধরনের অঙ্গীকার ছিল না। নির্বাচনী ইস্তাহারে যে-নীতি ঘোষিত হয়নি, নির্বাচনের পর সেই নীতি অবলম্বন করাকে তাঁরা নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি নৈতিক দায়িত্বহানি বলে মনে করতেন। পূর্ণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বিপিনচন্দ্রের পক্ষে এই ধরনের অ-গণতান্ত্রিক কাজ করা তাই সম্ভব ছিল না।[১৮১] এইজন্য স্বরাজ্য দল প্রকাশ্য সভায় বিপিনচন্দ্রকে নির্বাচকমণ্ডলীর চোখে হেয় করবার চেষ্টা করে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর কাছে লিখিত একখানি পত্রে তিনি স্বরাজ্য-দলের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে একমত হওয়ার অসুবিধার কথা যুক্তি সহকারে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন।[১৮২]

বিধানসভার অধিবেশনে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯২৪) বিপিনচন্দ্র স্বভাব-সিদ্ধ বাগ্মিতার সাহায্যে প্রথমে ১৮১৮-র তিন নম্বর বেঙ্গল রেগুলেশন আইন এবং অন্যান্য দমনমূলক আইন বাতিলের জন্য দাবি জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—'ভারতবাসীর পূর্ণ জাতীয় সার্বভৌমত্বলাভের দাবি স্বীকার করে নিয়ে আপনারা ভারতের সঙ্গে সাম্রাজ্যিক সম্পর্ক রক্ষা করুন।......আমাদের একটা সসম্মান চুক্তিতে আবদ্ধ হতে দিন, যে চুক্তি আমাদের আত্মমর্যাদা, আমাদের স্বাধীনতার চেতনা এবং আপনাদের নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।'[১৮৩] লক্ষণীয় এই যে দ্বিতীয়বার বিলাত-পর্যটনের পর তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় যে নতুন ধরনের

আন্তর্জাতিকতাবাদের উদ্ভব ঘটে, যাকে ভিত্তি করে তিনি নতুন ইম্পিরিয়াল ফেডারেশন-তত্ত্ব বা 'ফেডারেটেড কমনওয়েলথ'-এর আদর্শ প্রচার করেন, তার সঙ্গে এই উক্তি সামঞ্জস্যের সূত্রে বিধৃত। সম্পূর্ণভাবে সম-মর্যাদার ভিত্তিতে গ্রেট বৃটেনের অন্যান্য উপনিবেশসমূহ সহ গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে ভারতের সমবায়মূলক অংশীদারিত্ব অর্জন ছিল, সংক্ষেপে তাঁর নতুন আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ। দিল্লীর এই অধিবেশনে তিনি অন্যান্য কয়েকটি সমকালীন সমস্যা সম্পর্কেও বক্তৃতা দান করেন।[১৮৪]

এই সময় কিছুদিনের জন্য (জুন, ১৯২৪—মে, ১৯২৫) বিপিনচন্দ্র কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক 'বেঙ্গলী'র সম্পাদনা করেন। সে প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ের 'সাংবাদিক' পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া এ সময় থেকে বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকাতেও তাঁর নানা বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হতে থাকে।

বিপিনচন্দ্র বাংলা দেশের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ছিলেন। জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত নামে জনৈক মুদ্রক ও প্রেসকর্মী বাংলা ভাষায় শ্রম-বিষয়ক একখানি পত্রিকা প্রকাশের জন্য উদ্যোগী হন। তিনি সেই পত্রিকার নামকরণের জন্য বিপিনচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হলে বিপিনচন্দ্র তার নাম নির্দেশ করেন—'সংহতি' (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা—বৈশাখ, ১৩৩০ ; এপ্রিল-মে, ১৯২৩) অর্থাৎ সংগঠন। 'সংহতি'র প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি লেখা দিয়ে এই পত্রিকার সহায়তা করেন।[১৮৫]

এই সময় থেকে তিনি দেশের চলমান রাজনৈতিক জীবন-প্রবাহ থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য তিনি আজীবন সঞ্চয়ে বিমুখ ছিলেন ; তাই সঞ্চিত অর্থ বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। এইজন্য কোনোদিনই সচ্ছল অবস্থায় তাঁর দিন কাটেনি। যে দেশবাসীর মঙ্গলচিন্তায় তিনি নিজের সমস্ত চিন্তা উৎসর্গ করেছিলেন, সেই দেশবাসীর চিন্তায় যখন তাঁর স্থান হলো না তখন থেকে দারিদ্র্য কঠোরতর মূর্তি ধরে তাঁকে গ্রাস করতে উদ্যত হলো। অন্তিম বার্ধক্যে দারিদ্র্যের নির্মম ভ্রূকুটি নীরবে সহ্য করে তাঁকে জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাতে হলো। অথচ তাঁর স্বকীয় আদর্শবোধে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা চিন্তায় কোনো দৈন্য দেখা দিল না।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে যে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মেলনে শেষবারের মতো তাঁকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক মঞ্চে উপস্থিত হতে দেখা যায়।[১৮৬]

কিন্তু তখন দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া তাঁর ধ্যান-ধারণার প্রতিকূলে বইতে শুরু করেছে। যে নেতৃত্ব তাঁর করতলচ্যুত তার পুনরুদ্ধার তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলো না।

রাজনীতির দ্বার তাঁর জন্য সম্পূর্ণ রুদ্ধ হলেও সাহিত্যের দ্বার তখনও সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়নি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতির নিদর্শনরূপে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন (বেঙ্গল লিটারারি কন্‌ফারেন্স) অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মেলনে বিপিনচন্দ্র অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।[১৮৭] এই বছর ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ শহরেও একটি সাহিত্য-সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মিলনীতে বিপিনচন্দ্র সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন এবং সভাপতিরূপে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।[১৮৮] সেই ভাষণের প্রাসঙ্গিক অংশ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

পরলোকগমনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দিনগুলিতেও বিপিনচন্দ্রের চিন্তা-শক্তি স্বচ্ছ ও সক্রিয় ছিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'হিন্দু' পত্রিকার ইংরেজী ক্রোড়পত্রের অ-নামী সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। সে প্রসঙ্গ 'সাংবাদিক' পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এর পর প্রায় আড়াই মাস কাল তিনি জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর যে সমস্ত রচনা 'হিন্দু'র ইংরেজী ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনার সুর অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল।

তিনি রাজনৈতিক কারণে গুপ্তহত্যার বিরোধী ছিলেন। বিপ্লবী কুমারী বীণা দাস কর্তৃক গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনের জীবনের উপর আক্রমণের তিনি বিরূপ সমালোচনা করেন।[১৮৯] বিপিনচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে আইনের প্রতি প্রজাবৃন্দের সহজ আনুগত্যের উপরেই রাষ্ট্রের বনিয়াদ গড়ে ওঠে। অবাঞ্ছিত সরকারের উচ্ছেদের জন্য সেই মূল বনিয়াদে আঘাত করা অনুচিত। আইন অমান্য করবার জন্য প্রজাদের প্ররোচিত করলে হয়তো প্রতিষ্ঠিত সরকারকে পঙ্গু বা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায়; কিন্তু আইন অমান্য করবার মনোভাব একবার জনমনে প্রশ্রয় লাভ করলে অরাজকতাই বৃদ্ধি পায়, পরিবর্তিত অবস্থাতেও আইন মান্য করবার সুস্থ মানসিকতা ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি এই সময় মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলনের (সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট) বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। তিনি স্পষ্টই

বলেন—'...এবং আমি যে গান্ধী-নীতি এবং গান্ধী-অভিযানের এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-ভাবে বিরোধী, তার কারণ এই নীতি ও এই অভিযানের লক্ষ্য বর্তমান সরকারের স্থলে সরকারহীন একটা অবস্থা অথবা সম্ভবতঃ মহাত্মার পুরোহিততন্ত্রসুলভ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা।'[১৯০]

একদিকে দেশের প্রভাবশালী অংশের অপরিসীম উপেক্ষা ও অবজ্ঞা, অন্যদিকে কঠোর দারিদ্র্য—এ সমস্তই নীরবে শিরোধার্য করে তাঁকে অন্তিম জীবনের শেষ ক'টি বছর অতিবাহিত করতে হয়। কারণ, 'বঙ্গদেশের কংগ্রেস নেতাগণ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে না পারিয়া নানা প্রকার হীন উপায়ে তাঁহাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি যাহাতে সপরিবারে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তজ্জন্য তাঁহারা সংবাদপত্র-সম্পাদক, প্রকাশক ইত্যাদির নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইতে আরম্ভ করেন।...'[১৯১] অথচ এজন্য কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়নি। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের দ্বার যখন তাঁর জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন তিনি 'ইংলিশম্যান', 'স্টেটস্‌ম্যান' প্রভৃতি বিদেশী-পরিচালিত সংবাদপত্রের স্তম্ভ অবলম্বন করে নিজস্ব অভিমত প্রচার করতে থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্টেটসম্যান লেখেন যে তাঁদের ফাইলে বিপিনচন্দ্রের অনেক পত্র আছে। তা' থেকে তাঁদের ধারণা হয়েছে যে তাঁর অভিমতসমূহ প্রকাশের অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না বলেই তিনি ইউরোপীয়-পরিচালিত সংবাদপত্রের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হন। তবে 'এই সমস্ত পত্রে কোনো অভিযোগ নেই, কারণ বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের ঊর্ধ্বে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যিনি ভারতের সেবায় নিজের সর্বস্ব দান করেছেন, একদিন যাঁর কণ্ঠ ও লেখনীনিঃসৃত বাণী থেকেই দেশবাসী জাতীয়তাবাদের গভীরতর তাৎপর্যের কথা শিক্ষা করেছে, পরিপক্ক অভিমতের অধিকারী হবার পর তিনিই ভারতের অধিকতর সেবার সুযোগ থেকে দেশবাসী কর্তৃক বঞ্চিত হলেন।'[১৯২]

সেদিন ছিল ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে, (৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯) শুক্রবার। বিপিনচন্দ্র সে সময়ে সপরিবারে বালিগঞ্জ অঞ্চলে ৫০৯, পণ্ডিতিয়া রোডের বাসিন্দা। দীর্ঘজীবনে তাঁকে তেমন কঠিন রোগ ভোগ করতে না হলেও শেষের দিকে তাঁর স্বাস্থ্য তেমন ভালো যাচ্ছিল না। সহসা সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে

সেদিন সকাল থেকে তাঁর মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ শুরু হলো এবং সেইদিন দুপুরবেলা দেড়টার সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।[১৯৩]

প্রখ্যাত নাট্যকার ইব্‌সেনের সুবিখ্যাত নাটক 'ম্যান্ এনিমি অব্ দি পিপ্‌ল'-এর নিগৃহীত নায়ক ডাক্তার স্টকম্যান-এর মতো 'লাল-বাল-পাল'-এই ত্রিনাথের শেষতম বিপিনচন্দ্রও সারাজীবন নিজের চিন্তা ও কর্ম লোক-কল্যাণে উৎসর্গ করেও শেষজীবনে দেশবাসীর একাংশের কাছ থেকে 'লোক-শত্রু' আখ্যা লাভ করে দেশের মাটি থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। জীবন-নাট্যের যবনিকা-পতনের পূর্বে বিপিনচন্দ্রও ডাক্তার স্টকমান-এর মতো নিজের স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের কাছে ডেকে নিয়ে নিজের জীবনে আবিষ্কৃত বৃহত্তম সত্যটা উচ্চারণ করতে গিয়ে চুপি চুপি তাদের বলতে পারতেন—'তোমাদের কাছে এই কথা বলে যাচ্ছি যে জগতে যে সবচেয়ে বেশী একা, সে-ই সবচেয়ে বেশী শক্তিমান্'।[১৯৪] কারণ, বক্সার জেল থেকে প্রত্যাবর্তনের দিন যে পুরুষ কলকাতা এই দেশনায়কের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় হাওড়া স্টেশনে ভেঙে পড়েছিল, কলেজ স্কোয়ারে সোচ্চার কণ্ঠে সমবেত হয়েছিল, সেই পুরুষ কলকাতার হৃদয় এ দিন বেদনায় বিন্দুমাত্র স্পন্দিত হয়ে উঠলো না, এক যুগের অবিসংবাদিত দেশনায়কের শেষ দর্শনলাভের জন্য সেখানে বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা দেখা দিল না। জানা যায় আত্মীয়স্বজন এবং নিকট-বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অতি অল্প লোকেই শ্মশানঘাট পর্যন্ত তাঁর শবাধারের অনুগমন করেছিল"।[১৯৫]

বিপিনচন্দ্রের তিরোধানের সময় তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শ্রীযুক্তা বিরাজ-মোহিনী পাল, পাঁচ কন্যা—শোভনা নন্দী, ইন্দিরা দে, লীলা দত্ত, অমিয়া দেব, বীণা চৌধুরী এবং তিন পুত্র—নিরঞ্জন পাল, জ্ঞানাঞ্জন পাল এবং প্রেমাঞ্জন পাল জীবিত ছিলেন।

যাঁরা জন্ম-বিদ্রোহী, যাঁরা অন্তরে অনুভূত বাণীর নির্দেশে পরিচালিত হন, তাঁদের ভাগ্যে এইরকমই ঘটে। জীবনে তাঁদের অনেক লাঞ্ছনা বঞ্চনা বরণ করতে হয়। কিন্তু এই লাঞ্ছনা বঞ্চনা বরণ প্রতিবারেই তাঁদের জীবনকে সমৃদ্ধি দান করে এবং এইভাবে সমৃদ্ধ-হয়ে-ওঠা জীবনকে একদা তাঁদের স্বদেশবাসী এবং বিশ্ববাসী স্থায়ী সম্পদরূপে লাভ করে।

॥ বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্র-চিন্তা ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় লালিত প্রায় সমস্ত বাঙালী মনীষীই দু'টি ধারণাকে অভ্রান্ত সত্যের মতো গ্রহণ করেছিলেন। এক—পরানুকরণের পথে বড়ো হওয়া যায় না ; দুই—কালের তালে তাল ফেলে চলতে না পারলে চলাটাও সফল হয় না। এইজন্যেই রামমোহন-বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারে, রামমোহন-কেশবচন্দ্র-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধর্ম-সংস্কারে এবং মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র এই সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন রাজনীতি-ক্ষেত্রে।

বিপিনচন্দ্রের সমগ্র জীবনসাধনার মধ্যে যে অংশটি তাঁর স্বকীয় বিশিষ্টতায় সর্বাধিক সমুজ্জ্বল, সেটি হলো তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাপ্রসূত ভবিষ্যৎ-ভাবনা। এ-ভাবনা তাঁর সমকালে কখনই সম্পূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হয়নি, যদিও পরবর্তী কালে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, এ বিষয়ে বিপিনচন্দ্রের যেন ঋষিদৃষ্টি ছিল। এর সহজ কারণ অবশ্যই এই যে বিপিনচন্দ্র শুধুমাত্র ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রেই তাঁর সমগ্র আগ্রহকে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি, অর্থাৎ কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকেই তিনি ধ্যান জ্ঞান করেন নি। দখলীকৃত ক্ষমতার সুষ্ঠু শুভঙ্কর ব্যবহার কী ভাবে করতে হয় এবং কী ভাবে করা যায়, সে চিন্তাও তাঁকে সমকালীন অন্যান্য নেতাদের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে উদ্বেজিত করেছিল। ইংরেজের শাসন থেকে মুক্তিলাভের পর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন আবার ভারতবাসীদের হাতেই আসবে, তখন ভারতরাষ্ট্রের রূপটি কী হবে, বিদেশী শাসনমুক্ত ভারতবাসী-পরিচালিত সরকারী শাসনযন্ত্রের কাঠামোটি কেমন হবে, কোন্ নীতির ভিত্তিতে এবং কোন্ আদর্শের অনুসরণেই বা সেই শাসনব্যবস্থা কার্যকর হবে, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত করবার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন চিন্তাই হচ্ছে কর্মের নেত্রী। অস্পষ্ট চিন্তা-প্রসূত কর্ম পরিণামে ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হয়। অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে এখানেই তাঁর ছিল প্রভেদ এবং মতবিরোধের অনেকখানি কারণ। তখনকার দিনে অধিকাংশ নেতাই মনে করতেন যে ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের জন্য থাক, পর-শাসনমুক্ত ভারতরাষ্ট্রের রূপাদর্শ কেমন হবে, তার জন্য এখনই ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। এইজন্যই ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বরিশালে প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরূপে বিপিনচন্দ্র যখন ভাবী

ভারতের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র বা সে বিষয়ে এক সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দাবি করলেন, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো হৃদয়বান ব্যক্তিও বিপিনচন্দ্রকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলেন—"আই য়্যাম্ নট্ এ 'স্কিমিং' ম্যান।"[১৯৬] অথচ দেশবন্ধুর স্বদেশপ্রেমে কোনো ভাঁটা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির প্রয়োগ যে জীবনের অপর ক্ষেত্রেও সম্ভব, সে বিষয়ে তখনকার নেতারা তত সচেতন ছিলেন না। তাঁরা আবেগে যত সহজে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, স্বাদেশিকতামূলক যে কোনো কর্মের প্রবাহেই ঝাঁপিয়ে পড়তে যতটা অস্থির হয়েছিলেন, ধীর স্থিরভাবে ফলাফল ভাবনার অবকাশ রাখতে ততই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এইজন্যেই গান্ধীজী যখন খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করে ভারতের প্রভাবশালী মুসলমান নেতৃবৃন্দকে কংগ্রেসের সঙ্গে বৃটিশ শাসনবিরোধী আন্দোলনে সহযোগিতা করতে সম্মত করালেন, তখন প্রায় সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা করতলগত আশু লভ্য ফলটিকেই দেখলেন এবং খুব বড়ো করে দেখলেন। সেই আশু লভ্য ফলটি হলো বৃটিশ-শাসনের বিরোধিতায় এমন কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সম্মতি, যাঁরা এতকাল এই সম্মতিদানে কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু যে উপায়ে বা যে মূল্যে এই সম্মতি সংগৃহীত হলো, তার বিচার-বিবেচনা করতে তাঁরা ধৈর্যশীল ছিলেন না। গান্ধীজী এবং আলি-ভাইদের মধ্যে চুক্তি দ্বারাই ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মিলন ও সম্প্রীতি যে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গেল, এই সদিচ্ছার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করতে বা সংশয় পোষণ করতে তাঁরা একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু আবেগপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্র রাজনীতিক্ষেত্রে মস্তিষ্ক শাসনকে অবহেলা করতে স্বীকৃত ছিলেন না। তাই তিনি সেদিন খিলাফত আন্দোলনের মধ্যে স্থায়ী আশার আলো দেখতে পাননি।

এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের রাজনীতি-বিষয়ক রচনা সম্পর্কে লিখেছিলেন 'বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি।···রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে, প্রয়োজনের সঙ্গে সেই সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না।······রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে

উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে।...বস্তুতঃ সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই'।[১৯৭] এই কথাগুলি বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কেও প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য।

বস্তুতঃ বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তা সঙ্কীর্ণ একমুখী ছিল না। বিশ্লেষণাত্মক বিচারবুদ্ধি-আশ্রয়ী তাঁর চিন্তা রাষ্ট্রতত্ত্ব, রাষ্ট্রদর্শন এবং রাজনীতি—ফলিত ও নীতিগত, সবদিকেই প্রসারিত হয়েছিল। তথ্যকেই তিনি সর্বস্ব বিবেচনা করতেন না। তথ্যের ভিত্তিতে তিনি যেমন তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তেমনি তত্ত্বের নিরিখে তথ্যকে যাচাই করে তার মূল্যায়ন করেছেন। তথ্য বিচার করে তিনি দেখেছেন যে, কোন তত্ত্ব সার্বজনীন ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলেও, মৌল স্বভাবে অখণ্ড হলেও, দেশকালপাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিব্যক্ত হয়। আবার ঘটনাসমূহ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর স্বতন্ত্র প্রকৃতির প্রতীয়মান হলেও তাদের অন্তরালে এক তত্ত্বের অখণ্ড প্রবাহ পরিলক্ষিত হতে পারে। বিপিনচন্দ্রের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার ধারণা ও ভাবনা এই প্রত্যয়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

মানব-সভ্যতার বিকাশের মূল গতিধারা এবং জাতিবিশেষের চারিত্রিক ও স্বভাববৈশিষ্ট্য সেই বৃহৎ প্রবাহের অন্তর্গত জাতীয় ইতিহাসের এক স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি—এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিপিনচন্দ্র ভারতরাষ্ট্রের বর্তমান ও আগামী দিনের জন্য সম্ভাব্য রূপটিকে প্রত্যক্ষ ও নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন পলিটিক্স, পেট্রিয়টিজ্‌ম, নেশন, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইত্যাদি ইংরেজী শব্দগুলির প্রতিশব্দ প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় অনুপস্থিত। এগুলি পাশ্চাত্য রীতিনীতির প্রভাবে ও অনুকরণে এদেশে প্রচলিত হয়েছে। এবিষয়ে তাঁর মত ব্যক্ত করে তিনি লিখেছেন—'আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রাজনীতি বলিয়া কোন কথা নাই; রাজধর্ম কথাটা আছে, আর আছে নীতি। আমরা ইংরাজীতে যাহাকে পলিটিক্স বলি, তাহা কতকটা রাজধর্মের অন্তর্গত আর কতকটা প্রাচীনেরা সংস্কৃতে যাহাকে নীতি বলিতেন তাহার অন্তর্গত।...ইংরাজীতে যাহাকে স্টেটক্র্যাফট বলে, তাহাই আমাদের প্রাচীন ভাষায় নীতি ছিল। ইংরাজীতে যাহাকে স্টেটসম্যান বলে আমাদের প্রাচীন পরিভাষায় তাঁহারা নীতিজ্ঞ ছিলেন। শুক্রনীতি, কৌটিল্য-নীতি, চাণক্য-নীতি—এই সকলই ইংরাজী স্টেটক্র্যাফটের অন্তর্ভুক্ত'।[১৯৮]

অর্থাৎ ইংরেজী শব্দগুলির প্রতিশব্দ এদেশে প্রচলিত না থাকলেও, মূল বিষয়টি এদেশে অজানা ছিল না। তবে বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে পলিটিক্সের যে পরিসর, ভারতে রাজধর্ম ও নীতির পরিসর তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল।

প্রাচীন গ্রীকেরা 'এথিক্‌স্' বা ধর্মনীতিকে মূল শাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতিকে তার অংশমাত্র মনে করতেন। তাঁদের কাছে রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ছিল প্রধানতঃ নৈতিক আদর্শ। প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনা নৈতিক আদর্শের দ্বারাই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এরিস্টটলের মতে, মঙ্গলময় সুন্দর জীবন সম্ভব করবার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং একমাত্র সু-রাষ্ট্রেই সুনাগরিকের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। প্রাচীন ভারতেও অনুরূপভাবে এথিক্‌স্ বা ধর্মনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'নীতির প্রয়োজন প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া শুক্রনীতি-শাস্ত্রে বলিয়াছেন, নীতির প্রয়োজন মোক্ষ—জীবকে মুক্তির দিকে এগিয়ে দেওয়া···মহাভারতের ভীষ্মপর্বে রাজধর্ম সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তাহাতে রাজধর্ম পর্বাধ্যায়কে বলেছেন মোক্ষপর্বের অন্তর্গত।'

এই মোক্ষ কী ? বিপিনচন্দ্রের মতে—'মোক্ষ আর কিছুই নয়, জীবের শিবত্ব-প্রাপ্তিই মোক্ষ, মানুষের দেবত্ব-লাভই মোক্ষ। শিবত্ব বা দেবত্ব বাহিরের জিনিস নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই শিবত্ব, এই দেবত্ব রহিয়াছে'। কিন্তু এই 'মোক্ষ আকাশ হইতে পড়ে না, সাধনা দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে হয়।···জীবকে যদি শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে হয় তাহা হইলে তাহার ভিতর যে সমুদয় অসম্পূর্ণতা আছে, যে সমুদয় অজ্ঞানতা আছে, যে সমুদয় ক্ষুদ্র দৃষ্টি আছে···এই সকল নষ্ট হওয়া চাই, না হইলে মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারে না। জীবের যে সমুদয় মোহ, অজ্ঞানতা বা সঙ্কীর্ণতা আছে—যেজন্য তাহার নিজের শিবত্বকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইয়াছে—সেগুলিকে সরাইয়া দেওয়া সমাজ-বন্ধনের এবং সমাজ-ধর্মের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রীয় বন্ধন এবং রাজধর্মেরও সেই উদ্দেশ্য'। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলির যথেচ্ছাচার মানুষের অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক। এই প্রবৃত্তিসমূহের তাড়নাতেই মানুষ ঈর্ষা, দ্বেষ, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে একে অপরের অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপে প্রবৃত্ত হয়। সমাজে বঞ্চনা এবং তজ্জনিত দুঃখ-দারিদ্র্যের মূল উৎস এখানেই। সমাজ-বন্ধন এবং রাষ্ট্রীয়-বন্ধন, সমাজধর্ম এবং রাজধর্ম মানুষের এই জীবসুলভ প্রবৃত্তিসমূহকে বশে রাখবার জন্য বিধি-নিষেধের আকারে নিবৃত্তির শক্তি জুগিয়ে জীবকে শিবত্ব অর্জনের যোগ্য করে তোলে। শিবত্বের

স্বাদ একবার পেলে কোনো জীবের পক্ষে এমন কাজ করা আর সম্ভব হয় না যা' অপর জীবের বিকাশের পক্ষে প্রতিকূল। বিপিনচন্দ্রের সমগ্র রাষ্ট্র-চিন্তা এই মোক্ষের-আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। সাধ্য—মোক্ষ, সাধনোপায়—স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে বিপিনচন্দ্রের সমগ্র রাষ্ট্র-চিন্তা অলক্ষ্য ঐক্যের সূত্রে বিধৃত। বিভিন্ন সময়ে তাঁর চিন্তাধারায় যে পরিবর্তন দেখা গেছে তা' আসলে মতাদর্শের পরিবর্তন নয়; মতাদর্শ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে সময়োচিতভাবে কর্মপ্রণালীর পরিবর্তন।

ইউরোপে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে গ্রীক আদর্শ পরিত্যক্ত হয় এবং ইতালীয় চিন্তা-বীর মেকিয়াভেলীর প্রভাবে রাষ্ট্রনীতি ধর্মনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে পড়ে এবং স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হতে থাকে। এই নতুন মতাদর্শে বলা হয় যে, নীতিশাস্ত্র মানুষের মনের চিন্তা ও বাহ্যিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করবে, মনের চিন্তার সঙ্গে এই শাস্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। উপরন্তু, মানুষের সর্বপ্রকার বাহ্যিক আচরণও রাষ্ট্রনীতির অধিকারে আসে না। সরকার-গঠন, সরকার-পরিচালনা, আইন-প্রণয়ন, আইন-পালন, অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও সম্পর্ক পরিচালনা করা ইত্যাদি সাম্প্রতিক বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচরণই রাষ্ট্রনীতির বিবেচ্য। এই নতুন আদর্শে আরও বলা হলো, কোনো কল্পিত বিশুদ্ধ মানদণ্ডের নিরিখে ন্যায় ও অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রেখেই নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ রচিত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের আইন-রচনার সময় সাময়িক, সাম্প্রতিক স্বার্থসিদ্ধির সুবিধা-অসুবিধার কথাই বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়। দুর্নীতিমূলক না হলেও অনেক কিছুই বেআইনী হতে পারে। আবার সরকারী আইনসম্মত অনেক কিছুই নীতিসম্মত না-ও হতে পারে।

ধর্মনীতি থেকে বিযুক্ত হয়ে পঞ্চদশ শতকের পরবর্তী ইউরোপে রাষ্ট্রনীতি যেমন সঙ্কীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, প্রাচীন ভারতের রাজধর্ম এবং নীতিশাস্ত্রও তেমনি কালক্রমে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। মোক্ষলাভের আদর্শ সঙ্কীর্ণ হয়ে শুধু ব্যক্তিগত মুক্তিচিন্তায় পর্যবসিত হওয়ায় 'সন্ন্যাসধর্মের প্রাদুর্ভাবে সংসারধর্ম মলিন হইয়া গেলে, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া যায়'।

ধর্মনীতিবিযুক্ত রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রনীতিবিযুক্ত ধর্মনীতি—এই দুই বর্তমান বিপদ থেকে বিপিনচন্দ্র ভারতকে তথা জগৎকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। এইজন্যই তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত পেট্রিয়টিজ্‌ম্, নেশন, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইত্যাদি

শব্দের বিশ্লেষণ করে, এগুলির অনুপযোগিতা প্রমাণে অগ্রসর হয়েছেন। বিপিনচন্দ্রের মতে 'পলিটিক্সের অভিধেয়—রাজশক্তি এবং প্রজামণ্ডলী ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করা এবং সেই সম্বন্ধ যাহাতে উভয়ের ধর্মের অনুমোদিত হয়, উভয়ের মুক্তির অনুমোদিত হয়, সেইভাবে তাহা প্রচলিত করা।'

বিপিনচন্দ্রের মতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এবং স্বাধীনতা সমার্থক হতে পারে না। কারণ, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স শব্দ অভাবাত্মক। ডিপেণ্ডেন্স বা বশ্যতার অভাব। স্বাধীনতা শব্দ ভাবাত্মক; অধীনতার অভাব নহে, কিন্তু স্ব-এর অধীনতা। তাই তিনি মনে করেন যে ইউরোপের অনুকরণে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের সাধনা করলে স্বারাজ্য-লাভ সম্ভব হবে না। 'এই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বা অনধীনতার অনুশীলনে কখনই মুক্তি-লাভ হয় না, হইতেই পারে না। এই অনধীনতার অনুশীলনে বাস্তবিকই কেবল বিরোধের সৃষ্টি করে।...য়ুরোপের জাতিসকল এই নিঃসঙ্গ স্বারাজ্যলাভের লোভে পরস্পর রেষারেষি করিয়া নিদারুণ বিরোধের আয়োজন করিয়াছেন।...এই রেষারেষি হইতেই ক্রমে (১৯১৪-১৮) য়ুরোপীয় যুদ্ধ বাধিয়া ওঠে। আর ইহার মূল কারণ য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনীতির আদর্শে জাতীয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। কোন্ জাতি অপর জাতি হইতে বড়ো হইয়া উঠিবে, কে কাহাকে দমাইয়া রাখিবে, কে কাহার মুখের অন্ন কাড়িয়া লইবে, য়ুরোপের রাষ্ট্রনীতির ইহাই গতি ও প্রকৃতি হইয়া উঠিয়াছে।'

ইংরাজশাসনমুক্ত হবার পর ভারত যেন এই সর্বনাশা পথ অনুসরণ না করে, এইজন্যই বিপিনচন্দ্র স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণের চেষ্টায় আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় নীতি বিশ্লেষণে অগ্রসর হন এবং এই উদ্দেশ্যেই স্বাধীনতার স্বরূপনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন।

ভারতের জাতীয়তাবাদ প্রচারের অন্যতম প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা হয়েও বিপিনচন্দ্র ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী। ইউরোপের জাতিসমূহের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি এই ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন যে, আন্তর্জাতিকতার আদর্শবর্জিত জাতীয়তাবাদ দৃষ্টিভঙ্গিকে সঙ্কীর্ণ করে আনে। এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্রমে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয় যে, কোনো শ্রেষ্ঠ জাতির অপর সব জাতির উপর প্রভুত্ব করবার অধিকার আছে। ফলে উগ্র জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়।

কিন্তু স্বাদেশিকতা ও সাজাত্যবোধের যে একটা শুভঙ্কর দিকও আছে—তা'ও অনস্বীকার্য। যে ঐক্যবোধের ফলে জনসমষ্টি জনসমাজে পরিণত হয়, যে প্রীতির

বলে স্বাদেশিকতা ও সাজাত্যবোধের স্ফুরণ হয়, সেই ঐক্য ও প্রীতি অবশ্যই বাঞ্ছনীয় গুণ। এই গুণের আশ্রয়েই মানুষ পরস্পর মিলিত হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র জীবনের তুচ্ছ সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর জীবনে সঙ্গত হয়। সুতরাং সভ্যতার বিকাশে সুস্থ জাতীয়তাবাদের স্থান অপরিহার্য। নব্য ইউরোপে জাতীয়তাবাদের জনক ইতালীয় জননায়ক ও দার্শনিক ম্যাজিনিও বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক জাতির কোনো-না-কোনো বিষয়ে বিশেষ প্রতিভা আছে এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যেই এই প্রতিভার বিকাশের অবকাশ ও সম্ভাবনা থাকে।[২০০]

ম্যাজিনির অনুরূপ ধারণাবশে বিপিনচন্দ্রও লিখেছেন—'আমাদের দেশেরও সাধনার পুরাতন পথ ধরিয়া বর্তমানে জাতীয় জীবনের অভীষ্টলাভের চেষ্টাই জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম্। আমাদের সাধনা ও সভ্যতার, চিন্তার ধারা ও কর্মপদ্ধতির একটা সনাতন বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের চেহারাতে যেমন একটা ছাপ আছে, যাহার দ্বারা আমরা অপর দেশের লোক হইতে পৃথক হইয়া আছি, বাঙ্গালীকে দেখিলেই সে যে জাপানী বা ইংরাজ নহে ইহা বুঝিতে পারা যায়—সেইরূপ আমাদের পুরুষানুক্রমিক চিন্তাধারা বা সাধনারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা দ্বারা অন্যান্য জাতির চিন্তাধারা ও সাধনার সঙ্গে আমাদের চিন্তাধারা ও সাধনার পার্থক্য বুঝা যায়। এই বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্যই জাতীয়তার মূল লক্ষণ।... নিজেদের সাধনার ও চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সিদ্ধিপথে অগ্রসর হইবার নামই সত্য জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম্।'[২০১]

ঐক্যানুভূতিই যে জাতীয়তার মূল—এই তত্ত্বটির উপর বিপিনচন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এইজন্য ইংরেজের পক্ষ থেকে যখন প্রচার করা হয় যে, ভারতবাসী এক নেশন নয় এবং নেশনরূপে গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও ভারতে নেই, কারণ ভারতে বহু বিভিন্ন প্রকার ভাষা, ধর্ম, আচারব্যবহার—বহু সম্প্রদায় এবং এত বিভেদ যে সমগ্র ভারতে এই বিভেদ ঘুচিয়ে এক জাতি গড়ে তোলা যায়নি, তখন এর উত্তরে বিপিনচন্দ্র বলেন যে জাতীয়তার এই ঐক্য—বিভেদ সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দেওয়া হলেও, বৈশিষ্ট্য ঘুচিয়ে দেওয়া নয়। 'একত্ব' এবং 'একাকারত্ব' এক নয়। ভারতে ইউরোপের অনুকরণে এক ভাষা, এক ধর্ম, এক নৃগোষ্ঠীগত 'নেশন' গড়া সম্ভব না হলেও, এক সাধারণ স্বার্থের বন্ধন দ্বারা এক বৃহত্তর নেশন গড়ে তোলা যায়। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়ে বিপিনচন্দ্র লিখলেন—'বাংলার বায়

ভুঁইয়াদের মধ্যে হিন্দু ছিলেন, মুসলমান ছিলেন ; ইঁহারা আপন আপন স্বার্থরক্ষার জন্য কখন কখন দিল্লীর মুসলমান বাদশার বিরুদ্ধে পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিতও হইতেন।······সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যেও যে স্বার্থের সমতা হইতে ধর্মবন্ধন অতিক্রান্ত হইয়া এক দৃঢ়তর ঐক্যবন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—ইংরেজাধিকারে সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাসে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।···এই স্বার্থের বন্ধন যেখানে আছে, সেখানে মতামতের প্রভেদ বা সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিভিন্নতা নিবন্ধন নেশন গঠনের কোন সাংঘাতিক অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে না।'

বিপিনচন্দ্র যেমন ইতিহাসের বিবর্তন ও গতিতে বিশ্বাস করতেন, তেমনি ইতিহাসের 'নিয়তি' (ডিটারমিনিজম্)-তেও বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে এই নিয়তি হলো—সব দেশেই পরশাসনমুক্ত নেশনের উদ্ভব এবং ক্রমে এক বিশ্ব-নেশনের প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—'য়ুরোপ যেভাবে নেশন গড়িয়াছে, এশিয়াও যে সেইভাবেই নেশন গড়িবে, এমন কথা নাই। য়ুরোপে যে বিশালতর, উন্নততর, উদারতর ও মহত্তর রাষ্ট্রীয় আদর্শ ফেডারেশন বা যুক্তরাজ্যের আকারে ঈষৎ ফুটিয়া উঠিতেছে, কে জানে এশিয়ায় এবং বিশেষভাবে আমাদের ভারতবর্ষে সেই আদর্শ সত্যভাবে এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা হইবে না।'

বিপিনচন্দ্রের মতে দু'ভাবে নেশন গড়ে উঠতে পারে। এক—জাতি-বৈরিতার পথে ; ইউরোপ ও মার্কিনের মতো স্বজাতি ও স্বদেশকে আশ্রয় করে, 'রাজনীতির পুট' ব্যবহার করে, স্টেটের চর্যা করে—যেমন করে একদা গ্রীসে ও ইউরোপে নেশন-স্টেট গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আর একভাবেও অর্থাৎ 'ধর্মের পুট' ব্যবহার করেও নেশন গড়ে উঠতে পারে। এই প্রণালীতে দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ প্রভৃতি দেশে হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাম্প্রতকালে দু'বার—মহারাষ্ট্রীয়দের অভ্যুত্থানে এবং শিখসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানে—ইউরোপীয় ধরনের পেট্রিয়টিজমের অল্পবিস্তর জাগরণ দেখা গেছে। গ্রীকদের কাছে যা' ছিল 'স্টেট', শিখদের মধ্যে তা'ই খালসার আকার ধারণ করে। কিন্তু এ আদর্শ ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। কারণ, বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'খণ্ড খণ্ড ভাবে আমরা কখন বিশ্বকে দেখি নাই। বাহিরের আচারবিচারের শত প্রভেদ সত্ত্বেও আমরা কোনদিন জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায় আমাদিগের হইতে পৃথক এবং আমাদের

সঙ্গে সম্পর্কহীন এ কল্পনা করি নাই।' বিশ্বজনীন মৈত্রী, বিশ্বাত্মৈকত্ব অনুভূতি ভারতের জাতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য হওয়ায় ভারতে যে ন্যাশনালিজম্ গড়ে উঠবে, তার মধ্যে ইউরোপের জাতিবৈরমূলক নেশন-স্টেটভিত্তিক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বা অনধীনতার স্থান থাকতে পারে না। নেশন-স্টেট আভ্যন্তরীণ শাসন-বিষয়ে স্বাধীন বা পরনেশনের অনধীন হলেও বহির্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনধীন হতে পারে না। সেরূপ চেষ্টায় যুদ্ধবিগ্রহ অনিবার্য।

বিপিনচন্দ্রের এই সমস্ত বক্তব্যের তাৎপর্য হলো—তিনি জাতীয় বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাসী হলেও, জাতিবৈরিতায় বিশ্বাস করেন না। সুতরাং ম্যাজিনির সম্পর্কে রেভারেণ্ড মুরে যে মন্তব্য করেছেন,[২০২] তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায় যে, ম্যাজিনির মতোই বিপিনচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই প্রথমে রাষ্ট্র গঠিত হওয়া উচিত, কারণ তাঁর অভিমতে, 'আমি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা স্বরাজ চাই এইজন্য যে স্বাধীনতা বা স্বরাজ ব্যতীত পূর্ণ মনুষ্যত্ব-বিকাশ কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না'। তাই বলে হেগেল ও হেগেলপন্থীদের মতো [২০৩] বিপিনচন্দ্র রাষ্ট্রগঠনকে জীবনের চরমতম আদর্শ ও পূর্ণ লক্ষ্য বা 'এণ্ড' বিবেচনা করেন নি। তাঁর মতে রাষ্ট্র 'এণ্ড'-এ পৌছবার 'মিন্‌স্' বা উপায়। আবার মার্কস্‌বাদীগণ যেমন রাষ্ট্রের ক্রমবিলোপ (উইদারিং য়্যাওয়ে) আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি তা' করেন নি। রাষ্ট্রের ক্রমোন্নয়নই তাঁর মতে কাম্য।

তবে হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্বের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্রভাবনার অনেকাংশে মিল লক্ষ্য করা যায়। হেগেলের মতো [২০৪] বিপিনচন্দ্রও রাষ্ট্রের অধ্যাত্মসত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'মনে করিতে হইবে, আইন রাজা করেন নাই, তাহা বিধাতার কৃত। অপৌরুষেয় নিসর্গের আইন যেমন স্রষ্টিকর্তা করিয়া গিয়াছেন, তেমনি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও সমাজের সমষ্টিভূত রাজশক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাও বিধাতাপুরুষ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন'।[২০৫] হেগেলের মতোই বিপিনচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে মানুষ সমাজে বাস করে, সামাজিক বিধি-নিষেধের অধীন হয়ে যে স্বাধীনতা ভোগ করে, তা'ই হচ্ছে প্রকৃত স্বাধীনতা। তিনি বলেছেন—'পরিবারের অন্তর্গত হইয়া আমি একটা বৃহত্তর স্বাধীনতা সম্ভোগ করি ; আবার যখন গোষ্ঠীর বেষ্টনের মধ্যে বাস করি তদপেক্ষা বৃহত্তর স্বাধীনতা লাভ করি ; সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর সমষ্টিতে যে জাতি গঠিত হয়, সেই জাতির ভিতর যখন বাস করি তখন জাতির সমষ্টিভূত শক্তি দ্বারা আমার শক্তি ও

স্বাধীনতাকে কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব করি বটে কিন্তু তাহাতে একটা বৃহত্তর শক্তি ও স্বাধীনতা আমার লাভ হয়।'[২০৬] আবার, স্বাধীনতা যে শুধু পরবশ্যতা থেকে মুক্তি বা অনধীনতা নয়, স্ব-এর অধীনতা অর্থাৎ স্বাধীনতা যে একটা অভাবাত্মক ধারণা নয়, ভাবাত্মক ধারণা—বিপিনচন্দ্রের এই অভিমতের সঙ্গে হেগেলীয় স্বাধীনতা-তত্ত্বেরও মিল আছে।[২০৭] এইজন্য বিপিনচন্দ্র, অভাবাত্মক 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স'-এর পরিবর্তে ভাবাত্মক 'অটোনমি' বা স্বরাজের পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য তাঁর আদর্শ 'ন্যাশনাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' নয়, 'ন্যাশনাল অটোনমি।'

বিপিনচন্দ্র স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্রের সীমা অবশ্যই বর্ধিত হবে, তবে, হেগেল-শিষ্য ট্রিটস্‌কে প্রমুখ জার্মান দার্শনিকদের মতো তিনি কখনই স্বীকার করেন নি যে যুদ্ধের দ্বারা রাষ্ট্রকে বৃহৎ হতে হবে। তাঁর মতে জাতীয় রাষ্ট্রগুলি পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথ রাষ্ট্র গড়ে তুলবে। এই কারণেই তিনি সাম্রাজ্য-বাদের বদলে সমবায়মূলক অংশীদারী রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষপাতী হন। এই কারণেই তিনি স্বাধীন সার্বভৌম ভারত ও সার্বভৌম স্বাধীন বৃটেনের পারস্পরিক সাহচর্য-মূলক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গেই তিনি সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদের প্রচলিত সংজ্ঞা পরিমার্জিত করেন। বিপিনচন্দ্রের মতে কৌলিকতা (রেসিয়ালিটি) যেমন উপজাতীয়তার (ট্রাইবালিটি) চেয়ে উচ্চতর সমন্বয় (সিন্‌থিসিস্), জাতীয়তা (ন্যাশনালিটি) তেমন কৌলিকতার চেয়ে উচ্চতর সমন্বয়। সাম্রাজ্যিকতা (ইম্পিরিয়ালিজম্) অনুরূপভাবে জাতীয়তার চেয়েও উচ্চতর সমন্বয়। তাই তিনি বলেন—'সাম্রাজ্য-ধারণা প্রকৃতপক্ষে জাতিধারণা অপেক্ষা বৃহত্তর এবং ব্যাপকতর। বহুবিস্তৃত স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাজ্যসমূহকে, বহু বিচিত্র স্বার্থসমূহকে, বহু বিচিত্র মানুষ ও সংস্কৃতি সমূহকে একক জৈব সত্তার মধ্যে একত্রীকরণ হচ্ছে এর লক্ষ্য।'[২০৮] সাম্রাজ্য-ধারণায় প্রত্যয়শীল হলেও সাম্রাজ্য-চিন্তার মধ্যে যে অশুভ সম্ভাবনা নিহিত থাকতে পারে—সে সম্পর্কেও তিনি অনবহিত ছিলেন না। তাই তিনি এ কথাও বলতে ভোলেন নি—'শেষ পর্যন্ত অবশ্যই মানবজাতির বিশ্বজনীন সমবায় স্থাপনের সামর্থ্যের নিরিখেই সাম্রাজ্যের সার্থকতা বিচার করতে হবে।'[২০৯]

বলা বাহুল্য, 'ইম্পিরিয়ালিজম্' শব্দের সঙ্গে রাজনৈতিক কূটকৌশলে এবং সামরিক শক্তির বলে পররাজ্য গ্রাস করবার ও অধিকৃত রাখবার যে জনপ্রিয় ধারণা জড়িত, বিপিনচন্দ্রের সাম্রাজ্যিকতা তা' থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বিপিনচন্দ্রের

সাম্রাজ্য-ধারণা,—বিভিন্ন স্বাধীন জাতির বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিরূপ। বিপিনচন্দ্রের পরিকল্পিত সাম্রাজ্যে কোনও বিশেষ দেশ বা জাতির একাধিপত্য অচল। এই সাম্রাজ্যে প্রত্যেক জাতীয় রাষ্ট্রই সমান অংশীদার। প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কীর্ণতা ও অত্যাচারী রূপ সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবেই সচেতন ছিলেন। কিন্তু ঘরের ছাদের ছিদ্র দিয়ে জল পড়া বন্ধ করবার জন্য ঘরটাকেই ভেঙে ফেলা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। নেশন-স্টেটের বিলোপ না ঘটিয়েও জাতিবৈরিতার সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করে এক বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়—এ বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ।

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত স্ব-সম্পাদিত 'স্বরাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দি রিয়েল প্রব্লেম ইন ইণ্ডিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে (১লা এপ্রিল, ১৯০৯) বিপিনচন্দ্র প্রথম ঘোষণা করেন—'সাম্রাজ্য-ধারণা একটি বৃহৎ ধারণা, কিন্তু রাষ্ট্রসমবায়-ধারণা বৃহত্তর ধারণা। কারণ, শেষোক্ত ধারণা হচ্ছে সমগ্রের পূর্ণ ঐক্যের সঙ্গে তার সভ্যদের পূর্ণ স্বাধীনতার মিলনসাধন করা।'[২১০] এই ধারণাকে তিনি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় ১৯১০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'ই. উইলিস্'-এই ছদ্মনামে প্রকাশিত তাঁর 'দি প্রব্লেম অব ন্যাশনালিটি' শীর্ষক প্রবন্ধে (পরবর্তী কালে এই প্রবন্ধটি তাঁর 'ন্যাশনালিটি য়্যাণ্ড এম্পায়ার' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'প্রব্লেম অব ন্যাশনালিটি য়্যাণ্ড এম্পায়ার' শীর্ষনামে সঙ্কলিত হয়েছে)। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই লণ্ডন থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে (সেপ্টেম্বর, ১৯১১) বন্ধুমহলে ভাষণদানপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ঈশ্বর যদি ডান হাতে ভারতের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে সার্বভৌম পূর্ণ-স্বাধীনতার দান এবং বাম হাতে বৃটিশ সাম্রাজ্য-নামক বর্তমান সংস্থার অধীনে গ্রেট বৃটেন এবং তার উপনিবেশসমূহের সঙ্গে সম-অংশীদারিত্বের দান নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হন, তা' হলে তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলবেন যে, "পিতা, আপনি আপনার বাম হাতের দান আমাদের দিন।"[২১১] গ্রেট বৃটেন ও তার উপনিবেশসমূহের সঙ্গে সম-অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেই ১৯১১ খৃষ্টাব্দ থেকে তাঁর 'ফেডারেল ইম্পিরিয়ালিজম্' বা 'ইম্পিরিয়াল ফেডারেশন' তত্ত্ব গড়ে উঠে। লণ্ডন থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে 'রিভিউ অব্ রিভিউজ্' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক মিস্টার ডব্লিউ. টি. স্টীডের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই ধরনের ফেডারেশন গঠনের প্রতি আগ্রহের কারণ ব্যাখ্যা

করে বলেন যে তিনটি সমস্যা অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। এক—শ্বেতকায় জাতিসমূহের বর্ণবিদ্বেষ; দুই—প্যান-ঐশ্লামিকতা; তিন—মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের সঙ্ঘবদ্ধ মৈত্রী। এই ত্রিবিধ বিশ্বশান্তিবিঘ্নকর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ পরিহার করতে হলে বৃটেন ও ভারতের সঙ্ঘবদ্ধতা একান্তভাবে প্রয়োজন। এককভাবে বৃটেন বা ভারতের পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব হবে না।[২১২] দূরদ্রষ্টা বিপিনচন্দ্রের আশঙ্কা অমূলক নয়, ১৯৪৬-এর এবং ১৯৬২-র ভারতের ইতিহাস অন্ততঃ বিপিনচন্দ্র-কথিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সমস্যার ব্যাপারে প্রামাণ্য স্বাক্ষর রেখে গেছে।

বিপিনচন্দ্রের এই প্রাগ্রসর চিন্তাটিকে সেকালে অনেকেই অনুধাবন করতে পারেন নি। যে বিপিনচন্দ্র গরমপন্থীদলের নেতৃত্ব করেছেন, যে বিপিনচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীনতা ভারতবাসীর কাম্য বলে ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচার করেছেন, তিনিই আবার গরমপন্থা পরিত্যাগ করে বৃটেনের সঙ্গে সাহচর্যমূলক 'ইম্পিরিয়াল ফেডারেশন'-এর কথা বলেন কেমন করে? তা' হলে এটা নিশ্চয় গরমপন্থী বিপিনচন্দ্রের নরমপন্থী অবনমন (মডারেটিস্ট ক্লাইম্ব-ডাউন)। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো তা-ই, কিন্তু প্রকৃতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি অন্যরকম। ব্যবহারিক রাজনীতিক্ষেত্রে কর্মপ্রণালীর পরিবর্তন আর রাষ্ট্রতত্ত্বগত মৌল মতাদর্শের পরিবর্তন সমার্থক নয়। মাদ্রাজ বক্তৃতায় তিনি ব্যবহারিক রাজনীতিকে দাবাখেলার সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন—'আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এ হচ্ছে দাবাখেলা। জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও এ হচ্ছে দাবাখেলা। শক্তিমান, চতুর এবং দূরদর্শী প্রতিপক্ষের সঙ্গে দাবাখেলায় বসে যে অপরপক্ষের চালের খবর না রেখে নিজের প্রতিটি চাল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, তার মতো মূর্খ আর কে আছে? ওদের চালের দ্বারাই আমাদের চাল নির্ণীত হবে।[২১৩] তাই বিপিনচন্দ্রের চিন্তাধারা সঠিক অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, তিনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অবস্থানুসারে ব্যবস্থানির্ণয়ের পক্ষপাতী ছিলেন ঠিকই, কারণ সেটাই হচ্ছে বাস্তব-বুদ্ধিসম্মত পন্থা, কিন্তু তার জন্য স্ব-মতাদর্শের পরিবর্তনের কোন কারণ ঘটেনি। তাঁর পরিকল্পিত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে কিংবা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার সঙ্গে ইম্পিরিয়াল ফেডারেশনের কোনো তত্ত্বগত বা ব্যবহারিক বিরোধ নেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তা'হলে তিনি স্বদেশীযুগে 'ইম্পিরিয়াল ফেডারেশন'-এর কথা প্রচার না করে সে সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কমুক্ত পূর্ণ

স্বাধীনতার বাণী প্রচার করলেন কেন? বিপিনচন্দ্র এ প্রশ্নেরও সদুত্তর রেখে গেছেন। তিনি বলেছেন—"১৯০১—১৯০৮ অথবা ১৯০৯-এর অবস্থা এই 'ফেডারেশন আদর্শ' উপলব্ধির অনুকূল ছিল না। আধুনিক ভারতবর্ষের পক্ষে 'পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা' অথবা 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন'—কোন্‌টি সত্য ও বাস্তব আদর্শ, এ নিয়েই সে সময় বাদানুবাদ তীব্র হয়ে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদী দল প্রথমোক্ত আদর্শ ঘোষণা করেছিল, আর প্রবীণ কংগ্রেসদল শেষোক্ত আদর্শটিকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং বাস্তব বলে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত সমস্ত সাহিত্যই প্রকৃতপক্ষে এই বাদানুবাদ থেকে উদ্ভূত হয়।"[২১৪] তাঁর মতে, এই ধরনের বাদানুবাদমূলক সাহিত্য কখনই চিন্তাধারা বা আদর্শের মূল ভাবাত্মক মূল্য পরিস্ফুট করে তুলতে পারে না। ব্যাপারটি স্পষ্টতর করবার উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেছেন যে তাঁর মাদ্রাজ-বক্তৃতাসমূহের স্বরাজ সম্পর্কিত উক্তির লক্ষ্য ছিল—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের আদর্শের অসারতা উদ্‌ঘাটন করা; সুতরাং তাঁর বক্তৃতার মধ্যে এমন সব উক্তি ও যুক্তি আছে, যা' ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এমন ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে তিনি ভারতবর্ষের জন্য পূর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন সার্বভৌম স্বাধীনতাকেই জাতীয়তাবাদী প্রচেষ্টার একমাত্র সত্য উদ্দেশ্য বলে প্রচার করেছেন। বিপিনচন্দ্র এর কারণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, তাঁর মাদ্রাজ-বক্তৃতাসমূহ ছিল প্রকৃতপক্ষে ১৯০৬-এর কলকাতা কংগ্রেসে এবং ১৯০৭-এর ফেব্রুয়ারিতে এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌতে প্রদত্ত গোখেল মহোদয়ের ভাষণাবলীর জবাব।[২১৫] ঐ সমস্ত ভাষণে গোখেল মহোদয় উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের আদর্শকে তৎকালীন ব্যবস্থায় ভারতবাসীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য সর্বাপেক্ষা বাস্তব আদর্শ বলে উল্লেখ করেছিলেন; কারণ, তিনি মনে করতেন যে এর বেশী কিছু দাবি করলে বৃটিশ রাজনীতিবেত্তাগণ ও বৃটিশ জনসাধারণ তার মর্ম বুঝবে না এবং তাঁদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বিপিনচন্দ্র মন্তব্য করেছেন যে যাঁরা তাঁর উপরি-উক্ত বক্তৃতাসমূহের ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক উৎসের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের পক্ষে তাঁর মাদ্রাজ-বক্তৃতার তাৎপর্য সঠিক অর্থে গ্রহণ করা কঠিন।[২১৬]

বিপিনচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে মানবমনে প্রতিফলিত দিব্য অভীপ্সা (ডিভাইন

উইল) ক্রমান্বয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রসংগঠনের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। পরাধীনতা মানবাত্মার পরিপন্থী। কারণ ঈশ্বর তার নিজ রূপ ও সত্তায় মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বলে কোনো মানুষই পাপে ও পরাধীনতায় আবদ্ধ থাকতে পারে না—সকলেই নিষ্কলুষতা ও মুক্তির অধিকারী। সুতরাং বিপিনচন্দ্রের মতে পরাধীন ব্যক্তি ও জাতিমাত্রকেই প্রথমে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, তারপর সেই স্বাধীন মানুষ ও স্বাধীন জাতি স্বেচ্ছায় আরও বৃহত্তর এবং মহত্তর স্বাধীনতার ক্ষেত্র হিসাবে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ গঠন করবে। প্রথম-পর্যায়ে জাতীয়তার স্ফূর্তির জন্য ভারতবাসী ইংরাজের শাসনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম করবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পর আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দেবে। বৃটিশ কমনওয়েলথ অব্ নেশনস্-এর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিপিনচন্দ্রের তত্ত্বদৃষ্টির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেছে। এ বিষয়ে বিপিনচন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে সমসাময়িক কালে ইউরোপে মাত্র শ্বেতকায় জাতিগুলিকে নিয়ে এই ধরনের জাতিসঙ্ঘ-গঠনের যে চেষ্টা চলছিল, তাকে তিনি আরও সম্প্রসারিত করে, বর্ণবৈষম্যমুক্ত এক বিশ্বব্যাপী সমবায়ী সংস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা রচনা করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি যে ইম্পিরিয়াল ফেডারেশনের প্রস্তাব করেন, ১৯৪৭-এর পরবর্তী স্বাধীন ভারতের ইতিহাস তাকে ভিন্ন নামে বাস্তবে রূপায়িত করেছে।

বিপিনচন্দ্রের এই সমবায়মূলক রাষ্ট্রদর্শনের মূলে ছিল রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈব মতবাদে তাঁর আস্থা। জার্মান দার্শনিক ব্লুন্‌টসলি, ইংরেজ চিন্তাবীর হার্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতির মতো বিপিনচন্দ্রও বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্র এক প্রাণহীন যন্ত্র বা চুক্তিগত সংগঠন মাত্র নয়। 'নেশন'ও কোন যান্ত্রিক ক্রিয়ার ফল নয়, কিংবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিসমূহের বাহ্য সমন্বয়ও নয়। জীবসদৃশ নেশন জীবনের মতোই সর্বব্যাপী এক চেতনা ও নীতির সমন্বয়ে আবদ্ধ। নেশনের মধ্যেই মানবিক সত্তার পরিপূর্তি ঘটে এবং পরমাত্মা প্রকাশমান হন। ব্যক্তির পক্ষে মহত্তর স্বার্থানুকূল্যেই আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়। ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ও চেতনায় ভবিষ্য দিনের দিব্য উদ্দেশ্য অভিমুখে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপাদানে গঠিত জীবসদৃশ নেশন নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করে চলেছে।[২১৭] এই চলার ক্রমেই নেশন বিশ্বনেশনে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

জৈব মতবাদে বিশ্বাসী বিপিনচন্দ্র হার্বার্ট স্পেন্‌সারের মতো[২১৮] চরম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থন না করলেও মানুষের অধিকারকে প্রকৃতিগত মনে করতেন।

তাঁর মতে, মানুষমাত্রেই কতকগুলি মৌল অধিকার নিয়েই জন্মায়। এইসব মৌল অধিকার মানুষের একান্ত নিজস্ব, এগুলি অপর কোনো ব্যক্তি সৃষ্টি করতে পারে না। এই অধিকার বলেই মানুষ সংবিধান রচনা করে, অতএব সংবিধান অধিকারের উৎস নয়। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক দলিলে তাই বলা হয়েছিল যে, মানুষ কতকগুলি অপরিত্যাজ্য অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই অধিকারসমূহ আদায়ের জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।[২১৯] ফ্রান্সের স্বাধীনতা ঘোষণাতেও বলা হয়েছিল যে, মানুষ স্বাধীন এবং সমানাধিকার-সম্পন্ন হয়েই জন্মগ্রহণ করে এবং সমস্ত রাজনৈতিক সংস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক ও অপরিত্যাজ্য অধিকারসমূহের সংরক্ষণ।[২২০] বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার পূর্ণ অধিবেশনে গৃহীত মানবিক অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রেও অনুরূপ ভাবে সমান স্বাভাবিক অধিকারের গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে।[২২১]

বিপিনচন্দ্র ব্যক্তির জীবনে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করলেও সমাজ বা রাষ্ট্রের সত্তার সঙ্গে ব্যক্তির সত্তার একাকারত্ব স্বীকার করে নিতে পারেন নি। তিনি বলেছেন—'আমার নিকট স্বাধীনতা এক অখণ্ড বস্তু।…… সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর গড়িয়া না উঠিলে কখনই সত্য ও সার্থক হইতে পারে না। সুতরাং আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদে স্বরাজের ভিত্তি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে।'[২২২] এখানে নয়া আদর্শবাদী ইংরেজ দার্শনিক গ্রীনের ভাবনার সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের ভাবনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। হেগেলের অনুসরণে গ্রীন রাষ্ট্রকে সকলের উপর স্থান দিলেও ব্যক্তির অধিকারকে রাষ্ট্রের কাছে বলি দিতে রাজী হননি।[২২৩]

বিপিনচন্দ্র 'প্যাট্রিয়টিজ্‌ম'-এর অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম বা স্বাদেশিকতা ইউরোপীয় প্যাট্রিয়টিজ্‌ম থেকে ভিন্ন গোত্রের ছিল। বিপিনচন্দ্রের প্যাট্রিয়টিজ্‌মের ধারণার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনার প্রভাব লক্ষণীয়। ইউরোপ যাকে প্যাট্রিয়টিজ্‌ম বলে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তা' হলো—'…একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ!…ইউরোপীয় প্যাট্রিয়টিজ্‌ম ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।……জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য না লিখেন।'[২২৪] বিপিনচন্দ্রও

এ জাতীয় প্যাট্রিয়টিজ্‌ম চান না। কিন্তু তিনি তা' বলে প্যাট্রিয়টিজ্‌ম ত্যাগ করতে প্রস্তুত হন নি, কারণ এর কিছু কিছু গুণও আছে। তিনি ইউরোপীয় প্যাট্রিয়টিজ্‌মকে সংশোধন করে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। এই মনোভাবের প্রেরণাবশেই বিপিনচন্দ্র বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনাবহুল উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের তীব্রতার মধ্যেও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় 'জাতীয় দিবস' পালনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন—"আমরা এই দিনটিকে সেই স্বাদেশিকতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করি যা' মানবতার মধ্যে চরিতার্থতা সন্ধান করে। আমরা এই দিনটিকে সেই মানবতার উদ্দেশ্যেও উৎসর্গ করি, যে মানবতা মানুষের কাছে ঈশ্বরের শাশ্বত প্রকাশের নামান্তর।

ব্যক্তির পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীবন ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য। সেই জাতির বৃহত্তর ও পবিত্রতর জীবন ধন্য যার মধ্যে ব্যক্তি তার চরম চরিতার্থতা লাভ করে এবং ধন্য, ধন্য, ধন্য সেই মানবতার বিশ্বজনীন জীবন, যার মধ্যে সমস্ত জাতির জীবন এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা এবং সফলতা লাভ করে।"[২২৫]

বিপিনচন্দ্রের এই ঘোষণায় দেখা যাচ্ছে—তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের ভিত্তি 'মানবতা' (হিউম্যানিটি), এই আদর্শের পরাকাষ্ঠা 'মানবতার বিশ্বজনীন জীবন' (ইউনিভার্স্যাল লাইফ অব্ হিউম্যানিটি) এবং এই আদর্শের বন্ধনরজ্জু 'স্বাদেশিকতা' (প্যাট্রিয়টিজ্‌ম)। 'ব্যক্তির পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীবন' (পারফেকটেড লাইফ অব্ দি ইনডিভিজুয়াল) বলতে তিনি সেই ব্যক্তিজীবনকে বুঝেছেন, যে ব্যক্তির মধ্যে দেবত্ব প্রকট হয়েছে অর্থাৎ যার মনুষ্যত্ব পূর্ণ প্রকটিত হয়েছে। তখন সে ব্যক্তির কাছে '···ব্রাহ্মণ নাই, চণ্ডাল নাই ; উচ্চ নাই, নীচ নাই ;—সকলেই সমান।'[২২৬] এখানে স্মরণীয় যে বিপিনচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতা আর প্রচলিত সন্ন্যাসধর্ম এক নয়। তিনি সন্ন্যাসধর্মের পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে—'সন্ন্যাসধর্মের প্রাদুর্ভাবে সংসার-ধর্ম মলিন হইয়া গেলে, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া যায়।' এইজন্যই তিনি বলেন—"গোড়ার কথা মানুষ গড়া। প্রাচীন অর্থে মানুষ গড়া নয়, নূতন অর্থে মানুষ গড়া—সামাজিক মানুষ গড়া—ইংরাজীতে যাহাকে 'সিভিক ম্যান' বলা হয় ; রাষ্ট্রীয় মানুষ গড়া—ইংরাজীতে যাহাকে 'পলিটিক্যাল ম্যান' বলা যায়।" এই মানুষ গড়ার জন্য চাই রাষ্ট্র। কারণ,—'নানা প্রকৃতির, নানা অবস্থার, ভালো মন্দ নানা চরিত্রের লোক এই দেশে

একসঙ্গে বাস করিতেছে। যদি সকলের উপরে একটা এমন শাসনব্যবস্থা না থাকে, যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের স্বত্ব-স্বাধীনতাতে নির্বিবাদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে, কেহ কাহারও অধিকারে হাত দিবে না, কেহ কাহারও উপরে অত্যাচার করিবে না, কেহ কাহারও প্রাণ বা ধন হরণ করিবে না,—এমন শক্ত শাসন যদি না থাকে তাহা হইলে···অধিক লোক···একত্র সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে কখনই পারে না। এইজন্যই একটা রাষ্ট্রশক্তির বা শাসন-শক্তির প্রয়োজন।'

কিন্তু এই শাসন-শক্তি কোনো ব্যক্তি, শ্রেণী বা বর্ণ বিশেষের হাতে ন্যস্ত থাকবে না, থাকবে জনসাধারণের হাতে। বিপিনচন্দ্র রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র সমর্থন করেন না। তাঁর পছন্দ গণতন্ত্র। এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য হলো—'প্রাচীনকালে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে রাজকীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে সকল ব্যবস্থাকে স্বরাজ কহে না। সে রামরাজ্য হইলেও স্বারাজ্য নহে।······যে দেশে যাঁহারা আইনকানুন রচনা করেন, এবং যাঁহারা এই আইনকানুন অনুসারে দেশের শাসনকার্য নির্বাহ করেন, তাঁহারা সকলেই জনসাধারণের অধীন হইয়া কাজ করেন, সে দেশে সত্য স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।'

গণতন্ত্রের পক্ষপাতী হলেও বিপিনচন্দ্র কিন্তু ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে 'সংসদীয় গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করা পছন্দ করেন নি। তিনি ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মিল-প্রস্তাবিত 'রিপ্রেসেণ্টেটিভ গভর্নমেণ্ট'-এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। কারণ 'দলাদলি এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রাণ; এই দলাদলিকে আশ্রয় না করিয়া প্রজাতন্ত্র শাসন যে চলিতে পারে, য়ুরোপীয়দিগের পক্ষে এরূপ কল্পনা করাও প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'

জড়বিজ্ঞানের উপাসক ইউরোপের সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল নীতি হচ্ছে—'চেকস্ য়্যাণ্ড ব্যালান্স।' আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগ যেমন একে অপরকে সংযত রাখবে, তেমনি আইনসভায় এক দল অন্য দলকে সংযত রাখবে। বিপিনচন্দ্র মনে করেন—'মিল প্রভৃতি যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন, তাহার মূলে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের ভিতর একটা স্বাভাবিক স্বার্থবিরোধ ও মারাত্মক প্রতিযোগিতা রহিয়াছে, এই কথাটা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। য়ুরোপীয় প্রজা-প্রতিনিধি-তন্ত্র এই বিরোধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং য়ুরোপের সর্বত্রই প্রজা-প্রতিনিধিসভা সকল সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে একটা চিরন্তন সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।'

বাস্তবিকপক্ষে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্ত আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে স্বতন্ত্র বিচারবিভাগ স্থাপনা করতে হয়েছে এবং ক্ষমতা-বিভাজন ও স্বতন্ত্রীকরণের প্রশ্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দীর্ঘকালের দুশ্চিন্তায় পরিণত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলির শাসনতন্ত্রে ক্ষমতাবিভাজন-নীতিকে স্বীকৃতি দান করে সংবিধান রচনা করতে হচ্ছে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ বিপিনচন্দ্রের অনুভবে এটা সহজেই ধরা পড়েছিল।

বিপিনচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন—'ইংরেজ জনসাধারণের স্বাধীনতা মিথ্যা, প্রভাব মিথ্যা, একটা বিরাট মিথ্যার উপরে ইংরেজের রাষ্ট্র-তন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে।······মার্কিনেও সেই দশা।···বড় বড় কলকারখানার মজুরেরা কারখানার কর্তাদের আদেশে, তাঁহারা যাহাকে ভোট দিতে বলেন, তাহাকেই ভোট দিয়া থাকে। যে দেয় না, তাহার পক্ষে সেই কারখানায় কাজ করা অসম্ভব হইয়া থাকে। যেখানে ভয় এবং লোভ ভোটারের বা নির্বাচকের সভ্যনির্বাচনের প্রধান প্রেরণা হইয়া থাকে, সেখানে যে নির্বাচনে স্বাধীনতা নাই, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।' এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য তিনি বলেন—'যাঁহারা আইন-সভার সভ্য নির্বাচন করিবেন, তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রসম্বন্ধে ও সমাজসম্বন্ধে সুশিক্ষিত করা প্রয়োজন।···প্রথমে মানুষ গড়িতে হইবে। এ মানুষ নূতন যুগের নূতন মানুষ হইবে।···তাহার নিজের স্বার্থের সঙ্গে সমাজের সাধারণ লোকের স্বার্থ যে কি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, ইহা বুঝিবে। সকলের স্বার্থসাধন না করিয়া কোনো লোকের নিজের স্বার্থসাধন যে অসাধ্য—এ কথাটা প্রত্যক্ষ অনুভবে ধরিতে পারিবে।' কারণ তিনি যে স্বরাজ চান, সেই স্বরাজের অধীনে 'ধনী-নির্ধন, জ্ঞানী-মূর্খ, স্ত্রী-পুরুষ, ভারতের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক প্রজামাত্রেই জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে নিজেদের শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিজেরা মিলিয়া করিবে। এ বিষয়ে সকলের সমান অধিকার থাকিবে।'[২২৭]

তাই নতুন যুগের নতুন মানুষ নিয়ে বিপিনচন্দ্র রাষ্ট্র গড়তে চান। এই রাষ্ট্রের গঠন হবে গ্রামভিত্তিক। 'প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া স্বরাজ-যন্ত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইরূপে গ্রাম হইতে জেলা, জেলা হইতে প্রদেশ, প্রদেশ হইতে দেশে বা মহাদেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।' এই ক্ষেত্রে তিনি সুইজারল্যাণ্ডকে প্রাথমিক আদর্শরূপে গ্রহণ করবার পক্ষপাতী। কারণ, 'সুইজারল্যাণ্ড প্রজাতন্ত্র দেশ, সেখানে রাজা নাই; অথচ ফরাসিস্ ও মার্কিন

প্রজাতন্ত্রে যে সকল অমঙ্গল ফুটিয়া উঠিয়াছে, সুইজারল্যাণ্ডে তাহা হয় নাই; আর ইহার প্রধান কারণ এই যে, প্রথমতঃ সুইজারল্যাণ্ড দেশটি অপেক্ষাকৃত ছোট, দ্বিতীয়তঃ সুইজারল্যাণ্ডের প্রজাতন্ত্রতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য কেন্দ্রের উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে।' নির্বাচনের পর নির্বাচকের যদি নির্বাচিতকে নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা না থাকে, তা'হলে গণতন্ত্র অনেকাংশে অর্থহীন হয়ে পড়ে। বিপিনচন্দ্র তাই নির্বাচকমণ্ডলীকে 'রিকল'-এর অধিকারদানের পক্ষপাতী। নির্বাচন-ক্ষেত্র আয়তনে ছোট হলেই এটি সম্ভব। সুইজারল্যাণ্ডের আদর্শে গ্রামভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে সেটা স্বচ্ছন্দে সম্ভব হতে পারে মনে করে তাই তিনি বলেছেন—'ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যেরা সাধারণ প্রজামণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এবং প্রয়োজনমতো নির্বাচকেরা ইচ্ছা করিলে ইঁহাদের স্বাধিকার কাড়িয়া লইতে পারিবেন।'[২২৮] বিপিনচন্দ্রের এই পরিকল্পনা সর্বাংশে গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও এই পরিকল্পনা যে অলীক স্বপ্নবিলাস নয়, আধুনিক ভারতে গ্রামসভা, অঞ্চল-পরিষদ প্রভৃতি প্রবর্তন তার প্রমাণ।

আমাদের দেশে পল্লী-উন্নয়ন, পল্লীসমাজ-সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তার উপর রবীন্দ্রনাথও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এ ব্যাপারে বিপিনচন্দ্রের পূর্বেই তিনি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, 'দেশের যাবতীয় সমস্যা ও দুঃখকষ্টের ব্যাপারে তিনি দেশকর্মীদের সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন না করিয়া তাহাদের স্বয়ং প্রতিকারের জন্য আগাইয়া আসিবার আহ্বান জানাইলেন।'[২২৯] রবীন্দ্রনাথের এই আত্মনির্ভরতার আহ্বানের যৌক্তিকতা স্বীকার করেও সমালোচক কিন্তু মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন—'এইখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার মতো যে, রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের (স্টেট অব্ গভর্নমেণ্ট) ভূমিকাটি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।' রাষ্ট্রের আনুকূল্য ব্যতীত দেশের দুঃখ-দুর্দশার স্থায়ী প্রতিকার করা সম্ভব হয় না বলেই সেদিন দেশের জননায়কেরা রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর কর্তৃত্ববিস্তারের জন্য এ্যাজিটেশন-আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু সমালোচকের ভাষায়—'অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য এ্যাজিটেশন-আন্দোলনের বিরাট তাৎপর্যটি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।'[২৩০] বিপিনচন্দ্র কিন্তু এ বিষয়ে সঠিক মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন।

স্বদেশী-যুগে স্বদেশী-আন্দোলনের তাৎপর্য নানা নেতার কাছে নানাভাবে

প্রতিভাত হয়েছিল। মদনমোহন মালব্য মনে করতেন যে স্বদেশী-আন্দোলনের লক্ষ্য দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ। লালা লাজপৎ রায় মনে করতেন যে স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশীয় মূলধনকে বিদেশী মূলধনের আগ্রাস থেকে রক্ষা করা। বালগঙ্গাধর তিলক মনে করতেন যে স্বদেশী-আন্দোলনের সার্থকতা হচ্ছে দেশবাসীর মনে আত্মনির্ভরতা, ত্যাগ ও সঙ্কল্প সৃষ্টি করে দেশবাসীকে বিদেশী ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার থেকে নিবৃত্ত রাখা। দাদাভাই নৌরজী স্বদেশী-আন্দোলনের মধ্যে দেখেছিলেন দেশের আর্থিক ও শিক্ষাবিষয়ক পুনর্গঠনের সম্ভাবনা।[২৩১] বিপিনচন্দ্র কিন্তু স্বদেশী-আন্দোলনকে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—'রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রত্যেক শিক্ষানবিস জানে যে রাজনীতি বাদ দিয়ে কোনো অর্থনীতি হয় না। অর্থনীতি এবং রাজনীতি পরস্পর জৈব সম্পর্কে আবদ্ধ; এবং ভারতবর্ষ দু'টি বিষয়কে পৃথকভাবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করতে পারে না।'[২৩২] কারণ, তিনি লক্ষ্য করেছেন যে পাশ্চাত্য জগতের পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের মর্যাদা যথাযথভাবে রক্ষিত হয় না। পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রযন্ত্র পুঁজিপতিগণের করায়ত্ত হওয়ায় গণতন্ত্র এক বিরাট প্রহসনে পর্যবসিত হয়; কারণ, সেখানে ভোট কেনা-বেচা চলে এবং মানুষ ভয় ও লোভের প্ররোচনায় অপাত্রে ভোট দান করে। সুতরাং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাবিহীন রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন অসার বস্তু। পুঁজিবাদের সম্প্রসারণের ফলে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন হয় সত্য, কিন্তু ক্রমেই অধিক পরিমাণে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে দেশের অভ্যন্তরে বেকারসমস্যা দেখা দেয়, আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখা দেয় বহির্বাজার হস্তগত করবার প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার ফলেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ দেখা দেয় এবং রাজনৈতিক শাসন অর্থনৈতিক শোষণে পরিণত হয়। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের শিকার উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের সংগ্রাম অর্থনৈতিক স্বাধীনতালাভের সংগ্রামকে পরিহার করতে পারে না।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে রাজনৈতিক বন্ধন-মুক্তির উপরেই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং অর্থনৈতিক বন্ধন-মুক্তির কথা উপেক্ষিত হয়েছিল, বিপিনচন্দ্র এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এর কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—'আমাদের ভাব ও চিন্তা, আশা ও আদর্শ সকলই বিদেশীয় সাধনা ও শিক্ষার প্রভাবে একটা অস্বাভাবিক বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছিল। এই গভীর

আত্মবিস্মৃতির সময় আমাদিগকে এমন করিয়া নাড়াচাড়া না দিলে, আত্ম-চৈতন্যের উদয় হইত না। এই জাতীয় আত্মচৈতন্যকে জাগ্রত করাই এই স্বদেশী-আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল।'[২৩৩] তা' ছাড়া শোষণের ক্ষেত্রে দেশী এবং বিদেশী ধনিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে যে কোনো গুণগত তারতম্য নেই, এ সম্পর্কেও তাঁর ধারণায় কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলেছেন—'স্বদেশী আন্দোলনের সাহায্য লইয়া লোভী ধনী ও ব্যবসায়িগণ গরীব, সরল, স্বদেশপ্রেমিকদের কষ্টোপার্জিত অর্থ কিভাবে শোষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বদেশী পণ্যের উদ্ধারকল্পে যদি এইভাবে, কোনো কোনো বিদেশীয় পণ্যকে বর্জন করিতে হয়, তবে সর্বপ্রকার অযথা ও অবৈধ মুনাফার পথ বন্ধ করা আবশ্যক।···বক্তৃতাদির দ্বারা দেশের লোকের মনে একটা স্বার্থত্যাগের আকাঙ্ক্ষা জাগাইলে, তাহার ফলে কেবল শকুনির দলই পরিপুষ্ট হয়, স্বাদেশিক চেষ্টা সফলতা বা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না, এই সাত বৎসরে আমরা ইহার বিস্তর প্রমাণ পাইয়াছি।'[২৩৪]

ভারতবর্ষে বৃটিশ পুঁজিবাদের পরিবর্তে ভারতীয় পুঁজিবাদের প্রসার ঘটালেই যে তা' ভারতবাসীর পক্ষে কল্যাণকর হবে,—এই ধরনের অভিজ্ঞতার জন্যই বিপিনচন্দ্র তা' বিশ্বাস করে উঠতে পারেন নি। পরবর্তীকালে স্বাদেশিকতার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ-যখন দেশে ইউরোপীয় শ্রমশিল্পের পদ্ধতিতে ভারতীয় পুঁজিপতিদের অর্থানুকূল্যে ও পরিচালনাধীনে কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় গর্ব প্রকাশ করেছেন, তখনও ভারতবাসী সত্যই সঠিক পথ অনুসরণ করছেন কি না এ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের মনে সংশয় জাগ্রত হয়েছে।[২৩৫]

উনবিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী চিন্তানায়কদের সমাজ-চিন্তায় যে সমস্ত পাশ্চাত্য ভাবধারা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার মধ্যে 'সাম্য' ছিল অন্যতম প্রধান ভাব। সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং অধ্যাত্মসাধকদের মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবের দ্বারা সর্বাধিক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্কিম-সাহিত্যের অনুরক্ত পাঠক এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাব-শিষ্য উনবিংশ শতাব্দীর সন্তান বিপিনচন্দ্রের চিন্তায় তাই সহজেই সাম্যের ভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর স্বাধীনতা-চিন্তা তাই সাম্যভাবের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে স্বদেশ-চর্যায় দীক্ষাগ্রহণের সময় (১৮৭৭) যে প্রতিজ্ঞা-পত্রে তিনি স্বাক্ষর দান করেছিলেন, তার পঞ্চম শর্ত ছিল এই প্রকার : 'আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা করিব না ; যে যাহা অর্জন করিবে তাহাতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে এবং সেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্মে জীবন উৎসর্গ করিব '। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে প্রতিজ্ঞা-পত্রের এই শর্তটি তিনি সর্বাংশে পালন করতে পারেন নি ।[২৩৬] তবে এই শর্তের কথা যে সারাজীবন তাঁর চিন্তায় জাগরূক ছিল, তাঁর জীবন-বৃত্তান্তই তার প্রমাণ ।[২৩৭]

সাম্যবাদী ভাবধারা যে বিপিনচন্দ্রের ভাবনার একটি ধ্রুব সুর ছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে তৃতীয়বার (১৯১৯) বিলাত-পর্যটন-অন্তে দেশে ফিরে আসবার পর বিশ্বজাগতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে প্রদত্ত (১৪ই ডিসেম্বর, ১৯১৯) একটি বিশদ ভাষণে। এই ভাষণে তিনি রাশিয়ায় সদ্য-সংঘটিত মার্কস্‌বাদ-প্রভাবিত বলশেভিক আন্দোলনের তাৎপর্য ও সার্থকতা প্রসঙ্গে বলেন যে, এক শ' বছর যাবৎ ইউরোপ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শকে কার্যকর করবার চেষ্টা করেছে এবং সে চেষ্টা কীভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে, ইতিহাস তা' জানে। যা' ঘটেছিল, তা' হচ্ছে এই—অনুন্নত জনমণ্ডলীর উপরের স্তরের মানুষ এই নতুন আদর্শবাদকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রত্যেক ইউরোপীয় দেশে একটি নতুন শাসক-শ্রেণী গড়ে উঠেছিল যারা ফরাসী ভাষায় 'বুর্জোয়া' নামে পরিচিত অর্থাৎ উচ্চ-মধ্যবিত্তশ্রেণী।……এই উচ্চ-মধ্যবিত্তশ্রেণী নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ ও শ্রেণী-স্বাচ্ছন্দ্যের উদ্দেশ্যে জনগণের অধিকারের দোহাই দিয়ে জনগণকে শোষণ করেছে।[২৩৮] কারণ, পুঁজিবাদ এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকার যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ তাঁকে বলশেভিজ্‌মের প্রতি আগ্রহান্বিত করে তুলেছিল এবং বলশেভিক আন্দোলনের আদর্শের মধ্যে সাম্যের পূজারী বিপিনচন্দ্র জগতের শোষিত, বঞ্চিত মানবতার মুক্তির প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করেছিলেন।

সমাজ-সচেতন সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ একদা যেমন (১৮৯৯) নবীন ভারতের গঠনে কৃষি ও শ্রমজীবীদের ভাবী সক্রিয় ভূমিকার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে আবেগতপ্ত উক্তি করেছিলেন,[২৩৯] বিপিনচন্দ্রও বলশেভিক আন্দোলনের আদর্শে গভীর আস্থা স্থাপন করে রাষ্ট্রনীতিবিদের ভাষায় এক সময় বিশ্বের মেহনতী

মানুষের নবজাগরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সোল্লাসে ঘোষণা করলেন—"আর তথাকথিত উচ্চ-মধ্যবিত্তশ্রেণীর হাতে, সওদাগর এবং ব্যাপারীর হাতে, শিল্পের সৃষ্টিকর্তাদের হাতে, কাজকর্মের প্রভুদের হাতে জগতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না। নতুন সর্বহারা শ্রেণী—এই মহাকায় জীব (লেভিয়াথান) সুপ্তিভঙ্গের পর জেগে উঠছে—বহু শতাব্দীর জড়তা পরিত্যাগ করে, বহু শতাব্দীর নিপীড়নের পর, বহু শতাব্দী যাবৎ তাদের পেশী এবং তাদের মস্তিষ্কের শোষণকারী কর্তৃক তাদের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চনার নীরব সহনের পর তারা নড়ে উঠছে।"[২৪০]

কিন্তু বলশেভিক আন্দোলনের মূল অর্থ নৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব স্বীকার করলেও বলশেভিকদের বলপ্রয়োগমূলক রাজনৈতিক কর্মপ্রণালীর অনুসরণ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কারণ, তাঁর রাজনৈতিক অস্ত্র ছিল 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স' যা' স্বভাবে 'নন্-য়্যাক্টিভ' বা অ-সক্রিয় না হলেও নিঃসন্দেহে 'নন্-য়্যাগ্রেসিভ' বা অনাক্রমণাত্মক ছিল। তা' ছাড়া বিপিনচন্দ্রের সাম্য-চিন্তা রাজনৈতিক বুদ্ধি-প্রসূত একটি তত্ত্বমাত্র ছিল না, তা' ছিল জীবের মধ্যে শিব-দর্শী ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার রসে পরিপুষ্ট হৃদয়-সমুত্থ একটি মহান ভাব। এই ভাবে ভাবিত হয়েই তিনি পরবর্তীকালে বলেছেন—'মনুষ্যত্বের ভূমিতে, প্রাণের দরবারে, ভালবাসা-স্নেহ-প্রীতি-সেবার রাজ্যে সকল মানুষই যে সমান। সুতরাং এক জনের যাহা প্রয়োজন, সকলেরই তাহা চাই। সকল মানুষে এই মোটা কথাটা বুঝে না ; এই প্রত্যক্ষ সত্যটাকে চক্ষু মেলিয়া দেখে না ; তারই জন্য ত সংসারে এত দুঃখ, এত বিরোধ, এত পাপ'।[২৪১]

বিপিনচন্দ্রের চিন্তাধারা মূলতঃ বিশ্লেষণমুখী। বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশের ধারাটিকে তিনি যেভাবে পরিস্ফুট করেছেন, তা' বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তিনি লক্ষ্য করেছেন, যে প্রাচ্যদেশে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে সামাজিক চিন্তার বিকাশ নিম্নোক্ত ধারায় হয়েছিল—

ব্যক্তি
|
সমাজ
|
বিশ্বমানব

অর্থাৎ 'বহু ব্যক্তির সমষ্টি সমাজ। বহু সমাজের সমষ্টি বিশ্বমানব বা মানবজগৎ। মাঝখানে যে বহু সমাজের সম্মেলনে ও সমন্বয়ে এক একটা রাষ্ট্র গড়িয়া ওঠে ও নেশন প্রতিষ্ঠিত করে, এই কথাটা আমাদের প্রাচীন সামাজিক চিন্তাতে ধরা পড়ে নাই। আর পড়ে নাই বলিয়া আমাদের সামাজিক জীবন যতটা ঘননিবিষ্ট, যতটা সতেজ ও সংহত হইয়া উঠিয়াছিল, রাষ্ট্রীয় জীবন বা পলিটিক্যাল লাইফ ততটা সতেজ ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গড়িয়া উঠে নাই।'[২৪২] তাঁর মতে রাষ্ট্রলক্ষ্মী যখনই হিন্দুর অধিকার-বিচ্যুত হয়েছে, তখনই সে সমাজলক্ষ্মীকে দৃঢ়তর মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেছে, হৃত রাষ্ট্রলক্ষ্মীকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য সে সচেষ্ট হয়নি। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন—'আমাদের গভীর সামাজিক মমত্ববোধই বহুল পরিমাণে আমাদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য দায়ী'।

অপরপক্ষে ইউরোপে এই চিন্তার বিকাশ নিম্নোক্ত ধারায় হয়েছিল—
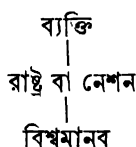
অর্থাৎ "ব্যক্তিগত 'ইনডিভিডুয়াল কন্‌সাস্‌নেস'-এর পরে যে একটা 'সোস্যাল কনসাস্‌নেস্' আছে, এই কথাটা ইউরোপ ভুলিয়া গিয়াছে। আর ভুলিবার কারণ এই যে ইউরোপে বহুদিন হইতে এই 'সোস্যাল কনসাস্‌নেস্'টা 'পলিটিক্যাল কনসাসনেস্'-এর সঙ্গে—সামাজিক আত্মবোধটা রাষ্ট্রীয় আত্মবোধের সঙ্গে মিশিয়া আছে!" সামাজিক সংহতির স্তরকে অতিক্রম করে বা সামাজিক সংহতিসাধন না করে 'ইউরোপ একেবারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপরে রাষ্ট্রতন্ত্রকে গড়িয়া তুলিতে যাইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকতার পথে ছুটিয়া যাইতেছে।'[২৪৩] সমাজ-সংহতির চেষ্টা না করায় ইউরোপীয় সমাজে শ্রেণীসংঘর্ষ প্রবল এবং সেই সংঘর্ষের ফলে রাষ্ট্র বিপন্ন হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমের প্রবর্তনে শ্রেণীসংঘর্ষ প্রবল হতে পারেনি। ফলে সমাজ সংহত হয়েছে।

বিপিনচন্দ্রের চিন্তা বিশ্লেষণমুখী হলেও, তাঁর আদর্শ সমন্বয়মুখী। তাঁর আদর্শানুসারে সভ্য সমাজের বিকাশের স্তরটি হওয়া উচিত তিন ধাপে নয়—চার ধাপে :
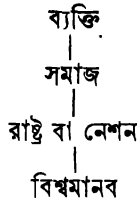
বিপিনচন্দ্র অবশ্য রাষ্ট্র বা নেশন এবং বিশ্বমানব—এই ধাপের মধ্যেও আর একটি অন্তর্বর্তী ধাপ কল্পনা করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন 'এম্পায়ার' বা সাম্রাজ্য। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে বর্তমান পৃথিবীতে নেশন-রাষ্ট্রের এক বিশেষ ধরনের বিকাশ ইতিমধ্যেই হয়েছে। কোনো কোনো নেশন-রাষ্ট্র অপর নেশনকে জয় করে নিজ শাসনাধিকারে এনে নেশন-রাষ্ট্রের সীমা ও অধিকার বাড়িয়ে তুলেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই জয় সম্পূর্ণ, অর্থাৎ বিজিত রাষ্ট্রটি রাষ্ট্রত্ব হারিয়ে বিজয়ী রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কুক্ষিগত হয়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজিত রাষ্ট্রটির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হানি না করে, সেটিকে বিজয়ী রাষ্ট্রের অধীনস্থ করদ রাজ্যে পরিণত করা হয়েছে। এইভাবে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে আর এক রাষ্ট্রের মিলনে এক বৃহত্তর সংস্থা গঠিত হয়েছে। এইভাবে বিজয়ের দ্বারা যে বৃহত্তর রাষ্ট্রসংস্থা গড়ে ওঠে, তাকেই বলা হয় সাম্রাজ্য।

বিপিনচন্দ্র বাস্তববাদী,—নীলপক্ষ আদর্শবাদী নন। সুতরাং তাঁর অভিমত হলো এই যে অন্যায় পথে হলেও পৃথিবীতে যখন কয়েকটি সাম্রাজ্য গড়েই উঠেছে এবং সে সাম্রাজ্যের মধ্যে একাধিক নেশন একই শাসনে কিছু পরিমাণে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তখন এই ঐক্যের ভাবটিকে যদি আরও বর্ধিত করে তোলা যায়, তবে বিশ্বমানবসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। সুতরাং সাম্রাজ্যকে ভেঙে দিয়ে পুনরায় কতকগুলি পরস্পর সম্পর্কহীন নেশনরাষ্ট্রে পরিণত করা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি। বরং তিনি বিশ্বাস করতেন যে বর্তমান সাম্রাজ্যের প্রকৃতি এবং শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত করে সেটিকে স্বশাসিত রাষ্ট্রসমবায়ে রূপান্তরিত করে দিলে বহু নেশনের মধ্যে ইতিমধ্যে স্থাপিত পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা এবং ঐক্যের ভাবটি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি রক্ষা করা সম্ভব হবে। বিপিনচন্দ্রের পরিকল্পিত 'সাম্রাজ্য' প্রকৃতপক্ষে একটি 'কনফেডারেশন' বা রাষ্ট্রসমবায়। ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজ, সমাজ থেকে নেশন, নেশন বা রাষ্ট্র থেকে সাম্রাজ্য বা যৌথরাষ্ট্র এবং যৌথরাষ্ট্র থেকে বিশ্বমানবসঙ্ঘ—মানবতার

বিকাশের এই ক্রমটি যাঁরা সম্যক অনুধাবন করেন নি বা 'সাম্রাজ্য' শব্দটিকে বিপিনচন্দ্র কী বিশেষ অর্থে গ্রহণ করেছেন, সেটি যাঁরা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেন নি, তাঁদের মনে হয়েছে—'বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার ক্রমাগত পরিবর্তন এবং ক্ষেত্রবিশেষে পারম্পর্যের অভাব সুপরিস্ফুট'।[২৪৪] শুধু নেশন-রাষ্ট্রের অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই বিপিনচন্দ্র নেশন-রাষ্ট্র অপেক্ষা বৃহত্তর ঐক্যের ক্ষেত্র হিসাবে 'ইম্পিরিয়াল ফেডারেশন'-এর পক্ষপাতী ছিলেন। এইটুকু লক্ষ্য করেই মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো চিন্তাবীরও বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিকে ঝাপসা বলে এবং তাঁর সাম্রাজ্যিক সম্পর্ক রক্ষার ইচ্ছাকে ব্যক্তিগত দুর্বলতার চিহ্ন বলে উল্লেখ করেছিলেন।[২৪৫] মানবেন্দ্রনাথ যদি একটু তলিয়ে দেখতেন, তবে দেখতে পেতেন যে বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টি আদৌ ঝাপসা ছিল না। বরং তাঁর মতো স্বচ্ছদৃষ্টির মানুষ কোনো দেশেই অগণিত সংখ্যায় জন্মেনি।

রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশের ধারাটি স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখেছিলেন বলেই তিনি দেখেছিলেন—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূখণ্ডেই বিকাশের ধারাটি একই লক্ষ্যাভিমুখী—গতি একমুখী—ব্যক্তি থেকে বিশ্বমানব। এই গতিপথে একটি ধাপ হচ্ছে 'সাম্রাজ্য' অর্থাৎ একাধিক নেশন বা রাষ্ট্রের একটি জৈব সমগ্রতার মধ্যে একত্রীকরণ। বিপিনচন্দ্রের চিন্তায় এই সাম্রাজ্যও শেষ কথা নয়। সাম্রাজ্যসমূহও শেষ পর্যন্ত একত্রীকৃত হবে বিশ্বমানবসঙ্ঘে। মানবেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ বিপিনচন্দ্রের চিন্তা, যুক্তি ও আদর্শের শেষ ধাপ পর্যন্ত লক্ষ্য করেন নি। 'এম্পায়ার', 'ইম্পিরিয়াল', 'রিলিজিয়ন', 'রিফর্ম' প্রভৃতি শব্দগুলি বিপিনচন্দ্রের প্রদত্ত সংজ্ঞায় গ্রহণ না করে, আটপৌরে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করে মানবেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য অনেকেরই মনে হয় বিপিনচন্দ্রকে ভুল বুঝেছেন এবং বিপিনচন্দ্রের বক্তব্যের ভিন্ন অর্থ করেছেন।

মানবসভ্যতার বিকাশের ধারা যে বিশ্বমানবমুখী, আজকের দিনে বাস্তবে পরিণত ইউনাইটেড নেশনস্ অরগ্যানাইজেশন তা' প্রমাণ করেছে। ইংরেজ সাম্রাজ্য যে বিবর্তিত হয়ে বিপিনচন্দ্রের পরিকল্পিত আদর্শ সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী হতে পারে, 'বৃটিশ এম্পায়ার'-এর 'বৃটিশ কমনওয়েলথ অব্ নেশনস' এবং বর্তমান 'কমনওয়েলথ অব্ নেশনস্'-এ রূপান্তর তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইতিহাসের ধারা বিপিনচন্দ্রকেই সমর্থন করে। স্বাধীন ভারতবর্ষ ইংরেজের সঙ্গে এবং ইংরেজ

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়নগুলির সঙ্গে (বিপিনচন্দ্রের ধারণামতোই এগুলি আজ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে) সম্পর্ক ছিন্ন করেনি।

প্রাচ্য দেশ রাষ্ট্রগঠনে মনোযোগী না হয়ে একেবারে 'সমাজ' থেকে 'বিশ্বমানব' স্তরে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে সফল হতে পারেনি। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য দেশ 'সমাজ'-গঠনে মনোযোগী না হয়ে রাষ্ট্রের মাধ্যমে বিশ্বমানবস্তরে উপনীত হতে গিয়ে ব্যর্থতা বরণ করেছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাবে প্রাচ্যভূখণ্ড আদর্শ-বিকাশ থেকে বঞ্চিত হয়েছে; সমাজ-সংহতির অভাবে শ্রেণীদ্বন্দ্বে পাশ্চাত্য ভূখণ্ড আদর্শ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। বিপিনচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অভীষ্টলাভের প্রতিবন্ধক ও ব্যর্থতার কারণটিকে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করেছেন এবং প্রতিবন্ধক দূরীকরণের সঠিক উপায় নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে প্রাচ্য দেশ তথা ভারতকে রাষ্ট্রগঠনে উদ্যোগী হতে হবে, আর ইউরোপকে সমাজ-সংহতি সম্ভব করতে হবে। তা'হলে রাষ্ট্রশক্তির অভাবজনিত কারণে ভারত ব্যর্থ হবে না আর সমাজ-সংহতির অভাববশতঃ শ্রেণীদ্বন্দ্বে ইউরোপ বিপর্যস্ত হবে না। মার্কস্‌বাদীরা একটিমাত্র শ্রেণী ব্যতীত অপর সকল শ্রেণীর বিলোপ ঘটিয়ে এবং ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করে 'বিশ্বমানব'-স্তরে উপনীত হতে চান। কিন্তু বলপ্রয়োগে বলের বিনাশ হয় না, হিংসায় হিংসা বৃদ্ধি হয়, রাষ্ট্র বিলুপ্ত না হয়ে সর্বগ্রাসী সর্বাত্মক রাষ্ট্রে (টোটালি-টেরিয়ান স্টেট) পরিণত হয়। বর্তমান জগতে এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বিপিনচন্দ্র অভাবাত্মক পথে, বলপ্রয়োগের পথে অগ্রসর হওয়া কাম্য বলে মনে করেন নি। তাঁর আদর্শ—বিলোপ নয়, বিকাশ; বিরোধ নয়, সমন্বয়; ভীতি নয়, প্রীতির আদান-প্রদান।

বিপিনচন্দ্রের আদর্শ সমন্বয়মুখী ছিল একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমন্বয়-সাধনার ধারা রামমোহন থেকে শুরু হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় বিকাশ লাভ করেছিল, বিপিনচন্দ্রের চিন্তা ও চেতনায় তার প্রভাব অনস্বীকার্য। রামমোহন ধর্মের ক্ষেত্রে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশচর্চার ক্ষেত্রে যে সমন্বয়-চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন, বিপিনচন্দ্র তাকে ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহনের বিশ্বজনীন মানবতার (ইউনিভার্স্যাল হিউম্যানিজ্‌ম্) ধারণাই[২৪৬] তাঁকে বিশ্বমানবসঙ্ঘ-পরিকল্পনায় উদ্দীপিত

করেছিল। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই তার জীবনাদর্শের কেন্দ্রবিন্দু ছিল—সর্বভূতের হিত এবং তাঁর স্বদেশচিন্তাও ছিল সর্বভূতের হিতের লক্ষ্যাভিমুখী। এই কেন্দ্র থেকেই অন্যান্য মতগুলি চাকার পাকির (স্পোক্‌স অব্‌ দি হুইল) মতো নানা দিকে প্রসারিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—'পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কেবল পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এইজন্য সর্বভূতের হিতের জন্য স্বদেশরক্ষণ কর্তব্য'।[২৪৭] আর বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'আত্মরক্ষা ধর্ম, কেননা এই দেহ-মন-প্রাণ-আত্মা ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঈশ্বরের দান; তাঁহাকে প্রীতি করিবার ও তাঁহার জগতের সেবা করিবার উপকরণ ও সহায়। স্বজনরক্ষা ধর্ম, কারণ স্বজনবর্গের শক্তি, সাহায্য ও সাহচর্যের উপরে আমার নিজের রক্ষা ও নিজের ঈশ্বরদত্ত শক্তি ও বৃত্তি সকলের অনুশীলন ও সার্থকতা নির্ভর করে। স্বদেশরক্ষা ধর্ম, কেননা ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়'।[২৪৮] বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বিশ্বাস করতেন যে '…বস্তুতঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে, আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা স্বদেশপ্রীতির কোনো বিরোধ নাই',[২৪৯] দেখা গেছে, বিপিনচন্দ্রও তাঁর জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে কোনো বিরোধ আছে বলে মনে করেন নি। জাগতিক প্রীতি ও স্বদেশপ্রীতির মধ্যে কোনো বিরোধের কল্পনা না করলেও বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রীতিকেই স্থান দিয়ে বলেছেন—'যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম'।[২৫০] বিপিনচন্দ্রও অনুরূপভাবে বলেছেন—"যে সার্বজনীন ধারণা (ইউনিভার্স্যাল) বিশেষের ধারণাকে (পার্টিকুলার) উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে, তা' প্রকৃত সার্বজনীন ধারণা নয়; তাকে বস্তুনিরপেক্ষ সার্বজনীন ধারণা বলা যেতে পারে। যে বিশ্বজনীন মানবতা 'জাতীয় জনসমাজসমূহ'কে (ন্যাশনালিটিজ্‌) উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে, তা' একটি বস্তুনিরপেক্ষ ধারণামাত্র এবং তা মানবমৈত্রী ও সামাজিক অগ্রগতির প্রকৃত কাজে সত্য ও শক্তি সঞ্চার করতে পারে না।'[২৫১] সুতরাং বিপিনচন্দ্রের মতে, বিশ্বজনীন মানবতা জাতীয়তা অপেক্ষা মহত্তর ধারণা সন্দেহ নেই; কিন্তু আগে জাতীয়তা, তারপর বিশ্বজনীন মানবতা।

বিপিনচন্দ্রের অনেক উক্তিকে প্রকৃত প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝেছেন। তাঁর লেখাতে বারংবার বর্ণাশ্রম-ধর্মের

উল্লেখ থাকাতে একথা প্রচার করবার সুযোগ হয়েছিল যে বিপিনচন্দ্র শুধুমাত্র হিন্দুর কথাই বলেছেন। খিলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের অংশগ্রহণ ব্যাপারে তাঁর আপত্তি এই অপপ্রচারকে পুষ্ট করতে সাহায্য করেছিল।

বিপিনচন্দ্র বর্ণাশ্রমধর্মের গুণগান করেছেন এই যুক্তিতে যে 'পুরাতন বর্ণাশ্রমের উপরে যে হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে য়ুরোপীয় সমাজের রজত-প্রাধান্য কিংবা সংসারযাত্রানির্বাহের জন্য বৈষয়িক ব্যাপারে সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কোন প্রকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান ছিল না'[২৫২] রজত-প্রাধান্য এবং শ্রেণী-দ্বন্দ্ব—এই দুই বিপত্তির পরিহারের সহায়ক বলেই বিপিনচন্দ্র সনাতন হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্মের পক্ষপাতী। তা' ভিন্ন আধুনিক সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদীর মতোই তিনি বলেন --'খেটে খাব, খেয়ে খাটব—আমি এইটুকুই চাই'।[২৫৩] পরশ্রমজীবী পরগাছা হয়ে জীবনোপভোগ তাঁর কাম্য নয়।

প্যান-ঐস্লামিক আন্দোলন সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের অভিমত তাঁর অন্যান্য বিষয়ক মতামতের মতোই যে কত যুক্তিসহ, তথ্যনির্ভর ও দূরদৃষ্টির ফল, আজ তা' নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। বিপিনচন্দ্র ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বলেছিলেন—'ইসলামী সাধনাকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, ইসলামী সভ্যতাকে যদি আধুনিক সভ্যতার সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হয়, তবে ইসলামের প্রতিনিধি হইয়া কোনও স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান প্রভুশক্তিকে আধুনিক জগতের শক্তিপুঞ্জের মাঝখানে দাঁড়াইয়া থাকা আবশ্যক। তুর্কী আজ পর্যন্ত য়ুরোপের শক্তিপুঞ্জের মাঝখানে বসিয়া এই কাজটাই করিতেছিল। অতএব তুর্কীর নাম যদি য়ুরোপের ভূগোল হইতে মুছিয়া যায়, তাহাতে মুসলমানী সাধনার ভবিষ্যৎ উন্নতির যে গুরুতর ব্যাঘাত উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। আর এইজন্য ভারতের মুসলমান সমাজ যদি তুর্কীর বর্তমান বিপদকে নিজেদের বিপদ বলিয়া মনে করেন, তাহা অস্বাভাবিক নয়, অসঙ্গতও নয়'।[২৫৪] তা'হলে খিলাফত আন্দোলন সমর্থনে বিপিনচন্দ্রের আপত্তি কেন এবং কোথায়? তাঁর আপত্তি দু'টি কারণে। প্রথমতঃ '...তুর্কীর সঙ্গে ভারতের মুসলমানগণের সম্বন্ধ কেবল ধর্ম ও সাধনা লইয়া, রাষ্ট্র লইয়া নহে। রাষ্ট্রগত সম্বন্ধ তাহাদের ভারতের সঙ্গে, তুরস্কের সঙ্গে নহে। রুমের বাদশাহ্ ভারতের বাদশাহ্ নহেন। এ দেশের মুসলমানগণের পক্ষে রুমের বাদশাহ্‌কে কোনো অর্থে বা কোনো আকারে নিজেদের বাদশাহ্ বলিয়া কল্পনা করা একটা বিরাট ও বিপদসঙ্কুল ভ্রান্তিকে

পোষণ করা মাত্র'। এইজন্য তিনি খিলাফত আন্দোলনের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মনে ভারতরাষ্ট্রের প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়বার এবং হ্রাস পাবার আশঙ্কা অনুভব করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ '...রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এবং রাষ্ট্র সম্বন্ধে যদি ভারতের মুসলমানগণের নিকট ভারতবাসিত্ব অপেক্ষা মুসলমানত্ব বড় হয়, তাহা হইলে ভারত রাষ্ট্রের বা প্রভুশক্তির সঙ্গে যদি কখন কোনো মুসলমান রাষ্ট্রের বা মুসলমান প্রভুশক্তির যুদ্ধবিগ্রহাদি বাধিয়া ওঠে, তখন ......প্যান-ইসলামী মুসলমান লোকনায়কগণের মতে ভারতের রাষ্ট্রশক্তির প্রতিকূলে বিপক্ষ মুসলমান রাষ্ট্রের বা মুসলমান প্রভুশক্তির আনুকূল্য করাই একান্ত ধর্মসঙ্গত হইবে।' সুতরাং 'রাষ্ট্র অপেক্ষা ধর্ম বড়'—এমন কোনো মনোভাব বা কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেওয়া তিনি অসঙ্গত বলে মনে করেছিলেন। বিপিনচন্দ্রের আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করে পৃথক মুস্লিম রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্ট হয়েছে।

তদানীন্তন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র বিপিনচন্দ্রই প্যান-ঐস্লামিক-বাদের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। প্যান-ঐস্লামিকবাদেব রাজনৈতিক বিপদ সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন বলেই তিনি ঐ মতবাদ সমর্থন করতে পারেন নি ; নইলে ঐস্লামিক সভ্যতা ও সাধনার উন্নতি তিনি আন্তরিকভাবেই কামনা করতেন। তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন—'এই প্যান-ইসলামী বস্তু যদি মোহম্মদের শিক্ষা ও সাধনাকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানাদির সাহায্যে সময়োপযোগী করিয়া তুলিয়া, মুসলমানসমাজে একটা উন্নত ও উদার আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প লইয়া জন্মগ্রহণ করিত, আমরা মুসলমান না হইয়াও সর্বান্তঃকরণে ইহার কল্যাণ কামনা করিতাম। কিন্তু প্যান-ইসলামী আদর্শ এইরূপ কোনো আধ্যাত্মিক প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই। মুসলমান-সমাজের রাষ্ট্রীয় প্রভাববিস্তারই ইহার মুখ্য লক্ষ্য, ধর্মসংস্কার নহে।'

ব্যক্তিগত জীবনে বিপিনচন্দ্র যে ধর্ম-সাধনারই অনুশীলন করুন না কেন, তাঁর ধর্ম-চেতনা ছিল সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। তা'ছাড়া রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্ম-চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার ছিলেন ঘোর বিরোধী। 'নিউ ইণ্ডিয়া'র স্তম্ভের মাধ্যমে তিনি যে যৌগিক স্বাদেশিকতা-তত্ত্ব' (কম্পোজিট প্যাট্রিয়টিজম্) উদ্ভাবন করেন, তাতে হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টান—কোনো সম্প্রদায়েরই একক গুরুত্ব স্বীকৃত হয়নি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর

সমানাধিকার ছিল সেই যৌগিক স্বাদেশিকতার ভিত্তি। ভারতের মুসলমান-সমাজ আশানুরূপভাবে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে উৎসাহ দেখান নি বলে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে শিবাজী-উৎসবের মতো 'আকবর-উৎসব' পালন করা হোক্।[২৫৫]

ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বমানব-সমন্বয়ের চিন্তাই বিপিনচন্দ্রের জীবন-সাধনা। এর সিদ্ধির মধ্যেই তিনি অভীষ্ট মোক্ষের সন্ধান করেছেন। একেই তিনি ধর্ম জ্ঞান করেছেন, করণীয় কর্মরূপে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু আদর্শবাদী হলেও তাঁর বাস্তববোধ ছিল প্রখর। মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়ে, বাস্তব অবস্থানুযায়ী অধিকতর ফলদায়ী কর্মনীতি নির্ধারণকে তিনি প্রকৃত নেতার কর্তব্য বলে বিবেচনা করতেন। এইজন্যই কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচীকে ধরাবাঁধা ছকে পরিণত না করে প্রতিপক্ষের ক্রিয়াকলাপ অনুসারে তা' নিরূপণ করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।

দূরদর্শী আদর্শবাদপুষ্ট বাস্তববোধ বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্র-চিন্তার বৈশিষ্ট্য। তিনিই প্রথম সর্বভারতীয় নেতা, যিনি প্রকৃত অর্থে সাম্যবাদী। সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র তাঁর রাষ্ট্রনীতি, বিশ্বমানবসঙ্ঘ-পরিকল্পনা তাঁর রাষ্ট্রদর্শন।

সূত্র-নির্দেশ

(১) Memories of My Life and Times, Vol. I, P. 373.

(২) Ibid, P. 382.

(৩) Ibid, P. 424.

(৪) 'প্রচার' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—'নবজীবনের পনের দিন পরে প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও উৎসাহে প্রকাশিত হয়'।—'বাংলা সাময়িক পত্র', ২য় খণ্ড, ২য় সং, ১৩৫৯ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৫) 'জীবন-স্মৃতি' : গগনচন্দ্র হোম, ১৩৩৬, পৃঃ ১৫।

(৬) Memories of My Life and Times, Vol. II, P. 30.

(৭) Ibid, P. 127.

(৮) Ibid, P. 128,

(৯) Ibid, P. 131.

(১০) Ibid, P. 131.

(১১) 'মার্কিনে চারিমাস' : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ১২।

(১২) 'Weekly Record and Review of Modern Thought and Life'.—New India, 12th August, 1901.

(১৩) 'For God, Humanity and Fatherland'.—New India, 12th August, 1901.

(১৪) 'This New India is neither Hindu—though the Hindu unquestionably form the original stalk and staple of it,—nor Muhammadan,—though they have made very material contributions to it,—nor even British,—though they are politically the masters of the country now,—but is made up of the varied and valuable materials supplied in successive stages of its evolution, by the three great world-civilisations, which the three great sections of the present Indian Community represent'.—New India, 12th August, 1901.

(১৫) '...Its standpoint is intensely national in spirit, breathing the deepest Veneration for the spiritual, moral and intellectual achievements of Indian Civilisation, and distinctly universal, in aspiration, reaching out to all that is noblest and loveliest in Western Culture...' New India, 12th August, 1901.

(১৬) New India, 12th August, 1901.

(১৭) দ্রঃ— The Poverty Problem in India' (Aug. 12 & 19, 1901); 'Capital and Labour in Assam' (Aug. 26, 1901); 'The Viceroy on Indian Education' (Sept. 9, 1901); 'Slavery in the Assam Tea Gardens' (Nov. 11, 1901); 'Indian Poverty and British Prosperity' (Dec. 16, 1901); The Handloom-weaving Industry of India' (Aug. 28, 1902); The Cause of High Education in India' (Aug. 7, 1902); 'The Education Policy of the Government' (Dec. 4,1902) etc.

(১৮) '...though such discontent is not of much consequence now, the cumulative effect of it, may be such that in course of time, the Government may find it very difficult to cure or cope with it'.— 'The Partition of Bengal': New India, July 7, 1904.

(১৯) এই প্রবন্ধগুলি বিপিনচন্দ্রের 'Swadesi and Swaraj' (যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, ১৯৫৪) নামক ইংরেজী গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

(২০) দ্রঃ—'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি,' বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩০৯ (১৯০২), 'রাজকুটুম্ব', বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১০ (১৯০৩), 'ঘুষাঘুষি', বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১০ (১৯০৩)। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড।

(২১) 'রাজকুটুম্ব', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৯।

(২২) প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় Extremist-কে 'গরমপন্থী' নামে চিহ্নিত করেছেন। হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়-রচিত 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ' গ্রন্থের ভূমিকা (পৃঃ দ) দ্রষ্টব্য। সুতরাং Terrorist (সন্ত্রাসবাদী) বা Revolutionary (বিপ্লবী)-কেই 'চরমপন্থী' নামে অভিহিত করা সমীচীন বলে মনে হয়।

(২৩) বিপিনচন্দ্র পালের জামাতা স্বর্গত সুরেশচন্দ্র দেবের 'বন্দে মাতরম্ পত্রিকার জন্মবৃত্তান্ত' শীর্ষক অপ্রকাশিত প্রবন্ধ। হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়ের 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ' গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

(২৪) 'Sri Aurobindo on Himself and on the Mother': Sri Aurobindo, 1953, P. 98.

(২৫) 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ': হরিদাস মুখোপাধ্যায়, এবং উমা মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯০—৯১। শ্রীঅরবিন্দের উপরি-উক্ত গ্রন্থে 'বন্দে মাতরম্' প্রকাশের প্রথম তারিখ ৭ই আগষ্ট (১৯০৬) বলে উল্লিখিত ; ৯৮ পৃষ্ঠার শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

(২৬) অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় রচিত 'Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj' গ্রন্থ থেকে (পৃঃ ৬১) জানা যায় যে ১৯০৬-এর অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের নাম যুগ্ম-সম্পাদকরূপে বন্দে মাতরম্-এর সঙ্গে সরকারীভাবে যুক্ত ছিল।

(২৭) 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগ' : শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, নব ভারত পাবলিশার্স, ১৯৫৬, পৃঃ ৪৬০— ৬১।

(২৮) 'Sri Aurobindo on Himself and on the Mother' Pp. 98-99.

(২৯) 'The man most detested and denounced by the Indian Revolutionary Organisation now active at Paris, Geneva and Berlin is Srijut Bepin Chandra Pal, the prophet and first preacher of Passive Resistance'.—'The New Policy', Karmayogin, 22nd January, 1910.

(৩০) 'Sri Aravinda Ghosh'; Character Sketches' : B. C. Pal, 1957, Pp. 94-95.

(৩১) 'Is the ideal of the Indian National Congress to be an essentially democratic ideal, or is it to work for the replacement of the present white and foreign Bureaucracy by a brown one composed of home-materials,—that is, it seems to us, the most vital question that the present agitation in regard to both the election of the President for the coming session and the proposed presentation of a fresh petition to Mr. Morley for revocation of the partition of Bengal, has raised before the country'.—Quoted in 'Bepin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj' by Profs. Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, P. 59.

(৩২) Ibid, P. 60.

(৩৩) Ibid, P. 61.

(৩৪) 'Sri Aurobindo on Himself and on the Mother' : Sri Aurobindo, 1953, Pp. 51-52.

(৩৫) 'কংগ্রেস' : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বসুমতী সাহিত্য-মন্দির, ১৩২৭, পৃঃ ১৪১-৪৩।

(৩৬) 'Sri Aurobindo on Himself and on the Mother', P. 52.

(৩৭) Confidential Report on the Native-owned English Newspapers in Bengal No. 19 of 1908 for its report on Bande Mataram. Quoted in 'Bepin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj' : Profs. Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, P. 105.

(৩৮) Ibid, P. 118.

(৩৯) Ibid, P. 119.

(৪০) Ibid, P. 119.

(৪১) শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন পাল মহাশয়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 'Hindu Review'-এর ফাইল-কপিতে প্রথম সংখ্যার প্রকাশের তারিখ নেই। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'Insurance and Co-operation' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক নিরঞ্জন পাল মহাশয়ের লেখার তারিখ আছে—'London, January 3rd, 1913'. সেইজন্য মনে হয় 'Hindu Review-এর প্রথম সংখ্যা ১৯১৩-র জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।

(৪২) 'Hindu Review,' First Issue, 1913.

(৪৩) উপরি-উক্ত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে ১—৫ সংখ্যক প্রবন্ধ বিপিনচন্দ্রের 'Nationality and Empire' গ্রন্থে (১৯১৬) সঙ্কলিত হয়ে পুনর্মুদ্রিত হয়। ৬ এবং ৭ সংখ্যক প্রবন্ধ দু'টি তাঁর 'Writings and Speeches', Vol. I (১৯৫৮) গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ৮ সংখ্যক প্রবন্ধটি তাঁর 'Character Sketches' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

(৪৪) বিপিনচন্দ্রের মধ্যমপুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন পাল মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত মূল পত্রের অনুলিপি পরিশিষ্ট 'ক' অংশে দ্রষ্টব্য।

(৪৫) শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন পাল কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ (১৪. ১০. ৬৯) দ্রষ্টব্য।

(৪৬) 'Hindu' (English Supplement), 27th February, 1932.

(৪৭) যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড (কলকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত 'বিপিনচন্দ্র পাল' নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

(৪৮) 'It was the first all-Bengal political demonstration'.—Beginnings of Freedom Movement in India ; B. C. Pal, 1959, P. 23.

(৪৯) 'Speech on the Congress Resolution for the Repeal of the Arms Act (1887), *vide* 'Writings and Speeches' : B. C. Pal, P. 4.

(৫০) Memories of My Life and Times, Vol. II : B. C. Pal, P. 40.

(৫১) 'The organisation was threatened with extinction from three quarters —the official, the Moslem and even from some of its leading members.' —'Congress and Congressmen in the Pre-Gandhian Era' ; Biman Behari Majumder and Bhakta Prasad Majumder, Calcutta, 1967, P. 16.

(৫২) 'A safety-valve for the escape of great and growing forces generated by our action, was urgently needed, and no more efficacious safety-valve than our Congress Movement could possibly be devised'—Quoted in 'The Indian National Movement', Nemai Sadhan Bose, Calcutta, 1965, P. 29.

(৫৩) B. B. Majumder & B. P. Majumder ; Op. cit. P, 17.

(৫৪) 'Memories of My Life and Times.' B. C. Pal, Vol. II, P. 52.

(৫৫) 'A Nation in Making' : S. N. Banerjee, 1925, Pp. 99-100.

(৫৬) The Report of the Proceedings of the Bengal Provincial Conference, Calcutta, 1888, Pp. 2-16.

(৫৭) 'The Basis of Political Reform (1889), *vide* 'Writings and Speeches' : B. C. Pal, Vol. I, Pp. 13-14.

(৫৮) Ibid, P. 21.

(৫৯) The Report of the Proceedings of the Bengal Provincial Conference, Calcutta, 1892, Pp. 19-21.

(৬০) Memories of My Life and Times, Vol. II, P. 118.

(৬১) 'Babu Bepin Chandra Pal who had been, since 1903-04, doing splendid work in the cause of National Renaissance through his Weekly New India, became the avowed and authoritative exponent of the cult of Nationalism, National Education and the New Spirit, throughout the Country'—'The History of Indian National Congress' : B. Pattabhi Sitaramayya, Vol. I, Bombay, Reprinted, 1946, P. 69.

(৬২) 'Bankim—Tilak—Dayananda' : Sri Aurobindo, 1947, P. 67. (First published in 'Karmayogin', December 4, 1909).

(৬৩) I hope I am making no false or arrogant claim when I say that the highest ideal of truth is to a large extent a western conception. I do not thereby mean to claim that Europeans are universally or even generally truthful, still less do I mean that Asiatics deliberately or habitually deviate from the truth, ...But undoubtedly truth took a high place in the moral codes of the West before it had been similarly honoured in the East'. 'Convocation Addresses', Vol. III, 1889-1906. Cal., 1914. P. 981.

(৬৪) কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৭, পৃ: ২৪৫ ।

(৬৫) 'India's Fight for Freedom' : Profs. Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee, P. 17.

(৬৬) '...to invest the Mohammedans in Eastern Bengal with a Unity which they have not enjoyed since the days of the old Mussulman Viceroys and Kings'.—Speech at Dacca, 18th Feb., 1904. Quoted in 'The Extremist Challenge' : Amalesh Tripathi, 1967, P. 97.

(৬৭) 'টহলরাম গঙ্গারাম' : শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়, শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ, ১৩৬৩ ।

(৬৮) কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত ।

(৬৯) 'A Nation in Making', S. N. Banerjee, P. 188.

(৭০) 'A Grave National Disaster': The Bengalee, July 5, 1905; 'The Partition Question or the Forthcoming Frankenstein': A. B. Patrika, July 10, 1905; 'Partition Question Agitation': A. B. Patrika, July 12, 1905; 'Partition Question: Real Situation'; A. B. Patrika, July 18, 1905 etc.

(৭১) A. B. Patrika. July 20, 1905 (Editorial).

(৭২) 'A Nation in Making': S. N Banerjee, P. 187.

(৭৩) 'The historic hall never witnessed before a gathering so vast, so representative and so enthusiastic withal so sober before any time of its hundred years' existence'.—A. B. Patrika, Aug. 8, 1905.

(৭৪) 'That this meeting fully sympathises with the resolutions adopted at many meetings held in the mofussil, to abstain from the purchase of British manufactures, so long as the Partition Resolution is not withdrawn as a protest against the indifference of the British public in regard to Indian affairs and consequent disregard of Indian public opinion by the present Government.'—A. B. Patrika, Aug. 8, 1905.

(৭৫) 'Bande Mataram and Indian Nationalism': Profs. Haridas, Mukherjee, and Uma Mukherjee, 1957. P. 13.

(৭৬) 'India's Fight for Freedom': Profs. Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, P. 40.

(৭৭) 'Partition Proclamation'—A. B. Patrika, Sept. 2, 1905.

(৭৮) 'Congress and Congressmen in the Pre-Gandhian Era': B. B. Majumder & B. P. Majumder, 1967, P. 43.

(৭৯) 'The belief that England will of her own free will help Indians out of their long-established servitude and establish those free institutions of Government which she herself values so much was once cherished, but all hope has now been abandoned.'—New India, December 21,1904.

(৮০) 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ': হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১, পৃঃ ৩৬।

(৮১) Pal's speech on 'Boycott of Association of Government' at the twenty-second session of the Indian National Congress, Calcutta (1906), "Swadeshi & Swaraj', P. 273.

(৮২) *Vide* Confidential History Sheet (No. 49) of Bipin Chandra Pal as prepared by the Government of Eastern Bengal and Assam. Abstract

No. 6 of 1907—Quoted in 'Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj' : Profs. Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee, P. 29.

(৮৩) কেদারনাথ দাসগুপ্ত সংকলিত 'শিক্ষার আন্দোলন' (ডিসেম্বর, ১৯০৫) পৃঃ থ-ব ।

(৮৪) 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ' : হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৯ ।

(৮৫) *Vide* Confidential Report on Native-owned English Newspapers in Bengal No. 39 of 1905. Quoted in 'Bepin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj : Profs. Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, P. 31.

(৮৬) *Vide* Govt. Report on Native-owned English Newspapers in Bengal No. 46 of 1905. Quoted in Ibid, P. 32.

(৮৭) 'Swadeshi Days' : Prof. Nripendra Chandra Banerjee, The Modern Review, January, 1947.

(৮৮) শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগ : গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, পৃঃ ৪৩৭-৩৮ ।

(৮৯) 'The question of Partition itself receded into the background, and the issue, until then succesfully veiled and now openly raised, was not whether Bengal should be one Unpartitioned Province or two partitioned provinces under British rule, but British rule itself was to endure in Bengal or, for the matter of that anywhere in India.'—Indian Unrest : Valentine Chirol, London, 1910, P. 88.

(৯০) 'They desire to make the Government in India popular without ceasing in any sense to be essentially British ; We desire to make it autonomous, absolutely free of the British Control.'—'The New Spirit II—"Swadeshi and Swaraj' : B. C. Pal, P. 56.

(৯১) 'Our method is Passive Resistance, which means an organised determination to refuse to render any voluntary and honorary service to Government ; ...'—'That Sinful Desire'—Swadeshi & Swaraj., B. C. Pal, P. 63.

(৯২) 'No one outside a lunatic asylum will ever think of or counsel any violent and unlawful methods in India, in her present helplessness, for the attainment of her civic freedom.'—Ibid, P. 62.

(৯৩) 'Passive Resistance is not non-active, but non-aggressive resistance. We stand upon our rights. We stand within the limits of law that we have still in the country.'—'Swaraj : Its ways and Means (Madras Speech, 1907)—Swadeshi and Swaraj : B. C. Pal, P. 216.

(৯৪) 'There is a limit however to Passive Resistance. So long as the action of the executive is peaceful and within the rules of fight, the Passive Resister scrupulously maintains his attitude of Passivity,......If the instruments of the executive choose to disperse our meeting by breaking the heads of those present, the right of self-defence entitles us not merely to defend our heads, but to retaliate on those of the head-breakers'.—The Doctrine of Passive Resistance: Sri Aurobindo, Calcutta, 1948, Pp. 62-63.

(৯৫) শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগ : গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, পৃঃ ৪৫১।

(৯৬) 'Our attitude is a political Vedantism. India, free, and indivisible, is the divine realisation to which we move,—emancipation our aim'. —The Doctrine of Passive Resistnce : Sri Aurobindo. Pp. 79.

(৯৭) 'It is not a mere economic movement, though it openly strives for the economic resurrection of the country. It is not a mere political movement, though it has boldly declared itself for absolute political independence. It is an intensely spiritual movement having for its object not simply the development of economic life or the attainment of political freedom, but really the emancipation in every sense of the term, of the Indian manhood and womanhood'—The Bed-Rock of Indian Netionalism—I. Bande Mataram, Weekly Edn., June 14, 1908, *vide* 'Bande Mataram and Indian Nationalism': Profs. Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee. P. 88.

(৯৮) 'There is a religious tone, a spiritnai elevation, such words very charateristic of Aurobindo Ghose himself, and of all Bengali Nationalists, contrasted with the shrewd political judgment of Poona Extremists'—The New Spirit in India, Henry W. Nevinson, London, 1908, P. 226.

(৯৯) 'Pal was a fire-eater and fire-spitter.'—Villages and Towns as Social Patterns: Prof. Benoy Kumar Sarkar, Cal., 1941, P. 631.

(১০০) স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ: হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৩২ থেকে উদ্ধৃত।

(১০১) পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃষ্ঠা ১৩১-এর পাদটীকা থেকে উদ্ধৃত।

(১০২) 'Boycott of association with Government'—'Swadeshi & Swaraj': B. C. Pal, Pp. 272-73.

(১০৩) 'We stand by Bengal in distress and suffering that Bengal has to endure, but let not Bengal drag us into paths that we may care or may not care to go'.—Speeches and Writings of Gopal Krishna Gokhale, Vol. II (Political) Bombay, 1966, P. 211.

(১০৪) 'In this boycott and by this boycott we propose to create in the people conciousness of the 'Pararaj' on the one hand, and the desire for Swaraj' on the other'.—'Boycott' (Madras Speech, 1907) *vide* Swadeshi & Swaraj. B. C. Pal. P. 241.

(১০৫) "Tilak raised the issue to higher plane and called boycott 'Political Yoga'. 'As in yoga, so in boycott even a little of this dharma saves us from a mighty peril".—The Extremist Challenge : A. Tripathi, P. 111.

(১০৬) 'The morality of Kshatriya justifies violence in times of war and boycott is a war. Nobody blames the Americans for throwing British tea into Boston harbour, nor can anybody blame similar action in India on moral grounds. It is reprehensible from the point of view of law, of social peace and order, not of political morality'—'The Morality of Boycott'—'The Doctrine of Passive Resistance : Sri Aurobindo, P. 87.

(১০৭) 'দেশনায়ক' রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গদর্শন ; জৈষ্ঠ, ১৩১৩ : মে—জুন, ১৯০৬।

(১০৮) 'Boycott' (Madras Speech 1907), *vide* Swadeshi and Swaraj : B. C. Pal, Pp. 234-35.

(১০৯) 'The Deccan and Bengal were the two principal centres of the new gospel that was preached from the press and platform by an ever-increasing band of youthful and aggressive politicians under the inspiration of men like Messrs Bipin Chandra Pal, Aurobindo Ghosh and that stormy petrel of Indian politics, Bal Gangadhar Tilak.—'Sir Pherozshah Mehta : Homi Mody, 2nd Edn., P. 296.

(১১০) 'The method which is perfectly legitimate, perfectly constitutional and perfectly justifiable is the method of passive resistance'—Report of the Indian National Congress, 1905, P. 73.

(১১১) এই ভ্রমণ-তালিকাটি অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়ের 'Bipin Chandra Pal and Indian Struggle for Swaraj' গ্রন্থ (পৃ: ৭১-৭২) থেকে উদ্ধৃত।

(১১২) 1. The New Movement ; 2. The Gospel of Swaraj ; 3. Swaraj : Its Ways and Means ; 4. Boycott or Passive Resistance ; 5. National

Education.—এই বক্তৃতাগুলি 'Swadeshi and Swaraj' গ্রন্থে (পৃঃ ১১৭-২৭১) সঙ্কলিত হয়েছে।

(১১৩) Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj'; Profs. Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, Pp. 86-87.

(১১৪) '...but after the long interval of nearly a century the Government brought out this rusty weapon from their armoury to suppress terrorism'—History of the Freedom Movement in India, Vol II: R. C. Majumder, 1963, P. 258.

(১১৫) কংগ্রেস: হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ১৩২৭, পৃঃ ১৬৩।

১১৬) 'Bande Mataram Prosecution': A. B. Patrika, August 27, 1907.

(১১৭) 'I have conscientious objections to swear or to take any part in these proceedings'—A. B. Patrika, Aug. 27. 1907.

(১১৮) Since this prosecution was started I honestly believed that it was unjust and injurious to the cause of popular freedom'.—Ibid, Aug. 27, 1907.

(১১৯) 'I care not what may happen. I have not taken my stand upon any technicalities of law but I stand upon my right which is the birthright of every human being to say, 'My conscience is against this, and my conscience tells me in emphatic language not to assist in a prosecution case of this inequitious character, and if for this I am to be punished, well let it be so'.—A. B. Patrika, September 13, 1907.

(১২০) 'I come to bury Bepin, not to praise him--might almost be said of Sjt. Surendranath at the Parsibagan on Wednesday. We seriously think that the leader of Bengal failed by a great deal to rise to the height of the occasion in his speech in Grear Park. The twelve thousand men who had assembled all round him expected an utterance that would breathe the same spirit that had inspired Bepin Chandra Pal in the witness-box'.—'A Lost Opportunity'—Bande Mataram; September 27, 1907. দ্রঃ—'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগ: গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, ১৯৫৬, পৃঃ ৬২৪-২৫।

(১২১) 'কংগ্রেস': হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ১৩২৭, পৃঃ ১৬৮।

(১২২) Bande Mataram, March 22, 1908. Quoted in 'Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj'. P. 100.

(১২৩) 'When Bipin Chandra Pal came out of jail, he came with a message, and it was an inspired message.···That message which Bipin Chandra

Pal received in Buxar Jail, God gave me in Alipore'.—'Uttarpara Speech : Speeches of Aurobindo Ghose, Chandernagore, 1982, Pp. 86-87.

(১২৪) '...it might be one lakh, two lakhs, nay even, three lakhs. It seemed all male Calcutta was, as it were, out'—'Babu Bipin Chunder's Home Coming' : A. B. Patrika, March 11, 1908.

(১২৫) 'Babu Bipin Chunder's Home Coming' : A. B. Patrika, March 11, 1908.

(১২৬) 'We welcome back today not Bepin Chandra Pal, but the speaker of a God-given message ; not the man but the voice of the Gospel of Nationalism. ...Welcome to him and thrice welcome.'—'Welcome to the Prophet of Nationalism'.—Bande Mataram, March 10, 1908, *vide* 'Sri Aurobindo and the New Thought in Indian Politics'· Profs. Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee, Pp. 282-285.

(১২৭) 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' : যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রথম সং ১৩৬৩, পৃঃ ৩২২।

(১২৮) 'সন্ধ্যা', ১লা চৈত্র, শনিবার, ১৩১৪ (১৪ই মার্চ, ১৯০৮) : স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য : সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৬৭, পৃঃ ৬৩ক।

(১২৯) 'Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj' : Mukherjees, Pp. 108-09.

(১৩০) 'The Indian National Congress became an organ of the loyal Moderates, who were determined not to take any step which might cause any trouble to the British Bureaucracy'.—Congress and Congressmen in the Pre-Gandhian Era : B. B. Majumder and B. P. Majumder, Calcutta, 1967, P. 71.

(১৩১) India, Minto and Morley (1905-1910), By Mary Countess of Minto, London, 1634, Pp. 147-148.

(১৩২) Character Sketches : B. C. Pal, 1957, P. 79.

(১৩৩) Ibid. P. 111.

(১৩৪) Swadeshi and Swaraj : B. C. Pal, P. 100.

(১৩৫) 'The tiny brook of 1905. fed by many currents, rushed like a mighty river since 1919, till it reached the ocean'—History of the Freedom Movement in India : R. C. Majumder, Vol. II, Preface, P. xxiii.

(১৩৬) The Labour Movement and the Development of the Freedom Struggle : A. I. Levkovsky, *vide* 'Tilak and the Struggle for Indian Freedom, People's Publishing House, New Delhi, 1966, P. 470.

(১৩৭) *Vide* Confidential History Sheet (No. 49) of B. C. Pal for his lectures in England ; Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj' ; Mukherjees. P. 118.

(১৩৮) Ibid, Pp. 117-118.

(১৩৯) শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন পাল কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য (২৬/৫/৬৮)।

(১৪০) 'Uttarpara Speech' ; Speeches of Aurobindo Ghose, 1932. P. 85.

(১৪১) 'But that which distinguished him most and was the source of his powers as a writer and a speaker was his capacity for thinking. Thinking was natural to him'.—'Bipin Chandra Pal,' Studies in the Bengal Renaissance, Jadavpore, 1958, P. 579.

(১৪২) History of Indian National Congress : Dr. P. Sitaramyya, P. 125.

(১৪৩) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ২য় খণ্ড : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১৯৪৭, পৃঃ ১২৩।

(১৪৪) '...the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire'—An Advanced History of India : Majumder, Raychowdhury & Dutta, Reprint of the 2nd Edition, 1956, P. 915.

(১৪৫) 'Congress and Congressmen in the Pre-Gandhian Era : P. 76-77.

(১৪৬) 'Responsible Government' : B. C. Pal, Calcutta, 1917, পুস্তকের (১) Responsible Government, (২) Our Demands, এবং (৩) The New Policy শীর্ষক প্রবন্ধত্রয় দ্রষ্টব্য।

(১৪৭) History of the Freedom Movement in India ; R. C. Majumder, Vol. II, 1963, Pp. 532-534.

(১৪৮) 'The Story of My Life, Vol. I : M. R. Jayakar, 1958, Pp. 207-08.

(১৪৯) 'Reception to Babu Bipin Chandra Pal at the Bangiya Jana Sabha', A. B. Patrika, July 30, 1919, and also the editorial entitled 'Lord Sinha on Indian Idea on Women'. A. B. Patrika, July 30, 1919.

(১৫০) The Story of My Life, Vol. I : M. R. Jayakar, P. 212.

(১৫১) 'The World Situation and Ourselves' ; B. C. Pal, Messrs Banerjee, Das & Co., Calcutta. 1919.

(১৫২) 'The World Situation and Ourselves' : B. C. Pal, Calcutta, 1919.

(১৫৩) The New Economic Menace to India ; B. C. Pal, Ganesh & Co., Madras, 1920.

(১৫৪) An Advanced History of India : Majumder, Roychoudhury & Dutta, P. 954.

(১৫৫) '.........what are called labour-saving appliances for the production of commodities, really result in labour-starving also.'—The New Economic Menace to India ; B. C. Pal, P. 209.

(১৫৬) "The death of Tilak on 1st August, 1920, removed from Indian Politics the main and principal opponent of Gandhi's non-co-operation movement and it is significant that 'the scheme of the N. C. O. was formally inaugurated on the 1st of August', *i.e.*, the same day as witnessed the death of Tilak".—The Story of My Life, Vol. I : M. R. Jayakar, Bombay, 1958, P. 388.

(১৫৭) 'The History of Indian National Congress, Vol. I' : Dr. P. Sitaramyya, 1946, Pp. 202-03.

(১৫৮) 'The Mussalmans of India cannot remain as honourable men and followers of the Faith of the Prophet, if they do not vindicate their honour at any cost......Therefore I venture to place before you a scheme of Non-co-operation...I make bold to reiterate the statement that you can gain Swaraj in one year under my conditions by the enforcement of this Resolution'.—Quoted in 'The Story of My Life,' Vol. I ; M. R. Jayakar, P. 395.

(১৫৯) Dr. P. Sitaramyya . Op. Cit. Pp. 203-04.

(১৬০) M. R. Jayakar : Op. Cit., P. 396.

(১৬১) '...পদটির বেতন শুনিয়াছি হাজার টাকা ছিল এবং বিপিনবাবু কোনকালেই সঞ্চয়ী ছিলেন না। তথাপি চিন্তার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিবার জন্য ইস্তফা দিয়াছিলেন।' —বিবিধ প্রসঙ্গ : 'প্রবাসী', আষাঢ়, ১৩৩৯ (১৯৩২) পৃঃ ৪৩৬।

(১৬২) 'Mr. Das and his followers mustered strong at Nagpur hoping to cross swords with Mr. Gandhi once again. But through the latter's tactful handling of the situation an understanding was arrived at between him and Mr. Das...It was, therefore, possible to persuade Mr. Das to come to an agreement. When this was done, the non-co-operation resolution was ratified with practical unanimity, though Pandit Malaviya, Mrs. Besant, Mr. Jinnah and Mr. B. C. Pal remained irreconcilable'.—The Indian Struggle (1920-1934); Published for Netaji Publishing Society by Thacker, Spink & Co., Ltd., Calcutta, 1948, P. 67.

(১৬৩) 'You will eschew all such feelings in thought, deed and word, and I would repeat the promise that I made that we do not require one

year, we do not require even nine months to obtain Swarajya'.—Gandhiji's Speech quoted in 'The Story of My Life,' Vol. I' : M. R. Jayakar, P. 420.

(১৬৪) 'Bengal Provincial Conference' : A. B. Patrika, March 26, 1921.

(১৬৫) 'দেশবন্ধু-স্মৃতি.' : শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত. কলিকাতা ১৩৩৩, পৃঃ ২৬৩।

(১৬৬) 'He was perhaps the first national leader to demand a clear definition of Swaraj'.—'Life and Work of Lal, Bal and Pal' ; Dr. P. D. Saggi, New Delhi, 1962, P. 248.

(১৬৭) "But uptil now they had not been able to understand the real meaning and significance of Swaraj......And this required 'tapasya' or culture of the soul. It needed deep meditation, it could not come from any outside scheme of Swaraj.···Let them not, therefore, now add qualifying phrases such as 'democratic' or 'autocratic'—to their ideal of Swaraj. It was no good to indulge in logical quibblings .now about the form of Swaraj".—'B. P. Conference : C. R. Das's eloquent speech', A. B. Patrika, March 29, 1921.

(১৬৮) '...They must stand alone in the world ; they must rely on their ownselves, and on none else'.—Ibid, A. B. Patrika, March 29, 1921.

(১৬৯) 'Democratic Swaraj' : Presidential Address., Bengal Provincial Conference, Barisal, 1921, Published by Suresh Chandra Deb, Pp. 44-45.

(১৭০) বিস্তৃত আলোচনা 'লাল-বাল-পাল' শীর্ষক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(১৭১) 'সত্যের আহ্বান' (১৩ই ভাদ্র, ১৩২৮ : আগষ্ট, ১৯২১ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে পঠিত) : কালান্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৫৫, পৃঃ ২০৩-০৪।

(১৭২) ঐ পৃঃ ২০৬।

(১৭৩) 'সমস্যা'. ১৩৩০ (১৯২৩) কালান্তর, পৃঃ ২২৮।

(১৭৪) 'You wanted magic. I tried to give you logic. But logic is in bad odour when the popular mind is excited. You wanted Mantram. I am no Rishi and cannot give Mantrams. I am an ordinary mortal who has all his life been beating his music out, sometimes stumbling upon truth, sometimes arriving at it through tedious process of introspections and circumstances, sometimes perhaps grouping in half-truth or deceived by falsehood owing to the limitations of my intellect and education. But I have never spoken a half-truth when I have known the truth. I have never tried to lead people in faith blind-

folded...I never expected that all of you will agree with everything I said. Such agreement is neither possible nor desirable...But I never dreamt that there would be protest against my presentation of Swaraj. This protest coming from one who is the leader of the present movement in Bengal has given me the greatest surprise in my life...I for one have no option but to part company with them. Conscience demands this practical protest against a tendency which I believe to be fatal to our future.'—'President's Closing Address' : A. B. Patrika, March 30, 1921.

(১৭৫) 'Did the agonised appeals wrung out of the heart of a devote react on the Lord of Destruction ? The people who had senselessly pulled down their idol are being pursued by the fury of his wrath and afflicted from all sides'.—Bipin Chandra Pal : Chapala Kanta Bhattacharjee : 'Hindusthan Standard,' May 20, 1941.

(১৭৬) 'To India he was a public man. To me for twenty years he had been almost a brother or a son, my friend private and loyal associate in public life......The public for the last five years have known me as a relentless critic and an untiring opponent of his public utterances and policies. But they do not know that when I felt called upon to write most bitterly against him, I almost literally dipped my pen in heart's blood. Memories of twenty years' association and co-partnership in public life come rushing to my mind this evening that render any estimate of his personality and character absolutely impossible just now...'—'A Tribute' : Bipin Chandra Pal—'The Bengalee', June 17, 1925.

(১৭৭) বিপিনচন্দ্রের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন পাল কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ (১৪.১০.৬৯) ।

(১৭৮) A. B. Patrika, November 25, 1923.

(১৭৯) The Calcutta Gazette, November 28, 1923 (Pt. I), P. 1817.

(১৮০) A Personal Narrative by Bipin Chandra Pal : The Indian Legislative Assembly (The Delhi Session, February & March, 1924) published by Jnananjan Pal, M A., Bhowanipore, Calcutta, P. V.

(১৮১) 'The Swarajist Policy of Obstruction' and 'Independent Nationalist' ; Ibid, Pp. VI-VII & PP. VIII to XI.

(১৮২) 'A Personal Narrative' by Bipin Chandra Pal : Ibid, P. I-IV.

(১৮৩) 'Reconcile the Imperial connection with the demand for full national sovereignty of the people of India......Let us come to some honourable understanding, honourable to us consistent with our self-respect and our spirit of freedom and your safety'.—Pal's Speech at the Legislative Assembly, Delhi ; Ibid, P. 83.

(১৮৪) 'Amalgamation of Indian Territorial Force with Auxilliary Force' ; 'Provision of Conveniences for Indian Rly. Passengers' ; 'Grievances of Sikh Community' ; 'Obscene Publication'—Ibid, Pp. 85-103.

(১৮৫) 'Bipin Chandra Pal' : Studies in the Bengal Renaissance, Jadavpore, 1958, P. 578.

(১৮৬) 'Our Indian Patriarchs' : The History of Indian National Congress, Vol. I by Dr. P. Sitaramayya, 1946, P. 110.

(১৮৭) বিপিনচন্দ্র পাল জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তিকা, ১৯৫৮, পৃঃ ১৪।

(১৮৮) 'অভিভাষণ'—বিপিনচন্দ্র পাল : কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ : ১৯২৯।

(১৮৯) 'The Murder that failed' ; The Moral Issue ; Hindu (English Supplement), 27th Feb., 1932.

(১৯০) 'And I am so determinedly opposed to the Gandhi cult and campaign, because it seeks to replace the present Govt. by no Govt. or possibly by the priestly autocracy of Mahatma...'—Hindu (English Supplement), 5th March, 1932.

(১৯১) হিন্দু (সহ-সম্পাদকীয় মন্তব্য), ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ : ২৮শে মে, ১৯৩২।

(১৯২) 'Here is no complaint in these letters, for Bipin Chandra Pal was above all petty resentments, but there is grief that one who had given his all to serve India should be denied in the maturity of his views the opening to serve India further by men who had learned all they knew of the deeper purport of nationalism from his voice and pen'.—'Democracy's Ingratitude' : 'The Statesman (Editorial), May 22, 1932.

(১৯৩) A. B. Patrika, May, 1932, P. 5 এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন পাল প্রদত্ত বিবরণ (২৬. ৫. ৬৮) দ্রষ্টব্য।

(১৯৪) 'Dr. Stockman. (Gathers them round him and says confidentially) : It is this, let me tell you—that the strongest man in the world is he who stands most alone'—'An Enemy of the People', Act V, Henrick

Ibsen : Eleven Plays of Ibsen, The Modern Library. New York, P. 172.

(১৯৫) Studies in the Bengal Renaissance ; Jadavpur, 1958, P. 580.

(১৯৬) 'C. R. Das's Eloquent Speech', B. P. Conference, Barisal, March 26, 1921 ; A. B. Patrika, March 29, 1921.

(১৯৭) 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' : কালান্তর,—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৫৫, পৃঃ ৩৪১-৪২ ।

(১৯৮) রাষ্ট্রনীতি : বিপিনচন্দ্র পাল, ১৩৬৩, পৃঃ ১ ।

(১৯৯) 'স্বদেশী বা জাতীয়তা'—রাষ্ট্রনীতি : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ৫৮

(২০০) '...He (God) divided Humanity into distinct groups upon the face of our globe, and thus planted the seeds of nations....O my Brothers love your Country...our country is our field of labour ; the products of our activity must go forth from it for the benefit of the whole earth... your country is the token of the mission which God has given you to fulfil in Humanity.—'The Duties of Man' : Joseph Mazzini (Quoted in 'the Future of Democracy and Other Essays' by D. N. Benerjee, 1953, Pp. 87-88).

(২০১) 'স্বাধীনতার আদর্শ'—রাষ্ট্রনীতি : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ১৩ ।

(২০২) 'He was the apostle of nationality simply because he was the apostle of humanity.'—'The History of Political Science from Plato to the Present' : Rev. Dr. Robert Murrey. 1926, p. 366.

(২০৩) "The State also is an end in itself. It is not only the highest expression to which the spirit has yet attained, it is the final embodiment of spirit on earth. There can thus be no spiritual evolution beyond the State, any more than there can be any physical evolusion beyond man".—'The State as Organism'—Political Thought : C. L. Waper, 1965, P. 163.

(২০৪) "Now for Hegel, the State is a form of the absolute spirit, which is the essence of all things. 'The State is the divine idea as it exists on earth.' "—"The Metaphysical Theory of the State' : L. T. Hobhouse, London, 1951, P. 20.

(২০৫) 'রাষ্ট্রনীতি'—'রাষ্ট্রনীতি' : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ১২ ।

(২০৬) 'রাষ্ট্রনীতি'—রাষ্ট্রনীতি—বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ৮ ।

(২০৭) 'In his theory of the freedom of the will lies the key to the Hegelian theory of the State, of morality and of law. ......The underlying

principle is that freedom consists not in the negative condition of absence of constraint but in the positive fact of self-determination". L. T. Hobhouse. Op. Cit, P. 33.

(২০৮) 'The empire idea is essentially larger and broader than the nation-idea. It aims at the unification of widely separated territories, of widely divergent interests, of widely different cultures and characters into one organic whole......Nationality and Empire ; B. C. Pal, 1916, Pp. 6-7.

(২০৯) '...finally empires must be judged and justified by their capacity to work out the universal federation of mankind'.—Ibid, p. 7.

(২১০) 'The Empire-Idea is a great idea, but the Federal Idea is greater. It reconciles the absolute autonomy of its members with the perfected unity of the whole'.—Ibid, Introduction, P. X.

(২১১) Nationality and Empire, Introduction, P. XII.

(২১২) Ibid, P. XII.

(২১৩) '...It is a game of chess in international politics. It is a game of chess in national politics also. And what a fool is he who setting down to play a game of chess with a powerful, astute and far-sighted opponent can foresee and forestall every move that he makes without knowing the move of the other party ! Our move shall be determined by their move'. Swadeshi and Swaraj—B. C. Pal, P. 206.

(২১৪) Nationality and Empire. Introduction, P. VIII

(২১৫) মিষ্টার গোখেলের এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ বক্তৃতার প্রসঙ্গের উল্লেখের জন্য বিপিনচন্দ্রের 'Swadeshi and Swaraj' গ্রন্থে বিধৃত 'The Gospel of Swaraj' (মাদ্রাজ বক্তৃতা ১৯০৭) প্রবন্ধ পৃঃ ১৬১-১৬৭ দ্রষ্টব্য।

(২১৬) Ibid, Pp. VIII-IX.

(২১৭) 'In a nation the individuals composing it stand in an organic relation to one another and to the whole of which they are limbs and organs. A crowd is a collection of individuals : a nation is an organism, the individuals are its organs. Organs find the fulfilment of their ends, not in themselves but in the collective life of the organism to which they belong. Kill the organism—the organs cease to be and act...Organs evolve, organs change, but the organism remains itself all the same. Individuals are born and individuals die, but the nation liveth for.' —Bande Mataram, July 26, 1906.

(২১৮) "......'every man shall be free to do what he wills, provided he infringes not the equal freedom of any other man" ; H. Spencer, Quoted in 'A History of Political Theories (From Rousseau to Spencer)' : W. A, Dunning, Allahabad, 1966, P. 399.

(২১৯) 'That all men are created equal that they are endowed by their creator with certain inalienable rights,...that to secure these rights, governments are instituted among men...'—Declaration of the American War of Independence.

(২২০) '...men are born and remain free and equal in rights,...the end of all political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man'.—Declaration of the Rights of Man and of Citizen (1789). Quoted from 'Essays in Social Theory' : G. D. H. Cole, London, 1950, Pp. 139-40.

(২২১) '...whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world : ...the General Assembly proclaims the declaration of Human Rights, as a common standard of achievement for all peoples and all nations'.—Universal Declaration of Human Rights : U. N. O.

(২২২) 'আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ : বিপিনচন্দ্র পাল, নব্য ভারত : জৈষ্ঠ, ১৩২৯ (১৯২২)।

(২২৩) '...the right of the individual runs through Green's entire argument. For Green, each man has to attain his own good, realize his own perfection as an integral part of the common good'.—L. T. Hobhouse, Op. Cit., P. 118.

(২২৪) 'ধর্মতত্ত্ব' (চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়—স্বদেশপ্রীতি), বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ. ১৩৬৬, পৃঃ ৬৬১।

(২২৫) We dedicate this day to that Patriotism which finds its fulfilment in Humanity. We dedicate it also to that Humanity which is only eternal revelation of God to man.

Blessed is the perfected life of the individual. Blessed is that larger and diviner life of the nation wherein the individual finds his highest fulfilment, and blessed, thrice blessed, is that Universal Life of Humanity wherein is the fulfilment and fruition of all national life and aspirations'.—Swadeshi and Swaraj : B. C. Pal, P. 278.

(২২৬) 'স্বদেশী বা জাতীয়তা'—রাষ্ট্রনীতি : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ৫৫-৫৬।

(২২৭) 'আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ' : বিপিনচন্দ্র পাল, নব্য ভারত—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯, ১৯২২।

(২২৮) 'আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ' : বিপিনচন্দ্র পাল, নব্য ভারত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯।

(২২৯) 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' : নেপাল মজুমদার, ১ম খণ্ড, ১৯৬১, পৃঃ ৪৫-৪৬।

(২৩০) ঐ ঐ পৃঃ ৪৬।

(২৩১) The History of Indian National Congress : P. Sitaramayya, Vol. I 1946, P. 84.

(২৩২) Swadeshi & Swaraj : B. C. Pal, P. 223.

(২৩৩) 'সাহিত্য ও সাধনা' : বিপিনচন্দ্র পাল, ১ম খণ্ড, ১৯৫৯, পৃ: ১২৯-৩০।

(২৩৪) ঐ ঐ পৃ: ১৩৬।

(২৩৫) 'The World Situation and Ourselves' : B. C. Pal 1919, Pp. 61-62.

(২৩৬) 'নবযুগের বাংলা' : বিপিন চন্দ্র পাল, ১৯৬৪, পৃঃ ১২৭-২৮

(২৩৭) এ প্রসঙ্গে ১৮০৭-০৮ শকাব্দে (১৮৮৫-৮৬) 'আলোচনা' নামীয় মাসিক পত্রে প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের 'সমাজ-শক্তি' ও 'সাম্য ও অনুপাত' শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টি (২য় খণ্ড : পৃঃ ৩-১৫ এবং ৫৯-৬৫) দ্রষ্টব্য।

(২৩৮) 'What is Bolshevism' ?—The World Situation and Ourselves : B. C. Pal, 1919, P. 21

(২৩৯) 'তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে। এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে,...'—'ভারত—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ'—পরিব্রাজক : স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (জন্মশতস্মরণে), ষষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৮২।

(২৪০) '...it is no longer with the so-called upper middle classes—it is no longer with the merchants and traders—no longer with the creators of industries—no longer with the masters of works that the future of the world lies. The new proletariat—this Leviathan is rising—awaking—shaking its limbs after centuries of torpor, after centuries of oppression, of patient suffering of the deprivation of their natural rights by the exploiters of their muscles, by the exploiters of their brains'.—The

Leviathan is rising'—The World Situation and Ourselves ; B. C. Pal, 1919, P. 24.

(২৪১) 'রাষ্ট্রনীতি' : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ৯২।

(২৪২) 'নবযুগের বাংলা' : বিপিনচন্দ্র পাল, ১৯৬৪, পৃঃ ২১৪।

(২৪৩) নবযুগের বাংলা : বিপিনচন্দ্র পাল, ১৯৬৪. পৃঃ ২১৭।

(২৪৪) 'বিপিনচন্দ্র পাল'—বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা : সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৬৮, পৃঃ ২০৬।

(২৪৫) 'Pal appeared to be bewildered by the extremely contradictory tendencies of his own ideas. Bourgeois radicalism .coupled with religious reformism rendered his political vision rather foggy...His pathetic desire for the imperial connection, in itself, was but a sign of subjective weakness ,...but this desire originated in a hidden mistrust of all those ideals cherished by orthodox nationalism'.—'India in Transition ;' Manabendra Nath Roy, pp. 199-200.

(২৪৬) 'He was the harbinger of the idea of Universal Humanism. Though Voltaire and Volney had a glimpse of the rising sun of Humanism, ...theirs was a militant Humanism as opposed to the Raja's synthetic and universalistic point of view'.—Rammohan Roy by Dr. Brajendra Nath Seal, 1959, P. 33.

(২৪৭) 'ধর্মতত্ত্ব, চতুর্বিংশতিতম অধ্যায় (স্বদেশ-প্রীতি) : বঙ্কিমচন্দ্র—'বঙ্কিম-রচনাবলী', ২য় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ, ১৩৬৬, পৃঃ ৬৬০।

(২৪৮) নবযুগের বাংলা পৃঃ ২৩৫।

(২৪৯) বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ, পৃঃ ৬৬১।

(২৫০) বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ, পৃঃ ৬৬১।

(২৫১) Character Sketches : B. C. Pal, 1957, P. 116.

(২৫২) 'পাশ্চাত্য গণতন্ত্রতা'—রাষ্ট্রনীতি, পৃঃ ৩৩

(২৫৩) 'গরীবের আকাঙ্ক্ষা'—রাষ্ট্রনীতি, পৃঃ ৮৯।

(২৫৪) 'রুমের বাদশাহ্ ও ভারতের মুসলমানসমাজ'—বিজয়া, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ (১৯১২)। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে 'Hindu Review' পত্রিকায় প্রকাশিত 'PAN-ISLAMISM' (An erroneous estimate) শিরোনামীয় প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

(২৫৫) 'In this view, we regard the Shivaji celebrations as much of a sacrament of national life, as we shall regard Akbar celebrations when these will be instituted among us'—New India, 8th April, 1905 Vide 'Swadeshi & Swaraj' : B. C. Pal, P. 17.

পঞ্চম অধ্যায়

অন্তর্জীবন—সাহিত্য ও সাধনা

(Celestial Fire)

"আমার লেখাতে ও বলাতে সর্বদাই আমি নিজেকে শিষ্যরূপে দেখিয়াছি। গুরু যে কে, তাহা ভালো করিয়া ধরিতে পারি নাই। তবে ইহা অসংখ্যবার উপলব্ধি করিয়াছি যে কে যেন অন্তরঙ্গ হইতে, আমার লেখনী বা রসনাকে অবলম্বন করিয়া আমাকে অনেক অদ্ভুত সত্য শিক্ষা দিতেছেন। এজন্য লোকে যাহাকে আমার রচনা বা আমার উক্তি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আমি নিজেই চমকিত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি এবং নিজের লেখা পড়িতে পড়িতে নিজেই কত সময় বিস্ময়ে, আনন্দে ভগবৎ-কৃপা ও ভগবৎ-প্রেরণা প্রত্যক্ষ করিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি"।[১]

অন্তর্লোকের এই অদৃশ্য প্রেরণা-শক্তি,—রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যে যিনি 'অন্তর্যামী' বা 'জীবনদেবতা' নামে বন্দিত,[২] এই শক্তিই বিপিনচন্দ্র পালের কর্মজীবন এবং মর্মজীবন, এককথায় সমগ্র জীবনচর্যার নেপথ্যে বিদ্যমান থেকে তাঁকে আত্মপ্রকাশের আগ্রহে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে।

বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিপিনচন্দ্র কর্মজীবনে ছিলেন—বাগ্মী, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ এবং সাংবাদিক, আর মর্মজীবনে ছিলেন—দার্শনিক এবং সাহিত্যিক। তাঁর ব্যক্তিত্বের বহুমুখিতা তাঁর বক্তৃতা ও রচনার ভিতর দিয়ে অহরহ আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। তিনি বলেছেন— '...আমি কোন গভীর চিন্তাই মনে মনে করিতে পারি না। প্রকাশের প্রয়াসেই আমার চিন্তা পরিস্ফুট হয়, অভিব্যক্তির চেষ্টাতেই আমার অন্তরের ভাব বিকশিত হইয়া উঠে।...এই-জন্যই লেখা ও বলা আমার প্রকৃতিগত হইয়া আছে'।[৩] এই 'প্রকাশের প্রয়াস' এবং 'অভিব্যক্তির চেষ্টা'ই তাঁর আগ্রহকে বিচিত্র ক্ষেত্রের অভিমুখী করে তুলেছে। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর সমকালীন অন্য কোনো দেশনেতা রাষ্ট্রনীতি-চর্চায় ব্যাপৃত থেকেও এমন বিপুল বিচিত্র রচনাসম্ভার রেখে যেতে পারেননি, যা' দার্শনিক মননে এবং সাহিত্যসুলভ রসানুভূতিতে উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যিক আগ্রহ তাঁর জীবনে এক আকস্মিক খেয়াল মাত্র ছিল না। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর আগ্রহ এদিকে সক্রিয়ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। সে কথা

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তবে নিত্য নবীন মৌলিক সৃষ্টির অবদানে বাংলা-সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তোলবার বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রেরণাতে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন—একথা বলা যায় না। রাজনীতি ও সাংবাদিকতা চর্চার অবসরে, কখনও বা রাজনীতি বা সাংবাদিকতা চর্চার প্রয়োজনেই লেখনী ধারণ করেছেন। কিন্তু অন্তরঙ্গ রসবোধ এবং সাহিত্যপ্রাণতার গুণে তাঁর অনেক সাময়িক বিষয়ক লেখাও সাময়িকতাকে অতিক্রম করে সাহিত্যের শাশ্বতধর্মে অভিষিক্ত হয়ে সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে।

বিপিনচন্দ্রের সাহিত্য-চর্চার নেপথ্য প্রেরণা-উৎস ছিল—ধর্মপ্রাণতা, সমাজ-চেতনা, এবং স্বাদেশিকতার সাধনা। এজন্য তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বকে কলা-কৈবল্যবাদীদের দলভুক্ত করা যায় না ; বরং উনিশ শতকে সর্বাঙ্গীণ সমাজ-সংস্কারের বাসনা থেকে যে নব্য সাহিত্যধারার উদ্ভব ঘটে, বিপিনচন্দ্রের সাহিত্য-কৃতিকে সেই সাহিত্য-ধারার অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারীরূপে চিহ্নিত করাই যুক্তি-সঙ্গত। বঙ্কিম-যুগে নব্য লেখকরূপে আবির্ভূত বিপিনচন্দ্র সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত সাহিত্যনীতি-বিষয়ক তৃতীয় সূত্রটির তাৎপর্য অঙ্গীকার করেই লেখনী ধারণ করেছিলেন : 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।'[৪] 'সৌন্দর্য সৃষ্টি' যা'ই হোক্, 'দেশের বা মনুষ্য-জাতির কিছু মঙ্গলসাধন' যে তাঁর লেখার নেপথ্য প্রেরণা ছিল,—একথা অনস্বীকার্য।

উপন্যাস, গল্প, কবিতা, গান প্রভৃতি সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে পদচারণা করলেও বিপিনচন্দ্রের যে সাহিত্য-কৃতি সর্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য,—তা' হচ্ছে তাঁর 'প্রবন্ধ-সাহিত্য'। প্রবন্ধকাররূপেই তিনি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসনের অধিকারী হবার যোগ্য। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার পরিধি কত বিস্তৃত ছিল, তাঁর প্রবন্ধের বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই তা' স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিপিনচন্দ্রের অধিকাংশ বাংলা লেখাই স্বনামে প্রকাশিত। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে তিনি, যে কোনো কারণেই হোক, ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। বিপিনচন্দ্র-ব্যবহৃত ছদ্মনামগুলি হচ্ছে : (১) শ্রীপ্রেমদাস বাবাজী, (২) হরিদাস ভারতী, (৩) 'শ্রীঃ' এবং (৪) বিলাত-ফেরত।

বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীকে বিষয়ানুসারে এইভাবে শ্রেণী-বিন্যস্ত করা যেতে পারে : (ক) ধর্ম ও দর্শন, (খ) সমাজতত্ত্ব ও সমাজনীতি, (গ) রাষ্ট্রদর্শন ও রাজনীতি, (ঘ) সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যসমালোচনা, (ঙ) চরিত-সাহিত্য, (চ) আত্মকথা এবং (ছ) বিবিধ।

ধর্ম ও দর্শন :

বিপিনচন্দ্র-রচিত নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি 'ধর্ম ও দর্শন' পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য : [৫]

ধর্ম ও অধর্ম ; ধর্মসাধনে সুশাস্ত্র ; ধর্মের কথা ; ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের ভবিষ্যৎ ; হিন্দুর ধর্ম ; হিন্দুধর্মের সার্বজনীনতা ; হিন্দুধর্মের বিচিত্রতা ; হিন্দুধর্মের বহুমুখীনতা ; নবজীবন ; বর্তমান হিন্দুধর্মের দেববাদ ও দেবোপাসনা ; বাঙালীর প্রতিমা-পূজা ও দুর্গোৎসব ; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ; শ্রীকৃষ্ণ ; আমি (দেহতত্ত্ব) ; আমি (প্রাণতত্ত্ব) ; ভক্তিতত্ত্ব ; কর্মযোগ ; যৌবনের টানে ; জয় রাধে গোবিন্দ, বল রাধে গোবিন্দ ; ভগবদ্গীতা ; ব্রহ্মসঙ্গীতে ব্রহ্মতত্ত্ব ; সাকার ও নিরাকার ; খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব ; অবতারবাদ ও সাকারবাদ ; স্বরূপোপাসনা, সম্পদুপাসনা ও প্রতীকোপাসনা ; প্রাণের কথা ; নিজের কথা ; জীবনের হিসাব-নিকাশ ; আভাস ও আকাঙ্ক্ষা ; ভক্তিসাধন (মার্কিন সাধু থিওডোর পার্কারের উপদেশাবলীর বাংলা ভাবানুবাদ—গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)

উপরি-উক্ত বাংলা প্রবন্ধগুলি ব্যতীত বিপিনচন্দ্রের 'দি সোল অব্ ইণ্ডিয়া,' 'দি স্টাডি অব্ হিন্দুয়িজম্' এবং 'শ্রীকৃষ্ণ',—এই ইংরেজী গ্রন্থত্রয়ও অংশতঃ এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির দাবি রাখে।

ভারতের তৎকালীন জাতীয় নেতাদের মধ্যে একমাত্র বিপিনচন্দ্রই ছিলেন ইউরোপের শিক্ষাগুরু গ্রীকদের মতোই রাষ্ট্রমনস্ক ব্যক্তি। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যেমন আদর্শ রাষ্ট্রগঠনের উদ্দেশ্যে আদর্শ মানব-চরিত্রের সন্ধানে ব্যাপৃত হন এবং ক্রমে ন্যায়-অন্যায়, সদসৎ বিচারের মাধ্যমে মানব-জীবনের তাৎপর্যের গভীরে প্রবেশ করেন, বিপিনচন্দ্রও তেমনিভাবে ধর্ম ও দর্শনের প্রত্যয় ও ভাবনাসমূহের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। তাঁর পূর্বেই রামমোহনের কাল থেকে এ বিষয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছিল এবং কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ এই চিন্তাচর্যাকে

নব্য যুগের লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত করেন। এঁদের সকলেরই যুক্তিবিশ্বাসের মূলে অফুরান রসের জোগান দিয়েছিল ভারতের সুপ্রাচীনকালের আরণ্যক সভ্যতার ধর্মদেশনার নির্ঝর। বিপিনচন্দ্রও এই নির্ঝর ধারায় স্নাত হয়েছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতের মৌল ধর্ম-জিজ্ঞাসার সূত্র উল্লেখ করেই আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ [৬]

প্রাচীন ভারতের ঋষি লক্ষ্য করেছিলেন—'এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ, সূর্য্য এষ, পর্জন্যোমঘবনেষ, বায়ুরেষ, পৃথিবীরয়িদৈবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ।' অর্থাৎ কে এই প্রাণ সৃষ্টি করেছেন, তার সুস্পষ্ট সন্দেহাতীত উত্তর না মিললেও ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন—'এই প্রাণই অগ্নির মতো প্রদীপ্ত হন, ইনিই সূর্য, ইনিই পর্জন্য, মঘবন, ইনিই বায়ু, ইনিই পৃথিবী,—ইনিই বিশ্বের উপাদান—রয়ি, এই প্রাণদেবতাই সূক্ষ্ম ও স্থূল, নিত্য ও অনিত্য যাহা কিছু তৎসমুদয়'।[৭]

সৃষ্টিরহস্য এবং প্রাণরহস্য জিজ্ঞাসাই প্রাচীন ভারতে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার জন্ম দেয় এবং বেদান্তে মানব-মনীষার চূড়ান্ত সাধ্যরূপে সিদ্ধান্ত আকারে তা' ব্যক্ত হয়েছে। বিপিনচন্দ্র এইসব সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন। উপনিষদে যে তিন নিত্যতত্ত্ব—প্রকৃতি, জীবাত্মা, পরমাত্মা—প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা স্বীকার করে উপনিষদের ঋষিবাক্য—'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ' ইত্যাদি উল্লেখ করে তিনি বলেন—'এ সকল কথা জীবনের অতিশয় অন্তরঙ্গ কথা। তার চিত্র কোন পটে উঠে না।..... সে গভীর আত্মতত্ত্ব, যেখানে জীব-ব্রহ্ম একীভূত হইয়া বাস করিতেছেন, সে আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রকাশ করে—তাহা বর্ণনা করে সাধ্য কার? প্রাকৃতজনের তাহা সাধ্যাতীত।' সুতরাং বিপিনচন্দ্র বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গে বিচরণে ব্যস্ত হননি। তিনি বলেন—'কিন্তু জীবন যাহাকে বলি, তাহা এই গভীর আত্মতত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাহার বাহিরে, তাহার বহিরঙ্গরূপেই বিরাজ করে। কেবল ইহারই চিত্রাঙ্কন, ইহারই বর্ণনা, ইহারই প্রতিকৃতির অভিব্যক্তি সম্ভবপর।' ব্যাপারটি আরও পরিস্ফুট করবার উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন—

'আর আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এই জীব-ভগবানের নিত্যলীলা নিয়ত অভিনীত হইতেছে। এইখানেই এই বিচ্ছিন্ন জীবনের একত্ব ও প্রতিষ্ঠা। ঐ লীলাতেই জীবনের বিবিধ সম্বন্ধ সকলের উৎপত্তি ও পরিণতি। ঐ নিত্য তুরীয়ধামে যে প্রেমের, জ্ঞানের, পুণ্যের আদান-প্রদান নিয়ত চলিতেছে, তারই বহিঃপ্রকাশ ও উপরিস্থ বুদ্বুদের ন্যায় আমাদের জীবনের জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যাদি ফুটিয়া উঠিতেছে .....এ অন্তরঙ্গ লীলাতত্ত্ব ভাষায় প্রকাশ হয় না; ব্যক্ত করিবার প্রয়াসেই বোধহয় তাহা লঘু হইয়া পড়ে। সে নিত্য বৈকুণ্ঠধামে ভক্তি-বলেই ভক্তেরা প্রবেশ করিয়া থাকেন।' এইজন্য বিপিনচন্দ্র ধর্ম-দর্শন-চর্যায় ভক্তিমার্গের সাধক হয়েছেন। তাঁর 'দি স্টাডি অব হিন্দুয়িজম্' এবং 'দি সোল অব্ ইণ্ডিয়া' দু'খানি গ্রন্থেই আদর্শ-বাণী হিসাবে তিনি চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি রামানন্দের উক্তির অংশ উদ্ধৃত করেছেন :

ইহা আমি কিছুই না জানি
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী।
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকপাঠ
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ?
হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী
কি কহিব ভালমন্দ কিছুই না জানি।

অথচ বিপিনচন্দ্র বিশেষভাবেই যুক্তিবাদী ছিলেন। বহির্জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে—রাজনীতি, সমাজনীতির আলোচনায় যুক্তির সীমা লঙ্ঘন করা তাঁর অনভিপ্রেত ছিল। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ অবশ্যই যুক্তির সীমায় আবদ্ধ হতে পারে, অতএব এক্ষেত্রে যুক্তির আশ্রয় ত্যাগ করা অনুচিত বলেই তিনি মনে করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ম্যাজিক নয়, লজিকের পক্ষপাতী। কিন্তু যুক্তিবাদী ছিলেন বলেই তিনি যুক্তির সীমা এবং প্রয়োগক্ষেত্র কোথায় তা' সবিশেষ জানতেন। তিনি বলেছেন—'ভগবানের সর্ববিধ নিকৃষ্ট প্রকৃতি মধ্যে আমাদের মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এ সকল অন্যতম। এ সকল অপরা-প্রকৃতি। অন্যা পরা-প্রকৃতি তাঁর আছে, তাহাই জীবাত্মা।...অহঙ্কার-তত্ত্ব পর্যন্ত মায়াধীন, প্রকৃত জীবতত্ত্ব মায়াতীত। এইজন্যই শ্রুতিতে জীবের মুক্তিকে নিত্য সিদ্ধাবস্থা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তি জন্য-বস্তু নহে।'

মুক্তি-কামনায় এই কারণেই বিপিনচন্দ্র ইন্দ্রিয়-সীমায় পরিমিত যুক্তির লগুড় ত্যাগ করে ভক্তির প্রবাশ্রয়ী হয়েছেন। অমনোযোগী পাঠকের মনে হতে পারে যে বিপিনচন্দ্রের মন এবং বুদ্ধি দ্বিধাগ্রস্ত ছিল! যুক্তির সঙ্গ ত্যাগ করে তিনি শুধু বিশ্বাসের দাস হয়েছেন। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু বিপরীত। বিস্তারিত আলোচনায় তিনি বলেছেন—'সংসারের যে সকল সম্বন্ধ আমাদিগকে আবদ্ধ করিতেছে, এই সকল বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য, মাধুর্যের কি কোন অর্থ নাই? জন্ম-মরণের অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যেই কি এ সকল সম্বন্ধের খেলা ফুরাইয়া যায়? তবে এ শোক, এ ক্রন্দন, এ নিরাশাই তো জীবের চিরবিহিত নিয়তি। সংসারের তবে কি অর্থ রহিল? এই যে অতৃপ্ত বাসনা, ইহারই বা সার্থকতা হইল কোথায়? এই যে অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা, এই যে চির-জ্বলন্ত প্রেমলিপ্সা, এই যে আত্যন্তিক সেবা-প্রবৃত্তি, এই যে অতুল-অতৃপ্ত করুণা—যাহা সংসারে কেবলমাত্র উদ্রিক্ত হয়, কিন্তু কদাপি পরিতৃপ্ত হয় না, হইতে পারে না, ইহার কি কোনই অর্থ নাই? যদি না থাকে, তবে সংসারের কোনই সার্থকতা কল্পনা করাও সম্ভব হয় না, জ্ঞান-ধারণা তো দূরের কথা। তাহা হইলে এ সংসার কোন একান্ত ক্রূরমতি ব্যক্তির খেলারূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়।······আর এই সংসার-চক্রের পশ্চাতে, ইহার উদ্ভব, ইহার আশ্রয়, ইহার প্রেরণা ও ইহার পরিণতি-রূপে এক নিত্য, তুরীয়, অপ্রাকৃত লীলারঙ্গের প্রতিষ্ঠা কর, দেখিবে সকলই সত্য ও সার্থক হইয়া উঠে।'[৮] অর্থাৎ জ্ঞানই আমাদের যুক্তির সঙ্কীর্ণ সীমার পারবর্তী ভক্তির অনন্ত বিস্তৃত অঙ্গনে পৌঁছে দেয়। যুক্তিই আমাদের ভক্তিমুখী করে। বিপিনচন্দ্রের মতে—'জ্ঞানই বুদ্ধিগত ভক্তি। জ্ঞানের দ্বারা মানব-বুদ্ধিতে বিধিনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, বুদ্ধির বিভিন্ন শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় এবং পরস্পরের সঙ্গে ও সমুদায় মনের সঙ্গে তাহাদের যথাবিহিত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়।'[৯]

পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞান-চর্চার সমূহ প্রসার হলে দর্শন ও ধর্মবিচারের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানসম্মত বিচার-পদ্ধতি অনুসৃত হতে থাকে এবং স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি (থিসিস্-য়্যান্টিথিসিস্-সিন্থেসিস্) এই ন্যায়ক্রমে সিদ্ধ এক ভাববাদী দর্শন-চিন্তার প্রাদুর্ভাব হয়। অপরদিকে বস্তুবাদী বা জড়দর্শনও এই নব্য বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতেই যুক্তিজাল বিস্তার করতে থাকে। কাণ্ট, হেগেল, বার্কলে, স্পেনসার, হিউম প্রমুখ দার্শনিকদের দ্বান্দ্বিক যুক্তিপদ্ধতি ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে

বাংলাদেশেও পরিচিত হতে এবং প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ম্যাক্সমূলর বেদগ্রন্থগুলির অনুবাদ করেন এবং উইলিয়ম জোনস, কোলব্রুক, হোরেস হেম্যান উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতেরা হিন্দুর ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিস্তারিত আলোচনা করেন। খৃষ্টধর্ম-প্রচারকেরাও অনুরূপভাবে তুলনামূলক ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুরাগী বিপিনচন্দ্রও এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো তিনিও তুলনা-মূলক ধর্মতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে স্বল্পপরিসরে আপন বক্তব্য স্পষ্ট করে তোলেন।

প্রখ্যাত লেখক টেইন সাহেব ইংরেজী সাহিত্যের রচনাকালে লক্ষ্য করেছেন যে, বংশগতি, পরিবেশ এবং যুগপ্রভাব দ্বারা কোনো জাতি ও দেশের সাহিত্যের প্রকৃতি বহুলাংশে নিয়মিত হয়।[১০] বিপিনচন্দ্র টেইন সাহেব-উদ্ভাবিত সূত্রটিকে 'হেরিডিটি, এনভিরনমেণ্ট এবং ইপক' নামে উল্লেখ করে বলেছেন যে, কোনো ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রেও ঐ তিনটি উপাদানের গুরুত্ব সমান। বিশেষ বিশেষ ধর্মের বিশেষ বিশেষ রীতিনীতি, রহস্যাদিও ঐ উপাদানত্রয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।[১১] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিপিনচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনেই এই তত্ত্বের কার্যকারিতা অনেকাংশে লক্ষ্য করা যায়।

প্রবল যুক্তিবাদী বিপিনচন্দ্র অজ্ঞাবাদী (য়্যাগনষ্টিক) না হয়ে যে নিজের ব্যক্তিজীবনে ভক্তিমার্গের পথিক হয়েছিলেন, তার মূলে ছিল মুখ্যতঃ বংশগতি এবং গৌণত যুগপ্রভাব। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন—"জয় রাধে গোবিন্দ! বল রাধে গোবিন্দ! বৈষ্ণবকুলে জন্মিয়া শৈশবে সর্বদাই এই আরতিই শুনিয়াছি।...বাবা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন'।[১২] পিতৃপুরুষের সংগুপ্ত প্রভাব উনিশ শতকের শেষপাদে ভক্তিবাদী সাধনার প্রভাবের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তাঁকে ভক্তিমার্গের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। নইলে যৌবনের শিক্ষা তাঁকে অন্য পথে চালিত করতো। কারণ, তিনি বলেছেন—'শৈশবে কৃষ্ণ কাকে বলে জানি নাই। যৌবনে যখন জানিলাম, তখন তার প্রতি কোন শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল না। সে শিক্ষা পাই খৃষ্টীয়ানদের নিকটে।...দেবতা হওয়া তো দূরের কথা, মানুষ হিসাবেও তিনি ভালো লোক নন।...তবে সাহিত্যের দিক দিয়া, কাব্যের হিসাবে, তখনও কৃষ্ণকথা মিষ্টি লাগিত।'

কিন্তু বংশগত বীজ অন্তরে নিহিত থাকায় ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করা সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্র ধীরে ধীরে বৈষ্ণবসাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দীক্ষাগ্রহণ তাঁর অন্তর্জীবনে এক লক্ষণীয় পরিবর্তনের সূচনা করে—সে কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এর পর কৃষ্ণবিষয় অবলম্বনে বিপিনচন্দ্রের অনেক লেখা ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়।[১৩]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ভাবধারায় স্নাত বাঙালী মনীষীদের চিন্তায় 'কৃষ্ণকথা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। কেশবচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ রায়, কবি নবীনচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষ্ণকথা আলোচনায় এবং কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কনে ব্রতী হন। 'স্বয়ং ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণকে হাজার হাজার বৎসরের সাহিত্য-পুরাণ-ইতিহাসে যে কিংবদন্তী, যে অলৌকিকতা, যে অতিরঞ্জনের ভিড় জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া একটি পূর্ণাদর্শের মানব-চরিত্র খুঁজিয়া বাহির'[১৪] করবার ঐকান্তিক আগ্রহই ছিল এই সব মনীষীদের প্রেরণা-উৎস। এই প্রয়াসের প্রথম লক্ষ্য ছিল—কিংবদন্তীর কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে খৃষ্টান মিশনারীদের নিক্ষিপ্ত অপবাদের স্খালন। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য একক ব্যক্তি-প্রচারিত মতবদ্ধ ধর্মের (ক্রেডাল রিলিজিয়ন) মর্মকেন্দ্রে যেমন একজন দিব্য ব্যক্তিত্বের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্বীকৃত, হিন্দুধর্মের মর্মকেন্দ্রে এই ধরনের একক দিব্য ব্যক্তিত্বের অনন্যপ্রধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল না। হিন্দুধর্ম ছিল বহু মত ও বহু পথের মিলন-স্থল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভাবধারায় পরিপুষ্ট নবজাগ্রত বাঙালী মনীষা সম্ভবতঃ সেদিন হিন্দুধর্মের এই অভাব পূরণের মনোভাব নিয়েই মতবদ্ধ ধর্মসমূহের আদর্শে হিন্দুধর্মের মর্মকেন্দ্রে একক দিব্য ব্যক্তিত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান প্রমাণের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। যাই হোক্, কৃষ্ণ-বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করেন গৌরগোবিন্দ রায়।

এই আলোচনায় যে আলোকে শ্রীকৃষ্ণকে বিচারের চেষ্টা করা হয়েছে, সে আলোক যে কেশবচন্দ্র সেনের জীবন-সমুত্থিত, একথা স্বীকার করে লেখক বলেছেন—'.. ভারতের ধর্মমধ্যে এক মহাশক্তি প্রথম হইতে' কার্য করিতেছিল। এই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জনসমাজকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্য হইতে ইহার এক-একটি উপাদান বিনিঃসৃত করিল। এ সমুদয় উপাদান পরস্পর

অসংশ্লিষ্ট এবং বিচ্ছিন্নভাবে ছিল, সেই মহাশক্তি যথাসময়ে একজন ব্যক্তিকে অভ্যুদিত করিলেন, যিনি দেখিতে পাইলেন, চারিদিকে ধর্মের যে উপাদানগুলি ছড়ান আছে, তাহার কোনটিকে তিনি ছাড়িতে পারেন না, ছাড়িলে তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না।...তিনি বেদবাদী, বেদান্তবাদী, পৌরাণিক, সাংখ্য ও যোগানুসারী ব্যক্তিদিগকে দেখিলেন, তাঁহারা সর্বদা বিরোধেপ্রবৃত্ত,...তিনি মিশিতে গিয়া কোন এক দলে মিশিতে পারিলেন না। তিনি জানিলেন, আমায় আমার পথে চলিতে হইবে এবং সেই পথে সকল ভিন্ন ভিন্ন পথের মিলন হইবে। এই ব্যক্তি কে, যদি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, তাহার উত্তর, এ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ'[১৬]। গৌরগোবিন্দের চিন্তাধারায় প্রতিফলিত যুক্তি ও ভক্তি অব্যবহিত পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মনীষাকে আশ্রয় করে পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছিল।[১৭] অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ এবং নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে এক নন, হতে পারেন না; কারণ একজনের দৃষ্টি ছিল গবেষকের, আর একজনের দৃষ্টি ছিল ভক্তের। 'বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মনীষা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিয়াছেন, আর নবীনচন্দ্র তাঁহার কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও হৃদয়াবেগের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-গৌরব উপলব্ধি করিয়াছেন;...'[১৮]

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় বিপিনচন্দ্রকে বঙ্কিম-নবীন-ধারার প্রকৃত উত্তর-সূরী বলা চলে না। তাঁর কৃষ্ণ-বিষয়ক আলোচনায় যুক্তির অবতারণা থাকলেও এই ব্যাপারে তিনি মুখ্যত বৈষ্ণব ভক্তিমার্গের পথিক। 'দি সোল অব্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে তিনি নানা তথ্যের উল্লেখ করে যুক্তিবাদীর মতো প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছেন যে—'ইউরোপ ও আমেরিকার আত্মা যেমন খৃষ্ট, ভারতের আত্মা হচ্ছেন তেমন শ্রীকৃষ্ণ।'[১৯] 'শ্রীকৃষ্ণ' নামধেয় ইংরেজী গ্রন্থে অবতারতত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে হিন্দুর চিন্তায় অবতারবাদের স্বরূপের বিশদ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন যে, ঈশ্বরের প্রাণশক্তি, আলোক-শক্তি এবং প্রেম-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশমান বলেই শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণতম অবতাররূপে গণ্য করা হয়ে থাকে।[২০]

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় পূর্ববর্তী লেখকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য উল্লেখ করে তিনি নিজেই বলেছেন—"...এই আলোচনার প্রথমেই কৃষ্ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণ-চরিত্র যে ঠিক একই কথা নহে, এটা বলিয়া রাখা আবশ্যক।...যে শ্রীকৃষ্ণের

চরিত-কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, 'প্রচার' ও 'নবজীবনের' যুগের হিন্দু পুনরুত্থান যে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে গিয়াছিল, ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক গৌরগোবিন্দ রায় যে শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম আলোচনা করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ বাহিরের বস্তু, ভারতবর্ষের প্রাচীন সামাজিক জীবনের রঙ্গভূমিতে তিনি বিবিধ লীলা করিয়া গিয়াছেন।···সেই শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণাবতার।···কিন্তু ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ ও তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ এক নহেন। ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ বাহিরের বস্তু, তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ ভিতরের বস্তু। ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ কে ও কি, তাহার বিচার করিতে হইলে মুখ্যভাবে তাঁহাকে ইতিহাসেই খুঁজিতে হইবে।'[২১]

তিনি আরও বলেছেন—'কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনার জন্য শাস্ত্রানুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজন।·· আমি শাস্ত্র পড়িয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাই নাই। অন্তর্জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই, শ্রীগুরুর কৃপায়, তিলে তিলে এই তত্ত্বটি আমার জ্ঞানেতে ফুটিয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে'।

কীভাবে, কোন্ কারণ বশতঃ তিনি বৈষ্ণব সাধনার সন্ধান পান, তার বিবরণ দিয়ে বিপিনচন্দ্র ঐ প্রবন্ধে লিখেছেন—'ইংরাজী পড়িয়া য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের অন্তরে পুরুষানুক্রমাগত বৈদান্তিক মায়াবাদের ভাবটা স্বল্পবিস্তর নষ্ট হইয়া যায়।···ইংরাজী পড়িয়া আমরা সমাজদ্রোহী হইয়া উঠিলাম।···এইরূপে ইংরাজী শিক্ষার আশ্রয়ে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার প্রেরণাতেই বিদেশীয় ভাব ও আদর্শ আমাদের চিত্তে যে সকল দুরূহ জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করিয়াছিল, তারই মীমাংসার সন্ধানে যাইয়া আমরা এই বৈষ্ণবতত্ত্বের ও বৈষ্ণবসাধনার খোঁজ পাইয়াছি'।

ব্যক্তিগত জীবন-সাধনায় বিপিনচন্দ্র ভক্তিমার্গের পথিক হলেও তাঁর ভক্তি ছিল প্রকৃতিতে জ্ঞান-মিশ্রা। তাই জ্ঞান-মার্গকে তিনি কোনোদিনই একেবারে পরিহার করতে পারেন নি। এই জ্ঞান-মার্গের আকর্ষণেই বিপিনচন্দ্র ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রাচ্য ধর্মদর্শনচর্চার দিকে আকৃষ্ট হন এবং নিজেও এ বিষয়ে চর্চাকালে ইউরোপীয় বিচার-পদ্ধতি অনুসরণ করেন। পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলর পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনাকালে লক্ষ্য করেন যে, মানুষের ধর্মচিন্তার মূলে রয়েছে 'অনন্ত' সম্পর্কে মানব-মনে নিগূঢ় এক চেতনার উপস্থিতি। মানবমনে অনন্তের এই চেতনা নিসর্গের দ্বারাই

প্রথম উদ্রিক্ত হয়। হিন্দু, গ্রীক, হিব্রু ধর্মসাহিত্য পাঠ করলে দেখা যায় যে মানুষ প্রথমে তার নৈসর্গিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং নিসর্গ-জগৎ ও মানব-অধ্যুষিত জগতের মধ্যে সম্পর্কনির্ণয়ে আগ্রহী হয়েছে। ধর্ম-চেতনা উন্মেষের এই স্তরে বহু দেবদেবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছে, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে কোন-না-কোন নৈসর্গিক শক্তি বা বস্তু। চিন্তার পরিপুষ্টি ও মানব-সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বহু দেবদেবীর পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়ে একেশ্বর-বাদ ধর্মের যুক্তিসম্মত অঙ্গরূপে গৃহীত হতে থাকে। ধর্ম-চিন্তা ও চেতনার এই বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার যে 'ডায়া-লেকৃটিকস্ অব্ রিজন' তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন, বিপিনচন্দ্র সেটি সমর্থন করেছেন।[২২]

ইংরেজ অধ্যাপক কেয়ার্ড ধর্ম-চেতনার উন্মেষ ও বিবর্তনে তিনটি স্তর বা পর্যায় লক্ষ্য করেছেন—অবজেক্টিভ, সাবজেক্টিভ এবং ইউনিভার্স্যাল। বিপিনচন্দ্র কেয়ার্ডের 'ইভলিউশন অব্ রিলিজিয়ন' গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে 'ডায়ালেকৃটিকস্ অব্ রিজন' তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যাবিশদ করতে গিয়ে বলেন যে অধ্যাপক কেয়ার্ড-কথিত অবজেক্টিভ, সাবজেক্টিভ এবং ইউনিভার্স্যাল প্রকৃত-পক্ষে থিসিস্, য়্যান্টিথিসিস্ এবং সিন্থেসিস্-এর সমার্থক শব্দ।[২৩] প্রসঙ্গতঃ তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে চিন্তার বিবর্তনে বা যুক্তির ক্রমাগতিতে উপরি-উক্ত তিনটি পর্যায়কে স্থায়ী পর্যায়রূপে গণ্য করা যায় না। কারণ, চিন্তা কখনই এই ধরনের নিশ্চিত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। যুক্তির গতি কখনই চরম অবস্থায় গিয়ে পৌছুতে পারে না। এদের প্রকৃতিই হচ্ছে অব্যাহত ধারায় উদ্ভুত হওয়া। আপন অভিমতের সমর্থনে তিনি ইতিহাস থেকে উদাহরণ উদ্ধার করে বলেছেন যে, খৃষ্টধর্মের ইতিহাস যদি কেউ পড়েন, তা'হলে তিনি লক্ষ্য করবেন যে গত দু'হাজার বছর যাবৎ খৃষ্টানদের চিন্তাধারায় ও জীবনচর্যায় কত বিবর্তন ঘটে গেছে। বিবর্তনের এই একই প্রক্রিয়া বৌদ্ধধর্ম এবং ইসলামধর্মের ইতিহাসেও লক্ষণীয়'।[২৪]

ইংরেজী গ্রন্থে ব্যক্ত এই মতটিই পাওয়া যায় তার 'নারায়ণে' (পৌষ ১৩২১) প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে আরও সরলভাবে—'শাস্ত্র আপনার যুগ-প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না। যে যুগে যে শাস্ত্র রচিত হয়, তাহাতে সেই যুগের প্রচলিত মত, বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত, আচার-বিচার, রীতি-নীতি জড়াইয়া

থাকে। আর এক যুগের মত, বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত ও আচার-বিচারাদি পরযুগেও ঠিক পূর্বেকার মতন কোথাও থাকে না। · ইহাই জগতের নিয়ম। এই নিয়মের বশবর্তী হইয়াই যুগে যুগে নূতন সমস্যার উদয় হইয়া, নূতন নূতন যুগধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক যুগের ধর্ম অন্য যুগের প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না। এক যুগের শাস্ত্র অবলম্বনে অপর যুগে তত্ত্বজ্ঞানলাভ বা ধর্মসাধন করাও সম্ভব হয় না। আমাদের দেশের বর্তমান শাস্ত্র যে যে যুগে রচিত হইয়াছিল, সেগুলি সেই সেই যুগেরই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিয়াছিল। সেই পুরাতন শাস্ত্রের দ্বারা এ যুগের নূতন জিজ্ঞাসার সম্যক মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে।'

বিপিনচন্দ্র ছিলেন একদিকে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী, অন্যদিকে সমাজ-চেতনা ছিল তাঁর চিন্তাজীবনের মূলে অধিষ্ঠিত। ম্যাক্সমূলর আদিম ধর্ম-চেতনার বিকাশে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকাকেই একমাত্র উদ্বোধক-কারণ বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মতে প্রকৃতি-পূজার মাধ্যমেই মানুষের ধর্মীয় মনোভাব প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে হিউম এবং স্পেনসার অসভ্য জাতিসমূহের চিন্তাধারা ও জীবনচর্চার ইতিবৃত্ত বিশেষভাবে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সামাজিক বিধি-নিষেধ ও প্রথাসমূহ থেকেই আদিম মানুষের ধর্ম-চেতনার উদ্ভব হয় এবং পূর্বপুরুষের পূজার ভিতর দিয়ে তার ধর্মীয় মনোভাব প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বিপিনচন্দ্র উভয়পক্ষের অভিমতকেই একদেশদর্শী বলে উল্লেখ করে বলেছেন যে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সমাজ-পরিবেশ—এই উভয় পরিবেশের দ্বৈত চেতনা থেকেই মানুষের আদি ধর্ম-ভাবনার উদ্ভব ঘটে। কারণ বস্তুতঃ মানবজাতির বিকাশের প্রতিটি স্তরে প্রকৃতির মতো সমাজও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে ক্রিয়াশীল ছিল।[২৫] আর এমন একটা সময়ের কথা 'কল্পনা করা যায় না, যখন মানুষ সমাজবদ্ধ জীব ছিল না…এবং এই সামাজিক বন্ধনই চিরন্তন আকারে মানুষের ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে এসেছে'।[২৬]

এই স্বভাবসিদ্ধ সমাজ-চেতনার জন্যই বিপিনচন্দ্র সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের পক্ষাবলম্বী হতে পারেন নি। অবশ্য বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের তত্ত্বালোচনায় বিপিনচন্দ্র যে একেবারে অমনোযোগী হননি, বিশেষভাবে তাঁর ইংরেজী গ্রন্থ 'দি স্টাডি অব্ হিন্দুয়িজ্ম' এবং বাংলা গ্রন্থ 'জেলের খাতা'র প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তার সুস্পষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। তবে ধর্ম ও দর্শনকে

তিনি তত্ত্বাঙ্গের দিক অপেক্ষা সাধনাঙ্গের দিক থেকে আলোচনা করেই যেন আনন্দলাভ করেছেন বেশী। কারণ, অন্তরতম সত্তায় বিপিনচন্দ্র ছিলেন রসতীর্থের পথিক। তিনি বলেছেন—'জগৎকে মিথ্যা, আর সংসারে স্নেহের, প্রীতির, প্রেমের, সেবার, ভক্তির সম্বন্ধ সকলকে মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি নাই বলিয়াই ঋজুকুটিল বহু পথ ঘুরিয়া শেষে কৃষ্ণতত্ত্বের খোঁজ পাইয়াছি।

এই মানসিকতার বশবর্তী হয়েই তিনি ধর্ম ও দর্শনকে অনুভবের দিক থেকে, ব্যবহারিক জীবনচর্যার দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বলেছেন—'ধর্মের প্রতিষ্ঠা অতিপ্রাকৃতে। যাহা চক্ষে দেখি, কানে শুনি, হাত দিয়া ধরি,—যাহা এ সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করি, যাহা এই মনের দ্বারা চিন্তা করি,…তাহার অতীতে, আপাতত তাহা হইতে পৃথক, আর একটা কিছু আছে;…তাহা ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ যাবতীয় বস্তুতে আচ্ছন্ন করিয়া আছে;—এই যে বিশ্বাস, এই যে ধারণা, এই যে ভাব, ইহাই মানুষের ধর্মের মূল বনিয়াদ'।[২৭] কারণ, 'ইন্দ্রিয়ের পথে চলিতে চলিতেই আমরা ইন্দ্রিয়ের অতীত যে একটা কিছু আছে, ইহার সন্ধান পাইয়া থাকি। এ সন্ধান পাইতে কারো অল্প, কারো বা বেশী সময় লাগে। কিন্তু সকলেই ইহা পায়'।[২৮] তাই নিজে নিরাকার ব্রহ্মোপাসক হয়েও বাঙালীর প্রতিমা-পূজার মধ্যে তিনি নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর ধারণায় 'আধুনিক জ্ঞানের চক্ষে এই প্রতিমা-পূজা হীন এবং হেয় মনে হইলেও ভাবের রাজ্যে ও রসের রাজ্যে এ সকলের একটা বিশেষ মূল্য আছে'।[২৯] বিষয়টি পরিস্ফুট করবার জন্য তিনি প্রাচীন-বেদান্ত-বিহিত স্বরূপোপাসনা, সম্পদুপাসনা এবং প্রতীকোপাসনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে সাধনমার্গে নিম্নতম অধিকারীর জন্য প্রতীকোপাসনা শাস্ত্রবিহিত। বেদান্তে প্রতীকোপাসনাকে 'অধ্যাসজনিত উপাসনা' বলা হয়েছে। বিপিনচন্দ্র বাঙালীর প্রতিমা-পূজাকে প্রতীকোপাসনার পর্যায়ভুক্ত করতে অস্বীকার করে বলেছেন—'এগুলি খাঁটি প্রতীকোপাসনা নহে, খাঁটি সম্পদুপাসনাও নহে। এগুলি একটা মিশ্র বস্তু। এখানে প্রতীকে সম্পদে অদ্ভুতরকমে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে। আর এই মাখামাখিটা বাঙালী চরিত্রের ভাবুকতার বিশেষ ফল'। প্রতিমারচনার মনস্তাত্ত্বিক উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি ঐ একই প্রবন্ধে বলেছেন—'ভক্ত আপনার ইষ্টদেবতাকে কেবল প্রাণের ভিতরে দেখিয়াই পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ

করিতে পারেন না। আপনার সাধনার ধনকে কেবল ধ্যান ও সমাধিতে পাইয়া তাঁর সাধ মিটে না। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি তাঁহাকে ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হন।' কেবলমাত্র ভগবৎ প্রেমের বেলাতেই নয়, সর্ববিধ প্রেমের বেলাতেই এই ধরনের ব্যাকুলতা স্বাভাবিক ঘটনা। বিপিনচন্দ্রের কথায়—'সকল প্রেমিকের মধ্যেই এক সময়ে না এক সময়ে প্রেমের এই বহির্মুখীনতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। অন্তরের সম্ভোগকে বাহিরে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা সাধারণ প্রেমধর্ম।...আর প্রেমিক, সাধক, কবি ইঁহারা সকলে যে একই জাতীয় জীব'। অর্থাৎ এঁরা সকলেই রূপের সরণি বেয়ে স্বরূপ-তীর্থের যাত্রী। কারণ, এঁরা জানেন, স্বরূপে যা' নির্বিশেষ, রূপে তা'ই বিশেষ এবং এ-ও জানেন যে বিশেষকে বর্জন করে নির্বিশেষকে অর্জন করা যায় না। তাই বাঙালীর প্রতিমা-পূজা ও দুর্গোৎসব সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"ইহা ভক্তের রূপকোপাসনা। ভাবুকের আপনার ইষ্টদেবতার রসমূর্তি পূজা।... তাই চারিদিকে যখন পূজার কাঁশর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, তখন সমগ্র সাধক-সমাজের সঙ্গে এক হইয়া, হাত তুলিয়া, ঊর্ধ্বনেত্রে,—মা! মা! বলিয়া চীৎকার করিতে ইচ্ছা হয়।'

এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সাকার ও নিরাকার-তত্ত্ব উত্থাপন করেছেন এবং এই তত্ত্বের উপর আপন অনুভবের আলোকসম্পাত করে দেখাতে চেয়েছেন যে সাকার ও নিরাকার প্রকৃতপক্ষে একে অপরের বিপরীত বস্তু নয়, বরং একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'সংসারে রসের সম্বন্ধ সকল বিশিষ্ট আধারকে ধরিয়া ফুটে, কিন্তু এ সকল আধারকে ছাপাইয়া উঠে। সাগর-দৃশ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গগুলি দিগন্ত-প্রসারিত হইয়া ক্রমে অনন্ত আকাশের গায়ে মিলিয়া মিশিয়া যায়, মানুষের রসের সম্বন্ধ-সকলও সেইরূপ বিশিষ্টকে ধরিয়া গড়িয়া উঠে, কিন্তু গড়িতে গড়িতেই ক্রমে নির্বিশেষে যাইয়া মিশিয়া পড়ে।' এই ব্যাপারকে উদাহরণের সাহায্যে বিশদ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'মাতার স্নেহ ক্ষুদ্র শিশুকে ধরিয়াই প্রথমে ফুটে, কিন্তু ক্রমে বাৎসল্যের অলখনিরঞ্জন বিশ্বরূপেতে যাইয়া মিশিয়া যায়। তখন সকল সন্তান, বিশ্বসন্তান তাঁর বাৎসল্যের মূর্তি হইয়া উঠে। কিন্তু এ ত মূর্ত নহে। বিশিষ্ট সন্তানই মূর্ত, সাকার; বিশ্বসন্তান একই সঙ্গে মূর্ত ও অমূর্ত, সাকার ও নিরাকার। অনুরূপভাবে বিশিষ্ট জননী মূর্ত ও সাকার, কিন্তু বিশ্ব-

জননী একাধারে মূর্ত ও অমূর্ত, সাকার ও নিরাকার। কারণ, বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'সত্য যাহা, বস্তু যাহা, তাহা যুগপৎ মূর্ত ও অমূর্ত, সাকার ও নিরাকার।' তিনি অনুভব করেছেন যে—'এ জগতের সর্বত্র বিশিষ্টে ও বিশ্বজনীনে, মূর্তে ও অমূর্তে, সাকারে ও নিরাকারে, রূপে ও স্বরূপে এই অদ্ভুত মাখামাখি রহিয়াছে। আর বিশিষ্টের মধ্যে বিশ্বজনীনকে, মূর্তের মধ্যে অমূর্তকে, সাকারের মধ্যে নিরাকারকে, রূপের মধ্যে স্বরূপকে ধরিবার চেষ্টা করিতে যাইয়াই মানুষ তার যাবতীয় ধর্ম, নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে।'

সাধ্য ও সাধন—এই দু'য়ের সমবায়েই সাধনা। বিপিনচন্দ্র সাধন-পন্থায় অধিকারী-ভেদতত্ত্ব বিশ্বাস করতেন। খৃষ্ট ও হিন্দুধর্ম—উভয় ধর্মেই অধিকারী-ভেদের কথা আছে। কিন্তু খৃষ্টধর্মের অধিকারীভেদতত্ত্বের সঙ্গে হিন্দুর অধিকারীভেদতত্ত্বের পার্থক্য কোথায় তা' পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'খৃষ্টানের অধিকারীভেদ শেষের কথা, অন্তিম লক্ষ্যের ও চরম নিয়তির কথা। হিন্দুর অধিকারীভেদ মাঝখানের পথের কথা। মুক্তি কেউ পাবে আর কেউ পাবে না, হিন্দু এমন অদ্ভুত নাস্তিক্যের কথা বলেন না। মুক্তি সকলেই পাবে। মুক্তি জন্য-বস্তু নয়। কোনও কর্মের দ্বারা তাহা উৎপন্ন হয় না। মুক্তি নিত্যসিদ্ধ বস্তু। নিদাঘ নিশীথে সূচীভেদ্য অন্ধকারে স্বচ্ছ শীতল সরোবর-তীরে বসিয়া তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যেমন পিপাসায় ক্লেশ পায়, জীব সেইরূপ মোহের অন্ধকারে পড়িয়া একান্ত আসন্ন যে নিত্যসিদ্ধ মুক্তি-বস্তু তাহা লাভ করিতে না পারিয়া ত্রিতাপে জর্জরিত হয়। আর্য ও ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল—সকলেরই ইহা নিত্য-সিদ্ধ বস্তু। সুতরাং ধর্মের যে চরম লক্ষ্য মোক্ষ, তৎসম্বন্ধে কোনও অধিকারী অনধিকারীর কথা হিন্দুর ধর্মে আদৌ উঠে না। কিন্তু এই সার্বজনীন মোক্ষপদ সকলে একই প্রকার সাধন অবলম্বন করিয়া লাভ করিতে পারে না। আর এই সাধন সম্বন্ধেই হিন্দু অধিকারীভেদের কথা বলেন, সাধ্য-বস্তু সম্বন্ধ নহে।'[৩০]

সমস্ত ধর্ম-সাধনার মূল লক্ষ্য—ঈশ্বরলাভ। খৃষ্টান সাধুসমাজের মতো তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের অনেকে ঈশ্বরলাভকে 'নবজীবনলাভ'-এর তুল্য বলে মনে করতেন। অনতিকাল পূর্বে ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট বিপিনচন্দ্র এই ধরনের ব্রাহ্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে নবজীবনলাভের ক্রমাগতির স্তরপরম্পরা বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেন—'নবজীবনের বীজসঞ্চার অনুতাপে, অঙ্কুরভেদ ঈশ্বর-

জিজ্ঞাসায় এবং পরিণতি ঈশ্বর-লাভে'।[৩১] একদা 'আলোচনা'র পৃষ্ঠায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি নবজীবনলাভের যে স্তর পরম্পরা সূত্রাকারে ব্যক্ত করেন, তা' পরবর্তীকালে তাঁর ব্যক্তিজীবনে আশ্চর্যভাবে সত্য হয়ে উঠেছিল।

১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দে বন্দীদশায় ইংরেজের কারা-প্রাচীরের অন্তরালে নির্জন সাধনায় বসে বিপিনচন্দ্র যে নবজীবন লাভ করেন, যা' পূর্বেই যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে, তা'ও এক প্রকারের অনুতাপ ও ঈশ্বর-জিজ্ঞাসার সরণি বেয়ে ঈশ্বর-লাভ বা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণে পরিণতি লাভ করেছিল। তরুণ যৌবনে একদা যুগধর্মের প্রভাবে তিনি পিতৃপিতামহের ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ভিন্নতর ধর্মসাধনার পথ অঙ্গীকার করে নিয়ে পিতার মনে অশেষ বেদনার সঞ্চার করেছিলেন। কারাগারের নিরালা অবসরে সে-কথা অনুতাপের আকারে তাঁর স্মৃতিপটে উদিত হয়ে তাঁকে নতুনভাবে ঈশ্বর-জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। ব্রাহ্মসমাজের অধীনে থাকলেও তখন অবশ্য তিনি বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত।

'আভাস ও আকাঙ্ক্ষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি অনুতাপের সুরে বলেছেন: 'ঠাকুর, অল্পবয়সে যৌবনমদে, আপনার খাদ্যোতদ্যুতিদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া এই পরমতত্ত্বকে অগ্রাহ্য করিয়া পিতা, মাতা, পিতৃলোক সকল হইতে একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। আজ এই তথ্য পাইয়া, এই কৃষ্ণনাম করিয়া এই রাধাগোবিন্দ নাম কণ্ঠে লইয়া ঠাকুর, তোমার অযাচিত করুণাগুণে পিতা, মাতা, পিতৃকুল, মাতৃকুল, কুলপুরোহিত, কুলগুরু, সকলের সঙ্গে পুনর্মিলনে সুখ ও সৌভাগ্য লাভ করিতেছি। ব্রহ্মনামে পিতামাতার প্রাণে সে আনন্দ সঞ্চারিত হইত বলিয়া মনে হয় না,...বরং তাঁহাদের ইষ্টনাম, প্রিয়নাম, সাধিত-নাম, এই কৃষ্ণনাম এই অধমের মুখেও শুনিয়া তাঁহাদের শতগুণ ও সহস্রগুণ বেশী আনন্দ ও প্রীতি হইতেছে'।[৩২] ঈশ্বরের আভাস অন্তরে অনুভূত হলে অহঙ্কার বাষ্পের মতো বিলীন হয়ে যায়। সর্ব চিন্তায়, সর্ব কর্মে, সর্ব প্রকারের প্রাপ্তিতে ঈশ্বরের অপার করুণা আভাসিত হতে থাকে। বিপিনচন্দ্র অল্পকথায় এই ধরনের অনুভূতিকে ঐ প্রবন্ধে বাঙ্ময় করে তুলেছেন: 'ঠাকুর' এ হীনজনকে তুমি যেভাবে লোকচক্ষে বাড়াইয়া তুলিলে তাতে আমার আনন্দ হয় না, এমন নহে। কিন্তু অন্তর্যামিন্, তুমি জানো, এ আনন্দ ভয়-বিষাদমিশ্রিত। ইহা যেন প্রভো! আমার পতনের কারণ না হয়। শেষ রক্ষা করো গুরো। শেষ রক্ষা

করো।... অনেকেই এখন, আমি অকৃতি হইলেও, আমাকে বড়ো করিয়া তুলিতেছেন। এখন যদি এ মাথা একেবারে নিচু না হইয়া যায়, এখনো যদি মাটিতে মিশাইয়া যাইতে না পারি, এখনো যদি সত্য সত্য বিনয় লাভ না করি, তবে আর কখন করিব? দয়াল, এটি করো,...দম্ভ অহঙ্কার সব নষ্ট কর'।

অহঙ্কার ত্যাগের সঙ্কল্প থেকেই আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হয়। বিপিনচন্দ্রেরও তাই হয়েছিল। আলোচ্যমান রচনার শেষভাগে তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছেন—'তাই তোমার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে চাই। আমায় একেবারে অধিকার কর। আমার ধর্মাধর্ম সকল গ্রহণ কর। যাতে সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য তোমার চরণশরণাগত হইতে পারি, তাই কর।' ভক্তিমার্গের চূড়ান্ত কথা এই আত্মসমর্পণ।

ধর্মসাধনে সুশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও বিপিনচন্দ্র স্বানুভূতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ, তাঁর মতে—'স্বানুভূতিকে ছাড়িয়া শাস্ত্র বল, অবতার বল, প্রবক্তা বল, পয়গম্বর বল, কেহই কাজ করিতে পারে না'।[৩৩] বলা বাহুল্য, স্বানুভূতির মাধ্যমে শাস্ত্রবাক্যকে বিচার করে তার মর্মার্থগ্রহণের প্রয়াসের সূচনা রামমোহন থেকে এবং এই প্রবণতা থেকেই উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব হয়েছিল।

এক শ্রেণীর সমালোচক একদা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলতেন যে হিন্দুধর্ম প্রচারক-ধর্ম নয়। হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ না করলে হিন্দুধর্মের কোলে স্থান পাবার অধিকারী হওয়া যায় না। তাঁদের মতে এটা হচ্ছে হিন্দু-ধর্মের প্রাণহীন সংকীর্ণতার পরিচায়ক। বিপিনচন্দ্র তাঁদের কথাটাকে একেবারে অসত্য বলে মনে না করলেও, তাঁদের নিন্দাবাদকে ন্যায্য বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তা'ছাড়া তাঁরা যে হিন্দুধর্ম ও ইহুদিধর্মকে 'ন্যাশনাল' বা জাতীয় ধর্ম এবং বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও ইসলামধর্মকে 'ইউনিভার্স্যাল' বা সার্বজনীন ধর্ম বলেন, এটাও বিপিনচন্দ্র স্বীকার করতে চাননি। তাঁর মতে—'বিচার করিয়া দেখিলে বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টধর্ম বা মুসলমানধর্মকে যে অর্থে সার্বজনীন বলা যায়, হিন্দুধর্মকে তদপেক্ষা বৃহত্তর অর্থে এই সার্বজনীন বিশেষণ দেওয়া যাইতে পারে...'।[৩৪] প্রচারক-ধর্মসমূহের সঙ্গে হিন্দুধর্মের পার্থক্যকে সূত্রাকারে ব্যক্ত করতে গিয়ে একই আলোচনায় তিনি বলেছেন—'প্রচারক-ধর্ম সকল আচারব্যবহার সম্বন্ধে উদার মত ও বিশ্বাস বিষয়ে সংকীর্ণ, হিন্দুধর্ম মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে উদার,

আচারব্যবহার সম্বন্ধে সংকীর্ণ'। হিন্দুধর্ম কেন প্রচারক-ধর্ম হয়ে উঠতে পারেনি তার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'পরধর্মের নিন্দাবাদ ব্যতিরেকে কখনো নিজের ধর্মের প্রচার হয় না। ...হিন্দু কোনো ধর্মের নিন্দাবাদকে মহা অপরাধ বলিয়া মনে করে।'[৩৫]

বিপিনচন্দ্র ছিলেন সমন্বয়ের সাধক এবং ধর্মসাধনে স্বানুভূতির সমর্থক। তাই তাঁর ব্রাহ্ম বিশ্বাসে হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধার কোনো স্থান ছিল না। হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, সার্বজনীনতা বিষয়ে তিনি ইংরেজী ও বাংলায় অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ইংরেজী প্রবন্ধসমূহের সংকলন-গ্রন্থ 'দি সোল অব্ ইণ্ডিয়া', 'দি স্টাডি অব্ হিন্দুয়িজম্' এবং 'শ্রীকৃষ্ণে'র কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর বাংলা প্রবন্ধ 'হিন্দুর ধর্ম', 'হিন্দুধর্মের সার্বজনীনতা', 'হিন্দুধর্মের বিচিত্রতা,' 'হিন্দুধর্মের বহুমুখীনতা' প্রভৃতি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।[৩৬] সমস্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যেই বক্তব্যে নতুনত্ব আছে, তা' নয়। তবে প্রবন্ধগুলি তাঁর হিন্দুধর্মের প্রতি আগ্রহ ও অভিনিবেশের ব্যাপকতার স্বাক্ষরবাহী। 'হিন্দুধর্মের বিচিত্রতা' শীর্ষক প্রবন্ধটিকে তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলির সার-সংক্ষেপ রূপে গণ্য করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধে তাঁর প্রথম বক্তব্য হচ্ছে : "হিন্দু যাহাকে ধর্ম বলেন, সে বস্তু সনাতন। কালবিশেষে তাহার উৎপত্তি হয় নাই। দেশবিশেষে সে ধর্ম আবদ্ধ হয় না।...সে ধর্মের তত্ত্ব 'গুহায়াং নিহিতং'—মানব-প্রকৃতির মূলে নিহিত আছে। আর গুহা-প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই এ ধর্ম সনাতন ও সার্বজনীন'। এইজন্য 'মানুষকে জাতিবর্ণনির্বিশেষে ভক্তি করাই তাঁর সাধনের একটা মুখ্য অঙ্গ। হিন্দুর চক্ষে মানুষ কেবল মানুষ নহেন, নারায়ণ ...।' এই প্রবন্ধে তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য : 'মানুষের ভিতরকার প্রকৃতি হইতেই যখন তার ধর্ম ফুটিয়া ওঠে, তখন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের অন্তঃ-প্রকৃতির বিভিন্নতানিবন্ধন, তাহাদের ধর্মও নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিবে। আর এই তত্ত্বটি দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দুর ধর্ম যেমন একদিকে খৃষ্টীয়ান, মুসলমান প্রভৃতি মতবদ্ধ ধর্মের ন্যায় দুনিয়ার লোককে আপনার ভিতরে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করেন নাই, সেইরূপ নিজের ভিতরেও অশেষ প্রকারের বিচিত্রতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন'। এই বিচিত্রতার প্রসঙ্গ পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি যা' বলেছেন তা' তাঁর এই প্রবন্ধের তৃতীয় বক্তব্যরূপে গণ্য করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—'যাঁর প্রকৃতি অতীন্দ্রিয়ের

অধিকারে যাইয়া পৌঁছিয়াছে, সে রামনামই করুক, আর খৃষ্টনামই করুক, সে সেই নামের ভিতরেই যিনি নামরূপের অতীত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। আর হিন্দু এ সকল তত্ত্ব অতি পরিষ্কারভাবে ধরিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার ধর্মে মূর্ত ও অমূর্ত, সাকার ও নিরাকার, অতি ঘোর তামসিক, অতি প্রবল রাজসিক ও নিরতিশয় সাত্ত্বিক এই সকল বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী মতামতের ও সাধন-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর ধর্মের তত্ত্ব গুহাতে— মানব-প্রকৃতির মূলে—প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, হিন্দু আপনার ধর্মকে এত উদার ও তাহাতে এত বিচিত্রতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন'।

এই পর্যায়ের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে ওঠে যে বিপিনচন্দ্রের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত চিন্তায় উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী ও ভক্তিবাদী উভয়বিধ সংস্কারই যুগপৎ বিগুমান ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজা রামমোহন-প্রবর্তিত যুক্তিবাদ এবং ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামকৃষ্ণদেব এবং প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-প্রতিষ্ঠিত ভক্তিবাদ,—এই উভয় 'বাদ'ই তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে আলোড়িত করেছিল। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ। তাই যুক্তিবাদ অপেক্ষা ধর্ম ও দর্শনচিন্তার ক্ষেত্রে ভক্তিবাদের দিকেই তাঁর অভিমুখিতা অধিকতর হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এই ধরনের অভিমুখিতায় প্রচ্ছন্নভাবে শক্তি সঞ্চার করেছিল বংশগতি। এইজন্য বিপিনচন্দ্র ধর্ম ও দর্শনের আলোচনা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমার্গের পথিক হয়ে উঠেছিলেন।

সমাজতত্ত্ব ও সমাজনীতি :

বিপিনচন্দ্রের বিচিত্রতন্ত্রী হৃদয়-বীণার ধ্রুব সুর ছিল—ধর্মপ্রাণতা। মোক্ষলাভকেই তিনি মানবিক সাধনার চরম সিদ্ধি বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাঁর মোক্ষের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো বিরোধ ছিল না। তাই ধর্মপ্রাণতার ধ্রুব সুর বাদিত রেখেই সমাজ-চিন্তা ও রাষ্ট্র-চিন্তার পর্দায় তিনি বিচিত্র সুরসৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। ধর্মপ্রাণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর ইতিহাস-চেতনা।

পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি 'সমাজতত্ত্ব ও সমাজনীতি' পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য :[৩৭]

ব্যক্তি ও সমাজ ; সমাজ-শক্তি ; আমি ও আমার সমাজ ; নূতনে পুরাতনে ; সামাজিক সমস্যা ; জাতি ও বর্ণভেদের কথা ; বর্ণাশ্রম ধর্ম ; শ্রাদ্ধের কথা ; হিন্দু শ্রাদ্ধের অর্থ ও অধিকার ; অমৃতে গরল ; অক্ষয়বাবু ও বিধবাবিবাহ ; বাঙালীর বাল্যক্রীড়া ও তাহার বিষময় ফল ; সাম্যবাদ ও সাম্যসাধন।

এ ছাড়া বিপিনচন্দ্রের নানাবিধ ইংরেজী ও বাংলা রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে সামাজিক প্রসঙ্গের আলোচনা আছে। তবে সমাজ সম্পর্কে তাঁর মূল বক্তব্য-সমূহ উপরি-উক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যেই উল্লিখিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারায় অবগাহনের ফলে বাঙালীর জীবনচর্যায় যে নবজাগরণের সূচনা ঘটে, তার অন্যতম লক্ষণ ছিল—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্বোধন। এই বোধের উন্মেষের ফলে সমাজের অনুশাসনের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য স্বীকারের প্রবণতা ক্রমশঃ শিথিল হতে থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিপিনচন্দ্র ছিলেন সেই সঙ্ঘর্ষের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ; শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজেও সেই সঙ্ঘর্ষের অংশীদার হয়েছিলেন। চিরাচরিত সামাজিক সংস্কারের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য পোষণে অপারগ হয়েই তরুণ বয়সে তিনি পিতৃপুরুষের ধর্মাদর্শ ত্যাগ করে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রেরণাতেই তিনি পরবর্তীকালে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক-নির্ণয়ে এবং প্রচলিত সমাজনীতির যৌক্তিকতা বিচারে লেখনী ধারণ করেন।

বিপিনচন্দ্রের ধারণায় মানব-সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় ব্যক্তি ও সমাজের ভূমিকা তুল্যমূল্য,—একে অপরের সঙ্গে জৈব সম্পর্কে আবদ্ধ।[৩৮] ব্যক্তি ও সমাজ পারস্পরিক পরিপূরণ ও পরিপোষণ-ক্রিয়ার মাধ্যমে মানব-সভ্যতাকে অগ্রগত করে চলেছে। কিন্তু প্রাচীনদের চিন্তায় সমাজের স্থান ছিল ব্যক্তির উপরে। 'ব্যক্তি ও সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'...প্রাচীন ভারতে কেন, প্রাচীন জগতের সর্বত্রই সমাজকে ব্যক্তির উপরে অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসে ও প্রাচীন রোমে সমাজ ছিল অঙ্গী, ব্যক্তি ছিল সে অঙ্গীর অঙ্গ ; সমাজ ছিল পরিপূর্ণ বস্তু, ব্যক্তি ছিল সে পরিপূর্ণ বস্তুর অংশ বা খণ্ড ;.........সমাজজীবনের সার্থকতা ব্যতীত ব্যক্তির নিজের জীবনের যে একটা নিজস্ব লক্ষ্য আছে—এ কথাটা প্রাচীন গ্রীস

বা রোমে কেহ বলে নাই'।[৩৯] তবু তাঁর মনে হয়েছে যে প্রাচীন ভারতের সমাজ-চিন্তায় এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যা' প্রাচীন জগতের অন্যত্র দুর্লভ। তিনি বলেছেন—'...আমাদের সমাজতত্ত্ব একদিকে যেমন ব্যক্তিকে সমাজশক্তির নিতান্ত অধীন করে রেখেছে, তেমনি এমন একটা অবস্থার কথা স্বীকার করা হয়েছে, যে-অবস্থায় ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে, সর্বপ্রকার সমাজ-শৃঙ্খলা, সমাজ-শাসন ও সমাজ-শক্তির অতীত হয়ে থাকে। অতি-সামাজিক একটা অবস্থা প্রত্যেক মানুষের হতে পারে, আমাদের প্রাচীন সমাজতত্ত্ববিদ্ ঋষিরা এটা স্বীকার করে গেছেন'। সম্ভবতঃ এই মন্তব্যের সূত্রে বিপিনচন্দ্র সেই সমস্ত মহাপুরুষের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন, যাঁদের অলোকসামান্য একক ব্যক্তিত্ব একটি বৃহৎ সমাজের অভাবনীয় রূপান্তর সাধন করেছে।

সমাজের কাছে অবশ্য ব্যক্তির ঋণ অপরিশোধ্য, কারণ 'সমাজ-খাতের ভিতর দিয়ে সভ্যতার ধারা, জ্ঞানের ধারা, আনন্দের ধারা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকে জীবনের সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়'। তাই বলে 'আবার ব্যক্তিত্বকে অগ্রাহ্য করলেও চলবে না। ব্যক্তিকে ফুটিয়ে দিয়ে সমাজকে ফুটোতে হবে,... .'

বিপিনচন্দ্র মনে করেন, সমাজ একটি জটিল প্রতিষ্ঠান। সমাজের বিকাশে বিচিত্র শক্তির প্রচ্ছন্ন ক্রিয়াকারিত্ব বিদ্যমান। একটি ক্ষুদ্র বীজের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশে যেমন ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের প্রচ্ছন্ন ক্রিয়াকারিত্ব বিদ্যমান, একটি ক্ষুদ্র শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই যেমন অসংখ্য শক্তি মিলিত হয়ে তার ভাগ্যলিপি নির্ধারিত করে দেয়, তেমনি—'একটি মনুষ্যসমাজ,—সেখানেও এইরূপ অসংখ্য শক্তির কার্য। এই সকল শক্তিরাশিই সমাজ-চরিত্রকে গঠিত, সমাজের জ্ঞান, ধর্ম নীতি ও রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত ও তাহার সভ্যতাস্রোতকে প্রতিনিয়ত নিয়মিত করিতেছে'।[৪০] তাই সমাজ-সংস্কারের জন্য ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। তিনি বলেছেন—'...প্রকৃত সংস্কার যদি করিতে চাও, তবে একযোগে সমাজের এই প্রধানতম শক্তিচতুষ্টয়ের সংস্কার-ব্রতে ব্রতী হইতে হইবে।'

বিপিনচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন যে বিশ্বের অভিব্যক্তি 'থিসিস্, য়্যান্টিথিসিস্ এবং সিন্থেসিস্,—এই ক্রম অনুসরণ করেই সংঘটিত হচ্ছে। বিপিনচন্দ্রের পরিভাষায় এই ক্রম হচ্ছে—স্থিতি, বিরোধ এবং সমন্বয়। গতি বিশ্বের অপরিহার্য প্রাণ-

লক্ষণ। তাই সর্বক্ষেত্রেই স্থিতিকে বিরোধের সম্মুখীন হতে হয় এবং বিরোধ শেষ পর্যন্ত স্থিতিকে একটা উচ্চতর এবং বৃহত্তর সমন্বয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। কারণ, বিপিনচন্দ্রের ভাষায় 'সমন্বয় মাত্রেই, যে বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে যায়, তার বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই পূর্ণ দাবিদাওয়া কিছু কাটিয়া-ছাঁটিয়া একটা মধ্যপথ ধরিয়া তাহার ন্যায্য মীমাংসা করিয়া দেয়। সমন্বয় প্রত্যাবর্তন নহে, অগ্রসর, প্রতিক্রিয়া নহে, বিকাশ'।[৪১]

সমাজ ও সভ্যতা এইভাবেই পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রগত হতে থাকে। বিপিনচন্দ্র বলেছেন—"আমাদের এই 'সনাতন' হিন্দুসমাজের জীবনেও এই সার্বজনীন বিকাশ-ক্রমের ব্যতিক্রম হয় নাই।...হিন্দু চিরদিনই মুক্তভাবে চলিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই মুক্তির জন্যই সে নিজেকে কতবার কত বাঁধনে জড়াইয়াছে, আবার এই বন্ধনের দ্বারা এই মুক্তিলাভ হইল না দেখিয়া নির্মমভাবে সকল বিধি-নিষেধকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে।'

ব্যক্তি ও সমাজের মতো ধর্ম এবং সমাজও অবিচ্ছেদ্য ও অন্যোন্য সম্পর্কে আবদ্ধ। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'ধর্ম প্রাণ, সমাজ তার দেহ। ধর্ম কেবল কতকগুলি তত্ত্ব, কতকগুলি মত ও বিশ্বাস নহে। অনুষ্ঠান ধর্মের প্রাণ। অনুষ্ঠানে ধর্ম আত্মপ্রকাশ করেও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই অনুষ্ঠান সামাজিক জীবনের সঙ্গে জড়িত। ধর্ম ও সমাজের সম্পর্ক আকস্মিক নহে, নিত্য; বাহ্য নহে, অঙ্গাঙ্গী।...একের বিনাশে অপরের স্থিতি অসম্ভব।'[৪২] বিষয়টি পরিস্ফুট করবার জন্য তিনি আরও বলেছেন—'কোথাও ধর্ম সমাজকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যেখানেই সমাজ এক পথে......আর ধর্ম আর এক পথে ...সেখানেই গোল বাধে। সেখানেই ধর্ম ও সমাজ উভয়েই যুগপৎ ক্ষয় পাইতে থাকে। আধুনিক খৃষ্টীয় জগতে ইহা তো সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যিশুখৃষ্টের আধ্যাত্মিক আদর্শের সঙ্গে বর্তমান খৃষ্টীয়ান সমাজের মতিগতির কোনও সামঞ্জস্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে তখন ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে যে রূপান্তরের পালা চলছিল, সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাই তিনি অনেকটা সাবধান-বাণী উচ্চারণের সুরে বলেন—'সাগরজলকে যেমন বাঁধা যায় না, তেমনি সামাজিক বিবর্তন বা পরিবর্তনের স্রোতকেও রোধ করা সম্ভব নহে।...পরিবর্তন হইবে হউক, তাতে ক্ষতি নাই। কেবল দেখিতে হইবে সে পরিবর্তনের স্রোত মূল ধরিয়া না

টানিয়া ফেলে। · বর্তমান ভাঙা-গড়ার মধ্যে আমাদের সনাতন ভূমানিষ্ঠা বা পরমার্থ নিষ্ঠাটুকু কিসে বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়, ইহাই আজিকার ভারতের প্রধান ও বিষম প্রশ্ন। ইহাই আমাদের অতি গুরুতর, অতিশয় জটিল সামাজিক সমস্যা।'

প্রাচীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি বিপিনচন্দ্রের সশ্রদ্ধ মনোভাব ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে তিনি অন্ধ রক্ষণশীলতার বিরোধী ছিলেন। এক যুগের প্রয়োজনে যে সামাজিক রীতিনীতির উদ্ভব ঘটে, সর্বযুগের পক্ষেই তা' অপরিবর্তনীয়—একথা তিনি বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন। 'অমৃত ও গরল' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : 'আজি যাহা অমৃত, জীবনসঞ্চারক ; কাল তাহাই বিষ, জীবনহারক।······যৌবনের অমৃত বার্ধক্যের গরল। যেমন মানুষ তেমনি সমাজ। কাল যাহা সমাজের পক্ষে অমৃত ছিল, আজ তাহাই সমাজের পক্ষে গরল। · যৌবনে মাতৃস্তন্য অনুপাদেয় খাদ্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি বয়ঃপ্রাপ্তিতে মাতৃস্তন্যের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি কমিয়া যায়? বার্ধক্যে যৌবনের খাদ্য অখাদ্য বলিয়া কি তাহাদের প্রতি বৃদ্ধদিগের ঘৃণা জন্মে?—জন্মে না একটি কারণে ;— যথাসময়ে তাহা পরিত্যক্ত হয় বলিয়া।···' সুতরাং যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনকে অবশ্যই অঙ্গীকার নিতে হবে, কিন্তু সেজন্য প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ অনুচিত। কারণ, প্রাচীনের প্রতি সকৃতজ্ঞ প্রণামনিবেদন,—প্রকৃত জাতীয়তার বিশিষ্ট লক্ষণ। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'আজ আমরা জনসমাজে যত প্রাচীন রীতিনীতি দেখিতে পাই, তাহারা বর্তমানের সম্পূর্ণ উপযোগী হউক আর নাই হউক,······একদিন তাহারাই জনসমাজের উন্নতির সহায় হইয়াছিল, একদিন তাহাদের হাত ধরিয়াই জনসমাজ জগতে দাঁড়াইয়াছিল। একদিন তাহারাই সমাজের পক্ষে অমৃত ছিল, আজ তাহারা হয়ত কাল-দোষে, গরলে পরিণত হইয়াছে'।[৪৩] তাই তিনি মনে করেন—'এই অমৃত হইতে গরলের উৎপত্তির মর্ম যিনি বুঝিয়াছেন,···রক্ষণশীলতার সঙ্গে উন্নতিশীলতার সমন্বয় ও সমাবেশ করিতে তিনিই সমর্থ হইয়াছেন'।

বিপিনচন্দ্র শুধু সমাজের গতি, প্রকৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতির তত্ত্বগত আলোচনা করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি ব্যবহারিক দিক থেকে প্রচলিত সমাজ-নীতির আলোচনা করেও বলিষ্ঠভাষায় আপন যুক্তিভূয়িষ্ঠ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। দেশপ্রচলিত কুফলপ্রসূ একটি সামাজিক নীতি ছিল—বাল্য-

বিবাহ। বিপিনচন্দ্র বাঙালীর বাল্য-বিবাহপ্রবণতার নিন্দা করে বলেন—'এদেশে বিবাহ ক্রীড়া-স্থলাভিষিক্ত, খেলার চক্ষুতে বাঙালী বিবাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাই এদেশে বৈবাহিক জীবনে এত কষ্ট, বিবাহের এত দুর্গতি'।[৪৪] 'অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী' ইত্যাদি—'পরাশরসংহিতা'র এই শ্লোকটির উপর ভিত্তি করে হিন্দুসমাজে বাল্য-বিবাহপ্রথা প্রতিষ্ঠিত। বিপিনচন্দ্র এই শ্লোকের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন—'যেরূপ ভাবে যেরূপ স্থলে এই শ্লোকটি সন্নিবেশিত আছে, তাহা দেখিয়া ইহারা বস্তুতঃ প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের রচিত কিনা তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ জন্মে। পরাশর-সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে বিবাহ সম্বন্ধে আর কোন কথাই নাই। ইহা দ্রব্য-সংশুদ্ধির অধ্যায়। দ্রব্য-সংশুদ্ধি-বিধির মধ্যে বিবাহের কাল-নিরূপক বিধি কিরূপে আসিতে পারে, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ইহা যে পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, কে বলিতে পারে?' তাঁর মতে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রীর নিম্নতম বয়স চৌদ্দ এবং পাত্রের নিম্নতম বয়স বিশ ধার্য হওয়াই বিধেয়। এর চেয়ে কম বয়সে বিবাহকেই বাল্য-বিবাহ বলে গণ্য করা উচিত। বাল্য-বিবাহের কুফলের কথা চিন্তা করে এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য সকলেরই উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন। তবে এই কুপ্রথা সম্পূর্ণ নিবারণের জন্য সহসা কোনো পন্থা অবলম্বন তিনি সম্ভব ও ইষ্টকর বলে মনে করেননি। তাঁর মতে—'জনসাধারণের মত গঠিত হওয়াই সর্বপ্রকার সামাজিক কুপ্রথা নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। বাল্য-বিবাহ নিবারণার্থেও এই উপায় অবলম্বিত হওয়া প্রার্থনীয়'।

ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির বিচারে বিপিনচন্দ্র শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা স্বানুভূতির পক্ষপাতী ছিলেন বেশী—একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ১২৯২ বঙ্গাব্দের ২৮শে বৈশাখ 'নব জীবন'-সম্পাদক প্রখ্যাত প্রবন্ধকার অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাবিত্রী পুস্তকালয়'-এর বার্ষিক অধিবেশনে 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ উচিত কিনা' এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৪৫] ঐ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল সংক্ষেপে এইরকম :

(১) হিন্দুর বিবাহ আধ্যাত্মিক ব্যাপার ; শরীরের যোগ নয়, আত্মার যোগ। আত্মা চিরজীবী ; আত্মায় আত্মায় যোগ অনন্তকাল স্থায়ী। অতএব

আত্মার যোগের বিয়োগ নেই। বিধবার বিবাহে ধর্ম নেই। বিধবা বিবাহার্থিনী না হয়ে ব্রহ্মচারিণী হবেন—এটাই শাস্ত্র, নীতি ও যুক্তি-সঙ্গত।

(২) 'প্রবৃত্তিরেষা নারীণাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'। প্রবৃত্তি নারীর পক্ষে স্বাভাবিক, তবে মহাফললাভের আশায় তাঁরা নিবৃত্তিমার্গের সাধনা করেন।

(৩) হিন্দু নারী একবার যে কুলে গৃহীতা, নীতা ও পরিণীতা হয়, সে কোনো প্রকারে আর সে কুল ত্যাগ করতে পারে না। কুলত্যাগিনী, কুলটা-ব্যাভিচারিণী, হিন্দুর অভিধানে একই পর্যায়ভুক্ত।

শিক্ষিত বাঙালীর মন থেকে যখন বিধবা-বিবাহ-বিরোধী ভাব দূরীভূত হয়ে গেছে এবং কী ভাবে বিধবাবিবাহ কার্যতঃ সমাজে প্রচলিত করা যায়, তার উপায় উদ্ভাবনে তাঁরা ব্যস্ত, এমন সময় অক্ষয়চন্দ্রের বিধবা-বিবাহ-বিরোধী প্রচার-মূলক প্রবন্ধপাঠ প্রগতিপন্থী তরুণ বিপিনচন্দ্রের বিরক্তিকর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিপিনচন্দ্র তখন 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন'-এর সহ-সম্পাদক এবং বয়সে ছাব্বিশ বছরের যুবক। তিনি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্যের প্রতিবাদে তিনি ঐ সভায় বক্তৃতা দান করেন এবং সেই বক্তৃতার সার-সংক্ষেপ 'অক্ষয়বাবু ও বিধবা-বিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধের আকারে 'আলোচনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৪৬]

ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেন যে হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা—এ প্রশ্নের মীমাংসা দুই ভাবে করতে পারা যায়। এক—শাস্ত্রালোচনার মাধ্যমে; দুই—যুক্তি অবলম্বন করে বুদ্ধি ও বিবেকের সাহায্যে। শাস্ত্রানুযায়ী এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় করে গেছেন। সুতরাং বুদ্ধি ও বিবেকের সাহায্যে আলোচনা করা যেতে পারে।

হিন্দুর বিবাহ আধ্যাত্মিক ব্যাপার—একথা মেনে নিয়েই বিপিনচন্দ্র বলতে চান যে বিবাহকে এইভাবে গ্রহণ করবার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, সে প্রস্তুতির জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কোথায়? আর যে দেশে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত, সে দেশের নাবালক-নাবালিকার মনে এভাব উদ্রেকের অবকাশই বা কোথায়? বাল্য-বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহ ব্যাপার সম্পর্কেই কোনো স্পষ্ট ধারণার উদ্রেক হয় কি না সন্দেহ—আধ্যাত্মিকতা তো দূরের কথা।

অক্ষয়বাবুর মতে প্রবৃত্তিই যদি নারীর পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়, তা' হলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা নিরর্থক। কারণ—'যে পুরুষ বা রমণী বিপত্নীক বা বিধবা হইয়া পুনরায় বিবাহেচ্ছু হন, তাঁহাদের পূর্ব-বিবাহ প্রকৃত প্রেমের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয় নাই; সুতরাং তাঁহাদের পুনর্বিবাহ অন্যায় নহে'। আর বাল্যবিবাহে বালক-বালিকার মনে প্রেমভাবের বিকাশ না হওয়াই তো স্বাভাবিক। বিপিনচন্দ্র মনে করেন—'যে দম্পতি মিলনে বর্তমানে বিভোর, বিচ্ছেদে অতীতে নিমগ্ন, সেই দম্পতিই আদর্শ দম্পতি। তাঁহাদের বিবাহই আদর্শ বিবাহ। এ বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য, অবিনশ্বর, অনন্তকালস্থায়ী। এ দম্পতির জীবনে বৈধব্য বা বিপত্নীকতা দুয়ের কিছুই নাই।...এইরূপ রমণীর স্বামীর লৌকিক মৃত্যুতে পুনর্বিবাহের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না'।

অক্ষয়বাবুর বক্তব্যের তৃতীয় যুক্তি অর্থাৎ হিন্দুবিবাহের কৌলিকতাও—বিপিনচন্দ্র গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ, হিন্দুবিবাহকে প্রচলিত অবস্থায় কৌলিক বিবাহ বা 'ক্ল্যান ম্যারেজ'-রূপে গ্রহণ করা যায় না। সভ্যতার প্রথম অবস্থায় ঐ রকম বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। তা' ছাড়া কুলত্যাগ করলেই যদি কোনো নারী কুলটা হন, তা' হলে বিবাহের পর যখন নারী পিতৃকুল ত্যাগ করে পতির কুলে আসেন, তখনও তো তাকে কুলত্যাগিনী অতএব কুলটা বলতে হয়।

এই প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্রের শেষ বক্তব্য : '...এমন হিন্দু বিধবা দুই চারিজন খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে, যাঁহাদের জীবন অক্ষয়বাবুর চিত্রের অনুরূপ হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ হিন্দু বিধবার পক্ষে এ চিত্র খাটে না—খাটা অসম্ভব।... তুমি আমি ষড়রিপুর দাস,...অধার্মিকের অধার্মিক, ইহা কি জান না? আর আমরাই যে রমণীগণের ভ্রাতা বা পিতা বা অপর আত্মীয়-স্বজন, সে রমণীগণ সর্বপ্রকার পুতিগন্ধ হইতে মুক্ত থাকিয়া, নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মচর্যধর্ম পালন করিতেছে—এ অসম্ভব কথা প্রচার কর কেমন করিয়া, বুঝিয়া উঠিতে পারি না'।

বিপিনচন্দ্র প্রাচীন বর্ণাশ্রম-ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন—এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন —'বর্ণাশ্রম-ধর্ম ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাধনার এক অপূর্ব সম্পত্তি। জগতের আর কোথাও ইহা পাওয়া যায় না।'[৪৭] বর্ণাশ্রম-ধর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে সংক্ষেপে তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন—'...অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের সনাতন

আর্য সাধনা বিবিধ অনার্যসমাজে আপনার বিশেষ সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সকল অনার্যসমাজকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়াছে। এই বিশেষ আর্যসমাজতন্ত্রকেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম বলে।' তাঁর মতে—'...এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম অবলম্বনেই প্রাচীন ভারতে অনেক জাতি এক বহুমুখী সাধনার অন্তর্গত হইয়া এই বিশাল ও বহুশাখ হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল'। তাই বর্ণাশ্রম-ধর্মের অবক্ষয়ে খেদ প্রকাশ করে এই প্রবন্ধেই তিনি মন্তব্য করেছেন—'দুর্দিনে পড়িয়া এই বর্ণাশ্রমধর্ম আশ্রমবিহীন, সুতরাং ধর্মচ্যুত হইয়া বর্ণভেদে পরিণত হইয়াছে। বর্ণ হইতে আশ্রমকে পৃথক করিলে যে বর্ণ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহার উপর বর্ণভেদ বা জাতিভেদকে প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম তিষ্ঠিতে পারে না।...বর্ণভেদ বা জাতিভেদ বর্ণাশ্রমধর্ম নহে।'

হিন্দুসমাজে পালিত নানাবিধ প্রথা ও রীতিনীতিকে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশ্লেষণ করে বিপিনচন্দ্র সেগুলির প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ঘাটনে উদ্যোগী হয়েছেন। এই ধরনের একটি বিশেষ প্রথা হচ্ছে—শ্রাদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে শ্রাদ্ধ-ব্যাপারটা কী,—এ সম্পর্কে শাস্ত্রে অনেক আলোচনা থাকলেও একদিন যে এ বিষয়ে তাঁর কোনো জ্ঞান বা শ্রদ্ধা কিছুই ছিল না সে-কথা স্বীকার করে তিনি বলেছেন—এগুলিকে সরাসরিভাবে সুপারস্টিশন বা পুরাগত অর্থহীন সংস্কার বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলাম'।[৪৮] এই স্বীকারোক্তির নেপথ্যে সম্ভবতঃ বিপিনচন্দ্রের সদ্য-আরব্ধ যৌবনের বেদনাময় আত্ম-স্মৃতি জাগরূক ছিল। মায়ের একমাত্র পুত্র-সন্তান হওয়া সত্ত্বেও নব্য শিক্ষা-দীক্ষার গর্বে কুসংস্কার-মুক্তির অবুঝ উল্লাসে মত্ত হয়ে মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পাদনে অবহেলা প্রকাশ করে তিনি গৌরব বোধ করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এই স্মৃতি সম্ভবতঃ তাঁকে পরবর্তীকালে পরিণত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে হিন্দুসমাজের শ্রাদ্ধতত্ত্বের তাৎপর্য অনুধাবনে ও উদ্ঘাটনে অলক্ষ্য প্রেরণা জুগিয়েছিল।

'হিন্দু শ্রাদ্ধের অর্থ ও অধিকার' শীর্ষক একটি বড়ো প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।[৪৯]

'প্রচলিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্যে বিস্তর ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার আছে'—একথা স্বীকার করেও বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'...শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্রাচীন অর্থ যাহাই থাকুক না, কালক্রমে সমাজবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে অর্থটা বদলাইয়া, এখন

ইহার মধ্যে এমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহাকে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষাও একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না'।

মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের ফল সত্যসত্যই মৃতের কাছে পৌঁছায় কি না—এ একটা দীর্ঘ দিনের জটিল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সদুত্তরের সন্ধানে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং সেখান থেকে উত্তরের সূত্র উদ্ধার করে তিনি ব্যাপারটি ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি বলেছেন—'আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে বলে জীবের যেমন একটা ভৌতিক স্থূল দেহ আছে, সেইরূপ একটা সূক্ষ্ম দেহও আছে। মৃত্যুতে এই ভৌতিক দেহই নষ্ট হয়, এই ভৌতিক শরীরের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ-শরীর আছে, তাহা বিনষ্ট হয় না। মৃত্যুর পরে ঐ লিঙ্গ-দেহকে আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা আপনার বৈশিষ্ট্য, আপনার স্বাতন্ত্র্য, আপনার ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করে।...এই লিঙ্গ-শরীরের জন্যই শ্রাদ্ধের প্রয়োজন। লিঙ্গ-শরীরই মরিয়াও সংসারের সম্বন্ধের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়া, শোক-দুঃখাদি ভোগ করে।...দেহ না থাকিলেও, স্বপ্নাবিষ্ট লোকের মতো, দেহের ক্ষুৎ-পিপাসাদির দ্বারা পীড়িত হয়। এইজন্য পিণ্ডাদি দান করিয়া তাহার তৃপ্তিসাধন করিতে হয়।' প্রাচীন শাস্ত্রের এই শ্রাদ্ধ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিপিনচন্দ্রকে তৃপ্তি দান করতে পারেনি। তার কারণ, ঐ ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে ইন্দ্রজালের প্রভাব লক্ষণীয়। অথচ বিপিনচন্দ্র ইন্দ্রজালের পক্ষপাতী নন। তাই তিনি ভিন্ন পথে হিন্দুর শ্রাদ্ধের তাৎপর্য সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই তিনি বলেছেন—'...সত্য রসের সম্বন্ধ যেখানে গড়িয়া উঠে, সেইখানে তার পশ্চাতে যেন একটা অনন্তকালের ইতিহাস, একটা অনাদি অনন্ত রহস্য লুকাইয়া আছে, মনে হয়।'

একটি দৃষ্টান্ত উত্থাপন করতে গিয়ে ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—'পিতার বা মাতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি কেবল এই বর্তমান জীবনের না চিরদিনের? যদি এই জীবনেই এই সম্বন্ধের আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে এই জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই তার শেষ হইবে না বা হয় নাই—একথা কে বলিবে?' কিন্তু যুক্তির দিক থেকে যিনি যা'ই বলুন, রসানুভূতির দিক থেকে বিপিনচন্দ্র কখনই তা' স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নন। তাঁর হৃদয় বলে—'পিতামাতার সঙ্গে তাঁহাদের নিজ নিজ পুত্র-কন্যার সম্বন্ধ যদি নিত্য না হয়, অনাদিকাল হইতে যদি ইহারা পরস্পরে এই সম্বন্ধে আবদ্ধ না থাকেন, তবে ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া, এ সংসারে

ভগবানের বাৎসল্য-লীলার অভিনয় অসম্ভব হয়। নিত্যকাল আমি আমার পিতার পুত্র, নিত্যকাল তিনি আমার পিতা, নিত্যকাল আমাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার বাৎসল্য ফুটিয়া আসিতেছে, নিত্যকাল তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার পিতৃভক্তি ও দাস্যরস ফুটিয়া আসিয়াছে, এ যদি সত্য না হয়, তবে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জীবনাবধি ; মৃত্যুর পরে সে সম্বন্ধের অনুসরণ বা অনুশীলন করা কুসংস্কার ও পণ্ডশ্রম মাত্র।...আর এ সকল রস যদি স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে পিতৃশ্রাদ্ধের প্রয়োজনই বা কি ?'

এর পর বিপিনচন্দ্র শ্রাদ্ধের অর্থ ও অধিকারের সমন্বয়সাধনের উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের শেষভাগে মন্তব্য করেছেন : 'এই সকল নিত্যসম্বন্ধের নিত্যত্বের জ্ঞান জাগাইয়া রাখিবার ও প্রোজ্জ্বল করিবার জন্যই, ভক্তিপথের পথিকের নিমিত্ত এই সকল শ্রাদ্ধাদি-অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। তাহার নিকট শ্রাদ্ধ প্রাচীন বৈদিক যাগযজ্ঞের ন্যায় কেবল একটা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া নহে। তাহার নিকটে শ্রাদ্ধ একটা বাহ্য সামাজিক ক্রিয়াও নহে। তাহার নিকট শ্রাদ্ধ ভক্তিপথের শ্রেষ্ঠ সাধন।'

বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্র-চিন্তায় সাম্যের একটি স্থান ছিল। 'বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্র-চিন্তা' পর্যায়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সে-কথা আলোচিত হয়েছে। রাষ্ট্র-চিন্তার মতো তাঁর সমাজ-চিন্তাতেও সাম্যাদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'সাম্যবাদ ও সাম্যসাধন' শীর্ষক প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যেতে পারে।[৫০]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির মাধ্যমে সাম্যের ভাবধারা বাঙালীর রাষ্ট্র-চিন্তায় ও সমাজ-চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, যদিও অতি প্রাচীনকালেই সাম্য-চিন্তার উদ্ভব ঘটে। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'...সাধক যেদিন নিজের ভিতরে ব্রহ্মের প্রকাশ অনুভব করিলেন, বিশ্বের সর্বত্র সেই একই ব্রহ্মের প্রকাশ দেখিতে লাগিলেন, সেইদিন হইতেই ভারতে এক অধ্যাত্ম সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।' শুধু ভারতবর্ষে কেন, খৃষ্টীয় যুগে পাশ্চাত্য জগতে সেণ্ট পলও প্রচার করেছিলেন যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। তারও পূর্বে প্রাচীন গ্রীসে নগর-রাষ্ট্রের যুগে সীমিত আকারে সাম্যবাদ-ভিত্তিক অধিকার-তত্ত্ব কার্যকর করা হয়েছিল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও কোনো দেশেই বাস্তবাধিকারের ক্ষেত্রে বিপুল বৈষম্যের অবসান ঘটেনি। এই ধরনের

বৈষম্যের প্রতিবাদেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও উত্তর আমেরিকার কয়েকজন বিপ্লবী চিন্তানায়কের কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে ওঠে। এঁদের মধ্যে রুশো, টম পেইন ও জেফারসনের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের চিন্তাধারাপ্রসূত সাম্যবাদের নেপথ্যে ধর্মীয় ভাব ক্রিয়াশীল ছিল না; তা' ছিল রাজনৈতিক ধ্যানধারণাপ্রসূত। কারণ, ইউরোপে এর পূর্বেই ধর্মনীতি থেকে রাষ্ট্রনীতি পৃথক হয়ে গেছে।

যাই হোক্, এর পর থেকে ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজ-চিন্তায় 'সাম্য' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে এবং সাম্যের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত হতে থাকে। এক শ্রেণীর সমালোচক সাম্যকে স্বাধীনতার পরিপন্থী বলতেও ক্ষান্ত হন না, আর এক শ্রেণীর সমালোচক নৈসর্গিক তারতম্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে অধিকারগত বৈষম্যের সমর্থনের চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্ত বাদ-বিতণ্ডা অতিক্রম করে যে অভিমত সাম্যের স্বপক্ষে প্রায়-সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে, তা' হচ্ছে এই যে—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত যেমন স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে, তেমনি সামাজিক সাম্য অর্থাৎ অধিকারগত সাম্য ব্যতীত সামাজিক উন্নতিও অর্থহীন হতে বাধ্য। সাম্যবাদের প্রবক্তারা নৈসর্গিক তারতম্যের জন্য অবস্থাগত তারতম্যের কথা স্বীকার করে নিয়েও অধিকারের ক্ষেত্রে সাম্যের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। এই সমস্ত চিন্তাধারা ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষীদের চিন্তাকে আকৃষ্ট করতে থাকে এবং বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যনীতির একজন প্রধান প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। তিনিও নৈসর্গিক তারতম্যের কথা মেনে নিয়েও অধিকারগত সাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[৫১]

পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এবং বঙ্কিম-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত বিপিনচন্দ্রও উল্লিখিত প্রবন্ধে তাঁর সমকালীন ইংরেজ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবিদ্ লাস্কির মতো[৫২] সাধ্য ও শক্তির অনুপাতে অধিকার-নির্ণয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রাগুক্ত প্রবন্ধে বলেন—'অথচ কতকগুলি বিষয় আছে, যাহার সম্বন্ধে সকল মানুষেরই সমান অধিকার থাকা সঙ্গত।...বাঁচিবার অধিকার, বাড়িবার অধিকার, সুখী হইবার অধিকার, দুঃখ এড়াইবার অধিকার—এ সকল অধিকার সকল মানুষেরই আছে।' ভারতের আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবনিষ্ঠ এবং যুক্তিবাদী বিপিনচন্দ্র সম্ভবতঃ এ কথা জানতেন যে আইনের দ্বারা এই

সমস্ত অধিকার প্রদত্ত না হলে আধ্যাত্মিক সাম্য কখনই বৈষয়িক বৈষম্যের অবসান ঘটাতে পারে না। আবার হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের মতো তাঁর মনেও অনুচ্চারিত প্রশ্ন ছিল: 'তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয়বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটা বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।'[৫৩] তাই আলোচ্যমান প্রবন্ধের উপসংহারে বিপিনচন্দ্র প্রাচীন প্রাচ্য এবং আধুনিক প্রতীচ্য সাম্যবাদ—উভয়ের অপূর্ণতা সম্পর্কে অবহিত হয়েই মন্তব্য করেছেন—'জনসমাজকে সাম্যের আদর্শের অনুকূল করাই য়ুরোপের সাধনার লক্ষ্য। য়ুরোপ সাম্যের বহিরঙ্গটা গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে; অন্তরঙ্গের দিকে তেমন দৃষ্টি করিতেছে না। আমরা আবার কেবল 'সাম্যের অন্তরঙ্গসাধনের জন্যই ব্যস্ত ছিলাম।... সুতরাং য়ুরোপের মতন আমাদিগেরও সাম্যসাধনা অপূর্ণ ও একদেশদর্শী হইয়া রহিয়াছে।' তাই তাঁর সিদ্ধান্ত: 'সাধনার সিদ্ধির জন্য য়ুরোপকে সাম্যের অন্তরঙ্গসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আর এই সাধনে ভারতবর্ষকেই তাহার শিক্ষাগুরু বলিয়া বরণ করিতে হইবে। আমাদিগকেও সেইরূপ আমাদের সাম্যসাধনকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য য়ুরোপের অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাম্যের বহিরঙ্গ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইবে।'

এই পর্যায়ের আলোচনা থেকে এই ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে সমাজ-তত্ত্বের আলোচনায় বিপিনচন্দ্র বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও তথ্যের হাত ধরে অগ্রসর হয়েছেন; আর সমাজনীতির বিচারের ক্ষেত্রে শাস্ত্র ও স্বানুভূতির যৌথ মাধ্যমকে অঙ্গীকার করে দেশ-প্রচলিত সমাজনীতিকে একটা সর্বজনগ্রাহ্য ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠাদানের চেষ্টা করেছেন।

রাষ্ট্রদর্শন ও রাজনীতি:

বিপিনচন্দ্র ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন অক্লান্ত সৈনিক। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দীকালব্যাপী ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী এবং ব্যক্তিগতভাবে তার একজন সক্রিয় অংশীদার। সেই সুদীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছেন এবং অজস্র বক্তৃতায় ও রচনায় প্রতিটি

পর্যায় সম্পর্কে নিজস্ব মতামত অকপট ভাষায় ব্যক্ত করে গেছেন। এইভাবেই তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা এক সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই বিপিনচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব পূর্ণদীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে এবং সেই সময় থেকেই তিনি রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় একাধারে তাত্ত্বিক ও ভাষ্যকাররূপে আবির্ভূত হন। তাঁর তত্ত্বগত ভাবনা অর্থাৎ রাষ্ট্রদর্শন পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তা' পর্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এই পর্যায়ে ব্যবহারিক রাজনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তার মধ্য থেকে নির্বাচিত কতকগুলি প্রবন্ধ অবলম্বন করে তাঁর মতামতের আলোচনা করা হবে।

বিপিনচন্দ্র-রচিত নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি 'রাষ্ট্রদর্শন ও রাজনীতি' পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির দাবি রাখে :[৫৪]

রাজধর্ম ; প্রশ্নোত্তর ; আমাদের ভলান্টিয়ার দল ; রাজা প্রজা ; বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা ; বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা ; জাপান ও হিন্দু-আসীয় সাধনা ; মায়ার পথ ও মুক্তির পথ ; স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজম্ ; নেশন বা জাতি ; শিবাজী উৎসব ; শিবাজী উৎসব ও ভবানীমূর্তি ; আগামী কংগ্রেসের প্রধান সমস্যা ; কংগ্রেসী কথা ; আবেদন ও আন্দোলন ; রাজভক্তি ; কংগ্রেসের কথা ; ইজ্জৎ ; ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস মিশন ; স্বদেশী ও বয়কট ; রাখী-বন্ধন ; রুমের বাদশাহ্ ও ভারতের মুসলমানসমাজ ; দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী ; পাশ্চাত্য গণতন্ত্রতা ; ভারতের ভবিষ্যৎ ও লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসননীতি ; দিল্লীর বোমা-বিভ্রাট ও হার্ডিঞ্জ নীতি ; নির্বাচন-নীতি ; নির্বাচন-নীতি ও সামাজিক কল্যাণ ; স্বাধীনতার অন্বেষণে ; আমরা কী চাই ? ; অনধীনতা না পরাধীনতা ; কঃ পন্থা ? ; আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ ; হিন্দু-মুসলমানের মিলন ; হিন্দু-মুসলমান আঁতাত ; রাষ্ট্রীয় ভারত (হিন্দু-মুসলমান) ; পলিটিক্স বা রাষ্ট্রধর্ম ; মনুষ্যত্বসাধনে নেশনধর্ম ; হিন্দু মহাসভা।

উপরি-লিখিত প্রবন্ধগুলির প্রকাশকাল বৈশাখ, ১৩১২ (এপ্রিল-মে, ১৯০৫) থেকে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ (মে-জুন, ১৯২৪) পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তাই আলোচ্যমান প্রবন্ধগুলির বক্তব্য দেশের সমকালীন পরিস্থিতির পটভূমিকায় বিচার্য।

এই পর্যায়ের প্রথম প্রবন্ধ হচ্ছে 'রাজধর্ম'।[৫৫] এই প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকর করবার জন্য বৃটিশরাজ বদ্ধপরিকর।

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য নানাবিধ জনমনবিরোধী সরকারী সিদ্ধান্তের জন্য তখন ধীরে ধীরে ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙালীর মনে তীব্র ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করেছে। অথচ বলদর্পী বৃটিশরাজ ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের ক্ষোভ প্রশমনের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র বিদ্বেষমুক্ত মনে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে তৎকালীন রাজশক্তিকে প্রকৃত রাজধর্ম সম্পর্কে সচেতন করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

প্রজাশক্তি ও রাজশক্তির আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'…প্রজাশক্তি হইতেই রাজশক্তির উৎপত্তি হয়। প্রজা যদি রাজ-আধার হইতে আপনার বিপুল শক্তিরাশি প্রত্যাহার করে, রাজার পক্ষে মুহূর্তকালের জন্যও শাসনদণ্ড ধারণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে।… প্রজা আত্মপ্রয়োজনেই রাজার সৃষ্টি করে। আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতির সুব্যবস্থা করিবার জন্যই প্রকৃতিপুঞ্জ আপনাদিগের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ও তাহার বশ্যতা স্বীকার করে।' সুতরাং তাঁর মতে—'রাজা আপনার সুখভোগ বা সুখ-অন্বেষণে নহে কিন্তু প্রজার কল্যাণ-সাধনে রাজ্যের সমুদয় শক্তিকে নিয়োজিত করিবে, ইহাই সনাতন রাজধর্ম। · প্রজার প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়ে রাজশক্তি প্রযুক্ত হইলেই রাজধর্মের ভীষণ ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে এবং এই ব্যভিচার-নিবন্ধন ক্রমে প্রজাধর্মও বিলোপ-প্রাপ্ত হয় এবং সমাজমধ্যে অত্যাচার, অবিচার, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিপ্লবাদি আনয়ন করিয়া থাকে'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিপিনচন্দ্রের এই অভিমতের মধ্যে 'সামাজিক চুক্তি-মতবাদ'-এর, বিশেষতঃ, লকের অভিমতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[৫৬] বঙ্গভঙ্গোত্তর পরিস্থিতিকে ভবিষ্যদৃষ্টির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করে তিনি যেন আগে থেকেই সমকালীন রাজশক্তির উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। আদর্শ রাজধর্মের রূপ কেমন হওয়া উচিত তা' পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি সাহিত্যিক বাক্‌ভঙ্গিতে বলেছেন—'বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষ যেমন আপনার সমুদয় জীবনীশক্তিকে বীজরূপেই পরিণত করিয়া কৃতার্থ হয়, সেইরূপ বিপুল প্রজাশক্তি হইতে প্রচ্ছন্নভাবে উৎপন্ন রাজশক্তিও পরিস্ফুট ও পরিপক্ক আকারে পুনরায় সেই প্রজামণ্ডলীতেই প্রত্যাবর্তন করে। এইরূপে রাজশক্তি সাক্ষাৎভাবে প্রজাপুঞ্জে প্রত্যর্পিত হইলেই রাজধর্ম পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে এর পূর্বেই লিখেছিলেন—'সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল'।

ইংরেজের উদারনীতির উপর তখন এদেশবাসীর আস্থা অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে গেছে। তার প্রধান কারণ, ইংরেজের উদার ঘোষণাসমূহ যতটা মৌখিক, ততটা আন্তরিক নয়—এ সত্য পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে ইংরেজ যে প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে, পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে উঠলেই আর সে তা' পালনে আগ্রহ দেখায় না। কারণ, তার উদারনীতি ধর্মপ্রণোদিত অর্থাৎ প্রজাকল্যাণের আন্তরিক সদিচ্ছাপ্রসূত নয়, তার উদার-নীতির উৎস হচ্ছে তার সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি। বঙ্গভঙ্গের ঠিক সমসাময়িককালে প্রকাশিত 'রাজা ও প্রজা' শীর্ষক প্রবন্ধে[৫৭] বিপিনচন্দ্র ইংরেজদের এই মনো-ভাবের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজ শাসকমণ্ডলীর সাময়িক বিপর্যয়, তার অব্যবহিত পরবর্তীকালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার উদার ঘোষণা এবং সে ঘোষণার শেষ পরিণতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—'আজও যদি আপনার স্বার্থরক্ষার জন্য সে উদারতা আবশ্যক মনে করিত ইংরেজ প্রাণপণে তাহা অবলম্বন করিয়া চলিত। কিন্তু আজ ইংরেজ ভারতে অভয়পদ পাইয়াছে। প্রজামণ্ডলী দুর্বল, নিঃস্ব, নিরস্ত্র ও নির্বীর্য হইয়া পড়িয়াছে।··· ইংরেজের আধুনিক অত্যাচার-প্রবণতা ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের নিশ্চেষ্টতা ও বীর্যহীনতারই প্রতিফল।'

ইংরেজদের অত্যাচার-প্রবণতার বিশেষ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একটি জাতি-বর্ণ-নিরপেক্ষ নির্বিশেষ সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছেন—'.. ইংরেজ আজ যাহা করিতেছে, তাহার মূল মানব-প্রকৃতির মধ্যে। ইংরেজ আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে, তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলে, আমরাও আমাদিগের অধীনস্থ জনমণ্ডলীর প্রতি ঠিক তাহাই করিতাম।' একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বিষয়টি পরিস্ফুট করে তুলতে গিয়ে আরও বলেছেন—'জাপানের মহত্ত্বে, জাপানের সংযমে ও আত্মত্যাগে, জাপানের ধর্মভীরুতায় আজ জগৎ বিমুগ্ধ, বিস্মিত, নতশির হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ করিতেছে। কিন্তু

এই জাপান যদি দ্বিশতবর্ষাধিককাল ইংরেজের মত একটা বিরাটকায় নির্বীর্য জাতির উপরে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজনৈতিক অধিকার ও আধিপত্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহার এ সদ্‌গুণ বেশীদিন কখনই টিকিয়া থাকিবে না'। এই ধরনের অবস্থার প্রতিকারের পথ-নির্দেশ করতে গিয়ে তাই আলোচ্যমান প্রবন্ধের শেষে তিনি বলেছেন—'অতএব ইংরেজকে যেমন বুঝিতে হইবে যে, প্রজাশক্তির আনুকূল্যলাভ ব্যতীত ভারতে তাহার প্রভুত্ব হইতে পারিবে না, সেইরূপ ভারতের প্রজাসাধারণকেও ইহা বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের আত্মশক্তি জাগ্রত, সংহত ও যথাযোগ্য বিষয়ে প্রযুক্ত না হইলে এদেশে ইংরেজ প্রভুশক্তি কদাপি জাতীয় জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদনের সহায় হইতে পারিবে না'। অর্থাৎ জাগ্রত এবং আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ প্রজাশক্তিই যে বলদর্পী রাজশক্তিকে সংযত রাখবার একমাত্র অস্ত্র—এ-ই হচ্ছে এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য।

'বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা' এবং 'বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টিও বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত রূপায়ণের সমসাময়িক রচনা।[৫৮] স্মরণ রাখতে হবে যে, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সেই উন্মাদনার যুগে বিপিনচন্দ্র ছিলেন নব্য বিপ্লবী ভাবধারার শুধু অন্যতম নন, বলিষ্ঠতম প্রচারক। যুব-বাংলা, তথা যুব-ভারতের রাজনৈতিক জাগরণে তাঁর সম্মোহনী কণ্ঠস্বরের প্রভাব ছিল অনন্য। বাগ্মী বিপিনচন্দ্র ছিলেন অগ্নি-উদ্‌গারী, কিন্তু লেখক বিপিনচন্দ্র ছিলেন বিস্ময়করভাবে সমগ্র পরিস্থিতির স্থিতধী ভাষ্যকার।

উল্লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ের প্রথমটিতে বিপিনচন্দ্র বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বঙ্গভঙ্গপ্রসূত পরিস্থিতি বিচার করে প্রথমেই বলেছেন—'বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা অধিকাংশ স্থলেই আমার নিকট অলীক ও অসার বলিয়া মনে হয়। সাক্ষাৎভাবে এই বঙ্গ-বিভাগের দ্বারা আমাদের মানসিক বা নৈতিক, বা অর্থগত বা সমাজগত কোন বিশেষ অনিষ্টপাতের আশঙ্কা আছে, ইহা আমি মনে করি না'। তাঁর এই ধারণার কারণ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে বঙ্গভঙ্গজনিত প্রকৃত ক্ষতির সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে তিনি বলেছেন—'আসল কথাটা এই যে, ইহা দ্বারা ইংরেজ এমন এক স্থানে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, যাহার উপরে আমাদের সকল ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মুক্তি নির্ভর করিতেছে। এই প্রস্তাবের দ্বারা ইংরেজ-

রাজ আমাদের নবোন্মেষিত জাতীয় জীবনের কেবল যে পেলব পল্লবে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু তাহার মূলে একেবারে আপনার সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইবার চেষ্টা করিতেছে।' তাঁর মতে—'…বঙ্গবিভাগ কেবল বাংলার নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের নবোন্মেষিত জাতীয় জীবনের উপরে বিষম কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে।'

প্রথম প্রবন্ধে তিনি বঙ্গভঙ্গোত্তর অবস্থার একটি যথার্থ চিত্র অঙ্কন করে, দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি ব্যবস্থার পথ-নির্দেশ করেছেন। আয়তনের বিশালতার জন্য প্রশাসনিক অসুবিধার কথা—ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর একটা অজুহাত মাত্র। বিপিনচন্দ্রের ধারণায়—'ইহার মূলে গভীর, কুটিল রাজনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ইংরেজ এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; সহজে কদাপি ইহা হইতে বিরত হইবে না'। সে গভীর, কুটিল রাজনীতি হচ্ছে,—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করে সদ্য-অঙ্কুরিত জাতীয়তাবোধের বিনাশসাধন। এই কুচক্রান্ত নষ্ট করতে হলে তাঁর মতে 'প্রথমত যে সূত্রে হিন্দুমুসলমানে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, তাহা নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। ইহার এক সূত্র সরকারী চাকুরি, অপর সরকারী অবৈতনিক সম্মানার্হ পদ ও খ্যাতি। এই দুই লোভ যদি জয় করিতে পারি তবে ইংরেজ শত চেষ্টা করিয়াও আমাদিগের মধ্যে কোনো বিরোধ উৎপাদন করিতে পারিবে না ··'। এছাড়া—'…হিন্দুদিগের মধ্যে মুসলমানের এবং মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর সাহিত্য ও সাধনার সম্যক প্রচার করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান করিতে হইবে। বিদেশীয় পণ্য-ব্যবহার হইতে বিরত হইয়া বঙ্গ-বিভাগ নিবারণের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাকে সর্ব প্রযত্নে জাগাইয়া রাখিতে হইবে।'

এর কয়েকমাস পরে প্রকাশিত 'স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজম্' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং তার অনুবৃত্তি 'নেশন বা জাতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রাচীন আর্য-সভ্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণে এবং স্বদেশচর্যার বাস্তবনিষ্ঠ ব্যাখ্যানে বিপিনচন্দ্রের গভীর ও ব্যাপক চিন্তাশক্তির পরিচয়বাহী।[৫৯]

'স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজম্' শীর্ষক প্রবন্ধের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন—'যে ভাব ও আদর্শকে আমরা এখন স্বদেশী নামে নির্দেশ করিতেছি, তাহা এদেশে নিতান্তই নূতন।…ইংরাজীতে ইহাকে পেট্রিয়টিজম্ বলে।…এ বস্তু পূর্বে

আমাদের দেশে ছিল না, আমাদের ভাষায় ইহার নাম নাই।' তারপর পেট্রিয়টিজমের আদি উৎসের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে তিনি বলেছেন—'য়ুরোপে গ্রীকেরা পেট্রিয়টিজমের আদিগুরু ছিলেন। গ্রীক সমাজ-তত্ত্বের মধ্যে এই অপূর্ব স্বদেশচর্যের বীজ নিহিত ছিল।' গ্রীক এবং হিন্দু—উভয়েই বিশাল আর্যজাতির দু'টি ভিন্ন শাখা। সুতরাং উভয়ের মধ্যেই আর্যকুল-লক্ষণ বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। সূত্রাকারে এই আর্য কুল-লক্ষণের উল্লেখ করে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'আর্যের লক্ষণ দুই—এক তাহার তীক্ষ্ণ তত্ত্বদৃষ্টি, দ্বিতীয় তাহার সমদর্শী সমাজ-গঠন।' সুপ্রাচীন কাল থেকে উভয় জাতি এই দ্বিবিধ আর্য-লক্ষণের অধিকারী হলেও উভয়ের তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ কিন্তু একই প্রণালী অনুসরণ করেনি। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'হিন্দু বিশিষ্টকে উপেক্ষা ও বর্জন করিয়া নির্বিশেষভাবে তত্ত্ববস্তুকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। সকল জাগতিক সম্বন্ধকে অলীক বা মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, হিন্দু জগদতীত ও মায়াতীত, নির্গুণ নির্বিশেষ চৈতন্য-বস্তুর অন্বেষণে গিয়াছে। গ্রীক সে পথে যায় নাই। হিন্দু মুখ্যত নির্গুণবাদী, গ্রীক মুখ্যত সগুণবাদী। গ্রীক জগতের সম্বন্ধসমূহকে একান্ত অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া তাহার উপরে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে। হিন্দু সম্বন্ধকে উপেক্ষা করে নাই, কিন্তু এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে সকল সম্বন্ধের আধার ও অবলম্বনরূপে তত্ত্ববস্তুকে পাইতে প্রয়াস পাইয়াছে। এখানেই গ্রীক ও হিন্দুর মধ্যে বিশাল প্রভেদ দাঁড়াইয়া যায়।

এইজন্য তাঁর মতে গ্রীসে ও প্রাচীন ভারতে সামাজিক আদর্শ একই ধারায় বিকাশ লাভ করতে পারেনি। 'ভারতের ধর্ম যেমন সনাতন, গ্রীসের স্টেট সেইরূপ সনাতন বস্তু। ভারতে ধর্মের শাসনে, ধর্মের চর্যা করিয়া জীবনে সফলতা লাভের চেষ্টা করিয়াছে। গ্রীসে স্টেটের শাসনে, স্টেটের চর্চা করিয়া আপনার সমুদয় শক্তিসামর্থ্যের সার্থকতা সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছে। এই স্টেট রাজনীতির মূল। স্টেটের মধ্যে বিবিধ ব্যক্তির ব্যষ্টিভাবে ব্যক্তি-সকলের পরস্পরের সঙ্গে ও সমষ্টিভাবে ঐ স্টেটের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহাই রাজনীতির বিষয়। এই সকল সম্বন্ধের মধ্য দিয়া জীবনের সফলতা লাভ করিবার চেষ্টা হইতেই গ্রীসে পেট্রিয়টিজমের জন্ম হয়।'

প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতা ও সাধনার উত্তরসাধক ইউরোপের ভূখণ্ডে এই-ভাবেই পেট্রিয়টিজমের ভাবধারার প্রসার হয়েছিল। ইউরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতার

দ্বারা বাহিত হয়েই সেই পেট্রিয়টিজমের বীজ আধুনিক ভারতের মাটিতে অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে। তিনি বলেছেন—'য়ুরোপে রাজনীতি হইতে পেট্রিয়টিজমের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের মধ্যেও ইংরাজশাসনে রাজনীতি-ক্ষেত্রেই এই নূতন স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজ্মের অভ্যুদয় হইয়াছে।' অভ্যুদয় যে সূত্রেই হোক্, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতবাসীর পক্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ঐ পেট্রিয়টিজমকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর মতে 'এই চেষ্টার সফলতার উপরেই আমাদিগের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও স্থিতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।'

আলোচিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর প্রথমে ইন্দ্রনাথ দেবশর্মা, তারপর অজিতকুমার চক্রবর্তী ঐ প্রবন্ধের বক্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন।[৬০] এঁদের প্রশ্নের উত্তরেই সম্ভবতঃ বিপিনচন্দ্রের 'নেশন বা জাতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের পর পর দু'টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংখ্যায় বিপিনচন্দ্র প্রথমেই নেশন বা জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—'নেশন হইতে গেলেই জগতের অপরাপর মানবসমষ্টি হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়াইতে হয়। এই পার্থক্য, এই পরিচ্ছন্নতা, এই স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত জাতি বা নেশনের উৎপত্তি অসম্ভব।...অপর নেশনের সঙ্গে ভেদ, আর নিজের নেশনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যথাসম্ভব অভেদ ও একাত্মতার প্রতিষ্ঠা নেশন গঠনের মূল তন্ত্র।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে রাজনীতি-সচেতন শিক্ষিত ভারতবাসী ইউরোপের নেশন-আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে এবং তার রাজনৈতিক সাধনায় ন্যাশনালিজম্ বা জাতি-প্রেমের আদর্শ প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় রাষ্ট্র ও নেশন সম্পর্কে নানাভাবে আলোচনা হতে থাকে। নেশন কাকে বলে, ভারতবাসীর নেশনরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা আছে কিনা, ইউরোপীয় ন্যাশনালিজমের আদর্শ ভারতবর্ষের পক্ষে গ্রহণ করা উচিত কিনা,—এ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে মতামত প্রকাশিত থাকে।[৬১]

'নেশন কি' শীর্ষক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক রেঁনার (রেনান, এরনেস্ট, ১৮২৩-৯২) নেশন-তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার সূত্র অনুসরণ করে নেশনের সংজ্ঞা স্থির করতে গিয়ে বলেন—'অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসঙ্ঘ যে একটি সচেতন চারিত্র্য সৃজন করে, তাহাই নেশন।' কিন্তু এর দুই মাস পূর্বে প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতায়

আদর্শ' শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় আদর্শে নেশন-প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ক'রে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত বলেন—'...সামাজিক মহত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব'। 'হিন্দুত্ব' শীর্ষক রচনায় তিনি বলেন—'সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতে বড়'। কিন্তু তখন সদ্য জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী তথা ভারতবাসী শুধু সমাজের স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে অন্যতর স্বাধীনতার জন্য মনে মনে লালায়িত হয়ে উঠছে। রাষ্ট্রকে মনুষ্যত্বের উপরে স্থান দিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলি ধ্বংসের আয়োজন করে তুলছে—এই সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে ইউরোপীয় ন্যাশনালিজমের ভয়াবহতার প্রতি সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা-লাভের জন্য লালায়িত দেশবাসী তখন ভারতবর্ষকে রাষ্ট্র ও নেশন রূপে প্রতিষ্ঠা দান করে বিশ্ব-নেশন-সভায় মর্যাদার আসন অধিকারের জন্য উৎকণ্ঠিত। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সর্বজন-গ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারেনি। বিপিনচন্দ্রও স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হয়েও রবীন্দ্রনাথের অভিমতের সঙ্গে আপন মত মেলাতে পারেননি। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথ নেশনতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা' বিশ্বপ্রেমের প্রেরণাপুষ্ট।...কিন্তু বিপিনচন্দ্র বিশুদ্ধ আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে নেশন-তত্ত্বের বিচার করেননি। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ মনোধর্ম বাস্তবতার ভিত্তিতেই এই তত্ত্বের বিচার করেছে। তাই তাঁর দেশপ্রেম বা পেট্রিয়টিজমের উৎস নেশন-অভিমান'।[৬২] রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল মুখ্যত কবির দৃষ্টি, আর বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টি মুখ্যত রাষ্ট্রনীতিবিদের দৃষ্টি। তাই উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রভেদ থাকা খুবই স্বাভাবিক আর রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের মনোধর্ম বস্তুনিষ্ঠ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই সমালোচকের উক্তি 'রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি বিশ্বপ্রেমের ভিত্তির উপর স্বদেশ-প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি বরং স্বদেশপ্রেমের ভিত্তির উপরেই বিশ্ব-প্রেমকে বসাতে চেয়েছেন',[৬৩] একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বিপিনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম যে কোনোদিনই বিশ্বপ্রেমের ধারণামুক্ত ছিল না—একথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নানা সূত্রে আলোচিত হয়েছে। তবে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী তাঁর বস্তুনিষ্ঠ মন একথাও বিস্মৃত হতে পারেনি যে জীবজগতের মতো

মানুষের মনোজগতেও চিন্তা ও চেতনার বিকাশের একটা স্তর-পরম্পরা আছে। প্রেমের বিশ্বমুখী বিকাশের পথে স্বদেশ-প্রেম বিশ্ব-প্রেমের পূর্ববর্তী স্তর। পরবর্তী স্তর যতই কাম্য হোক্, পূর্ববর্তী স্তর অতিক্রম না করে পরবর্তী স্তরে পৌছানো যায় না। তাই তিনি 'নেশন বা জাতি' শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় সংখ্যায় বিষয়টি পরিস্ফুট করতে গিয়ে বলেন—'নেশন-অভিমান হইতেই দেশচর্য বা পেট্রিয়টিজমের উৎপত্তি হয়।···সকল মানুষই সমান—এক অর্থে ইহা অত্যন্ত সত্য। আর প্রত্যেক মানুষেরই এমন একটা অবস্থা হইতে পারে যখন সত্য-সত্যই জাতিগত, বর্ণগত, দেশগত, নেশনগত প্রভৃতি যাবতীয় ভেদজ্ঞান একেবারে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। সে অনাবিল উদার বিশ্বপ্রেম সাধন না করিলে মানবজন্ম সার্থক হয় না, স্বীকার করি। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভেদাভেদকে উপেক্ষা করিয়া এই অভেদজ্ঞান লাভ হয় না। সত্য অভেদজ্ঞান ভেদের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রকৃত উদার বিশ্বজনীন মৈত্রীও সেইরূপ ভেদ-প্রাণ স্বদেশচর্যের মধ্য দিয়াই সাধিত হয়, অন্য উপায়ে নহে।'

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যে দু'জন বহির্বঙ্গীয় নেতা সংগ্রামী বাংলার ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন লোকমান্য তিলক এবং পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়। লোকমান্য তিলকের চেষ্টাতেই কংগ্রেসী আন্দোলনের সঙ্গে প্রথম জনসাধারণের সংযোগ স্থাপিত হয়।[৬৪] ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে প্রথম 'শিবাজী-উৎসব'-এর উদ্বোধন হয়; তার পর থেকে সেখানে প্রতি বৎসর শিবাজী-উৎসব পালিত হতে থাকে। তিলকের মতে, জনসাধারণকে রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট করবার পক্ষে এই উৎসব ছিল একটি কার্যকর পন্থা। শিবাজী-উৎসব অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দ থেকে বাংলাদেশেও প্রথমে কলকাতায় বাৎসরিক অনুষ্ঠানরূপে শিবাজী-উৎসবের প্রচলন হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'শিবাজী-উৎসব' কবিতাটি রচনা করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কলকাতায় ফিল্ড য়্যাণ্ড একাডেমি ক্লাবে সাড়ম্বরে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশে সখারাম গণেশ দেউস্কর ছিলেন এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিবাজীর সঙ্গে ভবানীমূর্তির এবং গুরু রামদাসের সংযোগ ঘটে। ফলে, অনুষ্ঠানটির হিন্দুভাবাপন্নতা এবং

পৌত্তলিকতা কেন্দ্র করে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই ধরনের উৎসব ক্রমপ্রসারমান যৌগিক স্বাদেশিকতার পক্ষে ক্ষতিকর বলে অনেকের মতে বিবেচিত হয়। কিন্তু এই ধরনের ব্যাখ্যা যে ভ্রান্ত তা' প্রমাণের জন্য বিপিনচন্দ্র লেখনী ধারণ করেন। তাঁর 'শিবাজী-উৎসব' এবং 'শিবাজী-উৎসব ও ভবানী-মূর্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টি এই প্রচেষ্টার ফল।[৬৫]

'শিবাজী-উৎসব' শীর্ষক প্রবন্ধে শিবাজীর ভাব-মূর্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন—'...রাজকীয় অত্যাচারের প্রতিবিধানই শিবাজীর জীবনের মুখ্য লক্ষ্য বা একমাত্র শিক্ষা নয়।...মোগল অত্যাচারের প্রতিরোধ—শিবাজীর জীবনের অভাবাত্মক দিক। এই বস্তুকে ধরিয়া শিবাজী আমাদের জাতীয় জীবনের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদিতে কদাপি সনাতন স্থান লাভ করিতে পারিবেন না।' তাঁর মতে—'...আধুনিককালের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হিন্দু নেশন রচয়িতা ও হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতারূপেই শিবাজী আমাদের বরণীয় ও পূজার্হ হইয়াছেন।... এইভাবে শিবাজীকে ধ্যান করিতে গেলে মোগলের অত্যাচার-কাহিনী স্মরণ করা অত্যাবশ্যকও নহে।' কিন্তু শিবাজীকে যদি হিন্দু নেশন রচয়িতা বা হিন্দু রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাতারূপে কল্পনা করা হয়, তা'হলে শিবাজী-উৎসবের বিরুদ্ধে যে হিন্দুয়ানির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তা' স্বাভাবিকভাবেই সমর্থিত হয়ে যায়। বিপিনচন্দ্র এই অভিযোগ সরাসরিভাবে অস্বীকার না করে শিবাজী-উৎসবের মধ্যে যে হিন্দুয়ানির ভাব আছে তার সমর্থনে বললেন—'রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ করা সহজ। ইংরেজ ভারতে তাহা করিয়াছে। কিন্তু জাতীয় জীবনকে ধর্মনিরপেক্ষ করিতে গেলে তাহার অঙ্গহানি হইবেই হইবে।...ধর্মকে যদি জাতীয় জীবনের বাহিরে না রাখিতে হয়, তবে হিন্দু-মুসলমানে মিলিত হইয়া ভারতে এক বিশাল জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে কিরূপে?' ভারতের সম্মিলিত জাতীয় জীবন ধর্মকে অস্বীকার করে নয়, অঙ্গীকার করেই অগ্রসর হবে—এই তাঁর ধারণা। তাই স্ব-উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বললেন—'...স্বদেশ-প্রেমসাধনে হিন্দু আপনার অভ্যস্ত রসতত্ত্বের ও ভাবাঙ্গ-সাধনের পন্থার অনুসরণ করিবে, মুসলমানও সেইরূপ তাহার অভ্যস্ত পন্থাই অবলম্বন করিবে।' এই প্রসঙ্গে তিনি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মতো ভাবী স্বাধীন ভারতের একটি বাক্‌চিত্র উপহার দিয়ে বলেন—'ভারতের ভবিষ্য জাতীয় জীবন ফেডারেশনের আদর্শে গঠিত হইবে। এই জীবনের এক অঙ্গ হিন্দু,

অপর অঙ্গ মুসলমান, তৃতীয় অঙ্গ খৃষ্টীয়ান থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু ইহারা প্রত্যেকে আপন আপন বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া ও সেই বিশেষত্বেরই বিকাশ সাধনের দ্বারা,—ভারতের সাধারণ জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট করিবে।'

'শিবাজী-উৎসব' প্রবন্ধে যেমন তিনি ঐ উৎসবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হিন্দুয়ানির অভিযোগের উত্তর দিলেন, 'শিবাজী-উৎসব ও ভবানীমূর্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে তেমনি ঐ উৎসবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত পৌত্তলিকতার অভিযোগ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি প্রথমে শিবাজী-উৎসবের বাস্তব তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন—'শিবাজীর বীরচরিত্র ও স্বদেশপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা এবং শিক্ষিত জনসাধারণকে যথাসম্ভব শিবাজী-চরিত্র-লাভে সাহায্য করা, ইহাই শিবাজী-উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই এবারে উৎসবক্ষেত্রে শিবাজী, রামদাস ও সিংহবাহিনী ভবানীমূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।' এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বললেন—'কোনো ভক্তকে বুঝিতে গেলে যেভাবে তিনি ভগবানকে ভজনা করিতেন, সে-ভাব তোমার আমার চক্ষে ভালো হউক আর মন্দ হউক, সেইভাবেই তাহাকে দেখিতে হইবে।' বিপিনচন্দ্রের মতে ভবানী কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ের দেবতা নন, ভবানী-মূর্তি জাতীয় মহাশক্তি বা 'স্পিরিট অব্ দি রেস্'-এর প্রতীক মাত্র। এই 'স্পিরিট অব্ দি রেস' নানা সময়ে নানা দেশে নানা রূপে প্রকাশ-মান হয়ে থাকে। বিপিনচন্দ্রের ভাষায় 'এই জাতীয় শক্তি, এই স্পিরিট অব্ দি রেস-ই শিবাজীর নিকটে ভবানী রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।' একে পৌত্তলিকতার দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করা তাঁর মতে ভ্রান্ত বিচার। কারণ, স্পিরিট অব্ দি রেস্ বা জাতীয় মহাশক্তির কোনো আকার নেই। আর 'যাহার নিজস্ব কোনো আকার নাই—তাহার কোনো আকারের সঙ্গেই বিরোধ ঘটিতে পারে না। ফলত নিরাকার ও সর্বাকার একই কথা'। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নির্বিচারে গৃহীত হয়নি।[৬৬]

'কংগ্রেসী কথা' শীর্ষক প্রবন্ধটি[৬৭] প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদী চিন্তার আলোকে তৎকালীন কংগ্রেসী মনোভাবের বিচার-বিশ্লেষণ। সুশাসন অথবা স্বায়ত্তশাসন—স্বাধীনতা-সংগ্রামের লক্ষ্য হবে কোন্‌টি, এ ছিল সে সময়কার একটি বহু-বিতর্কিত প্রশ্ন। কংগ্রেস যে স্বায়ত্তশাসন অপেক্ষা সুশাসনেরই

পক্ষপাতী বেশী, এই কথা প্রমাণ করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র এই প্রবন্ধে প্রথমেই কংগ্রেসের উদ্ভবের ইতিবৃত্তের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন—'ভারতের বৃটিশ শাসককর্তৃপক্ষগণকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়,—একদল শক্তি-উপাসক; আর একদল বৈষ্ণবী মায়ার অনুচর। একদলের অস্ত্র—তরবারি, আর একদলের অস্ত্র—সম্মোহন-বাণ। দাল্‌হৌসি, লীট্‌ন প্রভৃতি সকলেই স্বল্পবিস্তর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; ···মেও, রিপন প্রভৃতি বৈষ্ণব,—ভারতশাসনে বৈষ্ণবী মায়ার বিস্তার করিতে চাহিয়াছেন'। বিপিনচন্দ্রের মতে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউমও ছিলেন দ্বিতীয়োক্ত সম্প্রদায়ের লোক। আর ভারতশাসনে বৈষ্ণবী মায়ার প্রতিষ্ঠা ইঁহাদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। ঐ লক্ষ্য ধরিয়াই কংগ্রেসেরও প্রতিষ্ঠা হয়।' যে মুখ্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ভারতবন্ধু ইংরেজগণ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন, তাঁর মতে সে উদ্দেশ্য হচ্ছে,—বৃটিশ শাসনকে উন্নত ও নিষ্কণ্টক করা এবং ভারতের প্রজাশক্তির আনুকূল্যের উপর বৃটিশ প্রভুশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে তার স্থায়িত্ব বিধান করা। তাই তিনি মনে করেন—'রিপন, হিউম, ওয়েডারবরন্, কটন প্রভৃতি উদারমতি ইংরেজগণের চিরন্তন লক্ষ্য—সুশাসন,—গুড গভর্নমেণ্ট; কংগ্রেসেরও সনাতন আদর্শ—সুশাসন, সত্য স্বায়ত্তশাসন নহে। ইঁহারা স্বায়ত্তশাসন চান না বা চান নাই যে, তা' নয়। যেখানে সুশাসনের জন্য স্বায়ত্তশাসন অত্যাবশ্যক, সেখানে ইঁহারা সকলে স্বায়ত্তশাসনও চাহিয়াছেন। কিন্তু সুশাসন ইঁহাদের লক্ষ্য, স্বায়ত্তশাসন উপলক্ষ্য মাত্র'। এই প্রবন্ধের শেষে তিনি নরমপন্থী কংগ্রেসীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে এখন তাঁদের লক্ষ্য পরিবর্তনের একান্ত প্রয়োজন। সুশাসন নয়, স্বায়ত্তশাসনের মহত্তর আদর্শকেই তাঁদের বরণ করে নিতে হবে। উদ্দেশ্য বদলের সঙ্গে সঙ্গে উপায়ের বদলও অনিবার্য। এই সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে তিনি বললেন—'সুশাসনের পন্থা ছিল আবেদন ও আন্দোলন; স্বায়ত্তশাসনের মূলমন্ত্র হইবে বোধন ও গঠন,—প্রজাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা,···প্রজাশক্তিকে বিবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের আকারে গড়িয়া তোলা।'

এই সময়ে লিখিত 'আবেদন ও আন্দোলন, শীর্ষক প্রবন্ধটি বিপিনচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখযোগ্য।[৬৮] আবেদন ও আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে প্রথমেই তিনি বলেছেন—

'আবেদনের মূলে সর্বত্রই দুইটি ভাব লুকাইয়া থাকে। এক,—আপনার শক্তিসাধ্যে ঐকান্তিক অবিশ্বাস ; অপর,—যাহার নিকটে আবেদন উপস্থিত করা যায়, তাহার শক্তি ও সদিচ্ছার উপরে অচল আস্থা।' ধর্ম এবং রাজনীতি—উভয় ক্ষেত্রেই যিনি পদচারণা করেছেন, তিনি আপন অভিজ্ঞতায় জানেন যে ধর্মের ক্ষেত্রে যা' বরণীয়, রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক সময় তা' বর্জনীয়। কারণ 'আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস ধর্মরাজ্যে অমূল্য বস্তু। এই অবিশ্বাস হইতেই ক্রমে ভগবদ্ভক্তি জাগ্রত হইয়া জীবের ভববন্ধন মোচন করিয়া দেয়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রজার আত্মশক্তির উপরে ঐরূপ ঐকান্তিক অনাস্থা অতিশয় সাংঘাতিক বস্তু। ইহাতে অবস্থা বিশেষে রাজভক্তি জাগ্রত হইতে পারে, কিন্তু রাজ-বন্ধন কদাপি শিথিল হয় না'। ব্যাপারটি আরও পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি বলেন—'আত্ম-প্রতিষ্ঠা যেখানে লক্ষ্য, আত্মচেষ্টা সেখানে একমাত্র ধর্ম। আত্মনিবেদনে প্রকৃত আত্মচেষ্টার মূল বিনষ্ট করিয়া ফেলে ; এইজন্য রাজনীতিক্ষেত্রে আবেদন-নিবেদন কদাপি মোক্ষহেতু হইতে পারে না।' ইংরেজরা ভারতের রাজা হলেও বিপিনচন্দ্রের মতে তারা প্রকৃতপক্ষে ভারত-বিজেতা নয়। কারণ, ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধে ভারতবাসীরাই ইংরেজের পক্ষ হয়ে ভারতবাসীকে পরাজিত করেছে। ইংরেজ এ সত্য মনে মানে বলেই সে প্রথমাবধি এদেশে সুশাসন প্রবর্তনের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। কারণ, তারা জানতো যে এদেশে প্রজাশক্তির আনুকূল্য অর্জন করতে না পারলে সামান্য শক্তির সাহায্যে কখনই এত বড়ো দেশ নিজের অধিকারে রাখতে পারবে না। বিপিনচন্দ্রের ধারণা—'ইংরেজের উদারতা যে সর্বদাই প্রজাভীতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ঘোষণাপত্রই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ'। বৃটিশের সদিচ্ছা ও উদারতা যাঁরা তাদের সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ বলে মনে করেন, তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য তিনি বলেন যে বৃটিশ-নীতি সাধারণ মানবীয় রাজনীতির প্রকৃতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বৃটিশ রাজনীতি স্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত ; পরার্থ বা প্রজার্থের দ্বারা নয়। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত : 'অথচ ইংরেজের এই অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঔদার্য ও সদিচ্ছার উপরেই আমাদের সর্ববিধ রাজনৈতিক আবেদন-আন্দোলন অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই আবেদননীতির অসারতা ও অপকারিতা ভালো করিয়া বুঝিতে গেলে ভারতে বৃটিশ শাসননীতির কুটিল গতি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করিতে হয়।

এতকাল পর্যন্ত আমরা ইহা করি নাই বলিয়াই আমাদের সর্ববিধ রাজনৈতিক প্রয়াস এরূপভাবে নিস্ফল হইয়াছে'।

'আবেদন ও আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথমাংশে তিনি যে রাজভক্তির উল্লেখ করেছেন, 'রাজভক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে তা' পরিস্ফুট করে তুলেছেন।[৬৯] এই প্রবন্ধের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন—'আমরাও বলি, অপরেও বলেন যে, আমরা চিরদিনই বড় রাজভক্ত। কথাটার দৌড় কত, সকল সময় ঠিক বুঝিয়া ওঠা যায় না।' এ কথা সত্য যে প্রচলিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় রাজায় রাজায় বাদ-বিসম্বাদের কথা অনেক দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাজায়-প্রজায় হানাহানির ঘটনা একান্তভাবে বিরল। 'তবে সত্য কথা বলিতে গেলে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথা আমরা কি-ই বা এমন জানি? আমরা জানিনা, এমন হয়ত অনেক রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল।' এই উক্তির সমর্থনে তিনি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে বলেন—'প্রাচীনকালে যে এরূপ বিপ্লব কখনো কখনো ঘটিয়াছে, বেণরাজার উপাখ্যান তার প্রমাণ। আর মহাভারতের শান্তিপর্বে, ক্ষিপ্ত কুকুর যেমন লোকে একত্র হইয়া বধ করে, অত্যাচারী ও অধর্মাচারী রাজাকে প্রজাগণ সেইরূপ সমবেত শক্তিদ্বারা হনন করিবে—এ উপদেশও দেখিতে পাওয়া যায়'। রাজা-প্রজার সম্পর্ক সম্বন্ধে ভারতীয় মনোভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন—'রাজা-প্রজার সম্বন্ধ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত।...ধর্মাবতার-রূপেই রাজা পূজনীয়। ধর্মরক্ষকরূপেই তিনি বরণীয়। হিন্দুর রাজভক্তির মূল এই ধর্মে।...হিন্দু রাজভক্ত এইজন্য যে, সে ধর্মভক্ত।...হিন্দুর রাজভক্তি রাজার উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত।' হিন্দুর রাজভক্তি যে রাজা-খেতাবধারী ব্যক্তিটির প্রতি অন্ধ আনুগত্য নয়, একথা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি মন্তব্য করেন—'হিন্দুর রাজাকে এইজন্য সর্বদা ধর্মভীরু হইয়া চলিতে হয়; কারণ, রাজা যদি ধর্মকে পরিত্যাগ করেন, রাজভক্তি আশ্রয়হীন হইয়া তাঁহাকেও নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিবে।' ইংরেজদের ইতিহাসের একটি ঘটনা উল্লেখ করে তিনি নির্ভীক কণ্ঠে বলেছেন—'যে রাজা ধর্মকে পরিত্যাগ করে, সে আত্মাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। প্রজার বশ্যতার উপরে তাহার আর কোনো দাবিদাওয়া নাই। সে তখন রাজা নহে, আততায়ীমাত্র। তাহার বিরোধী হইলে রাজদ্রোহিতা হয় না। ইহাই হিন্দুর আদর্শ।...এই আদর্শ অনুসারে প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে বৃটিশ প্রজাবর্গের অস্ত্রধারণ,—রাজদ্রোহিতা-

পদবাচ্য কদাচিৎ হইতে পারে না।' স্বদেশীযুগে সমগ্র বাংলা যখন বহ্নিমান, ইংজের শাসকবর্গের দমননীতি যখন নির্লজ্জভাবে বল্গাহীন, সেই সময় ধর্মভ্রষ্ট রাজার বিরুদ্ধে প্রজাপুঞ্জের অস্ত্রধারণের অধিকারকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করবার দুঃসাহস সত্যই বিস্ময়কর। এর দেড় বছর পূর্বে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'রাজভক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[৭০] উভয়ের প্রবন্ধের আলোচনার ধারা পৃথক হলেও মূল চিন্তায় মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজভক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধের রচনার প্রেরণা-উৎসের মতো বিপিনচন্দ্রের 'রাজশক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রেরণা-উৎসও সম্ভবতঃ ১৯০৫-এর ডিসেম্বরে প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের ভারতে আগমন।

'রাজভক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশের ঠিক এক বছর পরে 'শ্রী'-ছদ্মনামে বিপিনচন্দ্রের 'ইজ্জৎ' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।[৭১] প্রবন্ধটি তাঁর দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে প্রকাশিত। এটিও গভীর এবং নিপুণ বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধরূপে উল্লেখযোগ্য।

ইজ্জৎ শুধু রাজার একচেটিয়া অধিকারের বস্তু নয়, ইজ্জতে রাজা ও প্রজার অধিকার সমান। কোন্ অবস্থায় রাজা এবং প্রজার ইজ্জৎবোধ ক্ষুণ্ণ হয়, তা' বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বললেন—'প্রজার নিকট অকৃত্রিম ভক্তি লাভ করা দুর্লভ হইয়া উঠিলে রাজার পক্ষে ইজ্জৎ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। কৃত্রিম শাসন-কৌশলে ফল হয় না।·· রাজার নিকট অকৃত্রিম সুশাসন লাভ করা দুর্লভ হইয়া উঠিলে প্রজার পক্ষেও ইজ্জৎ রক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে। কৃত্রিম আন্দোলন-কৌশলে ফল হয় না। বরং সুশাসন আদায় করিয়া লইবার কৃত্রিম চেষ্টায় অকৃত্রিম সুশাসন আরও দুর্লভ হইয়া দাঁড়ায়।' সমকালীন বৃটিশ শাসন-নীতির সঙ্গে নরমপন্থী কংগ্রেসীদের বিরোধের স্বরূপ ও তার সম্ভাব্য ফলাফলের প্রতি ইঙ্গিত এখানে সুস্পষ্ট।

ছলে, বলে কিংবা কৌশলে ভারতের প্রজাশক্তির কাছ থেকে বৃটিশের পক্ষে অন্ধ রাজভক্তি আদায়ের দিন অবসিতপ্রায়। কারণ ভারতবাসীর মনে আত্ম-সচেতনার উদ্রেক হয়েছে। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'এতদিন একতরফা ইজ্জতের ধূমপুঞ্জে গগন-মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এখন তাহার মধ্যে প্রজার ইজ্জৎ বিদ্যুদ্দামের মত ঝলসিয়া উঠিতেছে। তাহারও মানুষ—তাহারাও সুশাসন চায়। ভারতবাসীর এ ইচ্ছাকে 'চিত্তবিকার' মনে করলে ভুল করা হবে।

কারণ, এ ইচ্ছা দীর্ঘদিনের চিন্তা-চর্যার ফল। ভারতবাসীর এ ইচ্ছাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দান না করলে তার পরিণাম আর যা'ই হোক্ শান্তিপূর্ণ থাকতে পারে না। এখনও সময় আছে, কারণ এখনও ভারতবাসী রাজশক্তির প্রতি সম্পূর্ণভাবে আস্থা হারায়নি। উপস্থিত পরিস্থিতি সম্পর্কে যদি রাজশক্তি এখনও পূর্বভাবে অবহিত হয়ে প্রতিবিধান না করেন, তা'হলে সেই অবজ্ঞা ও উপেক্ষার প্রতিক্রিয়া ভয়ঙ্কর হতে পারে। সমকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি ধারা যে সঙ্গত মনস্তাত্ত্বিক কারণেই গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পথ অবলম্বন করেছে, সে কথা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি রাজশক্তির উদ্দেশ্যে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেন।

অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার অনিবার্য মানসিক প্রতিক্রিয়া—ক্ষোভ ও বিদ্বেষ। ব্যক্তিবিশেষের মানসিক প্রবণতা অনুসারে এই প্রতিক্রিয়া কোথাও ক্ষোভ, কোথাও বা বিদ্বেষের উদ্রেক করে। বিপিনচন্দ্রের বিশ্লেষণে—'ক্ষোভ আত্মসংবরণ করিতে পারে, বিদ্বেষ সকল অবস্থায় সকল সময়ে আত্মসংবরণ করিতে পারে না। তাই সে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার।' ব্যাপারটি স্পষ্টতর করবার জন্য তিনি আরও বলেন—'অক্ষমের বিদ্বেষ চিরদিন যে গোপন পথে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, সেই চির-পরিচিত পুরাতন পথেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।'

বিপিনচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে কোনদিনই রাজনৈতিক কারণে গুপ্তহত্যার অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী পথের সমর্থক ছিলেন না—একথা নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সমর্থন না করলেও তাঁর বস্তুনিষ্ঠ রাজনৈতিক জ্ঞান সন্ত্রাসবাদী মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারে না—এটা হতে পারে না। তাই তিনি উল্লিখিত উক্তির পরেই মন্তব্য করেছেন—'তাহার নিন্দা করিতে চাহিলে নিন্দা করিতে পারা যায়। কারণ তাহার নিন্দা সর্ববাদি-সম্মত। কিন্তু তাহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া তর্ক করিতে পারা যায় না।' কারণ বিপিনচন্দ্রের মতে—'ইহাই যে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক চিত্ত-বিক্ষেপ, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে সকল কারণে ইহা অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে, সেই সকল কারণ যখনই যে দেশে ঘনীভূত হইতে থাকে, সেই দেশে তখনই ইহা স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে।'

এই প্রবন্ধটির আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন—'গুপ্ত-সমিতিগুলির ক্রিয়াকলাপের প্রতি লেখকের সমর্থন পরিষ্কার ভাবেই প্রকাশ

পেয়েছে।'[৭২] এই মন্তব্য অভ্রান্ত নয়। গুপ্তসমিতির ক্রিয়া-কলাপ সমর্থনে অপারগতার জন্য স্ব-প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী পত্রিকা 'বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, সন্ত্রাসবাদের পথ সমর্থনে অপারগতার জন্য দ্বিতীয়বার বিলাত-যাত্রার পর শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার বিরাগভাজন হয়ে তাঁর অর্থসাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া প্রভৃতি ঘটনার কথা বাদ দিলেও, সমালোচক কর্তৃক 'ইজ্জৎ' প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশে বিপিনচন্দ্রের উক্তি—'তাহার নিন্দা করিতে চাহিলে নিন্দা করিতে পারা যায়। কারণ তাহার নিন্দা সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু তাহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া তর্ক করিতে পারা যায় না'—নিশ্চয় 'গুপ্তসমিতিগুলির ক্রিয়াকলাপের প্রতি লেখকের সমর্থন'-এর প্রামাণ্য যুক্তি হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। বরং যে বাস্তব অবস্থায় গুপ্তসমিতির উদ্ভব ঘটে, সেই অবস্থার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণরূপেই ঐ উক্তিকে গ্রহণ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। সমগ্র জীবনচর্যার পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করতে গিয়ে অনেকেই রবীন্দ্রনাথ এবং বিপিনচন্দ্রের অনেক উক্তির এইরকম ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

বিপিনচন্দ্রের এই মনোভাবের সমর্থন মেলে দ্বিতীয়বার বিলাত-প্রবাস অন্তে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর রচিত 'ভারতের ভবিষ্যৎ ও লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসননীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে।[৭৩] লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন ভারতের বড়োলাট, সেই সময় বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায় এবং তাঁর আমলেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ বৃটিশ শাসন-নীতির অঙ্গীভূত হয়।[৭৪] এইজন্য বিপিনচন্দ্র পূর্ববর্তী বড়োলাট লর্ড কার্জন এবং লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে তুলনায় লর্ড হার্ডিঞ্জকে দূরদর্শী অভিজ্ঞ নীতিজ্ঞরূপে গণ্য করেন। বিপিনচন্দ্রের সংজ্ঞায়—' আত্মস্থ থাকিয়া, ভালোমন্দ সকল অবস্থাতে জন-সমাজের নিত্য লক্ষ্যটিকে যিনি ধরিয়া থাকিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত নীতিজ্ঞ বা স্টেটস্‌ম্যান। এইরূপ নীতিজ্ঞ কর্মনায়কই আগন্তুক লাভালাভ বা আকস্মিক সুবিধা-অসুবিধাকে উপেক্ষা করিয়া জনসমাজকে আপনার সনাতন লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিতে পারেন।' তাঁর মতে লর্ড হার্ডিঞ্জের মধ্যে এই ধরনের অভিজ্ঞ নীতিজ্ঞ বা স্টেটস্‌ম্যানের লক্ষণ বিদ্যমান। কারণ, লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর উদার নীতির মাধ্যমে 'ভারতের স্বারাজ্য-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বৃটিশের সাম্রাজ্য-সম্পদ রক্ষার একটা চিরন্তন সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের সূত্রপাত করিয়াছেন ··।' এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে বিপিনচন্দ্র তখন 'ইম্পিরিয়াল ফেডারেশন' তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি হার্ডিঞ্জ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আরও বলেন—

…'ভারতের স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বৃটিশের সাম্রাজ্য-সম্পদের একটা সঙ্গতি-সাধন সম্ভব। লর্ড হার্ডিঞ্জ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তাঁহার শাসননীতি এই ফেডারেশনের পথ লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছে।'

তাই দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতি বোমা-নিক্ষেপের ঘটনাকে তিনি সমর্থন করতে পারেন না। প্রথমত, লর্ড হার্ডিঞ্জকে ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার শত্রুরূপে গণ্য করা অযৌক্তিক। দ্বিতীয়ত, নীতিগতভাবে গুপ্তহত্যার প্রয়াস, তাঁর মতে, কোনো ক্রমেই সমর্থনীয় নয়। তাই এই প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টত বলেন—'এই সকল বিপ্লবপন্থীর কর্মচেষ্টার সঙ্গে আমাদের সত্য স্বাদেশিকতার কোনও প্রকারের সঙ্গতি-সাধন যে একেবারে অসম্ভব, চিরদিন ইহা জানিতাম ও বুঝিতাম। স্বদেশী-আন্দোলনের প্রথমাবধি যখন এই সকল ভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তখনই প্রাণপণে তাহার প্রতিবাদও করিয়াছি। কিন্তু লাট মিণ্টোর শাসনকালে যথাযোগ্য-ভাবে এই বিষমরোগের প্রতিকার করিবার উপযুক্ত অবসর আমরা পাই নাই।'

১৯২১ খৃষ্টাব্দে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের রূপায়ণ-পদ্ধতি এবং বহু-আলোচিত ও বহু-প্রচারিত 'স্বরাজ' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় কেন্দ্র করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের আত্যন্তিক মতভেদ উপস্থিত হয়—সে প্রসঙ্গ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'দেশনায়ক' পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই মতবিরোধের ফলে বিপিনচন্দ্র দেশের চলমান রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং এই সময় থেকে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের এবং 'স্বরাজ'-এর ভাববাদী ব্যাখ্যার কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন।

'নব্য ভারত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত 'আমরা কি চাই?' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং তার পরবর্তী তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত 'অনধীনতা না স্বাধীনতা', 'স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' এবং 'কঃ পন্থা?' শীর্ষক প্রবন্ধ বিপিনচন্দ্রের তৎকালীন মনোভাব ও চিন্তাধারার স্পষ্ট পরিচয় বহন করে।[৭৫] তথ্যোল্লেখ ও তার্কিকতার সমবায়ে রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম কূটতার্কিকতার প্রবণতাই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'আমরা কি চাই ?' শীর্ষক প্রবন্ধটির প্রথম সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রদত্ত ভাষণের সমালোচনা। বিপিনচন্দ্র ভারতের আকাঙ্ক্ষিত 'স্বরাজ'কে 'গণতন্ত্র-মূলক' শব্দের দ্বারা বিশেষিত করবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধু স্বরাজকে কোনো বিশেষণের দ্বারা চিহ্নিত করবার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন "স্বরাজ মানে কি ? অনেকে বলেন, এই স্বরাজ ডিমক্রেটিক (গণতন্ত্রমূলক) স্বরাজ। কিন্তু যখনই আমরা এই স্বরাজকে একটা বিশেষণ দিতে চাই, তখনই আর স্বরাজ থাকে না। স্বরাজ—স্বরাজ। ইহা আবার ডিমক্রেটিক, অটক্রেটিক কি ?...ইংরেজ বলে—রাইট অব্ সেল্ফ্-ডিটারমিনেশন। কিন্তু আমাদের বেলায় এই সেল্ফ-ডিটারমিনেশন স্বীকার করে না। যেদিন আমরা এই অধিকার উপলব্ধি করব, সেইদিনই আমাদের স্বরাজ লাভ হবে।" বিপিনচন্দ্র ১৩২৮ সালের ১৩ই বৈশাখ সংখ্যার 'জনশক্তি'তে প্রকাশিত চিত্তরঞ্জনের এই উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন—"ইংরেজিতে 'স্ব'-কে সেল্ফ বলা যায়। কিন্তু 'রাজ' শব্দের অর্থ কি করিয়া 'ডিটারমিনেশন' হয়, এ পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই।" বিপিনচন্দ্র মনে করেন যে এ যাবৎ স্বরাজ শব্দটি বহুজনের মুখে শোনা গেলেও এ যে কী বস্তু তা' কেউ অনুভবে প্রত্যক্ষ করেন নি। এইভাবে তিনি নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তে এসে বলেন—'ফলতঃ স্বরাজ আর সেল্ফ-ডিটারমিনেশন বা আত্মসঙ্কল্প যদি একই বস্তু হয়, তবে স্বেচ্ছাকৃত বন্ধনকেও মুক্তি বলিতে হইবে।'

'আমরা কি চাই ?' শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় সংখ্যার (অন্তরে স্বরাজের উপলব্ধি ? না, সমাজে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা ?) বক্তব্যও দেশবন্ধুর উপরি-উক্ত বরিশাল-বক্তৃতার জবাব। দেশবন্ধু বলেছিলেন যে স্বরাজ অন্তরে উপলব্ধির বস্তু। তাকে বাইরে পাওয়া যায় না ; নিজের প্রাণের মধ্যে ধ্যানে তাকে লাভ করতে হয়। বিপিনচন্দ্র দেশবন্ধুর বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করে বলেন —"এ উক্তির মধ্যে উচ্ছ্বাস আছে, বস্তু-নির্ণয়ের প্রয়াস নাই।...স্বরাজ কেবল ভিতরের কথা নয় ; ভিতরে ইহার জন্য সঙ্কল্প জাগাইতে হইবে, সত্য। কিন্তু বস্তু লাভ হইবে বাইরে, ভিতরে নয়। এ কথাটা বুঝিলে, স্বরাজটা 'সিস্টেম অব্ য়্যাড্মিনিস্ট্রেশন নয়, এরূপ বাগ্জাল বিস্তার করা কঠিন হইয়া পড়ে।"

'আমরা কি চাই ?' শীর্ষনামের অন্তর্গত তৃতীয় প্রবন্ধে (স্বরাজ—কাহার রাজ ? বা কোন্ রাজ ?) বিপিনচন্দ্র স্বরাজের স্বরূপ নির্ণয়ের উপর গুরুত্ব

আরোপ করেছেন। প্রথমেই তিনি বলেছেন যে স্বরাজের নামে দেশের লোকের মনে যে আশা ও উদ্দীপনার উদ্রেক হয়েছে, সেটা শুভ লক্ষণ। কিন্তু সেই আশা ও উদ্দীপনাকে যথাযোগ্য কর্মে নিয়োগ করতে না পারলে পরিণাম বিষময় হওয়া বিচিত্র নয়। কারণ, উকিল-মোক্তারেরা ব্যবসায় এবং ইংরেজ-প্রদত্ত উপাধি ত্যাগ করলে, অথবা শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজ বর্জন করলে, কিংবা ঘরে ঘরে চরকা কাটা শুরু করলেই স্বরাজ লাভ হবে—একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। এমন কি কংগ্রেসের জন্য এক কোটি সভ্য এবং এক কোটি টাকা সংগ্রহ করতে পারলেও, তাঁর মতে, স্বরাজলাভ সম্ভব হবে না।

বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'পাঞ্জাবের অত্যাচার, খিলাফতের উপরে অবিচার, এই দুইটি বিষয়ের উপর বর্তমান আন্দোলনকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। মুসলমানেরা খিলাফত-সমস্যা সকলে বুঝুন আর নাই বুঝুন, তাঁদের ধর্মের উপরে একটা গুরুতর আঘাত পড়িয়াছে, ইহা বুঝেন। এইজন্য অনেক মুসলমান খিলাফতের নামে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁদের প্রেরণা ধর্মের, স্বাদেশিকতার নহে। এ কথাটা অস্বীকার করা কঠিন। সুতরাং মুসলমান-সমাজের সঙ্গে যতই সহানুভূতি করি না কেন, এই প্রেরণার দ্বারা যে আমাদের হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া ভারতের নূতন জাতি গড়িয়া উঠিবে, এখন কল্পনা করা যায় না। সাধারণ লোক, কি হিন্দু, কি মুসলমান কেহই এই নূতন জাতিটা যে কি···ইহা বুঝেন না। সুতরাং, তাঁহারা স্বরাজটা যে কি, ইহা ভালো করিয়া ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।' স্বরাজের প্রকৃত তাৎপর্য কী এবং সে স্বরাজ কার রাজ, তা' যথেষ্টভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়নি। সুতরাং শুধু হিন্দু বা মুসলমানই নয়, শিখ এবং মারাঠা-সম্প্রদায়, এমন কি দেশীয় রাজন্যবর্গেরও স্বরাজের ইচ্ছানুরূপ ব্যাখ্যা করবার সুযোগ অবারিত রয়ে গেছে। তাই তাঁর জিজ্ঞাসা—'সাধ্য নির্ণয় না হইলে, সাধনায় সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকে কি?'

'অনধীনতা না স্বাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র বলেন যে ভারতের আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজের লক্ষ্য—স্বাধীনতালাভ; ইংরেজী 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' শব্দে যা' আভাসিত হয়, তা' নয়। ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'অনধীনতা', 'স্বাধীনতা' নয়। অবশ্য ইণ্ডিপেডেন্স শব্দের এই ব্যাখ্যা নতুন নয়, এ তাঁর পূর্বকৃত ব্যাখ্যার পুনরুক্তিমাত্র।[৭৬] যাই হোক্, তাঁর ধারণা—ইংরেজ-বিতাড়নের

মাধ্যমে অনধীনতা লাভ করা যেতে পারে মাত্র, স্বাধীনতা নয়। কারণ, স্বাধীনতা তার চেয়ে বৃহত্তর বস্তু। যাঁরা 'কেবল ইংরাজকেই তাড়াইতে চাহেন, তারপরে যা' হয় হউক, সে ভাবনা ভাবিতে রাজী নহেন' তাঁরা প্রকৃত স্বরাজকামীদের বিভ্রান্ত করছেন। তিনি মনে করেন, সাধ্য স্বরাজের প্রকৃতি নির্ণীত না হওয়া পর্যন্ত শুধু বিদেশী রাজের পরিবর্তে দেশী রাজের পত্তন জনসাধারণের পক্ষে যথেষ্ট উদ্দীপনার কারণ হতে পারে না। সাহিত্যসুলভ ভাষায় একটি দৃষ্টান্ত পরিবেশন করে তিনি বলেছেন—'এদেশে দেশীয় কয়েদি-দিগকে হাতে কড়া ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লইয়া যায়। এই দড়িটা শ্বেতাঙ্গ জোহনের, কিংবা কৃষ্ণকায় জনার্দন সিংহের হাতে আছে, কয়েদি বেচারি এ বিচার করিয়া সান্ত্বনা পায় কি ?'

'স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র মহাত্মা-গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক উপযোগিতার বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে এই প্রবন্ধে তিনি কূটতার্কিকের মতো নন্-কো-অপারেশন বা 'অসহযোগ' এবং 'কো-অপারেশন' বা 'সহযোগ' শব্দ দু'টির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেশবাসীর মনে অসহযোগের প্রতি বিরূপতার সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সমাজ ও সভ্যতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেছেন—'সমষ্টির ভিতর দিয়া ব্যষ্টির জীবনের প্রসার ও শক্তি-বৃদ্ধি সভ্যতার মূল লক্ষণ।···একে অন্যের সাহচর্য করিয়া সভ্য-সমাজের লোকেরা প্রত্যেকের স্বাধীনতাকে একদিকে সঙ্কুচিত করিয়া আবার আর একদিকে বাড়াইয়া দেয়।' তাঁর মতে, এই স্বাধীনতার মূল সূত্র হচ্ছে—"সাহচর্য বা সহযোগ, ইংরেজীতে যাকে 'কো-অপারেশন' বলে ; অসহযোগ বা 'নন-কো-অপারেশন' নয়। এই কথাটা উপলব্ধি না করলে, তিনি মনে করেন যে, স্বাধীনতার নামে বর্বরতাকেই বরণ করে নেওয়া হবে। বিপিনচন্দ্রের নিজের ভাষায় 'সহযোগ জীবন, অ-সহযোগ মৃত্যু ; সহযোগে সংযম, অ-সহযোগে স্বেচ্ছাচার ; সহযোগে ব্যক্তিত্বের বিস্তার ; অ-সহযোগে নিরঙ্কুশ ব্যক্তিত্বের দ্বারা সেই ব্যক্তিত্বেরই বিনাশ। ··এই সাহচর্য ও সহযোগের উপরেই সমাজের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয়।"

এই পর্যায়ের শেষ প্রবন্ধ 'কঃ পন্থা ?'। এই প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ সম্পর্কে যে সমস্ত উক্তি করেছেন, সেগুলির সমালোচনা

করেছেন এবং স্বাধীনতালাভের জন্য গান্ধী-প্রদর্শিত পথের ভ্রান্ততা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। বিপিনচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়।[৭৭] প্রতিবাদকারী শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্মা মশায় বিপিনচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অক্ষুণ্ণ রেখেই বলেন—"তিনি কোথায় দেশের পথপ্রদর্শক হইবেন, না এখন পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কঃ পন্থা ?' পথের কথা না তুলিয়া কংগ্রেস-নির্দিষ্ট পথে চলিয়া স্বরাজলাভের আনুকূল্য করিবার জন্য শক্তিধর বিপিনচন্দ্রকে এখনও আমরা শতবার অনুরোধ করি।" কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতি বিপিনচন্দ্রের অসহযোগিতা প্রকাশের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করে আরও বলেন—"বিপিনবাবু ঘর ছাড়িয়া পরের ঘরে আশ্রয় লইয়াছেন ; বর্তমান স্বরাজ আন্দোলনের বিপক্ষে তাঁহার লেখনী ধারণ করিয়াছেন, ইহা আমাদের দুঃসহ বেদনাদায়ক। যাঁহাকে বঙ্গের তিলক মনে করিয়াছিলাম, তিনি আজ কোথায় ?…ইচ্ছা হয় তাঁহাকে বলি, 'এস হে, ফিরে এস, ঘরের ছেলে ঘরে। আর থেক না পরের ঘরে অভিমান করে।"

এর পর এই পর্যায়ে উল্লেখ্য দু'টি লেখা হচ্ছে যথাক্রমে—'হিন্দু-মুসলমান আঁতাত' এবং 'রাষ্ট্রীয় ভারত—হিন্দু ও মুসলমান'।[৭৮] লেখা দু'টি 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার 'বৈঠকী কথা' বিভাগে নাটিকার আকারে প্রকাশিত। বৈঠকী কথায় অংশগ্রহণকারী পাত্রগণ হচ্ছে :

বিষ্ণুশর্মা	—যাঁর বাড়ীতে বৈঠক বসে।
শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	—স্বদেশীযুগের যুবক
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়	—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
ভজহরি	—নৈষ্ঠিক নন্-কো-অপারেটর
হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায়	—সংবাদপত্র সম্পাদক
বিশ্বেশ্বর ঘোষ	—পেনসন-ভোগী ডেপুটি

হিন্দু-মুসলমান আঁতাতই এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে—স্থায়ী হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতি-সৃষ্টিতে খিলাফতের ব্যর্থতা এবং স্বরাজলাভের উপায়রূপে চরকার ভূমিকার অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা। এই প্রসঙ্গে মূল রচনা থেকে কিছু পরিমাণ অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে :

বিষ্ণুশর্মা (ভজহরিকে দেখিয়া)—কি ভায়া, তোমাদের তাসের ঘর যে উড়ে গেল।

ভজহরি—কথাটা খুলে বলুন। বিষয়টা বুঝতে পারছি না।

বিষ্ণু—তোমরা যে বড়ো বাহাদুরি করেছিলে, এ পর্যন্ত কেউ যা করতে পারেনি, তোমরা তাই করেছ। বাঘে-ছাগলে এক ঘাটে জল খাইয়েছ। হিন্দু-মুসলমান এক করেছ। এখন সে একতা রইল কৈ ?

ভজ—আপনারা কি একটা ম্যাজিক চান ?

শক্তিপদ—(ঘরে ঢুকিয়া) তোমাদের কসরতই ত ম্যাজিকে। কিন্তু ম্যাজিকটা কি ?

বিষ্ণু—আর কি হবে ? এই হিন্দু-মুসলমানের মিল।

হরিবিলাস—(দরজায় এসেই)—এখানেও ঐ কথা। এইমাত্র ঐ নিয়ে একটা ঝগড়া করে এলাম।

ভজ—ঐটাই ত আপনারা পারেন। যদি জীবনটাকে একটু ইকনমাইক করতে চান তবে ঝগড়াঝাঁটি ছাড়ুন। ...

হরি—ভায়া, ওটা ছাড়লে খাব কি ? ঐ যে আমাদের পেশা।

ভজ—ঐ পেশাটাই ছাড়তে বলছি।

হরি—ছেড়ে খাব কি ?

ভজ—কেন, চরকা কাটুন না কেন ? তাতে আহার ঔষধ দুই-ই হবে। প্রথম, চরকা ঘুরানর মতন অমন হেলদি এক্সারসাইজ আর নাই। হাতের পেশীর ব্যায়াম হয়, তার সঙ্গে ঘাড়ের পেশীর পরিচালনা হয়, তার সঙ্গে রিবস্‌গুলোর উপরেও টান পড়ে। চোখের দৃষ্টি স্থির হয়। যোগ-চক্ষু খুলে যায়।...স্বয়ং ভগবান চরকাধারী। তাঁর সুদর্শনচক্র আর কিছু নয়, চরকামাত্র। এই চরকাতেই তিনি দিনরাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বাঁধবার সুতো কাটছেন।......

* * *

হরি—খেলাফত একটা আশিয়াটিক শক্তি নয় কি ? খেলাফতকে রক্ষা করা ইউরোপের আততায়িতা থেকে আশিয়াকে রক্ষা করা নয় কি ?...

শক্তি—স্বীকার করি।...কিন্তু বর্তমান খেলাফত আন্দোলন ত...রাষ্ট্রনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।...এই খেলাফতী আন্দোলনে যোগ দিয়ে হিন্দু পলিটিসিয়ানরা মুসলমানদের ঘুষ দিতে চেয়েছেন, একথা বই আর কি বলতে পারি ? কিন্তু ঘুষ দিয়ে জাত গড়া যায় না।

কৃষ্ণ—তুমি যে কথাটা তুল্লে, সারা রাতেও ত তার মীমাংসা হবার সম্ভাবনা দেখছি না।

*　　*　　*

'রাষ্ট্রীয় ভারত—হিন্দু ও মুসলমান'-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—'স্বরাজ'-এর স্বরূপ নির্ণয় এবং প্যান-ঐস্লামিকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। শক্তিপদ লেখকের ব্যক্তিত্বের মুখপাত্র হয়ে এই দুই বিষয়ের উপরেই লেখকের স্বকীয় ভাবনার আলোকপাত করেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে এই রচনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারে :

*　　*　　*

বিষ্ণুশর্মা—স্বরাজ যদি একটি মনের ভাব হয়, তা'হলে সে স্বরাজ লাভ করবার জন্য এতটা হুজুগ জাগাবার আবশ্যক নেই। কেবল চোখ বুজে ভাবলেই তো হলো যে আমরা স্বরাজ পেয়েছি।

শক্তিপদ—স্বরাজলাভ অর্থ যদি ইংরাজ তাড়ান হয়, তার জন্য হিন্দু-মুসলমান এক হওয়া যে একান্ত আবশ্যক নয়, সে কথাটা ত সেদিন প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি। এই স্বরাজলাভ অর্থাৎ ইংরাজ তাড়ান আর ভারতবর্ষে একটা আধুনিক আদর্শে নেশন গড়ে তোলা এক কথা নয়।···

বিষ্ণু—তুমি স্বরাজ বলতে কি বুঝ ?

শক্তি—···প্রথম, স্বরাজ বলতে আমি একটা আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝি না। স্বরাজ বলতে আমি একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই বুঝি।

উপরি-উক্ত কথোপকথনে স্বরাজ-সম্পর্কিত তির্যক উক্তির লক্ষ্য হচ্ছেন তাঁর একদা-অনুজপ্রতিম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, যিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বরিশাল অধিবেশনে 'স্বরাজ'-এর ভাববাদী ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিলেন—একথা সহজেই অনুমেয়।

বৈঠকী আসরে কথায় কথায় স্বরাজের পর প্যান-ঐস্লামিকতার প্রসঙ্গ উঠলো :

কৃষ্ণধন—প্যান-ইসলামিজমের কি একটা ভালো দিক নাই ?

শক্তি—আছে বই কি। প্যান-ইসলামিজমের দু'টো দিক। একটা রাষ্ট্রীয় বা পলিটিক্যাল ; আর একটা সাধনা ও সভ্যতার দিক—কালচারাল।

> এই সাধনার বা কালচারাল প্যান-ইসলামিজম্ অতি বড় জিনিস। ইহার সঙ্গে ভারতের ন্যাশনালিজমের কোনো বিরোধ নাই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা পলিটিক্যাল প্যান-ইসলামিজম্ নিকৃষ্ট বস্তু। মুসলমানকে তুনিয়ার রাষ্ট্রশক্তিতে সর্বশক্তিমান করিয়া তোলাই এই রাষ্ট্রীয় বা পলিটিক্যাল প্যান-ইসলামিজমের তুরাকাঙ্ক্ষা। আর ইহার সঙ্গে কেবল ভারতবর্ষের নহে, তুনিয়ার যত অ-মুসলমান রাষ্ট্রশক্তি সকলেরই বিরোধ।

এই সমস্ত রচনাপ্রকাশের নেপথ্যে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-পথ পরিবর্তন করবার প্রয়াস স্পষ্ট। কিন্তু যুক্তির বাঁধ বেঁধে যুগ-প্রবৃত্তির জোয়ারকে যে রোধ করা যায় না, বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের পরবর্তীকালে প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক রচনাগুলি তার ঐতিহাসিক সাক্ষীরূপে বিদ্যমান।

সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনা ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নবজাগরণ নব্যশিক্ষিত বাঙালীর মনোজীবনে যে বিচিত্র অভিমুখিতার সৃষ্টি করেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সন্তান বিপিনচন্দ্র সেই সর্ববিধ অভিমুখিতার দ্বারাই অল্লাধিক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এইজন্য তিনি যেমন শিক্ষা, ধর্ম ও দর্শন, সমাজ এবং রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তেমনি অবিমিশ্র সাহিত্য-চিন্তার মধ্যে প্রবেশের অভিমুখিতাকেও পরিহার করতে পারেন নি। টমাস ডি কুইন্সী সাহিত্যকে তুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। একটির নাম 'লিটারেচার অব্ নলেজ' বা জ্ঞানের সাহিত্য, অপরটির নাম 'লিটারেচার অব্ পাওয়ার' বা বলের সাহিত্য। বিপিনচন্দ্রের অধিকাংশ সাহিত্যিক রচনাই লিটারেচার অব্ নলেজ বা জ্ঞানের সাহিত্যের অন্তর্গত।

তত্ত্বপ্রিয়তা এবং ভাষ্য-প্রবণতা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ। আলোচ্য বিষয়সমূহকে তিনি যেমন তত্ত্বের নিকষ পাথরে ঘষে তাদের সত্যাসত্য যাচাই করেছেন, তেমনি আবার স্বানুভূতির সাহায্যে তাদের মর্মলোকে প্রবেশ করে নিজস্ব ভাষ্যের মাধ্যমে তাদের অনুভব-বেদ্য স্বরূপটিও উদ্ঘাটন করে

দিয়েছেন। সর্বক্ষেত্রেই এটি তাঁর রচনা-রীতির একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। তাই অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্য-চিন্তার ক্ষেত্রেও তাত্ত্বিক ও ভাষ্যকার রূপে তিনি স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন। তবে একটা কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিপিনচন্দ্রের অন্তর্জীবনের আকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে তাঁর সমগ্র সাধনাই ছিল সূক্ষ্মভাবে স্বদেশচর্যার অন্তর্গত। দেশ, জাতি ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণচিন্তার উপর ছিল এই স্বদেশচর্যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তত্ত্ববিচারের ক্ষেত্রে এই সূক্ষ্ম লক্ষণ তেমন স্পষ্ট লক্ষ্য না হলেও ভাষ্যরচনার ক্ষেত্রে এই লক্ষণ প্রায় সর্বত্রই স্পষ্টরেখ।

বিপিনচন্দ্রের সাহিত্য-চিন্তায় যে দু'টি প্রভাব সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট লক্ষ্য, তা' হচ্ছে —বৈষ্ণব-সাহিত্য এবং বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রভাব। এই দুই সাহিত্যের প্রভাব যেমন তাঁর সাহিত্য-চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তেমনি তাঁর সমালোচনার মুখ্য বিষয়ও হয়েছে—বৈষ্ণব-সাহিত্য এবং বঙ্কিম-সাহিত্য।

বিপিনচন্দ্রের নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি 'সাহিত্যতত্ত্ব' পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য :[৭৯]

নাট্যকলা ও রসতত্ত্ব; সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা; কাব্যের লক্ষণ; কবিতার কষ্টিপাথর; ধর্ম, নীতি ও আর্ট; ধর্ম ও আর্ট।

এ ছাড়া 'চরিত-চিত্র' গ্রন্থে বিধৃত 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক রচনার মধ্যেও সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা আছে।

বিপিনচন্দ্র যখন সাহিত্য-তত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন, তখন বাংলা-সাহিত্যে এ বিষয়ে সুব্যবস্থিত চিন্তাদর্শ গড়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এদিকে বাংলা-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে থাকে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার সরকার, পূর্ণচন্দ্র বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর পাঁড়ে, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ পণ্ডিত এবং সাহিত্যসেবকদের চিন্তার অবদানে সাহিত্য-তত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনা একটি লক্ষণীয় রূপ পরিগ্রহ করে। এ ছাড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য' এবং 'সাহিত্য' গ্রন্থত্রয়ও ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে, সাহিত্য-তত্ত্ব আলোচনায়

প্রাক্-রবীন্দ্রযুগের যে দু'জন লেখক বিশেষভাবে স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এবং তারপর ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

বিপিনচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্র-সমসাময়িক মানুষ এবং লেখনীও ধারণ করেছিলেন রবীন্দ্র-যুগে। তা' ছাড়া তিনি ছিলেন রবীন্দ্রকাব্যেরও অনুরাগী পাঠক। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—'কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনুরাগী পাঠক হইলেও তাঁহার সাহিত্যচিন্তা রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, কখনও কখনও রবীন্দ্র-বিরোধী।'[৮০] বিপিনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে পুরোধা করেই সাহিত্যচিন্তায় অগ্রসর হয়েছিলেন।

'উত্তরচরিত' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—'.. কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্যবিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই। সৌন্দর্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই দুইয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না'।[৮১] বিপিনচন্দ্র এই 'স্বভাবানুকারিতা'-রূপ ব্যাপারটির সঙ্গে স্বকীয় চিন্তা যুক্ত করে 'বস্তুতন্ত্রতা'র সূত্র উদ্ভাবন করেন। 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে'।[৮২] সাহিত্যবিচারে বিপিনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিকে প্রায় গুরুবাক্যের মতো গ্রহণ করে অগ্রসর হয়েছেন এবং তার জন্য প্রতিবাদেরও সম্মুখীন হয়েছেন।

নিজে অসামান্য সাহিত্যস্রষ্টা হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম এবং সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে সাহিত্যকে ধর্মের অঙ্গরূপে এবং সাহিত্যপাঠকে ধর্মচর্চার নিম্নতর সোপানরূপে উল্লেখ করে বলেছিলেন—'সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে। কেননা সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম।...সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্নসোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।'[৮৩] বিপিনচন্দ্রও 'ধর্ম ও আর্ট' শীর্ষনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপরি-উক্ত প্রবন্ধে 'ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি—ইহাই ধর্ম' বলে উল্লেখ করে সনাতনধর্মের কথাই বলেছেন। কিন্তু দেশাচারমূলক

লৌকিক ধর্ম যা' সাধারণ মানুষের রুচি ও নীতিবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেই লৌকিক ধর্মের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লিখিত প্রবন্ধে অনুপস্থিত। বিপিনচন্দ্র তাঁর উপরি-উক্ত প্রবন্ধে ধর্মকে 'সনাতন' এবং 'লৌকিক'—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন এবং মানুষের জীবনচর্যায় সনাতনধর্মের কথা স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন—'...রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য—বিশাল ও জটিল মানবজীবনের সকল বিভাগের সকল কর্মকে পূর্ণ করিয়াই এই বিশ্বজনীন সনাতনধর্ম আপনার সিদ্ধি লাভ করে।' বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও মনে করেন—'এই ধর্ম আর্ট অপেক্ষা বড়ো।' কিন্তু তিনি একথাও স্বীকার করেন যে 'লৌকিক ধর্মের বা নীতির সঙ্গে সময়ে সময়ে সাহিত্যের ও আর্টের বিরোধ ঘটিতে পারে; কিন্তু এই সনাতনধর্মের সঙ্গে তার কখন বিরোধ সম্ভবে না'।[৮৪] বিপিনচন্দ্র ধর্ম এবং সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথেই পদক্ষেপ করেছেন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে নীরব, বিপিনচন্দ্র সেখানে মুখর হয়ে ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যাবিশদ করে তুলেছেন। এখানেই তার মনস্বিতার পরিচয়।

'নাট্যকলা ও রসতত্ত্ব' বিপিনচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য প্রথম প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি স্বদেশীযুগের উন্মাদনাময় পরিবেশের রচনা। তাই এর মধ্যে তত্ত্বকথার উল্লেখ থাকলেও সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা অনুপস্থিত। স্বদেশী আন্দোলন ও স্বদেশহিতৈষণার নেপথ্য প্রেরণা-উৎস রূপে বাংলাদেশের নাট্যকলা ও রঙ্গালয়ের গৌরবময় ভূমিকার কথাই এই প্রবন্ধে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। বাংলা নাট্যকলা এবং বঙ্গরঙ্গালয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেছেন—'...এ সকলের দ্বারা বিশুদ্ধ রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা যত না হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে সমাজের সাধারণ ভাব ও আদর্শাদির পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে'।

নাটক-সম্পর্কিত রসতত্ত্বের প্রসঙ্গ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন 'ধর্ম, নীতি ও আর্ট' শীর্ষক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি পরে পৃথকভাবে আলোচিত হবে। তবে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। 'নাট্যের লক্ষণ' শিরোনামীয় অংশে বিপিনচন্দ্র নাটকের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—'...দেশ-কাল ও কর্ম-বিশেষের যথাযোগ্য সমাবেশের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তির আচার-আচরণ ও উক্তি-প্রত্যুক্তির সাহায্যে তাহাদের চরিত্রকে ফুটাইয়া তোলাই মোটামুটি নাট্য-সাহিত্যের লক্ষ্য।' এই লক্ষ্য বিশ্লেষণ

প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'নাট্যে একাধিক চরিত্রের অবতারণা করা হইলেও প্রত্যেক নাট্যেই একটি কি দুইটি মূল চরিত্র থাকে। সেই মূল চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়াই অপর সকল চরিত্রগুলি আত্মপ্রকাশ করে। নদীসকল যেমন ঋজু-কুটিল পথে একই সাগরাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ ঐ নাট্যের সকল দৃশ্য, সকল কর্ম, সকল কর্তা, সকল কথাবার্তা কেন্দ্রস্থিত চরিত্রটিকে বা চরিত্রগুলিকেই ফুটাইতে চেষ্টা করে। সহজ বুদ্ধিতে ইহাই নাট্যের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। এই লক্ষ্য বাহিরের নয়, ভিতরের ; এটি নাট্যের নিজস্ব লক্ষ্য।'

এর পর তিনি নাটকে চরিত্রসৃষ্টির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলেছেন—' কেবল চরিত্রাঙ্কনই নাট্যের উদ্দেশ্য নহে। নাট্যের চরিত্রসকল সমাজের লোক-চরিত্র হইতেই সংগৃহীত হয়। কিন্তু এই সকল লোক-চরিত্র অসংখ্য। কবি কাব্য বা নাট্য রচনাকালে এ সকলের মধ্য হইতে দুই চারিটি চরিত্র বাছিয়া লইয়া, তাহাদিগকে আপনার কাব্যে বা নাট্যে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই বাছুনির সূত্র কি ? কবি কোন্ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, সমাজের বহুবিধ লোকচরিত্রের মধ্যে এই দুই-চারিটি চরিত্র বাছিয়া লন ? এ বাছুনির কি কোনও লক্ষ্য নাই ? ...এই বাছুনির একটা লক্ষ্য থাকে। সে লক্ষ্যটি রস। ...কবি কোন্ রস ফুটাইতে চান তাহা ভাবিয়াই তাঁর কাব্যের মূল নায়ক-নায়িকা নির্বাচন করেন। ইহাদিগকে তিনি একটা বিশিষ্ট রসের মূর্তিরূপে গড়িয়া তোলেন। কিন্তু কোন রসই নিঃসঙ্গভাবে থাকে না। রস-বৈচিত্র্য না হইলে কোন রসই ফোটে না...এইজন্য সকল কাব্যেই নানা রসের অবতারণা হয় ; কিন্তু এ সকলের মধ্যে একটি রসই সর্বাপেক্ষা বেশী ফোটে। সেইটিই সে কাব্যের বা নাট্যের মূল আশ্রয় হয়।'

বর্তমানকালে নাট্যতত্ত্ব এবং নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার তুলনায় এ আলোচনা তেমন উল্লেখযোগ্য বিবেচিত না হলেও, যে সময়ে এই আলোচনা প্রকাশিত হয়, সে সময়ের পটভূমিকায় বিপিনচন্দ্রের এই আলোচনা ঐতিহাসিক মূল্য এবং তাঁর অনুসন্ধিৎসার স্বাক্ষর বহন করে।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতার টাউনহলে আয়োজিত এক বিরাট সভায় (মাঘ, ১৩১৮) কবিকে জনসংবর্ধনা জানানো হয়। ঐ উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটি চরিতালেখ্য রচনা করেন।

সেটি 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষনামে বঙ্গদর্শনের ১৩১৮ সালের (১৯১২) চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি বিপিনচন্দ্রের 'জীবনী-সাহিত্য' পর্যায়ে যথাযথভাবে আলোচিত হবে। তবে এই প্রবন্ধেই তিনি প্রথম 'বস্তুতন্ত্রতা'র সূত্র প্রয়োগ করে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে বস্তুতন্ত্রহীনতার অভিযোগ উত্থাপন করেন। এইজন্য এই প্রবন্ধটি বিপিনচন্দ্রের 'সাহিত্যতত্ত্ব' পর্যায়েও আলোচনার দাবি রাখে। এই প্রবন্ধে তিনি বস্তুতন্ত্রতার সঠিক কোনো সংজ্ঞা দেন নি। 'বস্তুতন্ত্রতা'কে তিনি ব্যাখ্যা বিশদ করেছেন 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা' শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত 'স্বভাবানুকারিতার' সঙ্গে 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা' এবং 'প্রকৃত কল্পনার' উপাদানের মিশ্রণে যে বিপিনচন্দ্রের বস্তুতন্ত্রতার সূত্র নির্মিত, এই প্রবন্ধ থেকে সহজেই তা প্রতীয়মান হয়।

রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনার বিশালতার সপ্রশংস উল্লেখ করেও আলোচ্যমান প্রবন্ধে তিনি বলেন—'উর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতে অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তুসকল বাহির করিয়া, আপনার অদ্ভুত কাব্য-সকল রচনা করিয়াছেন। তাঁর কাব্যে যেমন, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও তেমন অনেক সময় এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র-নাথের অনেক সৃষ্টিকেই তিনি এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'মায়িক' বলে উল্লেখ করেন।

১৩১৯-এর (১৯১২) আষাঢ় সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন ?'-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তী বিপিনচন্দ্রের উল্লিখিত প্রবন্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করেন। অজিতকুমারের প্রবন্ধের উত্তরে বিপিনচন্দ্রের 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।[৮৫]

এই প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র বস্তুতন্ত্রতার একটি যুক্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্মাণ করতে গিয়ে প্রথমেই অজিতকুমারের প্রবন্ধের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলেছেন "...'বস্তুতন্ত্র' কথাটার প্রকৃত মর্ম না বুঝিয়াই, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ আমার অঙ্কিত রবীন্দ্র-চরিত-চিত্র পড়িয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।" 'বস্তুতন্ত্র' কথাটি সংস্কৃত, এবং ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এই শব্দের বহুল ব্যবহার আছে, এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে বস্তুতন্ত্রবিহীনতার একটি মামুলী দৃষ্টান্ত 'বন্ধ্যাপুত্রবৎ'। সন্তানবতীর বাৎসল্য বস্তুতন্ত্র কিন্তু

নিঃসন্তানার বাৎসল্য বস্তুতন্ত্রতাহীন। বিষয়টি পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি বললেন—'যথাযোগ্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যখন আমাদের চিত্তে কোনো রসের সঞ্চার হয়, তখন সে রসের বিকাশের ও পরিণতির একটা স্বাভাবিক ও সার্বভৌমিক ক্রমও প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে রস বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠে না, কেবল মানস-কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া জাগিয়া ওঠে, তাহাতে এই সকল স্বাভাবিক ও সার্বভৌমিক বিকাশ-ক্রমটি দেখা যায় না।' একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে তিনি বলেন যে, যে কখনো সমুদ্র দেখেনি, অপরের পুঁথিগত সমুদ্রের বর্ণনা পাঠ করে কল্পনাবলে সে একটি সমুদ্রের চিত্র অঙ্কন করতে পারে না তা' নয়; হয়তো সমুদ্রদর্শনের অপার বিস্ময়ের ভাবটিও সে জীবন্ত করে তুলতে পারে। কিন্তু এই ধরনের চিত্র যে কল্পিত, সত্য নয়; অধ্যাস-প্রতিষ্ঠিত, বস্তুতন্ত্র নয়, তা মানতেই হবে। তাঁর ধারণা : 'যারা কখনো সমুদ্র দেখে নাই, তাদের পক্ষে ইহা লক্ষ্য করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু যারা সমুদ্র স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তাহাদের নিকটে এই ছবিটি যে সাচ্চা নয়,—কল্পনা, ইহা ধরা পড়িবেই পড়িবে।'

বস্তুতন্ত্রতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র ফোটোগ্রাফ ও তৈলচিত্রের মধ্যে বাস্তবতার পার্থক্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—'একেতে বাস্তবতা প্রবল, অপরে কল্পনার প্রভাব প্রত্যক্ষ। এই কল্পনাই ললিতকলার প্রাণ'। এই কল্পনা বলেই কবি বস্তুর রূপ প্রত্যক্ষ করে তার স্বরূপকে উদ্ঘাটন করে থাকেন। সুতরাং বিপিনচন্দ্রের মতে কবি-কল্পনাকে বস্তুতন্ত্র হতে হবে। আর তাঁর ভাষায়—'কাব্যসৃষ্টির বস্তুতন্ত্রতা সর্বদা কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে'। তবে যে সমস্ত বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, অনুভূতিগ্রাহ্য, তাদের সম্পর্কে বাস্তব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভ সম্ভব নয়; সেসব বস্তুকে অপরোক্ষানুভূতির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। কবি-কল্পনা এইভাবেই প্রকৃত কল্পনা বা ইমাজিনেশন' রূপে আত্মরক্ষা করতে পারে; নইলে তা উৎকল্পনা বা 'ফ্যান্সি'তে পর্যবসিত হতে বাধ্য। শ্রেষ্ঠ কবি-কর্ম ইমাজিনেশনের সৃষ্টি, ফ্যান্সির সৃষ্টি নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত সৌন্দর্য ও স্বভাবানুকারিতার সূত্র অবলম্বন করে বিপিনচন্দ্রের পূর্বে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সাহিত্যসৃষ্টি-সম্পর্কিত সমস্যার তত্ত্বগত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন।[৮৬] সাহিত্য স্বভাবানুকারী কিন্তু তাকে সৌন্দর্য-বিশিষ্ট হতে হলে স্বভাবাতিরিক্ত হয়ে উঠতে

হয়—ঠাকুরদাসের মূল বক্তব্য এ-ই। বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"সাহিত্য স্বভাবের অনুকৃতি। অনুকৃত বটে, অতিরিক্তও বটে।··· রূপ-রস, গন্ধ-স্পর্শ, শব্দ, দোষ, গুণ, দৃশ্য,—সুন্দর মনোহর, ভয়ঙ্কর কুৎসিত কদর্য—মহতের মহৎ, নীচের নীচ—সংসারে বা স্বভাবে সবই আছে। শিল্প বা সাহিত্য সেই 'সব' হইতে 'রকমারি' বাছিয়া ঘসিয়া মাজিয়া, ঝালিয়া কাটিয়া, ছাঁটিয়া,—চোস্তদোরস্ত করিয়া, যার পর যেটি বসিলে মানুষের চোখে মানায়, মনের মতো হয় ও মনের পরিসর বৃদ্ধি করে, সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, অথচ স্বভাবের সহিত ষোল আনা সামঞ্জস্য রাখিয়া, স্বভাবের সামগ্রীগুলি নিজের বক্ষে ধারণ করেন'। বলা বাহুল্য, এ কাজ হচ্ছে কবি-কল্পনার। কবির প্রকৃত কল্পনা বা ইমাজিনেশনই বাস্তব জগতের উপকরণরাশি থেকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে প্রয়োজনমতো নির্বাচনপূর্বক নির্বাচিত উপকরণসমূহকে পরিমার্জিত করে সৃজন-কর্মে নিয়োজিত করে। এইভাবেই সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা রক্ষিত হয়ে থাকে এবং সাহিত্য সৌন্দর্যবিশিষ্ট হয়। ঠাকুরদাস এই ইমাজিনেশনের ভূমিকার উল্লেখ করেন নি এবং বক্তব্যকে তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠাদান করতে পারেন নি। বিপিনচন্দ্র তা' করেছেন।

'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা' শীর্ষক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র সাহিত্যিক সৃষ্টি কর্মে 'ইমাজিনেশন' এবং 'ফ্যান্সি'র আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কোলরিজ ইমাজিনেশনকে 'প্রাইমারী' এবং 'সেকেণ্ডারী'—এই দুইভাগে ভাগ করে কবি-কল্পনাকে ক্রিয়াকারিত্বের দিক থেকে 'সেকেণ্ডারী ইমাজিনেশন'-এর পর্যায়ভুক্ত করেছেন।[৮৭] বিপিনচন্দ্র 'সেকেণ্ডারী ইমাজিনেশন' কথাটি ব্যবহার না করলেও, তাঁর ইমাজিনেশন-এর স্বরূপ ব্যাখ্যা কোলরিজ-কথিত সেকেণ্ডারী ইমাজিনেশনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন —'এই জাতীয় কল্পনা সর্বথাই বস্তুর রূপের সাক্ষাৎকারে জাগ্রত হইয়া, তাহার স্বরূপকে যাইয়া অধিকার করিতে আরম্ভ করে। যাহা দেখা যায় তাহার প্রেরণায় সজাগ হইয়া এই কল্পনা বা ইমাজিনেশন বস্তুতন্ত্র হইয়া বস্তুকে ছাড়াইয়া যায়।'[৮৮]

ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন—'···ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় কবির এই সংগ্রহ করিবার, বাছিয়া নেওয়ার এবং নূতন রূপ দেওয়ার কোনো মানদণ্ড দিতে পারেন নাই। সেই কারণেই তাঁহার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ এই

সমস্যার গভীরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বিপিনচন্দ্র এইখানে অধিকতর সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন।...বিপিনচন্দ্র সাহিত্যের তাৎপর্য বা বস্তুতন্ত্রতা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার মননশীলতার পরিচয় দেয়'।[৮৯]

বস্তুতন্ত্রতার সূত্র ভিত্তি করে 'কবিতার কষ্টিপাথর' শীর্ষক অন্য একটি প্রবন্ধে শ্রেষ্ঠ কবিতার স্বরূপ লক্ষণ বিশ্লেষণ করে সূত্রের আকারে তিনি বলেছেন—'...শ্রেষ্ঠ কবিতামাত্রই রসাত্মক ও বস্তুতন্ত্র'।[৯০] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এরও পূর্বে বিপিনচন্দ্র বঙ্গদর্শনে অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করেন। 'এষা' শীর্ষনামে প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সমালোচনা-অংশ পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে। এই প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যায় তিনি কাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—'সাহিত্য-দর্পণ'-এর এই সূত্রকে অঙ্গীকার করেও আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেন—'বাক্য একদিকে যেমন রসাত্মক হইবে, অন্যদিকে সে রসটাও আবার বিশ্বজনীন হওয়া আবশ্যক। রসাত্মকতা যেমন, সেইরূপ এই বিশ্বজনীনত্বও কাব্যের বিশেষ লক্ষণ, ইহার একটি ছাড়িয়া দিলে কাব্যের কাব্যত্ব থাকে না'।[৯১] সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণরূপে 'বিশ্বজনীনতা'—বিপিনচন্দ্র-উদ্ভাবিত কোনো নতুন কথা নয়। তবে 'বিশ্বজনীনতা'র অঙ্গীকারের ফলে তাঁর কাব্যের সংজ্ঞা সম্প্রসারিত হয়েছে। বিপিনচন্দ্রের সূত্রানুসারে সার্থক কাব্যের লক্ষণ হচ্ছে তাই—বস্তুতন্ত্রতা, রসাত্মকতা এবং বিশ্বজনীনতা।

বিপিনচন্দ্র-উদ্ভাবিত বস্তুতন্ত্রতার সূত্র কেন্দ্র করে বাংলা-সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এক সময় (১৩১৮-১৩২২) বাদানুবাদের ঝড় বয়ে যায়। তরুণ অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বিপিনচন্দ্রের পক্ষ এবং অজিতকুমার চক্রবর্তী ও স্বনামখ্যাত প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্র-পক্ষ অবলম্বন করে বাদানুবাদের আসরে অবতীর্ণ হন।[৯২] বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের সে অধ্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে, বিপিনচন্দ্রের বস্তুতন্ত্রতা চিত্রশিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফরাসী শিল্প ও ভাবুক কুর্বে এবং ফ্লবেয়ার যে 'রিয়ালিজম্'-এর প্রবর্তন করেন, ঠিক তা'ও নয়; আবার এমিলি জোলা প্রবর্তিত 'রিয়ালিজমের' প্রকারভেদ 'নেচারালিজমের' স-গোত্রও নয়।[৯৩] কারণ, বস্তুতন্ত্রতার মাধ্যমে বিপিনচন্দ্র প্রকৃতি থেকে আহৃত অভিজ্ঞতার রসাত্মক বর্ণনা দাবি করেছেন, বিকৃতির যথাযথ উপস্থাপনা দাবি করেন নি।

'নারায়ণ' পত্রিকার ১৩২২-এর জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এবং শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত রচিত তিনটি কথা-নাট্য প্রকাশিত হয়। কথা-নাট্যগুলির নাম যথাক্রমে 'মরণে জয়', 'আঁধার ঘরে' এবং 'হাসির দাম'। এই কথা-নাট্যগুলি প্রকাশিত হবার পর এগুলির উদ্দেশ্যে সমালোচকমহল থেকে নিন্দা এবং প্রশংসা—উভয়ই বর্ষিত হয়। যাঁরা নিন্দা করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ধর্ম ও নীতির প্রশ্ন উত্থাপন করে নিন্দাবাদ করেন; আর যাঁরা প্রশংসা করেন, তাঁরা আর্টের দোহাই দিয়ে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেন।

'ধর্ম, নীতি ও আর্ট' শীর্ষক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র উভয় শ্রেণীর সমালোচকের মতামত বিচার বিশ্লেষণ করেন এবং সেই সূত্রে সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ সম্পর্কে আপন অভিমত ব্যক্ত করেন। বিপিনচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় সেই অভিমতের উল্লেখ একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক।

উপরি-উক্ত প্রবন্ধের মুখবন্ধে তিনি বলেন—'ধর্মের দোহাই দিয়া এগুলির অমন নিন্দা, কিংবা আর্টের দোহাই দিয়া অত প্রশংসা না করিলে আমি এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম না। কারণ, সাহিত্য-সমালোচনার একটা আদর্শ আছে। সে সমালোচনার একটা ক্ষেত্র চাই'। সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শের প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন—'··সাহিত্য-সমালোচনা বলিতে আমি সাহিত্য-সৃষ্টি বিশেষের নিজের আদর্শের দ্বারা তার বাস্তবতার, নিজের লক্ষ্যের দ্বারা তার প্রয়াসের, নিজের গন্তব্যের দ্বারা তার গতির, নিজের নিয়তির দ্বারা তার নীতির, নিজের স্বরূপের দ্বারা তার রূপের,—সত্যাসত্যের ও উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার বুঝি। ইহাই সাহিত্য-আলোচনার সত্য আদর্শ'। তবে সমস্ত সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রে এই ধরনের সমালোচনার ভূমি সহজলভ্য নয়। একমাত্র সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির বেলাতেই সমালোচনার প্রকৃত আদর্শ প্রয়োগ করা সম্ভব।

সাহিত্যের অন্তরঙ্গ লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—'আর্ট ধর্ম-প্রচার করে না, মত প্রতিষ্ঠা করে না, সমাজ-সংস্কার বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ যাহাতে হয়, তার প্রতিও দৃষ্টি রাখে না। এ সকল কথা মানিলাম। কিন্তু আর্টের যে নিজের একটা লক্ষ্য আছে, এই সকল মামুলি কথা দিয়া তার বিচার আলোচনার মুখ বন্ধ করা যায় না।···কবির প্রত্যেক শব্দযোজনার অন্তরালে সমগ্র চরণটির, প্রত্যেক চরণটির সংস্থানের মধ্যে সমগ্র কবিতাটির

প্রতি কি লক্ষ্য থাকে না ?... আর ঐ সমগ্র কবিতাটি যে কি, তাহা কি এই শব্দ ও চরণ-বিন্যাসের মধ্যেই প্রকাশ পায় না ? নাট্যকার, চিত্রকর, ভাস্কর, সকল রস-স্রষ্টা বা আর্টিস্ট সম্বন্ধে কি ওকথা খাটে না ?' অর্থাৎ আর্ট দৃশ্যত কোনো স্থূল উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক না হলেও অন্তরঙ্গ সত্তায় সে নিশ্চিতভাবে একটি বিশেষ লক্ষ্যের অভিমুখী হতে বাধ্য। সে লক্ষ্য কী তা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও, অন্ততপক্ষে তা যে রসসৃষ্টি বা সৌন্দর্যসৃষ্টি তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। সমন্বয়ের সাধক বিপিনচন্দ্র এখানে কলা-কৈবল্যবাদ এবং শিল্পে উদ্দেশ্যবাদ-তত্ত্বের সমন্বয়সাধন করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

বিপিনচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনা-বিষয়ক রচনার অধিকাংশ অধিকার করে রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য ও বঙ্কিম-সাহিত্য, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া, রবীন্দ্র-সাহিত্য, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ সাহিত্য-রথীদের সাহিত্য-কৃতি সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। সে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রসগ্রাহী মনের পরিচয়-বাহী।

একান্ত তরুণ বয়স থেকেই তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্পর্কে দু-একটি প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন, যদিও এ বিষয়ে তাঁর অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হয় ১৩১৯ থেকে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের মধ্যে। তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বের রচনা ইংরেজী গ্রন্থ 'বেঙ্গল বৈষ্ণভিজম্' বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্পর্কিত একখানি মনোজ্ঞ আলোচনা-গ্রন্থ। বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতিও তাঁর অনুরাগ সুবিদিত। ১৩২৯-এর পৌষ থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর সুব্যবস্থিত আলোচনা প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া বাংলা ও ইংরেজীতে লিখিত আত্মজীবনী গ্রন্থে এবং অন্যান্য বিষয়ক রচনাতেও বঙ্কিম ও বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবোধের প্রকাশ আছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য :

নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি বৈষ্ণব-সাহিত্যালোচনার পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য :

বাঙালীর বৈষ্ণবধর্ম ; রাধিকার প্রেম ; রসের রূপ (বাৎসল্য) ; রসের রূপ (দাস্যমুক্তি) ; পূর্বরাগ ; রসের পথে ; বৈষ্ণব কবিতার রসগ্রহণ ; মহাজন পদাবলী

ও রসকীর্তন ; বৈষ্ণব কবিতার কথা ; তদুচিত গৌরচন্দ্র ; বৈষ্ণব মহাজন ও বাঙ্গালা মহাজন পদ ; মহাজন পদের ঈশ্বরতত্ত্ব ; মহাজন সিদ্ধান্তে পুরুষ প্রকৃতি ; আদিরস ; একখানি পত্র ; আর একখানি পত্র।

এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য তাঁর ইংরেজী গ্রন্থ 'বেঙ্গল বৈষ্ণভিজম্'-এর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া 'নবযুগের বাংলা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'বাংলার বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক প্রবন্ধের 'মানবতার সাধন' অংশে এবং অন্যত্র দু-চারটি প্রবন্ধেও বিক্ষিপ্তভাবে বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনা আছে।

'বাঙালীর বৈষ্ণবধর্ম' এবং 'রাধিকার প্রেম' শীর্ষক প্রবন্ধ বিপিনচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের রচনা।[১৪] তখনও তিনি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেননি এবং তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের একান্ত অনুগত। সম্ভবত বংশগতির তাগিদেই তিনি এ সময় বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাংলার প্রেমভক্তিমূলক বৈষ্ণব-ধর্ম কালে কালে কিভাবে চূড়ান্ত অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয় এবং প্রাকৃত জনের কল্পনায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা কেমন ভাবে বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করে, 'বাঙালীর বৈষ্ণবধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র তার একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন—'ঈশ্বর যেমন মানুষকে সৃজন করিয়াছেন, মানুষও সেইরূপ সময়ে সময়ে ঈশ্বরকে সৃজন করিয়া থাকে। যাহার হৃদয়ের ভাব যেরূপ, তাহার ঈশ্বরও সেইরূপ হইয়া থাকেন'। প্রেমভক্তির ধর্ম অতি উচ্চ ধর্ম, সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমধর্মের কেন্দ্রস্থ প্রেমিক পুরুষ। কিন্তু তাঁর মতে বাঙালীর চারিত্রিক অপকর্ষই কালে কালে প্রেমিক পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়াসক্ত বিলাসী পুরুষে পরিণত করেছে।

'রাধিকার প্রেম' শীর্ষক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যের নায়িকা শ্রীরাধিকার প্রতি তথাকথিত নীতিবাগীশেরা যে কুলত্যাগের কলঙ্ক আরোপ করে থাকেন, তা' স্খালনে উদ্যোগী হয়েছেন।

প্রবন্ধের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন—'বর্তমান শিক্ষিত সমাজে রাধিকা যেরূপ কলঙ্কিনী, বাস্তবিকই কি তিনি তত কলঙ্কের অধিকারিণী? কলঙ্কিনীই হউন আর যাহাই হউন, রাধিকা বঙ্গের সাহিত্যভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম মণি।...' শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার আসক্তিকে তিনি রূপজ মোহ বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সে রূপানুরাগের নেপথ্যে প্রেমের উদ্দীপনা বিদ্যমান। আর তাঁর

নিজের কথায়—'প্রেম ও সৌন্দর্য যমজ ভ্রাতা'। শ্রীকৃষ্ণের চোখের চাহনিতে রাধিকার প্রাণমন-হরণ প্রকৃতপক্ষে প্রেমের শক্তি-সঞ্চারে রাধিকার নতুন প্রাণধর্মে নবজাগরণ। বিপিনচন্দ্রের ধারণায়—'এই ধর্মেই রাধা বিধর্মিনী; এই নূতন ধর্মের এই নূতন উপদেশেই রাধিকা কুলত্যাগিনী, কলঙ্কিনী। প্রকৃত প্রেম যাহার প্রাণে জাগিয়াছে, তাহার এ দশা সর্বথা ঘটে। প্রেমের ভাষা স্বতন্ত্র, ভাব স্বতন্ত্র, রীতি স্বতন্ত্র, নীতি স্বতন্ত্র।...সমাজের সঙ্গে তাহার চিরবিরোধ।' পাশ্চাত্য সাহিত্যজগতের প্রখ্যাত প্রেমিকা নায়িকা দেসদিমোনা এবং জুলিয়েট-এর সঙ্গে রাধিকার তুলনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে রাধিকার প্রেমের সঙ্গে জুলিয়েটের প্রেমের তুলনাই হতে পারে না; কারণ, জুলিয়েট আপন প্রেমে আপনি গরবিণী। তার প্রেমে আত্মসমর্পণের সুর নেই। বরং রাধিকার প্রেমের সঙ্গে দেসদিমোনার প্রেমের কিয়দংশে তুলনা করা চলে। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'উচ্চতম প্রেমে ও ধর্মভাবে কোন বৈষম্য নাই।...রাধিকার প্রেমে হৃদয়ের পূজা ছিল।'

বিপিনচন্দ্রের বৈষ্ণব-সাহিত্য সমালোচনা প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বভিত্তিক আলোচনা—বৈষ্ণব ভাব ও ভাবনার স্বরূপোদ্ধার। কারণ, সত্যই 'এই যুগের লেখকেরা মর্মকথার উদ্‌ঘাটনকেই সাহিত্য-সমালোচনা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তবু বলিতে হইবে, বিপিনচন্দ্র বৈষ্ণব কবিতার রহস্যের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাহার বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন'।[৯৫] এ প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে তিনি মুখ্যত বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাধনাকে কেন্দ্র করেই আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন।

বিপিনচন্দ্রের মতে 'বাংলার সনাতন সাধনার আর একটা বিশেষত্ব—ইহার মানবতা—...বাংলায় দেববাদ আছে সত্য, কিন্তু বাংলায় যে সকল দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত তাঁহাদের সকলের মধ্যেই একটা অদ্ভুত মানবতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।'[৯৬] এই মানবতার ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই একদা প্রাক্-চৈতন্য যুগের বাঙালী কবি চণ্ডীদাস দুনিয়ার মানুষের কাছে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন—

শুন হে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'এইরূপে বাংলার বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ভগবানের পরিপূর্ণ মানবত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধারণ মনুষ্যত্বের ভূমিতে মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে

এক নিত্য-মাধুর্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে'। তাঁর ইংরেজীতে লেখা 'বেঙ্গল বৈষ্ণভিজম্' গ্রন্থেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।[৯৭] বিপিনচন্দ্রের মতে তাই বৈষ্ণব-সাহিত্যের মুখ্য লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মানবিক ভাব। এই প্রসঙ্গে অনেককাল পূর্বে রচিত (১২৯৯) রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত 'বৈষ্ণব-কবিতা' শীর্ষনামীয় কবিতাটি স্মরণযোগ্য। অনুরূপ ভাবের অভিনব বাঙ্ময় প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের 'বৈষ্ণব-কবিতা' অনবদ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি অন্যান্য বিষয়ের মতো বৈষ্ণব-কবিতারও সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা—ধর্মবুদ্ধিনিরপেক্ষ এবং তত্ত্বদৃষ্টিমুক্ত রসগ্রাহী আলোচনা। বঙ্কিমের অনুবর্তী ও পরবর্তী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সতীশচন্দ্র রায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ সমালোচকগণও অনেকাংশে বঙ্কিমী ধারার অনুসরণেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরক্ত ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্র কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনায় একটু ভিন্ন পথের পথিক হয়েছেন।

ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের ভাষায় উপরি-উক্ত সমালোচকগণ—'··· বৈষ্ণব-কবিতার কোমলতা, সরলতা ও কেন্দ্রীভূত এক ঘন রসময়তার দ্বারা আপ্লুত হইয়াছেন। বিপিনচন্দ্র এই সকল গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু ইহার অন্তরালে তিনি দেখিয়াছেন জটিলতা, বৈচিত্র্য, দুইটি বিরোধী ভাবের স্বাতন্ত্র্য ও সম্মিলন। তাহারই নাম লীলা'।[৯৮] বিপিনচন্দ্রের মতে কৃষ্ণলীলাই মহাজন পদের বিষয় আর পদাবলী-কীর্তনে লীলাই বিধেয়স্বরূপ। এই লীলা-তত্ত্বকে তিনি ব্যাখ্যা-বিশদ করে তুলেছেন তাঁর 'বেঙ্গল বৈষ্ণভিজম্' গ্রন্থে।[৯৯] বিচ্ছেদ ও মিলনের চিরন্তন প্রক্রিয়াই হচ্ছে, তাঁর মতে লীলা-তত্ত্বের ভিত্তিভূমি। প্রকৃতি পুরুষ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পুরুষের সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য সচেষ্ট হয়,—এইভাবেই নিত্যকাল ধরে লীলা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এই লীলারস উপলব্ধ করাবার উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যে পরমপুরুষকে প্রেমিকপ্রবর শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং জীব ও জগৎরূপী প্রকৃতিকে রাধারূপে কল্পনা করা হয়েছে। আর এই প্রেমিকযুগলের প্রেম-লীলা মানুষী ভাবের আধারে ব্যক্ত করা

হয়েছে। বিপিনচন্দ্র এই তত্ত্বের উল্লেখ করে বলেছেন—'এই পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব মহাজন-সিদ্ধান্তের মূল-তত্ত্ব। মহাজন-সিদ্ধান্তের ঈশ্বরতত্ত্ব এই যুগল-তত্ত্ব'।[১০০]

বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত রসসমূহকে স্বীকার করে নিয়ে বিপিনচন্দ্র বলেছেন যে লৌকিক জগতের মানবিক সম্পর্কই হচ্ছে এই সমস্ত রসের উৎস। 'বেঙ্গল বৈষ্ণভিজম্' নামক ইংরেজী গ্রন্থে তিনি এই 'রস'-এর নামকরণ করেছেন 'রোমান্স'।[১০১] কিন্তু তা'ই বলে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মাধুর্যের সমস্ত সম্পর্কই রসের পর্যায়ে উন্নীত হয় না। রসের যিনি আলম্বনবিভাব, তাঁর সত্তায় যখন রস-সাধক আপন সত্তা বিলীন করে দিতে পারেন, তখনই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য কিংবা মধুর রস-মূর্তি পরিগ্রহ করে। বিপিনচন্দ্র মনে করেন যে, রসের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দৃশ্য ও বাস্তবের মাধ্যমে অদৃশ্য ও আদর্শের অনুসন্ধান।[১০২]

বিপিনচন্দ্রের মতে বাংলার বৈষ্ণব ভক্তিমার্গের আর একটি উল্লেখ্য অবদান হচ্ছে এর 'ভিকেরিয়াস্‌নেস' বা পরোক্ষ আস্বাদন-প্রণালী।[১০৩] বিপিনচন্দ্র এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'পরকীয়া'। 'মহাজন পদাবলী ও রসকীর্তন' শীর্ষক একটি বাংলা প্রবন্ধে তিনি 'ভিকেরিয়াস্‌নেস্' ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যাবিশদ করে তুলেছেন। তিনি বলেছেন—'হীনবুদ্ধি লোকের হাতে পরকীয়া শব্দটি অতি জঘন্য অর্থ লাভ করিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব-সাধনের পরকীয়ার আদর্শ বস্তুতঃ হীন নহে। খৃষ্টীয় সাধনে ও খৃষ্টীয়ান মুক্তিতত্ত্বে যাহাকে ভিকেরিয়াস্ বলিয়াছে, বৈষ্ণব-সাধনার পরকীয়াও বস্তুতঃ তাহা।' ভিকেরিয়াস্‌নেস্ আর পরকীয়া-লীলা সমার্থক,—এই কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন—'প্রেম মাত্রেই এই পরকীয়া-বৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলে। আপনার সুস্থ শরীরে স্নেহময়ী জননী রুগ্‌ণ সন্তানের রোগ-যাতনা অনুভব করেন। পিতা অপরাধী পুত্রের লাঞ্ছনার ভার আপনার প্রাণে বহন করেন।...যুবদম্পতির প্রেমাভিনয় দেখিয়া বৃদ্ধ সুরসিকেরা আপনাদের যৌবন যেন ফিরাইয়া পান,—ইহাও পরকীয়া-লীলা। নিষ্কাম প্রেম মাত্রেই পরকীয়া বৃত্তি অবলম্বন করে।'[১০৪] এই তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করে তিনি আরও বলেছেন যে সমস্ত শিল্পসৃষ্টির রসাস্বাদনেই এই পরকীয়াত্ব ক্রিয়াশীল থাকে।[১০৫] পরকীয়া-তত্ত্বের এই নতুন তাৎপর্য ব্যাখ্যা বিপিনচন্দ্রের চিন্তা-শক্তির মৌলিকতার পরিচয়-বাহী।

আলোচিত তত্ত্বাদর্শসমূহের মানদণ্ডেই বিপিনচন্দ্র বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের মূল্যায়নে অগ্রসর হয়েছেন। তবে একথাও স্মরণযোগ্য যে তিনি চিন্তার কোনো

ক্ষেত্রেই শুধু নীরস তত্ত্বের পথে পদচারণা করেননি। রস-সাধনাই ছিল তাঁর অন্তরের নিগূঢ় বাসনা। রসের অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্যই যেন তিনি তত্ত্বের আলোকবর্তিকা অনুসন্ধান করেছেন।

মানবিক ভাবকে আশ্রয় করেই রস পরিপুষ্টি লাভ করে। বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'বৈষ্ণব কবিতার প্রধান গুণ ইহাদের মানুষী ভাব।...এইজন্যই মহাজন পদাবলী পড়িতে বসিয়া, সকলের আগে শ্রীকৃষ্ণ যে দেবতা, এই কথাটি ভুলিয়া যাইতে হইবে। বৃন্দাবনলীলা যে নরলীলা, বৃন্দাবনের সকলেই যে মানুষ, ইহা যারা বুঝে না বা বুঝিয়াও ভুলিয়া যায়, অথবা এই নরলীলাকে যারা একটা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বলিয়া মনে করে, তাদের পক্ষে মহাজন-পদাবলীর নিগূঢ় রস সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করা আদৌ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না'।[১০৬]

মানুষী ভাব কিংবা নরলীলার বিকাশের পক্ষে দেহের অবলম্বন অপরিহার্য। তাই তাঁর ধারণায় '...প্রেমের রাজ্যে, রসের রাজ্যে মানুষের শরীরটা একটা অতি প্রধান আশ্রয়। রস-বস্তু প্রকৃতপক্ষে ও স্বরূপত চিন্ময় হইলেও দেহাশ্রয় ব্যতীত ইহার স্ফূর্তি হয় না, হইতেও পারে না।'[১০৭] আর দেহের ভূমিকা স্বীকার করলে ইন্দ্রিয়ের ভূমিকাও অবশ্য স্বীকার্য। তিনি বলেন—'রসবস্তু যে বোঝে, সে ইহা জানে যে জীবের এই সকল স্থূল ইন্দ্রিয়েরও একটা নিত্য, অতীন্দ্রিয় আশ্রয় ও সম্বন্ধ আছে।...[১০৮] তাঁর মতে প্রেমের উৎস দেহাশ্রিত ইন্দ্রিয়জ কামনা, কিন্তু তার মোহানা অনেক দূরবর্তী। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'প্রেমের যে দুরন্ত অঙ্গসঙ্গলাভপিয়াসা তাহা ফলতঃ অঙ্গকে পাইবার জন্য নহে, অঙ্গকে ছাড়াইয়া উঠিয়া দুই প্রাণ ও দুই অঙ্গকে এক করিয়া দিবার জন্য'।[১০৯]

এই অনুভবকে তিনি স্পষ্টতর করে তুলেছেন তাঁর 'বৈষ্ণব-কবিতার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন—'এই মানুষের মধ্যেই মানুষকে ছাড়াইয়া একটা কি যেন আছে, তারই টানে আমাকে অমন পাগল করিয়া তুলে।... আমাদের প্রাণ চায় এমন কাহাকেও যাঁর মধ্যে ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় মিশিয়া গিয়াছে, যাঁর মধ্যে বাস্তবই কল্পনা ও কল্পনাই বাস্তব হইয়াছে; যাঁকে দেখিয়া যাহা দেখা যায় না তার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি; যাঁকে ছুঁইয়া যাঁকে ছোঁয়া যায় না তার অঙ্গসঙ্গ পাইতে পারি।. আমার প্রাণ তোমার স্বর্গের ঈশ্বরকে চায় না।'

রসের লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি ঐ প্রবন্ধেই বলেছেন—'সর্বসঞ্চারণশীলতা ও সর্বানন্দদান রসের মুখ্য ধর্ম'। সখ্যরসের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—'...রস যখন প্রগাঢ় হইয়া ইহাদের দেহকে, ইন্দ্রিয়কে, স্নায়ুমণ্ডলকে, মনকে, ভাবনাকে, এককথায় ইহাদের পরস্পরের সমগ্রতাকে গ্রাস করিয়া বসে, তখন ইহারা চক্ষুসাক্ষাৎকার ব্যতীতও পরস্পরের রূপ দেখে, শ্রুতিসাক্ষাৎকার ছাড়াও পরস্পরের শব্দ শোনে, বহিরিন্দ্রিয় সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে আপনাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা একে অন্যকে গ্রহণ করে ও একে অন্যের সঙ্গ লাভ করে। এই অবস্থা লাভ হইলে, সখ্যরস সখ্যরতিতে পরিণত হয়। ইহাই রসের চরম পরিণতি'। রসের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যাবিশদ করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকে রাধার উক্তি—

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়।......

উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন—'একে বলে রস। এ যে কেবল অনুভব বা 'ফিলিং' নহে, ইহাও কি আবার বলিতে হয়, না বুঝাইতে হয়। তবে অনুভব বা ফিলিং হইতে এই রসের বা রোমান্স-এর জন্ম হয়, ইহাও অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। অনুভব বীজ, রস এই বীজের গাছ। অনুভব বা ফিলিং-এর সঙ্গে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ নিত্য, অপরিহার্য। এইজন্য ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের আশ্রয়ে ব্যতীত কোনও সত্য রস জন্মিতে পারে না।' বলা বাহুল্য, বিপিনচন্দ্রের এই রস-প্রক্রিয়া-বিশ্লেষণ তাঁর বস্তুতন্ত্রতার সূত্র স্মরণ করিয়ে দেয়।

'বৈষ্ণব-কবিতার রসগ্রহণ' শীর্ষক প্রবন্ধে[১১০] প্রথমেই তিনি বৈষ্ণব-কবিতার বস্তুতন্ত্রতা-গুণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—'বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহা আর কোনো কবিতায় এ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। প্রথমতঃ এগুলি অত্যন্ত বস্তুতন্ত্র। বৈষ্ণব-কবিকুলগুরুগণ যে সকল রসের ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কল্পিত নয়, প্রত্যক্ষ। ..' বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি বলেন—'...প্রাচীন মহাজনেরা সকলেই চাক্ষুষ মানুষেতে এই অমানুষী প্রেমের সাধনা করিয়া তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির যেমন লক্ষ্মীবাঈ, চণ্ডীদাসের তেমন রজকিনী রামী, জয়দেব ঠাকুরের

সেইরূপ পদ্মাবতী ছিলেন।' তবে এ বস্তুতন্ত্রতার অবলম্বন, তাঁর মতে, শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 'রিয়েল' নয় ; অতীন্দ্রিয় 'আইডিয়াল'ও বটে। আর এই 'রিয়েল' ও 'আইডিয়াল'-এর মধ্যে ধ্যানের জগতে তিনি কোনো প্রকৃত বিরোধ আছে বলে মনে করেন না। তাই উপরি-উক্ত প্রবন্ধের শেষে তিনি সমন্বয়বাদীর ভাষায় বলেছেন—'বৈষ্ণব-কবিতার সম্যক রস গ্রহণ করিতে হইলে এই ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় সংকেতটি ধরিতে হইবে। রিয়েলিজ্‌ম্ এবং আইডিয়ালিজ্‌মের চিরন্তন বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে হইবে। যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ তারই মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় সত্য নিত্য বিরাজ করে, যাহাকে লোকে ইন্দ্রিয়-রস বা বিষয়-রস বলে, তারই মধ্যে যে নিখিল রসামৃত মূর্তি শ্রীভগবানের রসধারা নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, জীবের আনন্দ মাত্রেই যে ব্রহ্মানন্দ ও চিদানন্দ এই তত্ত্বটি বুঝিতে হইবে।…'

'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের 'রসের রূপ' শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি এই পর্যায়ে আলোচনার যোগ্য।[১১১] রস স্বরূপে অতীন্দ্রিয় কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মধ্যে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথম প্রবন্ধটিতে তিনি রসের শারীর-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—'…বাহিরের আলোকের সঙ্গে আমাদের চক্ষের গোলকের এমন একটা সম্বন্ধ আছে যে, আলোক ফুটিলেই গোলকে তার প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায়। সেইরূপ আমাদের অন্তরের রসের সঙ্গে একদিকে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর ও অন্যদিকে এই স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়াই আমাদের শরীরের পেশীসমূহের একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অন্তরে কোনও রসের সঞ্চার হইবামাত্রই স্নায়ুমণ্ডলে তাহার সাড়া পড়িয়া যায়।…ভিন্ন ভিন্ন রসের তাড়নায় আমাদের স্নায়ুমণ্ডলে প্রথমে এবং ক্রমে আমাদের শরীরের বিভিন্ন পেশীসমূহের সাহায্যে বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশিত হয় এবং এই সকল স্নায়বিক ও পৈশিক ক্রিয়া নিবন্ধন আমাদের চক্ষে মুখে যে সকল ছবি ফুটিয়া ওঠে, তাহাই এই সকল রসের রূপ।' রসের এই রূপ-পরিগ্রহ ব্যাপারটিকে বিশদ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'…প্রাকৃত-জনে হয়তো ভাবে যে সন্তান কোলে ধরিয়াই ম্যাডোনা ম্যাডোনা এবং গণেশ-জননী গণেশজননী হইয়াছেন।…কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। সন্তান কোলে লইয়াও কোনও জননীর মধ্যে কখনও কখনও তাঁর সত্যিকার মাতৃমূর্তিটি ফুটিয়া নাও উঠিতে পারে ;…বাৎসল্যরসের পীড়নে জননীর স্নায়ুমণ্ডলে যে সকল বিপ্লব

উপস্থিত হয়, তাহার চক্ষের, মুখের, উরসের স্নায়ুসকল ও পেশীসমূহ যে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, এগুলিকে লক্ষ্য করিয়া, এই ক্রিয়ার ছবিকে অন্তরে ধারণ করিয়া যে চিত্রকর বা ভাস্কর তাহাকে চিত্রপটে বা মর্মর-খণ্ডে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনিই সত্য মাতৃমূর্তি-রচনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

'রসের রূপ' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'· যেমন বাৎসল্যের সেইরূপ মাধুর্যেরও একটা নিজস্ব মূর্তি আছে। দাস্য এবং সখ্যেরও আছে।···সখ্যরসটি দাস্যরসটি অপেক্ষা অধিক জটিল।' বিষয়টি পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'শৈশব আর যৌবন যেখানে গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যাইতে আরম্ভ করে, তখনকার সখ্যেতে এমন সকল বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে, যাহা বস্তুতঃ সচরাচর কেবল মাধুর্যেতেই দেখা দিয়া থাকে।···তাহাদের সুকোমল ও কামসম্পর্কশূন্য দেহেতেই কেবল সত্য সখ্যের বিশুদ্ধ রূপটি ফুটিবার অবসর প্রাপ্ত হয়।'

'বৈষ্ণব মহাজন ও বাঙ্গালা মহাজন-পদ' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'মহাজন', 'মহাজন-পদ' এবং বৈষ্ণব সাধনধারার ব্যাখ্যানের দিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।[১১২] প্রবন্ধের মুখবন্ধেই তিনি উল্লেখ করেছেন—'সকল বৈষ্ণবই মহাজন নহেন ; সকল বৈষ্ণব কবির কবিতাকেই মহাজন-পদ বলা যায় না।' বিপিনচন্দ্রের মতে 'ভক্তিপথের সাধক সিদ্ধিলাভে, সমাধিতে যখন সকল ইন্দ্রিয়ের বহিশ্চেষ্টার একান্ত নিবৃত্তি হয়, তখন অন্তরের অপরোক্ষ অনুভবেতে এই চিদৈশ্বর্যসম্পন্ন চিদ্‌বিভূতিভূষিত, চিদ্দেহেতে চিদিন্দ্রিয়সমাবিষ্ট, সর্বজীবের সর্বেন্দ্রিয়াকর্ষক ভগবানের বা পুরুষোত্তমের বা নরোত্তমের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এই সিদ্ধি যাঁহার লাভ হইয়াছে, কেবল তাঁহাকেই বৈষ্ণব মহাজন বলা যায়'। অর্থাৎ বিপিনচন্দ্রের মতে যিনি একাধারে কবি এবং সিদ্ধসাধক, তিনিই মহাজনপদবাচ্য এবং এই স্তরের বৈষ্ণব কবিদের রচিত কবিতাই মহাজন-পদ নামে অভিহিত হবার যোগ্য। অবশ্য 'মহাজন-পদ' বা 'মহাজন-পদাবলী' কথাটি বৈষ্ণব-কবিতার প্রসঙ্গে সাধারণত এত সূক্ষ্ম অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বিপিনচন্দ্র নিজেও তা' অন্যত্র করেন নি।

বৈষ্ণব সাধনার ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই প্রবন্ধেই তিনি বলেছেন—, ···জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—সাধনের এই তিনটি ধারা অবলম্বন করিয়া, ক্রমে সিদ্ধিলাভে সাধকেরা ভগবৎ-স্বরূপের যে তিনটি দিক্ প্রত্যক্ষ করেন, শ্রীমদ্ভাগবত

তাহার তিনটি নাম দিয়াছেন। জ্ঞান-সিদ্ধেরা পরমতত্ত্বের যে দিক প্রত্যক্ষ করেন, ভাগবত তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। কর্ম-সিদ্ধেরা পরমতত্ত্বের যে দিক প্রত্যক্ষ করেন, ভাগবত তাহাকে পরমাত্মা কহিয়াছেন। আর ভক্তি-সিদ্ধেরা পরমতত্ত্বের যেদিক প্রত্যক্ষ করেন ভাগবত তাহাকে ভগবান কহিয়াছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান—তিনটি পৃথক তত্ত্ব বা বস্তু নহে ; একই তত্ত্বের বা বস্তুর তিনটি দিক মাত্র।...মহাপ্রভুর অনুগত বাঙালী বৈষ্ণব গোস্বামী এই ভাগবত-বাক্যের অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন—

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তাঁর রূপ॥'

বিপিনচন্দ্রের 'আদিরস' শীর্ষক প্রবন্ধটিও এই পর্যায়ে আলোচনার দাবি রাখে।[১১৩] এই প্রবন্ধের মুখবন্ধেই বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'...আনন্দই আদি-রসের প্রাণ। উপনিষদ এইজন্যই নবদম্পতির যৌন সম্বন্ধের আনন্দের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে ব্রহ্মানন্দের সজাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই তত্ত্বটি যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা আদিরসাশ্রিত বলিয়া মহাজন-পদাবলীর নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন না। আদিরসের নিন্দা নাস্তিক্যবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে।...' আদিরসের আলোচনার সূত্রে তিনি নায়ক-নায়িকা তত্ত্বটিও এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যা-বিশদ করে তুলেছেন। তিনি বলেছেন—'নী ধাতু হইতে নায়ক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই নী ধাতুর অর্থ পাইয়ে দেওয়া—নী প্রাপণে। নায়ক নায়িকাকে কিছু পাইয়ে দেন, নতুবা সত্য নায়ক-ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় না।...' তাই তাঁর মতে '...নায়ক ধর্মের বিশেষত্ব দেওয়াতে নয়, পাইয়ে দেওয়াতে ; দানে নয়, প্রাপণে। .. নায়ক-নায়িকা পরস্পরকে অঙ্গদান করেন, কিন্তু এই দানের দ্বারা তাঁহাদের নায়ক-নায়িকা ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না। নায়ক-নায়িকা-ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য এই দান ছাড়া আরও কিছু পাইয়ে দেওয়া প্রয়োজন। পরস্পরের সঙ্গলাভে যতক্ষণ ইঁহারা এই বস্তুটি না পাইয়াছেন, ততক্ষণ প্রকৃত নায়ক-নায়িকা-ধর্মের প্রকাশ ও নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয় না।...এইজন্য পুরুষ নারীকে বা নারী পুরুষকে সার্থকতা দিতে পারেন না,—পাইয়ে দিতে পারেন মাত্র। এই সার্থকতা-প্রাপণেই নায়ক-নায়িকা-ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়।...'

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে একথা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে বিপিনচন্দ্র বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্পর্কে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলিকে 'বৈষ্ণব-সাহিত্য

সমালোচনা' রূপে গ্রহণ না করে 'বৈষ্ণব-সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা'রূপে গ্রহণ করা সঙ্গত। কারণ, ঐ সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে বৈষ্ণব-পদাবলীর কাব্য-সৌন্দর্য বিশ্লেষণ অপেক্ষা বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশের মূল সূত্রগুলির রসগ্রাহী আলোচনাই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে। ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত যথার্থই মন্তব্য করেছেন—"·বৈষ্ণব-কাব্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' জাতীয় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সমালোচনামূলক কোন প্রবন্ধ বঙ্কিমোত্তর যুগে লিখিত হয় নাই। তবে বিপিনচন্দ্র বৈষ্ণব-কবিতার যে মূলসূত্রের সন্ধান দিয়েছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।"[১১৪]

বঙ্কিম-সাহিত্য :

বিপিনচন্দ্র যখন বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনায় লেখনী ধারণ করেন, তখন বঙ্কিম-সাহিত্যকে ভিত্তি করে অনেক সমালোচকের অনেক সমালোচনা প্রকাশিত হয়ে গেছে। বিপিনচন্দ্রের বঙ্কিম-সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি ১৩২৯ থেকে ১৩৩২ (১৯২৩-১৯২৫)—এই কাল-পরিধির মধ্যে রচিত। এর পূর্বেই যাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে স্ব স্ব পদ্ধতিতে বঙ্কিম-সাহিত্য সমালোচনায় লেখনী ধারণ করেন, তাঁদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, পূর্ণচন্দ্র বসু, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, বীরেশ্বর পাঁড়ে, শ্রীঅরবিন্দ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ সাহিত্য-সেবী ও চিন্তানায়কদের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে···'স্বদেশীযুগের লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী লিখিয়াছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল।'[১১৫]

বিপিনচন্দ্র-রচিত নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি বঙ্কিম-সাহিত্যালোচনার পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য : [১১৬]

সাহিত্যে নবযুগ—বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র ; বঙ্কিম-সাহিত্য ; বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যা ; বঙ্কিম-সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি ; বাংলার নবযুগে বঙ্কিম-সাহিত্য ; জাতীয়তা ও বঙ্কিমচন্দ্র।

'সাহিত্যে নবযুগ—বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধের মুখবন্ধে বিপিনচন্দ্র নবযুগের বাংলা-সাহিত্যের প্রেরণা-উৎস এবং সেই সাহিত্যের ব্যাপক অর্থ-বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে 'নবযুগের বাংলা' গ্রন্থে বলেছেন—'কোনও

সমাজে নূতন চিন্তা ও ভাবের প্রেরণায় যখন একটা নূতন জীবনের সাড়া পড়ে, তখন তাহার সঙ্গে ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সঙ্গীত, কবিতা, নাট্যকলা প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগে এই নূতন জীবন আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। এ সকলের দ্বারা সেই সমাজের নব চেতনা ও নূতন প্রাণতার প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। ব্যাপক অর্থে সাহিত্য বলিতে ধর্মতত্ত্ব, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য-গাথা পর্যন্ত জাতির ভাব ও চিন্তা যেদিকেই নিজের ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, তার সাকুল্যটা বুঝায়। বাংলার নবযুগের সাহিত্য বলিতে এইরূপ সাকুল্যটাই বুঝি।'[১১৭] যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়, তাঁর মতে, নবযুগের সাহিত্যেরও প্রথম প্রবর্তক। রামমোহনের চিন্তা ও সাধনার ধারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষী ও চিন্তাশীলদের হাতে সময়োচিত পরিমার্জনা লাভ করে বিচিত্র সাহিত্য-কৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ অথবা তাঁর তত্ত্ববোধিনী-সভার সঙ্গে স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এইসঙ্গে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিভার কথাও উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে অবশ্য মাইকেল মধুসূদনের যুগান্তকারী আবির্ভাব বিশেষভাবে শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তবে "…শিক্ষিত বাঙালীর নিকটে 'বঙ্গদর্শন'ই সর্বপ্রথমে বাংলার নবযুগের নবীন সাধনার পুরোহিতরূপে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়।" 'বঙ্গদর্শন'-এর পূর্বেকার আধুনিক বাংলা-সাহিত্য মোটের উপর, তাঁর মতে, তাই 'ব্রাহ্মযুগের সাহিত্য' বলে চিহ্নিত হবার যোগ্য। বিপিনচন্দ্রের ভাষায় 'ব্যক্তিগত চরিত্রে শুদ্ধতাসাধন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রেরণায় সমাজ-সংস্কার, ইহাই আধুনিক বাংলার ব্রাহ্মযুগের প্রধান লক্ষণ ছিল।'

উপরি-উক্ত বক্তব্যের অনুসরণ করে তিনি বলেছেন—"আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত। এক ব্রাহ্ম-যুগ, আর এক বঙ্কিম-যুগ। 'বঙ্গদর্শন' এই বঙ্কিম-যুগের সূচনা করে।"[১১৮]

বাঙালীর আত্মচৈতন্যের উন্মেষে 'বঙ্গদর্শন' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, সে যুগের ইংরেজীনবিসদের

মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম 'বঙ্গদর্শন'-এর সাহায্যে বাঙালীর অন্তরে একটা সাজাত্য-বোধ জাগ্রত করে তোলেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি 'অযৌক্তিক বা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তের বিরোধী কোনও হেতু বা মতবাদ অবলম্বন করিয়া নিজের ঈপ্সিত মতের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন নাই'। প্রসঙ্গত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বাঙালীর বাহুবল' এবং 'ভারতকলঙ্ক' শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টির উল্লেখ করেন। 'বাঙালীর বাহুবল' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী যে বাহুবলে দীন,—এ অভিযোগ স্বীকার করেও বলেছিলেন যে শারীরিক বল আর বাহুবল এক নয় এবং আরও বলেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে বাঙালীর শারীরিক বলের উন্নতিবিধানের সম্ভাবনা না থাকলেও বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে তার বাহুবল জাগ্রত হবার সম্ভাবনা নিশ্চিতপ্রায়।[১১৯] বিপিনচন্দ্র বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী স্বদেশী যুগে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। সে সময় বাঙালীর সাহসিকতা ও বাহুবলের সন্দেহাতীত পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। 'ভারতকলঙ্ক' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে হিন্দুদের মধ্যে স্বজাতি-প্রতিষ্ঠার ভাব কোনো দিন প্রবল হয়ে ওঠেনি ; এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার মূল কারণ। আর 'স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা' প্রভৃতি কথা ভারতবাসীর কাছে অজ্ঞাত ছিল। ইংরেজদের সৌজন্যে, ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে যে ভারতবাসী এই সমস্ত কথার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে এবং 'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতি-প্রতিষ্ঠা'র ভাব তার চিত্তকে আকৃষ্ট করছে। 'জাতি' শব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যে 'ন্যাশনালিটি' বা 'নেশন' বোঝাতে চেয়েছেন তা' তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।[১২০] বিপিনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন—'বাংলার নবযুগের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রই এই জাতি-প্রতিষ্ঠা ব্রতের প্রথম ও প্রধান পুরোহিত। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্র জাতি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের দিকে বাঙালীর চিত্তকে বিশেষভাবে প্রেরিত করেন। তাঁহার অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এই কথাটা সর্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই বঙ্কিম-যুগের বাংলা-সাহিত্যের মূল কথা।'[১২১]

'বঙ্কিম-সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র প্রথমেই বঙ্কিম-সাহিত্যের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেন—'বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথমে ভারতের সাহিত্যকে

আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের পরিষদে লইয়া যান। আর তখন হইতেই বাঙালী স্বদেশের সাহিত্যের আদর করিতে আরম্ভ করেন।'

সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যকে বিপিনচন্দ্র তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) উপন্যাস, (২) ধর্মতত্ত্ব, এবং (৩) রাষ্ট্রনীতি। তাঁর মতে,—এই তিন বিভাগেই বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের মধ্যে নূতন স্বাধীনতা এবং মানবতার প্রেরণা জাগ্রত করতে চেষ্টা করেন। উপন্যাসসমূহকে তিনি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে বলেছেন—'কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী এবং মৃণালিনী এক শ্রেণীর; বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর এবং কৃষ্ণকান্তের উইল আর এক শ্রেণীর; এবং আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এবং সীতারাম অপর শ্রেণীভুক্ত। প্রথম তিনখানিকে রোমান্স্ বলা যায়।' দ্বিতীয় বিভাগের উপন্যাসগুলিকে তিনি বাঙালী সমাজের বৈশিষ্ট্যের বাস্তব চিত্ররূপে উল্লেখ করেছেন এবং তৃতীয় বিভাগের উপন্যাসগুলিকে নিষ্কাম কর্মযোগ প্রচার-মূলক বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এর আগে থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের শ্রেণী-বিন্যাসের চেষ্টা চলতে থাকে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩২২) বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস-সাহিত্যের শ্রেণী-বিভাগ না করলেও বিষয়বস্তুর স্বাধর্ম্যের দিক থেকে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এবং সীতারামকে এক শ্রেণী-বদ্ধ করে উপন্যাসত্রয়ীর বিচার-বিশ্লেষণ করেন। বিপিন-চন্দ্রের এই প্রবন্ধপ্রকাশের বৎসরাধিক কাল পরে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশমান 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' শীর্ষক গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের শ্রেণী-বিভাগ করেন।[১২২] সুতরাং ঐতিহাসিক দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিপিনচন্দ্র-কৃত শ্রেণী-বিন্যাস নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

যে সমস্ত মুখ্য উপাদানের সমবায়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস গঠিত হয়ে থাকে,[১২৩] বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সমালোচনায় বিপিনচন্দ্র সে সমস্ত উপাদানের বিশ্লেষণের প্রতি মনোযোগ দেননি। তিনি স্বদেশ ও সমাজ-চেতনা এবং মানবতাবোধের দৃষ্টিকোণ থেকেই উপরি-উক্ত উপন্যাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কারণ, স্বদেশীযুগের অনেক মনীষীর কাছেই সাহিত্যচর্চা ছিল স্বদেশচর্যার অঙ্গবিশেষ। প্রথম বিভাগে উল্লিখিত উপন্যাসত্রয় সম্পর্কে তিনি

বলেছেন—'এই তিনখানি উপন্যাস সার্বজনীন মানুষী-প্রবৃত্তির সাধারণ ভূমির উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে। এগুলিতে বাংলার বা ভারতের বৈশিষ্ট্যের তেমন প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই না। কিন্তু এই তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সাধারণ মানবতার প্রবল প্রেরণা অনুভব করিয়া থাকি। এখানে বাঙালী মেয়ে সামাজিক অবরোধের ভিতরেও কতটা পরিমাণে যে স্বাধীনতা ভোগ করে, এবং নিজের প্রকৃতি বা বিশুদ্ধ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের জন্য কতটা আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়, ইহা দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হই।'

দ্বিতীয় বিভাগের উপন্যাস বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর এবং কৃষ্ণকান্তের উইল-এর মধ্যে বিপিনচন্দ্র বঙ্কিমের রসসৃজনী প্রতিভার উন্নততর বিকাশ লক্ষ্য করেছেন। শুধু তা'ই নয়, এই সমস্ত উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র সার্বজনীন মানবতার ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঙালী চরিত্রের এবং বাঙালী সমাজের বৈশিষ্ট্যের আবরণে সজ্জিত করে তুলেছেন। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীতে, সুন্দরী ও শৈবলিনীতে, ভ্রমর এবং রোহিণীতে আমরা কেবল সাধারণ নারীত্বের সার্বজনীন মূর্তি দেখি না, কিন্তু সার্বজনীন নারীত্ব কোন্ আকারে কিরূপে বাংলার মাটি, বাংলার জলবায়ু, বাংলার মাঠঘাট, বাংলার নৈসর্গিক প্রকৃতি এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া কোন্ কোন্ মূর্তিতে ফুটিয়া উঠে, ইহাও প্রত্যক্ষ করি। ·····এতদিন বাঙালী ভাবিত যে য়ুরোপীয় সমাজে এবং পাশ্চাত্য জাতীয় লোকদের পারিবারিক জীবনে যে রস ও আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠে, হতভাগ্য বাঙালী-জীবনে তাহা সম্ভবে না। বিষবৃক্ষ প্রভৃতি উপন্যাস করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালীর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন—বিবিধ রসের উৎস ও রসমূর্তির উপকরণ কেবল য়ুরোপেই যে আছে তাহা নহে, বাঙালীর ঘরে ঘরেও তাহা আছে।······বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাবে বাংলার সমাজ বাংলার ঘরকে আধুনিক শিক্ষিত রস-পিয়াসু বাঙালীর নিকটে আদরের বস্তু করিয়া তুলিলেন। এইভাবে এই তিনখানি উপন্যাসের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার নবযুগের নবীন সাধনাকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলেন'।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বিচার করতে গিয়েও তিনি দ্বান্দ্বিক যুক্তিতত্ত্বের বা 'ডায়ালেকটিকস্ অব্ রিজন'-এর সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

"আধুনিক য়ুরোপীয় ইভলিউশন বা অভিব্যক্তিবাদের ভাষায় দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতিকে রসরাজ্যে মানবের আত্মচরিতার্থতার অভিব্যক্তিধারাতে থিসিস্-এর অবস্থা বলা যায়। বিষবৃক্ষ প্রভৃতিকে এই অভিব্যক্তিধারাতে য়্যান্টিথিসিস-এর অবস্থা বলা যায়। দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতিতে সহজ রসবিলাসের ছবি দেখিতে পাই। এখানকার কথা সহজ ভোগ। বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে ভোগের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংযমের ও সমাজশাসনের একটা প্রবল বিরোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—এই দু'য়ের সংগ্রামের ভিতর দিয়া এই তিনখানি ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখানে কোনও সন্ধির কথা বা সমন্বয়ের সংকেত নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে এই সন্ধি বা সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। ইহাই আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী এবং সীতারামের বিশেষত্ব। কেবল রসমূর্তি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী বা সীতারামের রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। এই তিনখানির উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশবাসীকে ভারতের উচ্চাঙ্গের কর্মযোগে দীক্ষিত করা'।

এই 'কর্মযোগ'-এর ব্যাপারটিকে পরিস্ফুট করবার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—'আমাদের দেশের ইংরাজীনবিসদের ইহসর্বস্ববাদ অনেকটা ধার-করা জিনিস ছিল। ইহাতে য়ুরোপের ইহসর্বস্ববাদের প্রাণতা ছিল না; অথচ সেকালের ইংরাজী শিক্ষা ইহার দ্বারা আমাদের দেশের প্রকৃতিনিহিত আধ্যাত্মিকতাকে ঢাকিয়া ও চাপিয়া রাখিতেছিল।·····এই দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সংসার ও পরমার্থের মধ্যে, ভোগের এবং বৈরাগ্যের মধ্যে, প্রবৃত্তিধর্ম এবং নিবৃত্তিধর্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সমসাময়িক শিক্ষিতসমাজের ইহ-সর্বস্বতা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, কর্মযোগের প্রতিষ্ঠাকল্পে, আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী এবং সীতারাম রচনা করেন।'

বিপিনচন্দ্রের মতে বঙ্কিমের এই কর্মযোগ গীতোক্ত কর্মযোগের যুগোপযোগী পরিমার্জিত রূপ। এই কর্মযোগ নিষ্কাম কর্ম ও নিষ্কাম প্রেমের নামান্তর। আর 'এই নিষ্কাম প্রেমের এবং নিষ্কাম কর্মের একটা সুগম এবং প্রশস্ত পথ স্বদেশ-প্রীতি। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে, দেবী-চৌধুরাণীতে এবং সীতারামে দেশমাতৃকার প্রতি নির্মলা ভক্তির উপরে আধুনিক নিষ্কাম কর্মযোগের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই দেশ-প্রীতিই এই তিনখানি উপন্যাসের মূলসূত্র।'

এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধের পূর্বে প্রকাশিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' (আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী ও সীতারাম) শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।[১২৪]

লক্ষণীয় বিষয় এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী এবং সীতারামের বিচারে তিনি যতটা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি 'কপালকুণ্ডলা' 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতির বিচারে ততটা আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। মনে হয়, স্বদেশ-প্রীতির প্রাবল্যই তাঁকে পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলির প্রতি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করেছে।

সমালোচনার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং বিচার-সিদ্ধান্ত। বিচার-সিদ্ধান্তের জন্যই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন।[১২৫] বিপিনচন্দ্রের সমালোচনায় এই দুই উদ্দেশ্যেরই অঙ্গীকার আছে—একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েও তাঁর সমালোচনা উপন্যাসের অন্তর্নিহিত শিল্পোৎকর্ষের উদ্ঘাটনে আত্মনিয়োগ করেনি। স্বকীয় মানস-প্রবণতানুসারে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মূল্যায়ন করে গেছেন। তাঁর এই ধরনের আলোচনাকে 'জুডিসিয়াল ক্রিটিসিজম্' বলা যায় না।[১২৬] কারণ, তিনি প্রাক্-নির্ধারিত কোন মানদণ্ডের সাহায্যে বিচারকের অহংবোধ নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হন নি। বরং এই ধরণের আলোচনা অনেকটা 'ইম্প্রেসনিস্ট ক্রিটিসিজম্-এর সগোত্র।[১২৭] এইজন্য রোমাণ্টিকতার দিকে তাঁর অভিমুখিতাও স্পষ্টলক্ষ্য। বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনায় এই অভিমুখিতা লক্ষ্য করা গেছে; রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনাতেও এই অভিমুখিতা লক্ষ্য করা যাবে। ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বিপিনচন্দ্রের এই আলোচনার ধারা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা' এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—'তিন শ্রেণীর উপন্যাসের আলোচনায়ই তিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তুর কথাই বলিয়াছেন; ইহাদের রসময়তার উল্লেখ আছে, কিন্তু বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা বা বিচার নাই। সুতরাং যথেষ্ট মননশীলতার পরিচয় বহন করিলেও এই আলোচনাকে সাহিত্য-সমালোচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।'[১২৮] এই উক্তির মাধ্যমে ডক্টর সেনগুপ্ত সম্ভবত বিশুদ্ধ নান্দনিক সমালোচনার (পিওর এস্থেটিক ক্রিটিসিজম্) প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। অর্থাৎ ভাষা, ভণিতি, বৃত্ত-গঠন, চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি যে সমস্ত উপাদান বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে শিল্প-

কৃতিরূপে উপন্যাসের রূপ-রসের উৎকৃষ্ট-অপকর্ষ বিচার করা হয়ে থাকে, বিপিনচন্দ্রের আলোচনা সত্যই সে পদ্ধতি অনুসরণ করেনি। বিপিনচন্দ্র উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের ইতিহাসের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রকে দাঁড় করিয়ে সমকালীন শিক্ষিত জনমানসে তাঁর মনন ও কল্পনার প্রভাবের পরিমাণ নিরূপণের চেষ্টা করেছেন।

বিপিনচন্দ্র-কৃত বঙ্কিম-সাহিত্যের দ্বিতীয় ভাগের নাম 'ধর্মতত্ত্ব'। 'বঙ্কিম-চন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বঙ্কিম-সাহিত্যে আলোচিত ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন।

মুখবন্ধে তিনি বলেছেন—'একদিকে ব্রাহ্ম-সমাজের বিশুদ্ধ মতবাদ ও জীবনের আদর্শ, অন্যদিকে প্রাচীন হিন্দুসমাজের কোমল স্নেহের বন্ধন এবং কঠোর শাসনদণ্ড, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মাঝখানে পড়িয়া নব্যশিক্ষিত বাঙালী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাহিরের এই সংগ্রাম তাহার ভিতরেও বাধিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধর্ম ব্যাখ্যা দ্বারা এই দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তির মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-ব্যাখ্যা ও ধর্মপ্রচারের মূল কথা।'

বিপিনচন্দ্রের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন ধর্ম' ব্রাহ্মধর্মেরই নামান্তর মাত্র। 'কৃষ্ণ চরিত্র'-এর প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র শিষ্যের জবানীতে অনুশীলনী-তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন—'.. জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই'।[১২৯] বঙ্কিম-রচনা থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'সংক্ষেপে ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনধর্মের সাধ্য। সেকালের ব্রাহ্মসমাজেরও ইহাই আদর্শ ছিল'।

বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সমন্বয়বাদের ঋষি। বঙ্কিমচন্দ্র যে অনুশীলন-ধর্মের ব্যাখ্যা করেন, তা' বিপিনচন্দ্রের মতে ইউরোপে কোম্‌ত-প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্মের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস। বিপিনচন্দ্রের ভাষায় —'...কোম্‌ত বাদ এবং আধুনিক য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ মানুষ এবং ঈশ্বরের মাঝখানে যে ব্যবধানের কল্পনা করিয়াছে, গীতোক্ত ধর্মে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা

হইয়াছে। কোম্‌ত-ধর্ম এবং আধুনিক য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ উভয়ই ঈশ্বরতত্ত্বকে বর্জন করিয়া পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শের উপরে আধুনিক সাধনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। গীতা ঈশ্বরকে রাখিয়া এই চেষ্টাই করিয়াছেন। এইজন্য গীতার ধর্মে আধুনিক যুগের য়ুরোপীয় অনুশীলন-ধর্ম পূর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে।'

ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যানে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক অবদান পরিস্ফুট করবার উদ্দেশ্যে আলোচ্যমান প্রবন্ধের শেষভাগে তিনি মন্তব্য করেছেন—"রাজা রামমোহন রায় যে কর্মের সূচনা করেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই কর্মকেই আধুনিক সময় ও সাধনার উপযোগী করিয়া পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাংলার নবযুগের যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন যে সমন্বয়ধারা প্রবর্তিত করেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই ধারাকেই তাঁহার 'ধর্মতত্ত্বে' ও 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।"

বিপিনচন্দ্র-কৃত বঙ্কিম-সাহিত্যের তৃতীয় ভাগের নাম 'রাষ্ট্রনীতি'। 'বঙ্কিম-সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র বঙ্কিম-ব্যাখ্যাত রাষ্ট্রনীতির আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি বঙ্কিম-সাহিত্যবিষয়ক তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ অপেক্ষা আয়তনে বড়ো। বঙ্কিম-সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যার সূত্রে এই প্রবন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত নানা প্রসঙ্গের অবতারণা ও আলোচনা করেছেন।

'বঙ্কিম-সাহিত্যে দেশাত্মবোধ' শীর্ষক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'রাষ্ট্রনীতির জন্ম হয় রাষ্ট্ররক্ষা ও রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়লাভের চেষ্টা হইতে। এই চেষ্টার উৎপত্তি হয় রাষ্ট্রের প্রতি মমত্ববুদ্ধি হইতে। পুরাকালে রাষ্ট্র ছিল রাজাদের ; সুতরাং রাষ্ট্রের প্রতি সত্য মমত্ববুদ্ধি কেবল রাষ্ট্রপতিদের অন্তরেই জন্মিত। সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের অন্তরে রাজভক্তির অনুশীলন কিছুটা হয়ত হইত এবং এই রাজ-ভক্তির আশ্রয়ে অপরোক্ষভাবে তাহাদের রাষ্ট্রের প্রতি কতকটা মমত্ববুদ্ধি জন্মিত। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি সত্য মমত্ববুদ্ধি প্রজাদের মধ্যে সেকালে ছিল না। রাষ্ট্রের প্রতি মমত্ববুদ্ধি দেশাত্মবোধ থেকে জন্ম লাভ করে। দেশাত্মবোধের উদ্বোধনের প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'দেশ আমার, আমি দেশের,—দেশের জনসমষ্টির কল্যাণ ও অকল্যাণের উপরে আমার নিজের এবং আমার স্বজনবর্গের কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে, এই ধারণা হইতে সত্য দেশাত্মবোধের জন্ম হয়'। বিপিনচন্দ্রের মতে 'বঙ্কিম-সাহিত্যের সকল বিভাগে এই দেশাত্মবোধের প্রেরণা জাগিয়া

আছে। এই ভিত্তির উপরেই বঙ্কিম-সাহিত্যে একটা সমীচীন রাষ্ট্র-নীতিও গড়িয়া উঠিয়াছে।'

এর পর আলোচ্যমান প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বর্ণিত অনুশীলন-তত্ত্বের আলোচনা করেছেন এবং প্রীতির সম্প্রসারণের ক্রম অনুসরণ করে কীভাবে আত্মপ্রীতি ধীরে ধীরে বিশ্বপ্রীতিতে রূপান্তরিত হয়,—বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা অনুসরণে তা' স্পষ্ট করে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি যে ঈশ্বর-ভক্তির অঙ্গ ছিল এবং জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বদেশ প্রীতির যে প্রকৃত কোনো বিরোধ নেই,—সমন্বয়ের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে তাঁর সাহিত্যে পরিস্ফুট করে তুলেছেন, বিপিনচন্দ্র তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

তারপর বিপিনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রে 'সাম্য' প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে ফরাসী-বিপ্লব-সম্ভূত 'ইকোয়ালিটি, লিবার্টি এবং ফ্রেট্রারনিটি'র বাণীটি হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রকে 'সাম্য' প্রবন্ধরচনায় প্রেরণা দান করেছিল। তবে "য়ুরোপে ফরাসী-বিপ্লব যে সাম্যের সন্ধানে গিয়াছিল, আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকালে ভগবান বুদ্ধদেব সেই আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সাম্য' শীর্ষক প্রবন্ধে এই সার্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। সময়োচিত হয় নাই বলিয়া তিনি এই প্রবন্ধটিকে পরে তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে ছাঁটিয়া দিয়াছিলেন"। বিপিনচন্দ্রের মতে বিশ্বজনীন মৈত্রীর উপরেই বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় বিরোধের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন।

বিশ্বজনীন মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতির চরম লক্ষ্য হলেও প্রয়োজন হলে যুদ্ধবিগ্রহ যে পাপ—একথা বঙ্কিমচন্দ্র কখনও মনে করতেন না। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—"নিষ্কামভাবে আততায়ীর আততায়িতা নিবারণের জন্য অস্ত্রধারণ পাপ হওয়া দূরে থাকুক, অতিশয় পুণ্যকর্ম, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা। 'আনন্দমঠে', 'সীতারামে', দেবী চৌধুরাণীতে', 'অনুশীলন-ধর্মে' ও অন্যান্য প্রসঙ্গে তিনি অতি পরিষ্কার করিয়া এই কথাটা বলিয়াছেন।" তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে 'বঙ্কিমের রাষ্ট্রনীতিতে সমরায়োজনের স্থান আছে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য সংগ্রাম নহে, সন্ধির দিকে প্রতিপক্ষকে প্রণোদিত করা। এইরূপে বঙ্কিম-সাহিত্যের রাষ্ট্রনীতি একটা সমন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছে।'

রবীন্দ্র-সাহিত্য :

রবীন্দ্রনাথের চরিত-চিত্র রচনার সূত্রেই (বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১৩১৮ : মার্চ-এপ্রিল, ১৯১২) বিপিনচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ : নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯১২) তাঁর চরিত-চিত্রের অনুবৃত্তি বলা চলে। এই দু'টি প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখনও বাংলাদেশের কবি বিশ্বকবিতে রূপান্তরিত হয়নি[১৩০] এবং তখনও রবীন্দ্র-সাহিত্য অবলম্বন করে বিচিত্র সমালোচনা-সম্ভার রচিত হয়নি। এর পূর্বে বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান সম্পর্কে ইংরেজী প্রবন্ধে সপ্রশংস মন্তব্য করলেও তা প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুষ্ঠু আলোচনারূপে গণ্য হবার যোগ্য নয়।

প্রথমোক্ত বহু-বিতর্কিত প্রবন্ধটি সম্পর্কে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধেই তিনি বস্তুতন্ত্রতার মানদণ্ডে এবং রবীন্দ্রজীবনীর পটভূমিকায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচারে প্রবৃত্ত হন। কবিত্ব-বিচারে কবি-জীবনী জানবার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বঙ্কিম-সাহিত্য থেকে আহরণ করেন—একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি যে একটি স্থির ধারণার বশবর্তী হয়েছিলেন, প্রায় তিন বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত-চিত্র-বিষয়ক রচনাতেও (নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২২) তার পরিচয় মেলে। 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক রচনার 'সাহিত্য ও জীবন' প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—'স্রষ্টাকে না জানিলে, তাঁর সৃষ্টির সকল রহস্যভেদ ও সকল রসভোগ সম্ভব হয় না। সেইরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি যাঁরা করেন, তাঁহাদিগকে ভালো করিয়া না জানিলে, তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যেরও সকল রহস্যভেদ ও সকল রস সম্ভোগ করা যায় না। সাহিত্য-সমালোচনায় সাহিত্যিকের জীবন-চরিতের বিচার ও আলোচনা এই কারণেই অতিশয় আবশ্যক।'[১৩১] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিম-সাহিত্যের সূত্রে আহৃত এই অভিমত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী মনীষী সেণ্টে বুভে-প্রচারিত নতুন সমালোচনা-পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৩২]

যাই হোক্, উপরি-উক্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অভাবের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন—'আমি একথা ভুলি নাই যে, তাঁর পৈতৃক জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া রবীন্দ্রনাথের উপরেই ন্যস্ত ছিল এবং এই উপলক্ষে তিনি বহুকাল শিলাইদহ ও

অন্যান্য স্থানে থাকিয়া সাক্ষাৎভাবে বাংলার পল্লীজীবন পর্যবেক্ষণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই বাহ্য যোগ নিবন্ধন যে সে জীবনের অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, একেবারে এ মীমাংসা করা যায় না'।[১৩৩] বক্তব্যকে স্পষ্টতর করবার উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেছেন—"বড় বড় জমিদারির 'বাবুদের' সঙ্গে তাঁহাদের প্রজাসাধারণের কোনো প্রকারের ঘনিষ্ঠ ও প্রমুক্ত মেশামেশি কুত্রাপি সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের উদার অন্তরে এইরূপ যোগাযোগ স্থাপনের বলবতী আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ধনপদাদির অবস্থার আকস্মিক তারতম্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, মানুষ বলিয়াই মানুষকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে প্রাণে টানিয়া লইবার জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে যে সময় সময় আকুল করিয়া তুলিয়াছে, ইহাও সত্য।…কিন্তু এ সকল চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের প্রাণের উদারতাই প্রকাশিত হয়, সে সকল চেষ্টার সফলতা প্রমাণ হয় না।' কিন্তু কেবলমাত্র জমিদারের উদারতায় প্রজা-জমিদারের মধ্যকার পুরুষানুক্রমিক ব্যবধান দূরীভূত হওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন নি। তাই তিনি বলেছেন…'এই ব্যবধান নষ্ট হয় নাই বলিয়াই আপনার জমিদারির পল্লী-সমাজের মাঝখানে বহুদিন বাস করিয়াও, ঔদার্য সাধনের আন্তরিক আগ্রহ চেষ্টা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ সে সমাজের প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করেন নাই। অতি নিকটে থাকিয়াও, বাংলার পল্লীজীবন ও বাঙালীর সাচ্চা প্রাণটা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া আছে।' রবীন্দ্রসাধনার এই অপূর্ণতার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ সহজেই রবীন্দ্র-বিরূপতার নামান্তর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সম্ভবতঃ তা' নয়। কারণ বিপিনচন্দ্রের এই রচনা প্রকাশিত হবার প্রায় উনত্রিশ বছর পরে সত্যদ্রষ্টা ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'ঐকতান' শীর্ষক কবিতায় (২৮শে জানুয়ারি, ১৯৪১) এই অপূর্ণতার প্রসন্ন স্বীকৃতি উচ্চারণ করে গেছেন।

বিপিনচন্দ্রের উক্তির সুরে সুর মিলিয়েই যেন তিনি বলেছেন—

*   *   *

'অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।'

রবীন্দ্রনাথের এই চরিত-চিত্র প্রকাশিত হবার পর শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তী বিপিনচন্দ্রের বক্তব্যের প্রতিবাদে 'প্রবাসী'তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলে বিপিনচন্দ্র তার উত্তরে 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯)—এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি অজিতকুমারের মূল বক্তব্যের খণ্ডনে অগ্রসর হন। অজিতকুমার বলেন—'সাহিত্য-রচয়িতার জীবনের ভালোমন্দের সহিত তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির একান্ত সম্বন্ধ নাই' এবং সেইজন্য অজিতকুমারের ধারণা —বিপিনচন্দ্র 'সাহিত্য-সমালোচনার বিশুদ্ধ রীত্যনুসারে' রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনায় অগ্রসর হন নি।[১৩৪] বিপিনচন্দ্র অজিতকুমারের সঙ্গে একমত হতে পারেননি এবং তার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর পূর্বালোচিত ধারণার স্পষ্ট উল্লেখ করে বলেন—'সাহিত্যিকের জীবনের সত্য অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করিয়া কোথাও তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মর্ম ও মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির আলোচনা করিতে যাইয়া তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার অভিধানের সাহায্যে এগুলির অর্থ ও মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি।'[১৩৫] অজিতকুমার-কথিত 'জীবনের ভালোমন্দের' প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"প্রকৃতিভেদে, অবস্থাভেদে, অধিকারভেদে ভালো-মন্দের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ও একই ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে রমণীমুখ দর্শন কেন, স্ত্রীলোকের ছায়াস্পর্শ পর্যন্ত অপরাধের কথা। কিন্তু যে চিত্রকর বা ভাস্কর চিত্রপটে বা মর্মরখণ্ডে রমণী-রূপের অশরীরী মূর্তিটি ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহার ভিতর দিয়া মনুষ্যসমাজে 'সুন্দরের' সংবাদ প্রচার করিবেন, তাঁর পক্ষে জীবন্ত রূপসীকে সম্মুখে রাখিয়া, তার মুখ ধ্যান করিতে করিতে, সে রূপে তন্ময় হইবার জন্য সর্বপ্রকারের সাধন

অবলম্বন না করা অধর্ম। ··কবির পক্ষে আপনার কবি-প্রকৃতির পরম পরিণতি ও চরম চরিতার্থতালাভই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কোনও কাব্যসৃষ্টি এই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে কি না করিয়াছে, ইহারই দ্বারা তাহার ভালোমন্দের বিচার হইবে। এই কষ্টিপাথরেই আমিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। দশ-আজ্ঞার ফুট-ফিতা ফেলিয়া তাঁর 'জীবনের ভালোমন্দের' কালি কষিতে যাই নাই"।

সাহিত্যিকের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই যে সাহিত্যে রস-মূর্তি পরিগ্রহ করে সার্বজনীনতা লাভ করে—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই বিপিনচন্দ্র অজিতকুমার কর্তৃক উদ্ধৃত শেলীর 'এপিসাইকিডিয়ন' কবিতার চরণ—'ইন্ মেনি মর্টাল ফর্মস্ আই রাস্লি সট/দি শ্যাডো অব্ দ্যাট আইডল অব্ মাই থট'-এর উল্লেখ করে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—"এই 'আইডল অব্ মাই থট', এই মানস-প্রতিমা কি শেলীর অন্তরে আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, না যে সকল মর্ত-দেহের সঙ্গে তিনি বিবিধভাবে বিবিধ রসের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই বরাঙ্গিনীদের বরবপুকে আশ্রয় করিয়া তাঁর চিত্তে এই মানস-প্রতিমার আবির্ভাব হইয়াছিল ?' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে বিধৃত 'বৈষ্ণব-কবিতা' শীর্ষক কবিতায় একদা বৈষ্ণব-কবিদের সম্বোধন করে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন—

'সত্য করে কহ দেখি হে বৈষ্ণব-কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।

শেলীর এই কবিতার মর্মকথা খৃষ্টীয় সমাজনীতির বিচারে হয়ত নিন্দনীয় হতে পারে কিন্তু সাহিত্য-বিচারে সমাজনীতির অধিকার তিনি অস্বীকার করে বলেছেন যে একমাত্র রসের ওজনে এই ধরনের কবিতা সত্য ও সুন্দর কিনা তা' বিচার করা বিধেয়। বস্তুতন্ত্রতার উদ্ভাবক বিপিনচন্দ্র তাই প্রকৃত বাস্তববাদীর ভঙ্গিতে বলেছেন—"আজন্ম ব্রহ্মচারী কার্ডিনাল নিউম্যান যদি এই কবিতাটি লিখিতেন, আর শেলী যদি কার্ডিনাল নিউম্যানের 'লিড কাইণ্ডলি লাইট'—এই বিশ্ববিশ্রুত সঙ্গীতটি রচনা করিতেন, তবে এ দু'টিকেই কি

বস্তুতন্ত্রতাবিহীন বলা যাইত না ? ভগবান শঙ্করাচার্য যদি অলৌকিক কল্পনা বলে কালিদাসের উমার রূপবর্ণনাটি লিখিতেন, আর কালিদাস যদি শঙ্করের 'মোহমুদ্গর' রচনা করিতেন, তবে এ সকলকে তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও অপরোক্ষ রসানুভূতির কষ্টিপাথর দিয়া বিচার করিয়া, ইহাদের সত্যাসত্য ও ভালোমন্দ নির্ধারণ করা কি 'সাহিত্য-সমালোচনার বিশুদ্ধ রীতি'-সম্মত হইত না ?"

এর পর বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যের রসোত্তীর্ণ সৃষ্টির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথ যেখানেই এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরে আপনার কবি-কল্পনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই তাঁর কাব্যসৃষ্টি অলৌকিক উৎকর্ষ ও সত্য লাভ করিয়াছে।' দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' শীর্ষক কবিতাটির উল্লেখ করে বলেছেন—'এই কবিতাটির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, এমন কবিতা জগতের কোনো সাহিত্যে আছে কিনা, জানিনা। শুনিয়াছি ব্রাউনিং-এর রচনার কোনো কোনো স্থলে নাকি ইহার আভাসমাত্র পাওয়া যায়।' বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—" 'পতিতা' লোকচক্ষে 'পতিতা', সমাজে পরিত্যক্তা, অনার্যসেবিতা হইলেও, ভাগবতী প্রকৃতির বিগ্রহ বলিয়া, প্রকৃতপক্ষে সে দেবতা ; তার এই দেবভাব ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মতো, পাতিত্য-কর্মের পাপকলুষে আচ্ছন্ন হইয়া আছে মাত্র,—শুভ যোগাযোগে যে সে অন্তর্নিহিত দেবতা সেই পতিতার মধ্যেই আত্মস্বরূপের প্রকাশ করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন,—এ বিশ্বাস কেবল হিন্দুর আছে। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু না হইলে 'পতিতা'র অপূর্ব আধ্যাত্মিক রূপরাশিকে এমনভাবে ভক্ত অবনত প্রাণে কখনো ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন না'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রায় পাঁচ বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে লোকচক্ষে পতিতা অন্নদা-দিদি প্রথমদর্শনে শ্রীকান্তের দৃষ্টিতে অনুরূপ রূপে উদ্ভাসিতা হয়ে উঠেছিলেন। ভাব-কল্পনা ও বর্ণনার স্বাধর্ম্যটি লক্ষণীয়।[১৩৬]

'পতিতা'র পর বিপিনচন্দ্র 'উর্বশী' কবিতার সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে "উর্বশী রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। জগতের আর কোনো সাহিত্যে 'উর্বশী'র মতো কোনো কিছু আছে কি না সন্দেহ। থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ উর্বশী হিন্দুর নিজস্ব বস্তু।" স্বদেশী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি বিপিনচন্দ্রের অবিচলিত শ্রদ্ধাবোধ এখানেও লক্ষণীয়। এর পর উর্বশীর সুবিস্তৃত

আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"ভিনাসের মতো রূপসী হইয়াও উর্বশী ভিনাস নহেন। আধুনিক সাহিত্য-সৃষ্টিতে রাইডার হ্যাগার্ডের 'শী'তে আমাদের উর্বশীর ছায়ার ছায়া একটু ফুটিয়াছে মাত্র বলিয়া মনে হয়। হ্যাগার্ড এই 'শী'কে পরবর্তী উপন্যাসে 'ওয়ার্লডস্ ডিজায়ার' বা 'বিশ্ববাসনা'-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।[১৩৭] কিন্তু

····· বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে······

রবীন্দ্রনাথ যে 'উর্বশী'কে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তার সঙ্গে হ্যাগার্ডের 'শী'র কোনো তুলনা হয় না। ফলত রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবি-প্রতিভার অসাধারণ সৃষ্টিকুশলতা 'উর্বশী'তে যেমন ফুটিয়াছে, তাঁর আর কোনো কবিতায়, বোধ হয়, তেমন ফোটে নাই।···উর্বশী সত্য সত্যই—

'অখিল মানস-স্বর্গে অনন্তরঙ্গিনী'

'স্বপ্নসঙ্গিনী' ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কিন্তু 'বিশ্ববাসনা'র এই স্বপ্ন যে সত্য, বাস্তবজীবনের সকল সত্য অপেক্ষা কম সত্য নহে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেশী সত্য, রবীন্দ্রনাথ আপনার অপূর্ব সৃষ্টিকুশলতাগুণে, 'উর্বশী'র চিত্রে এই তত্ত্বটি বিশদ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বস্তুতন্ত্র কাব্য কাহাকে বলে, 'উর্বশী'তে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহা দেখাইয়াছেন।" 'উর্বশী' শীর্ষক কবিতাটি বিপিনচন্দ্রকে এমনভাবে মুগ্ধ করেছিল যে তিনি এখানেই ক্ষান্ত হতে পারেননি। 'উর্বশী'র রসোত্তীর্ণতা আরও ব্যাখ্যাবিশদ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"বিশিষ্টের মধ্যে যে নির্বিশেষ বস্তু আত্মগোপন করিতে যাইয়া নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, সান্তের মধ্যে যে অনন্ত আপনাকে হারাইবার চেষ্টা করিয়া পূর্ণতর স্ফুটতররূপে আপনাকে ফিরিয়া পাইতেছেন; অনিত্যের চাঞ্চল্যের মধ্যে যে নিত্যত্বের নিত্যস্বরূপটি স্থির হইয়া 'নির্বাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' জ্বলিতেছে,—রবীন্দ্রনাথ সমষ্টিগত মানবহৃদয়ের অতৃপ্ত-অনন্ত-রূপপিয়াসার চিরন্তন-বিষয়রূপিণী 'উর্বশী'র চিত্রে তাহা দেখাইয়াছেন। এখানে অন্য-কামনা-শূন্য কাম, সর্বসম্পর্কবিহীনা কামিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার ধ্যান করিতেছে। এখানে রমণী শুদ্ধ রমণী-রূপে আপনার নিত্য ও নিজস্ব স্বরূপটিতে পুরুষের শুদ্ধ পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত। এখানে পতঙ্গ অগ্নির মধ্যে নিজ স্বরূপের সাক্ষাৎকার পাইয়া আত্মহারা। জগতের সকল কবিই কোনো-না-কোনো ভাবে, রমণীরূপের বর্ণনা করিয়াছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'উর্বশী'র চিত্রে ও রূপটি যেমন ধরিয়াছেন, সেক্সপীয়র, কি, শেলী, বায়রন কি ব্রাউনিং, হাফেজ কি সাদি,—অথবা আমাদের কালিদাস বা ভবভূতি, জয়দেব বা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা আর কেহ তেমন ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' শ্রেষ্ঠতম কাব্য ও গভীরতম দর্শন।" 'উর্বশী'র কল্পমূর্তির নেপথ্যে যে 'ইটারনাল ওম্যান' বা 'আনএক্সপ্রেসিভ শী'র ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, বিপিনচন্দ্র তাকেই স্বানুভূতির আলোকে প্রত্যক্ষ করে সাহিত্যরসিকের অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এখানে সমালোচক যেন কবি-কল্পনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতা পরবর্তীকালে বহু বিদগ্ধ রবীন্দ্রভক্ত সমালোচকের সুবিস্তৃত আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে—সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের আলোচনা যখন প্রকাশিত হয়, তখনও পর্যন্ত অন্য কেউ সম্ভবতঃ রবীন্দ্র-কল্পিত উর্বশীর স্বরূপের প্রতি এমন স্বচ্ছ আলোকপাত করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে অজিতকুমার চক্রবর্তীর যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে উর্বশীর একটি সংক্ষিপ্ত রসগ্রাহী আলোচনা আছে।[১৩৮] কিন্তু অজিতকুমারের আলোচনা বিপিনচন্দ্রের আলোচনার বৎসরাধিককাল পূর্বে প্রকাশিত হলেও সে আলোচনা অপেক্ষা বিপিনচন্দ্রের আলোচনা ব্যাপকতর ও গভীরতর। এ ছাড়া এ-ও লক্ষণীয় যে ব্যক্তিগত জীবনে বিপিনচন্দ্র একান্তভাবে নীতিনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে আশ্চর্যভাবে মুক্তবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

এরপর বিপিনচন্দ্র স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্র-কাব্য-সঙ্কলন গ্রন্থে (ভাবধারার অনুক্রমে বিভিন্ন বিভাগে সজ্জিত) বিধৃত 'নারী' বিভাগের কবিতাগুলির[১৩৯] প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন—"একদিকে আপনার চারিপাশের নিসর্গের ও মানব-সমাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অন্যদিকে আপনার অন্তরের নিগূঢ়তম অপরোক্ষ রসানুভূতি—এই দ্বিবিধ সত্যকে আশ্রয় করিয়া যেমন কবি তাঁর অপূর্ব 'উর্বশী'কে, সেইরূপ এই 'নারী' শীর্ষক অনেক চিত্র ও চরিত্রকে গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং এইজন্য তাঁর 'উর্বশী' যেমন গভীর বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিয়াছে, সেইরূপ তাঁর 'তোমরা ও আমরা', 'ব্যক্ত প্রেম', 'লজ্জিতা' এই সকলগুলিই অনুপম সৌন্দর্য ও বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিয়াছে।" এই সমস্ত কবিতার মধ্যে বস্তুতন্ত্রতার সার্থকতালাভের কারণ উল্লেখ করে

তিনি বলেছেন—'আর রবীন্দ্রনাথ যে কালে, যে দেশে, যে পরিবারে, যে সমাজে অসাধারণ রূপগুণে বিভূষিত হইয়া জন্মিয়াছেন এবং যে সকল বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া জীবনের সমুদয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁর নারী-চিত্রগুলি এমন অপূর্ব সৌন্দর্য ও সত্য লাভ করিয়াছে।'

বস্তুতন্ত্রতার মধ্যে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দাবি নিহিত আছে, তা' অনস্বীকার্য। কারণ—'জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।'

কিন্তু তা'ই বলে একমাত্র জীবনে জীবনযোগের প্রমাণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকলেই গানের পসরা বা সাহিত্যকর্ম সার্থক হয়ে ওঠে, একথা সত্য নয়। বিপিনচন্দ্রও তা' মনে করেন নি। তাঁর বিভিন্ন আলোচনা অনুসরণ করে একথা পূর্বেই প্রমাণ করা হয়েছে যে বস্তুতন্ত্রতা, রসাত্মকতা এবং বিশ্বজনীনতা—এ-ই হচ্ছে তাঁর মতে সার্থক কাব্যের লক্ষণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বস্তুতন্ত্রতার মতো বিশ্বজনীনতাকেও তিনি ব্যাখ্যা-বিশদ করে তুলেছেন তাঁর 'কাব্যের লক্ষণ' শীর্ষক পূর্বালোচিত প্রবন্ধে। বিপিনচন্দ্রের বিশ্বজনীনতা প্রকৃতপক্ষে রস-মূর্তির সর্বজনগ্রাহ্যতা ও স্থায়িত্ব-ধর্মের সমবায়ে পরিকল্পিত। ম্যাডোনাকে 'বাৎসল্যের' বিশ্ব-মূর্তির বলে তিনি রসমূর্তির সর্বজনগ্রাহ্যতার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন। স্বদেশীযুগে সাময়িক উত্তেজনাকে অবলম্বন করে রচিত অনেকগুলি গান সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন—'এগুলি জাতীয় জীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হইলেও জাতীয় সাহিত্যের স্মৃতিমন্দিরে কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না'—সে মন্তব্য সাহিত্যের 'স্থায়িত্ব' ধর্মের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সাহিত্যের এই সর্বজনগ্রাহ্যতা ও স্থায়িত্বধর্মের কথা পাশ্চাত্য জগতেও বহু-আলোচিত ও স্বীকৃত। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স'-এর সঙ্গে সংযোজিত তাঁর বিখ্যাত ভূমিকায় কাব্যের এই স্থায়িত্ব-ধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৪০] উইলিয়াম জে. লঙ্‌ও তাঁর ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের ভূমিকায় সাহিত্যের 'কোয়ালিটি'র গুণ হিসাবে 'পার্মানেন্স' বা স্থায়িত্ব এবং 'ইউনিভার্স্যালিটি' বা বিশ্বজনীনতার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৪১]

অন্যান্য আলোচনা :

বিপিনচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনাবলীর মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল-রচিত শোক-কাব্য 'এষা'র সমালোচনা উল্লেখযোগ্য।[১৪২] এই সুদীর্ঘ আলোচনাটি অনেকগুলি অংশে বিভক্ত। অংশগুলির শিরোনাম যথাক্রমে: কাব্যের লক্ষণ, এষার বিশেষত্ব, পরলোকের কল্পনা, আধুনিক কবিতা ও এষা, ইন্ মেমোরিয়ম ও এষা, এষায় রসমূর্তি, এষার বিশ্বসমস্যা। এগুলির মধ্যে 'এষায় বিশ্বসমস্যা' শিরোনামীয় অংশটি বঙ্গদর্শনে নেই। সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'এষা'র সঙ্গে সংযোজিত 'পরিচয়'-এ আছে। সম্ভবত এই অংশটি পরবর্তীকালে লেখক কর্তৃক সংযোজিত।

বিপিনচন্দ্র তাঁর এই সুদীর্ঘ আলোচনায় শোক-কাব্যরূপে অক্ষয়কুমারের 'এষা'র অসামান্য সার্থকতা প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছেন। বিশ্বসাহিত্যে শোক-কাব্যের মুকুটমণিরূপে টেনিসনের 'ইন্ মেমরিয়ম্' এবং শেলীর 'এডোনাইস্'-এর খ্যাতি সুবিদিত। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের অন্তর্গত 'রতি-বিলাপ' অংশও শোক-গাথারূপে গণ্য হবার যোগ্য। বাংলা ভাষাতেও প্রিয়জন-বিচ্ছেদবেদনাপ্রসূত বহু রচনা শোক-সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করেছে। গদ্যে রচিত—চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম', মানকুমারী বসুর 'প্রিয়-প্রসঙ্গ', পদ্যে রচিত—রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ, দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রীবিয়োগকেন্দ্রিক 'কবিতানিচয়', মুন্সী কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা', শ্রীযুক্তা গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অশ্রুকণা', জনৈক বঙ্গনারী প্রণীত 'নির্বাণ'—এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পত্নী-বিয়োগ-বেদনার অশ্রু-নির্ঝরের বাঙ্‌মূর্তিরূপে অক্ষয়কুমারের 'এষা' বাংলা শোক-সাহিত্যে এক গৌরবময় সংযোজন।

কবির মৃত্যুর পর তাঁর কবি-প্রতিভা এবং 'এষা' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে অনেক বিশিষ্ট আলোচনা প্রকাশিত হয়।[১৪৩] কিন্তু কবির জীবৎকালে প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের এই রচনাই অক্ষয়কুমারের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'এষা'র সর্বাপেক্ষা রসগ্রাহী আলোচনা।

'কাব্যের লক্ষণ' অংশে রসোত্তীর্ণ কাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করে 'এষার বিশেষত্ব' অংশে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'অক্ষয়কুমারের এই গীতিকাব্যের উৎপত্তি—শোকে, ইহার বিষয়—জীবনমৃত্যুর নিত্য সমস্যা। এ অভিজ্ঞতা বিশ্বজনীন। এ সমস্যা সার্বজনীন। আর সেইজন্যেই ইহা কাব্যসৃষ্টির উৎকৃষ্ট

উপকরণ।' এই শোকের উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'যেখানে জীবন, সেখানেই মৃত্যু ; সেইরূপ যেখানে ভালোবাসা, সেইখানেই বিরহ ও শোক। যেখানে সংসারের দুটি প্রাণীতে কোন প্রেমের সম্বন্ধ গড়িয়া তুলে, সেইখানেই বরুণের ন্যায়, মৃত্যুর ছায়া ও শোকের নিঃশ্বাস, তৃতীয় হইয়া তাহাদের মাঝে আসিয়া দাঁড়ায়। জীবনের মাঝখানেও আমরা মৃত্যুকে ভুলিতে পারি না। মিলনের গভীরতম আনন্দালোকের মাঝখানেও বিরহের কৃষ্ণখণ্ডমেঘসকল সর্বদাই উড়িয়া বেড়ায়।'[১৪৪] জীবন-ট্র্যাজেডির এই রহস্যময় সূত্র উদ্‌ঘাটন করে তিনি বলেছেন যে এই বিরহভীতি প্রেমের সার্বজনীন ধর্ম। আলঙ্কারিক পরিভাষায় যা' সাধারণীকৃতি নামে পরিচিত, সেই সাধারণীকৃতির সূত্র অনুসরণ করে এষার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'...যাহা তাঁহার নিতান্ত নিজের কথা ও নিজের ব্যথা, তাহাও তোমার আমার সকলেরই কথা ও সকলেরই ব্যথা হইয়া পড়িয়াছে। এষার শ্রেষ্ঠত্বের মূলতত্ত্বটি এই।'

'পরলোকের কল্পনা' শীর্ষক অংশে বিপিনচন্দ্র দেখিয়েছেন যে অক্ষয়কুমার তত্ত্বদর্শী সিদ্ধপুরুষ ছিলেন না। সুতরাং অক্ষয়কুমারের কাব্যে পরলোক সম্পর্কিত তত্ত্বোপলব্ধির প্রকাশ না থাকাই স্বাভাবিক। তাতে তাঁর কাব্যের গৌরবহানি ঘটেনি। বরং অতর্কপ্রতিষ্ঠ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ না করে সে সম্পর্কে কল্পিত উপদেশদানের যে ভাণ তিনি করেন নি, এটা তাঁর পক্ষে প্রশংসার কথা।

'আধুনিক কবিতা ও এষা' শীর্ষক অংশে তাই তাঁর প্রধান বক্তব্য : 'এষার প্রথম ও প্রধান গুণ—ইহার অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা। কবি আপনার জীবনের —বাহিরের ও ভিতরের অতি ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত অভিজ্ঞতার উপর এই কবিতা-গুলি গড়িয়াছেন।'

বিপিনচন্দ্রের মতে রসানুভূতির গভীরতার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিরা তুলনাবিহীন। অক্ষয়কুমারের কাব্য রসনাভূতির নিগূঢ়তায় বৈষ্ণব কবিতার সমকক্ষ কখনই নয়। কারণ—'অক্ষয়কুমারের বিরহ কেবল বিরহ ; ইহার মধ্যে সেই নিগূঢ়তম মিলনের অনুপম আনন্দটুকু লুকাইয়া নাই।' তবে তিনি একথাও স্বীকার করেন যে এ যুগের কাব্যে বৈষ্ণব কাব্যের নিগূঢ় রসানুভূতি ফুটে ওঠাও সম্ভব নয়। কারণ বৈষ্ণব কাব্য-

রচনার সময় ও সমাজ থেকে এ যুগ অনেক দূরবর্তী। তাই তিনি মনে করেন যে অক্ষয়কুমার সমসাময়িককালের বিশিষ্ট সাধনার নিগূঢ় ও সার্বজনীন সমস্যা ও ভাবকে যেভাবে তাঁর কাব্যে বিশদ করে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা' নিঃসন্দেহে তাঁর কবি-প্রতিভার মহিমাব্যঞ্জক।

'ইন্ মেমরিয়ম্ ও এষা' শীর্ষক অংশে আধুনিক জীবন-সাধনার অন্তরঙ্গ সমস্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'আমাদের বুদ্ধি এক প্রকার সিদ্ধান্ত করে, কিন্তু আমাদের প্রাণ সে সিদ্ধান্তকে ধরিয়া সান্ত্বনা পায় না বলিয়া, তাহার বিরোধী বিশ্বাসকেও আলিঙ্গন করিতে ব্যগ্র হয়। এই দু'টানায় পড়িয়া আমরা কখন একদিকে, কখনও বা অন্যদিকে ঝুঁকিয়া পড়ি। ইহাই আধুনিক সাধনার সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা—বর্তমান যুগের ইহাই সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি।' বিপিনচন্দ্রের মতে অক্ষয়কুমার তাঁর এষাতে এই ট্র্যাজেডি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইংরেজী সাহিত্যে লর্ড টেনিসনও তাঁর 'ইন্ মেমোরিয়ম্'-এ এই আধুনিক ট্র্যাজেডির চিত্র অঙ্কিত করেছেন। আধুনিক জীবন-সাধনার এই বিশ্বজনীন সমস্যাকে অঙ্গীকার করেই টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম' বিশ্বসাহিত্যে অমন উচ্চস্থান অধিকার করেছে। বিপিনচন্দ্রের ধারণায়—'অক্ষয়কুমারের এষা ও টেনিসনের ইন মেমোরিয়ম্ একই শ্রেণীর কাব্যসৃষ্টি।' দু'খানি কাব্যগ্রন্থ পাশাপাশি রেখে পড়লে এমনও মনে হতে পারে যে, অক্ষয়কুমার টেনিসনের ভাব-কল্পনা আত্মসাৎ করে তাঁর কাব্যে পুনরুদ্গীরণ করেছেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্র মনে করেন—'…এষাখানি অক্ষয়-কুমারের,—টেনিসনের নহে। ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে বাঙালী কবির প্রাণের ছাপ, হিন্দু-কবির যুগযুগান্তবাহী বিচিত্র জাতীয় সাধনার সহি-মোহর অঙ্কিত রহিয়াছে।'

'ইন্ মেমোরিয়ম্' কাব্যগ্রন্থের প্রথমাংশের সঙ্গে 'এষা'র শেষাংশের তুলনা করে বিপিনচন্দ্র উভয় কবির ভাব-কল্পনার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য এবং উভয় কাব্য-গ্রন্থের উৎকর্ষ-অপকর্ষ পরিস্ফুট করে বলেছেন যে অক্ষয়কুমারের কবিপ্রতিভা সর্বাংশে টেনিসনের কবি-প্রতিভার সমকক্ষ—এটা তাঁর বক্তব্য নয়। তাঁর অবলম্বিত ভাব ও তাঁর রসাত্মক অভিব্যক্তির দিক থেকে বিচার করলে 'এষা' যে 'ইন্ মেমোরিয়ম্' অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নয়, বরং গভীরতর ও শ্রেষ্ঠতর—এটা তিনি নিঃসংকোচে ঘোষণা করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে তিনি

বলেছেন—'কথাটা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, প্রত্যেক কবিতার তুলনায় সমালোচনা করিতে হয়। সে বিচার বিস্তর সময়সাপেক্ষ।' তবে 'ইম্প্রেসন' বা স্বানুভূতির আলোকে উভয় গ্রন্থ তাঁর দৃষ্টিতে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তার উল্লেখ করে আবেগতপ্ত ভাষায় তিনি বলেছেন—'ইন্ মেমোরিয়ম্ বহুবার পড়িয়াছি, তন্নতন্ন করিয়া পড়িয়াছি, শোকার্ত হৃদয়ে মৃত্যুর অন্ধকারে বসিয়া দিবানিশি পড়িয়াছি। কিন্তু তাহা জীবন-মৃত্যুর সমস্যাকে যে এষার মতো এমন তন্নতন্ন করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছে, এমন কখন অনুভব করি নাই।' এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'টেনিসন বহু বর্ষ ধরিয়া বিবিধ বিষয়কর্মের বিক্ষেপের মধ্যে ইহার এক-একটি অংশ রচনা করিয়াছিলেন, তিনি গ্রন্থখানি যোগস্থ হইয়া, একৈক রসনাভূতিতে বিভোর হইয়া লেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার কাব্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা আছে।... এবিষয়ে অক্ষয়কুমারের 'এষা' টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম্' অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইন্ মেমোরিয়মের বুনুনী আলগা, এষার বুনুনী ঠাসা। শোককাব্যের মূল লক্ষ্য করুণরসের অভিব্যক্তি। টেনিসনের কাব্যে সে গভীর কারুণ্য কোথায়? অক্ষয়কুমারের এই কাব্যখানির প্রতি ছত্রে নিদারুণ মর্মস্পর্শী কারুণ্য-অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।'

'এষার রসমূর্তি' শীর্ষক অংশে তিনি বলেছেন যে শুধু করুণরসের কাব্য বললেই এষার পূর্ণ পরিচায়ন করা হয় না। মনোবিজ্ঞানের অভিব্যক্তিরূপেও এষার কবিতাগুলির মূল্য নগণ্য নয়। বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'পতি-পত্নীর সম্বন্ধ কেবলমাত্র দুইটি প্রাণীকে লইয়া নহে। যতক্ষণ এই সম্বন্ধ দ্বিপাদমাত্র আশ্রয় করিয়া রহে, ততক্ষণ পতি-পত্নী কেবল রমণ ও রমণী।...কিন্তু পতি যখন পত্নীর মাতৃত্বকে এবং পত্নী যখন পতির পিতৃত্বকে ফুটাইয়া তুলেন, তখনই অভিনব বাৎসল্যে আচ্ছন্ন হইয়া মাধুর্যের মোহিনী—চিরকল্যাণী হইয়া উঠে। দ্বিপাদ ত্রিপাদে পরিপূর্ণ হয়।' বক্তব্যের সমর্থনে জার্মান কবি গ্যেটের 'ফাউস্ট' থেকে কয়েকছত্র পাদটীকায় উৎকলিত করে[১৪৫] তিনি মন্তব্য করেছেন—'মাধুর্য তখন স্নেহসারে পরিণত হইয়া বাৎসল্যকে আপনার আলম্বন ও উদ্দীপন রূপে গ্রহণ করে। এই স্নেহসারস্থিত দাম্পত্যপ্রেম যখন মৃত্যুর আঘাতে ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তাহার শোকও স্নেহাশ্রয়-বিহীন বাৎসল্যের দৈন্য দেখিয়া আপনার তীব্রতা অনুভব করে। মাধুর্যের সঙ্গে

বাৎসল্য তখন একই আঘাতে আহত হইয়া অপূর্ব ও গভীর কারুণ্যের সৃষ্টি করে। এই অদ্ভুত ও জটিল কারুণ্যের চিত্র এবায় যেমন ফুটিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।'

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প-গ্রন্থ 'করঞ্চ''-এর সমালোচনা বিপিনচন্দ্রের সাহিত্য সমালোচনামূলক রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য।[১৪৬]

আলোচনার মুখবন্ধে তিনি ছোটগল্পের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—'ছোটগল্পের প্রধান একটা লক্ষণ এই যে, তাহা একদিকে যেমন সরস ও কুতুহলোদ্দীপক হইবে, সেইরূপ অন্যদিকে অত্যন্ত হাল্‌কাও হইবে। পড়িতে কোনও প্রকারের ক্লান্তির উদ্রেক হইবে না। বুঝিতে ভাবনা ব্যয় করিতে হইবে না।......পড়া সাঙ্গ হইলে একখানি পরিষ্কার ছবি, একটি সংযত রস, একটা ভাবের হাওয়া, নীরবে, ধীরে, মাদকতা ও চাঞ্চল্যশূন্য হইয়া মনের মধ্যে জাগিয়া থাকিবে।' 'হাল্‌কা' শব্দের দ্বারা বিপিনচন্দ্র সম্ভবত ছোটগল্পের আয়তনগত ক্ষুদ্রতার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। ছোটগল্পের লক্ষণ স্পষ্টতর করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন—"...চিত্রকলায় যাহাকে 'প্যাস্টেল ড্রয়িং' অথবা 'চক ড্রয়িং' বলে, সাহিত্য-কলায় ছোটগল্প অনেকটা তারই সমশ্রেণীর। প্যাস্টেলাঙ্কনে লোকবিশেষের প্রতিকৃতিকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গোটাকতক স্থূল রেখার সাহায্যে পরিষ্কাররূপে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। ছোটগল্পেও সেইরূপ।'

ছোটগল্পের লক্ষণ নির্দেশের পর তিনি সুধীন্দ্রনাথের 'করঞ্চ' গ্রন্থের 'মিতে', 'কাসিমের মুরগী' এবং 'ঠাকুর দেখা' শীর্ষক তিনটি গল্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন—"মিতে ও কাসিমের মুরগী—এই দু'টি গল্পের রসেতে জটিলতা বড়ো নাই। দুইটির মধ্যেই সখ্যরস ফুটিয়াছে। 'ঠাকুর দেখা' শীর্ষক গল্পে সুধীবাবু গভীরতর ও জটিলতর স্ত্রী-চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা করিয়াছেন। এ গল্পের অবলম্বন ও আশ্রয় সখ্য নহে, কিন্তু মাধুর্য।..." এই গল্পটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে বাংলা ছোটগল্পলেখকদের আসরে সুধীন্দ্রনাথের স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন— '...বাংলার সকল ছোটগল্পের বই যে আমি পড়িয়াছি, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু যতটা পড়িয়াছি, তাহাতে সুধীবাবু বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের লেখকশ্রেণীর মধ্যে অতিশয় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা সম্ভব বলিয়া মনে করি না'।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের আলোচনা পরিমাণে সর্বাধিক হলেও, সমকালীন যুগের অন্যান্য সাহিত্যরথীদের কৃতিত্বও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাহিত্য-সমালোচকের অনুসন্ধিৎসা নিয়েই তিনি রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, তারকনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কৃতির মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। এঁদের সম্পর্কিত আলোচনা আয়তনে সংক্ষিপ্ত হলেও বিশ্লেষণী-শক্তির নৈপুণ্যের দিক থেকে তা' উপেক্ষণীয় নয়।

পূর্বোল্লিখিত 'ধর্ম ও আর্ট' শীর্ষক প্রবন্ধে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' শিরোনামীয় প্রসঙ্গে তিনি বস্তুতন্ত্রতার কথা উত্থাপন করে বলেছেন—'আধুনিক বাংলা কাব্যেও যেখানে কবিকল্পনা প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর গড়িয়াছে, সেইখানে যুগপৎ সত্য সৌন্দর্য ফুটিয়াছে, সেখানে শব্দ অর্থের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। শব্দ ও অর্থ মিলিয়া জীবন্ত রসমূর্তি সকল গড়িয়া তুলিয়াছে। আর যেখানে কবিকল্পনা শ্রুতিস্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া অপ্রত্যক্ষের সন্ধানে গিয়াছে, সেইখানে শব্দ অর্থকে, ভাষা ভাবকে, ঝঙ্কার রসকে অভিভূত করিয়া একটা অলীক সৃষ্টি রচনা করিয়াছে।

মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্য' তাঁর মতে একখানি সার্থক কাব্য। তিনি বলেছেন—"মাইকেলের মেঘনাদবধে একটা সত্য অনুভূতির প্রমাণ পাই। উপাখ্যানভাগমাত্র কবি রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এই উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া তিনি যে সকল চিত্র ও রস ফুটিইয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের, রামায়ণের নহে। এই মহাকাব্যে শব্দের ঝঙ্কারে কবিকল্পনার সত্যকে আচ্ছন্ন করে নাই। কিন্তু 'মেঘনাদবধে' যে বস্তুতন্ত্রতা আছে 'ব্রজাঙ্গনা'য় তাহা নাই। এইজন্য 'ব্রজাঙ্গনা' শব্দের লালিত্য ও ছন্দের মাধুর্য দিয়া অনুভূতির দৈন্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে"।

হেমচন্দ্রের আলোচনায় তিনি 'বৃত্রসংহার' সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন নি, কিন্তু 'কবিতাবলী'র সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। মহাকাব্যরূপে বৃত্রসংহারের রসোত্তীর্ণতা সম্পর্কে সংশয়ই সম্ভবত এই নীরবতার কারণ। তিনি বলেছেন —"হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'তে এবং নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী'তে কোন গভীর বা জটিল রস না ফুটিলেও, যতটুকু রস আছে, তাহা সত্য ও বস্তুতন্ত্র, কবিগণের প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ। এইজন্য এই দুইখানি গীতি-কাব্যে শব্দ ও অর্থে, সত্যে ও কল্পনাতে, একটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে।"

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এবং নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ'ও বিপিনচন্দ্রের মতে মোটামুটিভাবে কাব্য হিসাবে সার্থক রচনা। কারণ —"আধুনিক কালের শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী সে সময়ে মর্মে মর্মে যে বেদনা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, রাষ্ট্রীয় জীবনে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তার প্রাণের ভিতরে স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহারই প্রেরণায় রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এবং নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' রচিত হয়। এই দুইখানি কাব্যের মধ্যে একটা সতেজ অনুভূতি বিদ্যমান ছিল। এইজন্য ইহাদের ভাষা ও ভাবের, শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটা সঙ্গতি রহিয়াছে, কোথাও বিশেষ সত্যাভাস বা রসাভাস নাই।"

কিন্তু নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' ও রৈবতক' সম্পর্কে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করতে পারেন নি। তাঁর মতে "...নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' ও 'রৈবতক' একটা সাময়িক, কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ামুখে রচিত হয়।...তখনও প্রাচীনে-নবীনে সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস জাগে নাই। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই তখন এই সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভব করিয়া তার চেষ্টা করিতেছিলেন। অপরে একটা কৃত্রিম ও কল্পিত 'সনাতনী'র প্রতিষ্ঠা করিয়া, বর্তমানের সহজ ও অনিবার্য বিকাশ-গতির একান্ত প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই কৃত্রিম ও কল্পিত 'সনাতনী'র প্রেরণাতেই নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' ও 'রৈবতকের' জন্ম হয়। এইজন্যই এ দু'খানি কাব্য তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নাই। কৃত্রিম কল্পিত ধর্মের চাপে আর্ট পঙ্গু হইয়াছে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন, উভয়ই অমন অলীক হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রাচীনের প্রতিকৃতিও ফুটে নাই, নূতনের অনুভূতিও জাগে নাই। ইঁহারা কোন গভীর রস বা সার্বজনীন আদর্শ ফুটাইয়া সাহিত্যে অচ্যুত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই"। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত সমালোচকগণ নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী' কাব্য সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসকার ডক্টর সুকুমার সেন নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন—'পুরুষ চরিত্রের মধ্যে কৃষ্ণ ও অর্জুন এই দুই প্রধান ভূমিকায় ব্যক্তিত্বের একান্ত অভাব। কৃষ্ণ মানুষও নহেন, দেবতাও নহেন—যেন একজন আধুনিক স্বপ্নবিলাসী দার্শনিক জননায়ক'।[১৪৭] স্বনামখ্যাত সমালোচক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন—'...কবি যে বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা মহাকাব্যের উপাদান হিসাবে সার্থক হইয়াছে। কিন্তু এই

বিরাট পরিকল্পনা সত্ত্বেও এই কাব্যত্রয় একত্রিত হইয়া একখানি সত্যকার মহাকাব্য হইয়া উঠিতে পারে নাই'।[১৪৮]

আধুনিক যুগের বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—"...বিগত চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা উপন্যাসের মধ্যে এক বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ছাড়া, 'স্বর্ণলতা' ব্যতীত আর একখানিও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। আর বর্তমানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আশ্রয়েই, অসাধারণ কবিকল্পনা-প্রসূত না হইয়াও 'স্বর্ণলতা' অমন অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। অন্যদিকে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামের' আর গুণাগুণ যাহাই থাকুক না কেন, রসের বিচারে, কাব্যের হিসাবে, ইঁহারা লেখকের অলোক-সামান্য প্রতিভার গৌরব রক্ষা করে নাই।"[১৪৯]

শুধু প্রবীণ সাহিত্যিকবৃন্দের মূল্যায়ন নয়, সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে যাঁরা একান্ত আধুনিক বলে পরিচিত, বিপিনচন্দ্রের মনীষা তাঁদেরও মূল্যায়নে অগ্রসর হয়েছে। প্রয়াণের প্রায় তিন বছর পূর্বে 'মাণিকগঞ্জ সাহিত্য-সম্মিলনী'তে (১৩৩৫) সভাপতিরূপে প্রদত্ত তাঁর মনোজ্ঞ অভিভাষণটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[১৫০]

এই অভিভাষণে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পটভূমিকায় নবীন বাংলা-সাহিত্যের অভিনব মূল্যায়নের চেষ্টা করেন। পূর্বসূরীদের অবদানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে ব্যবহৃত গদ্যরীতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন—"জীবিতদের কথা বেশী বলিতে নাই। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে বিশ্বসাহিত্যে উঠাইয়াছেন—অস্বীকার করা যায় না। দুনিয়ার মাঝখানে তিনি বাংলা-সাহিত্যের স্থান করিয়াছেন। লড়াইয়ের পর ইউরোপীয় মনীষীবর্গ 'আন্তর্জাতিক আলোক-সঙ্ঘ' নাম দিয়া এক ইস্তাহার জারী করেন। তাহাতে যাঁহাদের সহি ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের একজন। দেখিয়া ধন্য হইলাম। তিনি কেবল কবি নহেন—জগতের আধুনিক চিন্তানায়কদের সঙ্গে সমকক্ষ আসন গ্রহণ করিয়া বাংলাকে তিনি মহীয়ান করিয়াছেন, জাতিকে বড়ো করিয়াছেন।" এই অভিভাষণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে—তখনকার শক্তিমান উদীয়মান কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভার উচ্ছ্বসিত

স্বীকৃতি-উচ্চারণ। বিপিনচন্দ্র আবেগতপ্ত ভাষায় বললেন—'তারপর সর্বকনিষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলাম।...তাঁহার কবিতার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিলাম এ ত' কম নয়। এ খাঁটি মাটি হইতে উঠিয়াছে। আগেকার কবি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দোতালা প্রাসাদে থাকিয়া কবিতা লিখিতেন। নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মিয়াছেন জানি না; কিন্তু তাঁহার কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই।...তাহাতে পালিশ বেশী নাই; আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান।' হুইট্‌ম্যানের কবিতার সঙ্গে নজরুলের কবিতার তুলনা করে বিপিনচন্দ্র বলেন— 'রবীন্দ্রনাথের পর নজরুল ইসলাম নূতন যুগের কবি। হাততালি দিয়া নজরুলকে নষ্ট করিবেন না—তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিন। সমবয়স্ক যাঁহারা তাঁহারা তাঁকে সহায়তা করুন, কনিষ্ঠ যাঁহারা তাঁহারা তাঁকে নমস্কার করুন।.. জাতির প্রাণে লাঙ্গল আসিয়াছে, নূতন ডিমোক্র্যাট নজরুলের বীণার ঝঙ্কারে তাহা পাই।'

জীবনী এবং আত্মজীবনী :

বাংলা-ভাষায় জীবনী-সাহিত্য-রচনার প্রয়াস সুপ্রাচীন। বাংলা গদ্যরীতি উদ্ভবের অনেক আগে থেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে জীবনী-সাহিত্য-রচনার ব্যাপক প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্য-চরিত-গ্রন্থসমূহ এই প্রয়াসের ঐতিহাসিক সাক্ষী। তবে ইংরেজীতে যাকে 'বায়োগ্রাফি' বলে চৈতন্য-চরিতগ্রন্থসমূহকে সেই শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। কারণ, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে সন্তজীবনী; সুতরাং সেগুলি ইংরেজী 'হেজিয়োগ্রাফি'র শাখাভুক্ত হবার যোগ্য। কারণ, সন্তজীবনী-রচয়িতাদের দৃষ্টি অনেকাংশে ভক্তির ধূম্রজালে আবিল।

গদ্যরীতির উদ্ভবের পরেই প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী 'বায়োগ্রাফি'র আদর্শে বাংলা-ভাষায় সমকালীন জীবিত বা মৃত মানুষের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে জীবনী-সাহিত্য-রচনার প্রচলন হতে থাকে। 'বাংলা-চরিত-সাহিত্য'-এর গ্রন্থকার ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে 'ধর্মসভা'র উদ্যোগে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিতকেই 'বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রকৃত পূর্ণাঙ্গকল্প জীবনচরিত' বলে উল্লেখ করেছেন।[৫১] এর পর থেকে নানাভাবে

বিভিন্ন প্রকারের জীবনী রচনা হতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'এতদ্দেশীয় পূর্বতন কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত' এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' ব্যতীত দীনবন্ধু মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চিত্র রচনা করে গঠমান বাংলা-চরিত-সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তোলেন। ইতিমধ্যে ব্রাহ্ম ভাবধারা প্রচারের অঙ্গরূপে সাধু ও ভক্তদের জীবন-কাহিনী অবলম্বন করে অনেকগুলি চরিতগ্রন্থ রচিত হয়। তবে 'এগুলি হলো আধুনিককালের হেজিয়োগ্রাফি'।[১৫২]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যে সমস্ত সাহিত্যিক বাংলা-ভাষায় জীবনী-রচনায় অগ্রসর হন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্য জীবনী-সাহিত্যকারগণই ছিলেন তাঁদের আদর্শ। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—'জীবনী-সাহিত্যের জনক' প্লুটার্ক, ভলটেয়ার, বসওয়েল, কার্লাইল, এমার্সন এবং আরও পরবর্তীকালে লিটন স্ট্র্যাচি প্রমুখ।

'বাংলা-চরিত-সাহিত্যের' গ্রন্থকার ১৮৮১-১৯১৮ পর্যন্ত কাল-পরিধিকে 'চরিত-সাহিত্যের ঐশ্বর্যযুগ' নামে চিহ্নিত করেছেন। এই কাল-পরিধির মধ্যে রচিত ঊনত্রিশখানি উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থের তিনি নামোল্লেখ করেছেন। সেগুলির মধ্যে প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে,—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত' (১৮৮১) এবং শেষ গ্রন্থ—কুমার দেব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক দু'খণ্ডে প্রকাশিত 'ভূদেব-চরিত' (১৯১৭, ১৯২৩)। এই সময়ের মধ্যেই অবশ্য উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের 'আচার্য কেশবচন্দ্র' (তিন খণ্ড, ১৮৯১-৯৬), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫), যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' (১৮৯৬), রামচন্দ্র দত্তের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী (১৮৯০), শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৩), অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী (১৯১৩) প্রভৃতি বিখ্যাত জীবনী-গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়।

'বাংলা-চরিত-সাহিত্য'-এর গ্রন্থকার ডক্টর ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের চরিত-সাহিত্যকে 'চরিত-সাহিত্যের ঐশ্বর্যযুগ'-এর অন্তর্ভুক্ত না করে পৃথক এক অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং বিপিনচন্দ্র পালের চরিত-সাহিত্য অন্য একটি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'চারিত্র-পূজা' (১৯০৭), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'চরিত-

কথা' (১৯১৩) এবং বিপিনচন্দ্র পালের 'চরিত-কথা' (১৩২৩ : ১৯১৬) চরিত-সাহিত্যের ঐশ্বর্য যুগের কাল-পরিধির মধ্যেই প্রকাশিত হয়। কাল-পরিধির দিক দিয়ে চিন্তা করলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর এবং বিপিনচন্দ্রও চরিত-সাহিত্যের ঐশ্বর্যযুগের লেখকরূপেই গণ্য হবার যোগ্য। বিপিনচন্দ্রের বর্তমান 'চরিত-চিত্র' গ্রন্থে (পূর্বে প্রকাশিত 'চরিত-কথা' গ্রন্থের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ) বিধৃত আটটি চরিত্র-চিত্রই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর বর্তমান ইংরেজী জীবনী-গ্রন্থ 'ক্যারেক্টার স্কেচেস্'-এ (১৯৫৭) সঙ্কলিত আঠারোটি স্কেচের মধ্যে পনেরটি স্কেচই ১৯০১ থেকে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত। এ ছাড়া তাঁর আরও অনেকগুলি বাংলা চরিত্র-চিত্র ১৯১৮-র আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং যাঁদের রচনার অবদানে বাংলা চরিত-সাহিত্য ঐশ্বর্যযুগে প্রবেশ করেছিল, তাঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্রের নামও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

বিপিনচন্দ্র পাল কর্তৃক রচিত জীবনালেখ্য সংখ্যায় অনেক। তাঁর সুপরিচিত 'চরিত-চিত্র' গ্রন্থে মাত্র আটটি জীবনালেখ্য সঙ্কলিত হয়েছে।[১৫৩] সেগুলির মধ্যে রাজা রামমোহনের জীবনালেখ্য দু'টি রচনায় সম্পূর্ণ। অবশ্য আরও নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে তিনি রামমোহনের জীবন-কথা ও তাঁর কীর্তির উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন। যা'ই হোক্, 'চরিত্র-চিত্র' গ্রন্থে বিধৃত আটটি জীবনালেখ্য ১৩১৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের মধ্যে রচিত। এগুলির নাম : (১) ব্রাহ্ম-সমাজ ও রাজা রামমোহন, এবং রামমোহন ও ব্রহ্মসভা, (২) বঙ্কিমচন্দ্র (৩) সুরেন্দ্রনাথ (৪) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫) অশ্বিনীকুমার দত্ত, (৬) ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায়, (৭) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, (৮) রবীন্দ্রনাথ।

উপরি-উক্ত কাল-পরিধির পূর্বে, মধ্যে এবং পরেও তাঁর অনেকগুলি জীবনালেখ্য প্রকাশিত হয়। পূর্বে প্রকাশিত জীবনালেখ্যগুলির মধ্যে (১) বঙ্গবন্ধু উইলিয়ম কেরী (মুকুল, চৈত্র ১৩০৩), (২) মহারানী স্বর্ণময়ী (মুকুল, অগ্রহায়ণ, ১৩০৪), (৩) স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ (মুকুল, বৈশাখ, ১৩০৫), (৪) অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর (প্রদীপ, পৌষ ১৩০৭), (৫) এমার্সন (প্রদীপ, আষাঢ় ১৩০৮) এবং (৬) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১২) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'ভারতেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া' এবং 'সখা-সম্পাদক স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন' ও এই পর্বে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য। দু'খানি

গ্রন্থই ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। উপরি-উক্ত কাল-পরিধির মধ্যে প্রকাশিত অন্যান্য জীবনালেখ্যগুলি হচ্ছে: (১) উইলিয়ম টি স্টেড, (২) নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, (৩) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, (৪) তারকনাথ পালিত এবং (৫) বিলাতে রবীন্দ্রনাথ।[১৫৪] পরে প্রকাশিত জীবনালেখ্যগুলির মধ্যে (১) মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী (বিজয়া, বৈশাখ ১৩২১), (২) বাঙালী টলস্টয় (সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯), (৩) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩১), (৪) সুবোধচন্দ্র মল্লিক (নব্যভারত, পৌষ ১৩৩২) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'যুগের মানুষ বিজয়কৃষ্ণ'ও (প্রথম সং ১৩৪১ : ১৯৩৪) এই পর্বে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য।

মহাপুরুষ এবং সার্থকনামা মানুষের জীবন-চরিত পাঠ যে চরিত্র-গঠনের একটি বড়ো সহায়ক উপাদান—এ বিশ্বাস তখন সমাজে প্রবল ছিল। সেই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই বিপিনচন্দ্র গভীর শ্রদ্ধাবোধ মনে নিয়ে জীবনী নির্বাচনে অগ্রসর হয়েছেন। চরিতকাররূপে তাঁর আগ্রহ ও অভিনিবেশ কত ব্যাপক ও বিচিত্র ছিল এই তালিকা থেকে তা' সহজেই প্রতীয়মান হয়। সমসাময়িক-কালের চরিতকারদের মধ্যে আগ্রহ ও অভিনিবেশের এমন ব্যাপ্তি বিরল।

বিপিনচন্দ্র-রচিত সমস্ত জীবনালেখ্যগুলির আলোচনা এখানে স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। চরিত-সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনের জন্য তাঁর সুনির্বাচিত কয়েকটি জীবনালেখ্যের আলোচনাই যথেষ্ট।

চরিত-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র তাঁর বাংলা আত্মজীবনী 'সত্তর বৎসর'-গ্রন্থে বলেছেন—'জীবন-চরিত সমাজের নিগূঢ় শক্তি ও অভিব্যক্তির সূত্র ধরাইয়া দেয়।'[১৫৫] এই সূত্রাকার বক্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা আছে তাঁর ইংরেজীতে রচিত আত্মজীবনীর ভূমিকায়। সেখানে তিনি জীবন-চরিতকে সামাজিক অভিব্যক্তিধারার সটীক গ্রন্থরূপে উল্লেখ করে বলেছেন যে জাতির শিক্ষাবিধানই জীবনচরিতের লক্ষ্য।[১৫৬]

চরিত-সাহিত্য রচনায় বিপিনচন্দ্র মুখ্যত এই সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন, সন্দেহ নেই। তবে সর্বক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

'চরিত্র-চিত্র' গ্রন্থে বিধৃত 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক জীবনালেখ্যটি বিপিনচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত রচনা। এইজন্য প্রথমে এই রচনাটিকেই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এই রচনাটি বিপিনচন্দ্রের 'সাহিত্যতত্ত্ব' এবং 'রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনা'র ক্ষেত্রেও আংশিকভাবে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে যে জন-সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, তার অব্যবহিত পরে বঙ্গদর্শনে (চৈত্র, ১৩১৮) এই জীবনালেখ্যটি প্রকাশিত হয়—সে কথাও পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

এই রচনায় বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্র-সংবর্ধনার হু'টি দিকের কথা উল্লেখ করেন। একদিকে তাঁর মতে 'যোগ্যের সংবর্ধনা যে সমাজের একটা প্রধান কর্তব্য, বাংলার সমাজ একদিন এ বিধানকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। মধুসূদন, হেমচন্দ্রের অন্ত্যলীলা তার সাক্ষী। কিন্তু বাংলার সে আত্মবিস্মৃতি ক্রমে ঘুচিয়া যাইতেছে। এই কয় বৎসরে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই সংবর্ধনাও তারই প্রমাণ'। কিন্তু তাঁর মতে এই সংবর্ধনার আর একটি দিকও আছে। তিনি বলেন—'কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ আপনার প্রতিভা-বলেই এইরূপ সমৃদ্ধ রাজসিক সংবর্ধনা পাইয়াছেন, একেবারে এত বড় কথাটা বলিতেও সঙ্কোচ হয়।··রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি বা মনীষী নহেন। তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ঠাকুর-বংশের কুলপ্রদীপ।···তাঁর পৈতৃক কুল ও ধনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই কবি-প্রতিভার মণিকাঞ্চন যোগ না থাকিলে, বাঙালী হয়ত আজ এইভাবে তাঁর সে শুদ্ধ সাত্ত্বিকী যোগ্যতার সংবর্ধনা করিত না।' রবীন্দ্র-ভক্তের কানে এ উক্তি কখনই শ্রুতিমধুর হতে পারে না। কিন্তু এই উক্তি যে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতি কটাক্ষ নয়, সমকালীন দেশবাসীর মানসিকতার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পরের ছত্রেই যেখানে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন 'কিন্তু তাহাতে আমাদের হীনতা প্রকাশ পাইত, রবীন্দ্র-প্রতিভার অযোগ্যতা প্রমাণিত হইত না'।

কাব্যের উৎকর্ষবিচারে বস্তুতন্ত্রতা বিপিনচন্দ্রের মতে অন্যতম প্রধান মানদণ্ড। যা' বস্তুতন্ত্র নয় তা' মায়িক। এই দিক দিয়ে বিচার করে রবীন্দ্র-নাথের অনেক সৃষ্টিকে 'মায়িক' বলে ঘোষণা করলেও এ কথা তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করেছেন যে—'···রসানুভূতির তীক্ষ্ণতা ও অধ্যাত্ম-দৃষ্টির প্রসার

ও গভীরতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পরে, বাংলায় জন্মিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।' বিপিনচন্দ্রের মতে এই মায়িকতার কারণ সাধারণভাবে বস্তুতন্ত্রহীনতা। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসাধনাও তাঁর মতে অংশত বস্তুতন্ত্রতাহীন। কারণ, সে সাধনায় 'চৈত্যগুরুর স্থান' আছে, 'মোহান্ত গুরুর স্থান' নেই। কারণ, প্রাচীন ধর্ম সমস্তই গুরুমুখী কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো মোহান্তগুরু বা সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন নি। বিপিনচন্দ্র বলেন—'চিত্তে যে ভগবৎ প্রকাশ হয়, তাহা যখন মোহান্তগুরু বা সদ্‌গুরুতে তাঁর যে অধিষ্ঠান হয়, তার সঙ্গে মিলিয়া যায়,—চৈত্য-প্রকাশ ও মোহান্ত-প্রকাশ যখন একে অন্যের সমর্থক ও পরস্পরকে প্রতিষ্ঠিত করে, তখন ভিতরকার আদর্শ ও ভাব সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হয়'। গুরুবাদী অধ্যাত্ম-সাধনার দেশে সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা-প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যদি অদীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অধ্যাত্ম ভাব ও ভাবনার প্রকাশ ও প্রচারকে অপূর্ণ সাধনা-প্রসূত বলে মনে করেন, তা'হলে তাকে নিন্দাবাদ বলে মনে করা হয়তো যুক্তিযুক্ত হয় না। তবে দীক্ষা গ্রহণ না করেও কবিসুলভ ধ্যানী দৃষ্টি নিয়ে অধ্যাত্ম জগতের রস ও রহস্যের অতলে অবগাহন করে মণিমুক্তা আহরণ ও বিতরণ যে সম্ভব—সম্ভবতঃ রবীন্দ্র-সমালোচনার ক্ষেত্রে এই কথাটি বিপিনচন্দ্রের চিন্তায় উদিত হয়নি। শুধু দীক্ষাগ্রহণ লৌকিক অধিকার দিতে পারে মাত্র, অলৌকিক অনুভূতির জোগান দিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা তখন প্রবলভাবে আন্তর্জাতিকতার অভিমুখী। জাতীয়তার উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ না করে সমাজের উপরেই তিনি 'বিশ্বমানব'-এর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করছেন। বিপিন-চন্দ্রেরও চরম লক্ষ্য ছিল—আন্তর্জাতিকতাভিত্তিক 'বিশ্বমানব'। কিন্তু বিপিনচন্দ্র জাতীয়তার নিরাপদ ভূমির উপরেই বিশ্বমানবের সৌধ নির্মাণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানব-কল্পনাকেও বস্তুতন্ত্রতা-হীন, অতএব মায়িক বলে উল্লেখ করেন। এ উল্লেখকে স্তুতি বা নিন্দা বলে গ্রহণ না করে, বরং ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরের অভিমতের অকপট সমালোচনা বলে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই একটিমাত্র রচনার অংশ-বিশেষ উদ্ধার করে বিপিনচন্দ্রকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেশ সমাজপতি প্রমুখ রবীন্দ্র-বিরোধীদের

দলভুক্ত করে মন্তব্য করেছেন—'বিপিনচন্দ্র এই প্রবন্ধে ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, ধর্মবোধ, স্বদেশসেবা প্রভৃতি সমস্তই বস্তুতন্ত্রহীন অর্থাৎ বাংলা-ভাষায় বলিতে হয় আজগুবি ও ফাঁকিবাজি। বিপিনচন্দ্র কিভাবে বাক্‌চাতুর্য দ্বারা মহৎ বিষয় ও বস্তুকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এই রচনা তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন'।[১৫৭] রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের যে সমস্ত উক্তি ও মন্তব্য পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রভাতকুমারের এই মন্তব্যকে পক্ষপাতশূন্য সমালোচকের মন্তব্য বলে গ্রহণ করা কঠিন। প্রভাতকুমার আরও বলেছেন—'বিপিনচন্দ্র সাহিত্যের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখেন নাই; তিনি তাঁহার জীবনকে ও সাহিত্যকে মিলাইয়া পড়িতে গিয়াছিলেন এবং জীবনের এমন সকল ভাগ, এমন সকল ঘটনার দিক দিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন, যাহার সঙ্গে সাহিত্যের কোনো যোগ নাই।'[১৫৮] এ মন্তব্যও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। এ সম্পর্কে আর একজন বিদগ্ধ সমালোচক ডক্টর ভবতোষ দত্তের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"সত্যসত্যই বিপিনচন্দ্র জীবন ও সাহিত্যকে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলে তার প্রতিকূল সিদ্ধান্তে আসবার জন্যই বিপিনচন্দ্র এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন একথা মেনে নেওয়া শক্ত। বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধ-রচনার এটাই ছিল পদ্ধতি। 'চরিত-কথা' বইটিতে তিনি যে কয়জনের জীবনী আলোচনা করেছেন, সব কয়টিতেই তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।"[১৫৯] তবে রাজা রামমোহন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত-চিত্রে তাঁদের অপূর্ণতার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশের প্রবণতা অনুপস্থিত। সম্ভবত, এঁরা দুজন ছিলেন তাঁর কাছে শুধু আলোচ্য নয় আরাধ্যও বটে।

সত্যই বিপিনচন্দ্র ব্যক্তিগত আক্রোশ পোষণের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তো বটেই। তাঁর 'বিলাতে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধটি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে।[১৬০] রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বারের জন্য বিলাত যাত্রা করেন ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে প্রায় পাঁচ মাস যাবৎ লণ্ডনে বাস করবার পর ঐ বছরের ২৮শে অক্টোবর তিনি পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকায় যান। প্রায় ছয় মাস মার্কিন দেশে বাস করবার পর তিনি আবার লণ্ডনে ফিরে আসেন। এই প্রবাসকালে

রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং সেগুলি পাশ্চাত্য সাহিত্যরসিকদের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষত তাঁর ইংরেজী গীতাঞ্জলির (সঙ্‌ অফারিংস্) প্রকাশ তাঁকে পাশ্চাত্য কাব্যানুরাগীমহলে বিশেষ খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তখনও অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার জয় করেননি। এইরকম সময় বিপিনচন্দ্রের উপরি-উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বঙ্কিমচন্দ্রের পর যুগপ্রবর্তক সাহিত্য-রথী বলে অভিহিত করেন এবং পাশ্চাত্যজগতে রবীন্দ্রনাথের সদ্য যশোলাভে উল্লাস প্রকাশ করে বলেন—'বিলাতে যাইয়াও রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশেরই সেবা করিতেছেন, তাঁর এই সদ্যোলব্ধ যশের দ্বারা…যে আমাদেরই মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন,…ইহা অস্বীকার করা যায় কি? এই দিক দিয়া স্বদেশের এমন সেবা এ পর্যন্ত আর কোনও বাঙালী বা ভারতবাসী করেন নাই বা করিতে পারেন নাই।'

বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনায় রাজা রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্বামী বিবেকানন্দের অপরিমেয় অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এই তিনজনের প্রভাব স্বদেশেই অনুভূত হয়েছে বেশী। স্বামীজীর তেজে, সাহসে, স্পর্ধায় ভারতবাসীর আত্মচৈতন্য যে পরিমাণে জাগ্রত হয়েছে সে পরিমাণে বিদেশীসমাজে ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিপিনচন্দ্রের মতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভারতবাসী যিনি ওই কাজে সাফল্য লাভ করেছেন। তিনি মনে করেন—'রবীন্দ্রনাথই বোধহয় সর্বপ্রথম ইংরেজের প্রাণে আমাদের সভ্যতার ও সাধনার, ভাষার ও সাহিত্যের রস আস্বাদনের লোভটা জাগাইয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবাস-যজ্ঞের ইহাই সকলের চাইতে বড় কথা ও বড়ো ফল।'

সুতরাং রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় বিপিনচন্দ্র যে কেবল 'বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা মহৎ বিষয় ও বস্তুকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন'—রবীন্দ্র-জীবনীকারের এই অভিযোগ পর্যাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত নয়। কোলরিজ বলেছেন যে, সৎ চরিতকারের কর্তব্য হচ্ছে নির্বাচিত নায়কের মহত্ত্ব চিত্রণের পাশাপাশি তাঁর মুখ্য অপূর্ণতাসমূহকেও চিত্রিত করা।[১৬১] সুতরাং চরিত-চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র যদি নিজের বিবেচনানুসারে কারও কোনো অপূর্ণতার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ

করে থাকেন, তা'হলে তিনি কোলরিজের সূত্রানুযায়ী সংচরিতকারের কর্তব্যই পালন করেছেন বলতে হয়।

বিপিনচন্দ্রের চরিত-সাহিত্য-রচনার রীতিতে কোন্ পাশ্চাত্য চরিতকারের (বায়োগ্রাফার) রচনাদর্শের অনুসরণ সর্বাধিক তা' নির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। বিপিনচন্দ্র কার্লাইলের 'হিরোজ য়্যাণ্ড হিরো ওয়ারশিপ' (১৮৪৩) এবং এমার্সনের 'রিপ্রেজেণ্টেটিভ মেন' (১৮৫০)-এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন জানা যায়। এমার্সনের প্রবন্ধাবলীর তিনি যে বিশেষ ভক্ত ছিলেন, সে-কথা ইংরেজী আত্মজীবনীতে তিনি উল্লেখ করে গেছেন। সুতরাং তাঁর চিন্তা ও রচনাধারায় কোথাও কোথাও এমার্সনের প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক নয়।

এমার্সন কার্লাইলের ভাব-শিষ্য হলেও জীবনী-রচনায় উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পার্থক্য ছিল—একথা সুবিদিত। এমার্সনের ধারণা ছিল গণতান্ত্রিক আর কার্লাইলের ধারণা কর্তৃত্বপ্রধান।[১৬২] বিপিনচন্দ্র এমার্সনের মতোই বিশ্বাস করতেন যে মহৎ ব্যক্তির কাজই হচ্ছে অপরকে মহত্ত্বে উদ্বুদ্ধ করে তোলা; কার্লাইলের নায়কদের মতো শুধু অনুগামী মূঢ় জনতার পথপ্রদর্শক হওয়া নয়। এমার্সনের মহৎ ব্যক্তিগণ যেমন অপেক্ষাকৃত কম দেবতাসদৃশ, কম প্রপীড়ক এবং কখনই পূজা পাবার যোগ্য নন, বিপিনচন্দ্র যাঁদের চরিত-চিত্র অঙ্কন করেছেন, তাঁরাও অনেকটা সেইভাবেই চিত্রিত হয়েছেন।[১৬৩]

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত লিটন স্ট্র্যাচির 'এমিনেণ্ট ভিক্টোরিয়ানস্' গ্রন্থখানি চরিত-সাহিত্যে একখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় স্ট্র্যাচি প্রাজ্ঞোক্তি উদ্ধার করে বলেছেন যে তিনি কিছু আরোপ করবেন না, কিছু প্রস্তাব করবেন না, তিনি শুধু প্রকাশ করে যাবেন।[১৬৪] কিন্তু রচনার মধ্যে তাঁর এই প্রতিজ্ঞা পালিত হয়নি। ভিক্টোরীয় যুগের গণমান্যদের হেয় প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যেই যেন তাঁর লেখনী নিয়োজিত হয়েছে। স্ট্র্যাচির গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বেই বিপিনচন্দ্রের অধিকাংশ চরিত-চিত্র প্রকাশিত হয়। সুতরাং চরিত-সাহিত্য রচনা-রীতিতে বিপিনচন্দ্রের পক্ষে স্ট্র্যাচির অনুসরণের প্রশ্ন ওঠে না। তা' ছাড়া স্ট্র্যাচির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির মিল নেই। তা' সত্ত্বেও মনে হয়, বিপিনচন্দ্রের অনেকগুলি চরিত-চিত্রে 'আরোপ না করে, প্রস্তাব না করে, প্রকাশ করে যাওয়ার' রীতিই যেন অনেকটা অনুসৃত হয়েছে।

স্ট্র্যাচির গ্রন্থের সঙ্গে এই রহস্যময় সাদৃশ্যটুকু যে কোনো পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিপিনচন্দ্রের প্রচলিত ইংরেজী 'ক্যারেক্টার স্কেচেস্' গ্রন্থে যে পনেরটি চরিত-চিত্র (আঠারোটি রচনায় অঙ্কিত) রয়েছে, সেগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্তর একটি চিত্র, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের চরিত-চিত্র ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে রচিত। বিপিনচন্দ্র তখন বিলাতে। এই পাঁচটি চরিত-চিত্র অন্যান্য বিষয়ক কয়েকটি রচনার সঙ্গে একত্রিত হয়ে 'দি স্পিরিট অব্ ইণ্ডিয়ান ন্যাশলাজিম' নামে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভূমিকা রচনা করে দিয়েছিলেন বিলাতের বিশ্ববিশ্রুত পত্রিকা 'রিভিউ অব্ রিভিউজ'-এর স্বনামখ্যাত সম্পাদক উইলিয়াম টি. স্টেড।[১৬৫] সুতরাং বিপিনচন্দ্রের এই পুস্তক ইংরেজ পাঠকমহলে যথাযোগ্য প্রচার লাভ করেছিল এটা স্বচ্ছন্দেই অনুমান করা চলে। এ ছাড়া ইংরেজীতে লেখা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৩), সিস্টার নিবেদিতা (১৯১৪), তারকনাথ পালিত (১৯১৪) এবং মিসেস্ য়্যানি বেসাণ্টের (১৯১৭) চরিত-চিত্রগুলিও স্ট্র্যাচির 'এমিনেণ্ট ভিক্টোরিয়ানস্' প্রকাশের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। তা' হলে লিটন স্ট্র্যাচি-ই কি বিপিনচন্দ্রের চরিত-চিত্র রচনারীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন?

পরিচারিকায় নোয়েল য়্যানান লিখেছেন যে 'এমিনেণ্ট ভিক্টোরিয়ানস্' গ্রন্থখানি না ইতিহাস, না জীবনী। এখানি তর্কমূলক রচনা।[১৬৬] বিপিনচন্দ্রের চরিত-চিত্রগুলিও অনুরূপ তর্কমূলক রচনা।

'চরিত-চিত্র' গ্রন্থের প্রথম দু'টি রচনা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত-বিষয়ক, শেষ রচনাটি রবীন্দ্রনাথের। ধারাবাহিকভাবে রচনা ক'টি পাঠ করলে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনধারার একটি সর্বাঙ্গীণ চিত্র চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ এই রচনাগুলিকে ঠিক ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। আবার প্রত্যেক রচনাই জীবনীবিষয়ক হলেও, কোনো রচনাতেই কারও জীবনালেখ্য পূর্ণ প্রভায় ভাস্বর হয়ে ওঠেনি। এক-একজন ব্যক্তি-পুরুষের জীবন-কথা কেন্দ্র করে যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করে তিনি নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত

হয়েছেন। অথচ কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করবার সজ্ঞান সঙ্কল্প তার অন্তরে অনুপস্থিত। সুতরাং সামগ্রিক বিচারে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে ওঠে যে চরিত-সাহিত্য রচনায় তিনি বিশেষ কোনো চরিতকারের রচনাদর্শই অনুসরণ করেন নি। তিনি নিজের ধ্যানধারণা প্রকাশের উপযোগী একটা রীতি নিজেই গড়ে তুলেছেন। সে রীতি অনেকাংশে কোলরিজের পূর্বোক্ত সূত্রের অনুসারী।

'ব্রাহ্মসমাজ ও রাজা রামমোহন' এবং 'রামমোহন ও ব্রহ্মসভা' শীর্ষক রচনা দু'টিতে বিপিনচন্দ্র রামমোহনকে 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করে বলেছেন যে, রাজা ধর্মপ্রবর্তক নন, তিনি একজন ধর্মব্যাখ্যাতা মাত্র। সনাতন ধর্মকে যুগ যুগ বাহিত সংস্কারের ভস্মাচ্ছাদন থেকে মুক্ত করে তিনি তার যুগোচিত বহির্মূর্তিকে উদ্ঘাটিত করে গেছেন। বিপিনচন্দ্রের মতে রাজা রামমোহন '...হিন্দুধর্মের সনাতন সার্বভৌমিকতাকে আকারিত করিয়াই যেন সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল মতবাদীর ও সকল সাধনাবলম্বীর একটা সাধারণ সম্মেলন-ভূমিরূপে ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন'। তাঁর মতে রাজা সত্য নির্ণয়ে ইউরোপীয় যুক্তিবাদীদের মতো একমাত্র স্বাভিমতের উপর নির্ভর না করে শাস্ত্র, গুরু এবং স্বাভিমতের সমন্বিত শক্তির উপর নির্ভর করেছেন। পরবর্তী ব্রাহ্মগণ একমাত্র স্বাভিমতকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করে রামমোহন-প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হন। রাজা সমস্ত বিষয়েই সময়োপযোগী সংস্কার এবং পুনর্গঠনের পক্ষপাতী হলেও বিপিনচন্দ্রের ধারণায় সঙ্গতিবিধান ও সমন্বয়-সাধনের প্রয়াসই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সমন্বয়ের সাধনা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান যুগ-লক্ষণ আর রামমোহন ছিলেন এর আদি প্রবর্তক।

'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক চরিতালেখ্যটি দু'টি অংশে বিভক্ত। বঙ্কিমের চরিতালেখ্য রচনার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথম অংশে তিনি বলেছেন—'বাংলার লক্ষ লক্ষ লোকে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকেই কেবল একটু-আধটু চেনে, মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে চেনে না। অথচ সেটিকে না চিনিলে, তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির নিগূঢ় এবং যথার্থ মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এইজন্যই সাহিত্য-সমালোচনায় সাহিত্যিকদের খাঁটি চরিত্রটি যথাসম্ভব জানা ও ধরা এত আবশ্যক।' এর পর তিনি জীবনের সঙ্গে সাহিত্য কেমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, তা' বিশ্লেষণ করে বঙ্কিম-চরিতের উপাদানের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে আত্ম-

প্রত্যয় বঙ্কিম-চরিতের অন্যতম বিশিষ্ট উপাদান। কারণ, অলৌকিক প্রতিভায় একটা 'আত্মসম্ভাবিত ভাব' সর্বদাই থাকে। কিন্তু তা' আত্মশ্লাঘা নয়, আত্ম-প্রত্যয়। 'এই একান্ত নির্ভরটুকু, আপনার শক্তিতে এই অটল আস্থাটুকু যাঁহার নাই, তাঁহার কোনও প্রতিভা আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।'

প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে তিনি ক্ষেত্র-বীজ তত্ত্বের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশের ধারাটি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে 'ক্ষেত্র' হচ্ছে—সমকালীন সমাজেতিহাসের ভূমি যাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা এনভাইরনমেণ্ট বলা যেতে পারে, আর 'বীজ' হচ্ছে বংশগতি বা হেরিডিটি। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'আধুনিক অভিব্যক্তি-তত্ত্বে বা ইভলিউশনে এই হেরিডিটি ও এনভাইরনমেণ্ট দুইটিই মূল তত্ত্ব।' এই তত্ত্বের আলোকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা-দীক্ষা, তাঁর সাহিত্য-সাধনার নিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে বঙ্কিম-মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল—আত্তীকরণ-শক্তি। বিপিন-চন্দ্র বলেছেন—'অধীত বিদ্যাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। পরের বস্তু তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই হইয়া, তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাঁর নিজের মোহরাঙ্কিত হইয়া সঞ্চিত হইত।' জীবদেহ যেমন আপন পুষ্টির জন্য বাইরের খাদ্যগ্রহণের পর প্রয়োজনীয় অংশ নিজের অঙ্গীভূত করে নিষ্প্রয়োজনীয়কে বর্জন করে, বঙ্কিম-মানসও এইভাবে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে আপন স্বাস্থ্য রক্ষা করে চলেছে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের চরিত-চিত্র আলোচ্যমান গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণপ্রসূত নবীন ভাবধারার সাধনায় সুরেন্দ্রনাথের স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'এই নূতন সাধনার প্রথম যুগের প্রধান দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু তিনজন,—রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ'। বিপিনচন্দ্রের মতে '…কেশবচন্দ্র ধর্মসাধনে ও সমাজ-শাসনে যে ব্যক্তিগত অনধীনতার আদর্শকে জাগাইয়া তুলিয়া দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নূতন শক্তির সঞ্চার করেন, সুরেন্দ্রনাথ সেই আদর্শকে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া আপনার অনন্যপ্রতিযোগী ঐতিহাসিক কীর্তি অর্জন করিয়াছেন।'

এই প্রবন্ধে 'আধুনিক ভারতের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার' অংশে বিপিনচন্দ্র 'নেতি'র ভিতর দিয়ে 'ইতি'তে পৌছাবার যে প্রাচীন বেদান্তবিহিত

'ব্যতিরেক-অন্বয়' পন্থার উল্লেখ করেছেন, সেই পন্থা অনুসরণ করেই তিনি সুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করেছেন।

সুরেন্দ্র-চরিত্রের নেতিবাচক দিক উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'সুরেন্দ্রনাথের প্রাণের টানটা পুরাদমেই স্বদেশাভিমুখী হইলেও তাঁর মত, প্রকৃতি এবং ভিতরকার ভাব ও আদর্শ যে সত্যই স্বদেশী, এমন বলা যায় না। শুদ্ধ সাত্ত্বিকী প্রকৃতিই আমাদের স্বদেশী চরিত্রের চিরন্তন আদর্শ।' কিন্তু তাঁর ধারণা—সুরেন্দ্রনাথের অন্তঃপ্রকৃতি খুব সাত্ত্বিক ছিল না। তিনি বলেন যে নির্মলত্ব, ভাস্বরত্ব এবং অনাময়ত্ব হচ্ছে সাত্ত্বিকতার প্রধান লক্ষণ; আর লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, অশম ও স্পৃহা হলো রাজসিকতার প্রধান লক্ষণ। সুরেন্দ্র-নাথের প্রকৃতির মধ্যে রজোপ্রাধান্যই প্রমাণিত হয়। তাই তাঁর মতে—'এই রাজসিকতাই সুরেন্দ্রনাথের জীবনের ও চরিত্রের একদিকে বলের ও অন্যদিকে দুর্বলতার হেতু হইয়া আছে।'

বাগ্মীরূপে সুরেন্দ্রনাথের খ্যাতি সুবিদিত। কিন্তু সে বাগ্মিতা উচ্চাঙ্গের কিনা—এ সম্পর্কে তিনি সংশয় উত্থাপন করে বলেন—'সুললিত শব্দযোজনায় সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা যে অনন্যসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছে, চিন্তার গভীরতায় কিংবা ভাবের মৌলিকতায় অথবা যুক্তি-পরম্পরা-প্রয়োগে কোনো সিদ্ধান্ত বিশেষের প্রতিষ্ঠার নিপুণতায় সেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে নাই। সুরেন্দ্র-নাথের বাগ্মিতা বহুল পরিমাণে ধ্বন্যাত্মক।'

সুরেন্দ্র-চরিত্রের নেতিবাচক দিক স্পষ্ট করতে গিয়ে সমকালীন মনীষীদের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের তুলনা করে তিনি আরও বলেন যে কৃষ্ণদাসের মতো রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি, কিংবা রাজেন্দ্রলালের মতো পাণ্ডিত্য অথবা শিশিরকুমারের প্রতিভা—কোনোটাই সুরেন্দ্রনাথের ছিল না। অথচ আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথ যে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছেন, পূর্বোক্তদের মধ্যে কেউ তা' অর্জন করতে পারেন নি। তাঁর মতে এর কারণ হলো সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষকারের সঙ্গে দৈবের অনুকূল যোগাযোগ। তাঁর সমসাময়িক বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী অন্য কোনো জননায়কের ভাগ্যে তা' ঘটেনি। দৈবের আনুকূল্য ব্যতীত পুরুষকারের সম্যক্ স্ফুরণ যে সম্ভব নয় তা' প্রমাণের জন্য তিনি পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে তিনি বলেছেন যে নেপোলিয়নের অসাধারণ পুরুষকার লোক-প্রসিদ্ধ। কিন্তু ফরাসী-

বিপ্লবের তরঙ্গ-মুখে না পড়লে সে পুরুষকার সম্যক্‌ভাবে স্ফুরণ ও চরিতার্থতা-লাভে সমর্থ হতো কিনা সন্দেহ।

সুরেন্দ্রনাথ যে আজীবন ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির চিরাভ্যস্ত পথেই পদচারণা করেছেন, নিজেদের সভ্যতা ও সাধনানুযায়ী নতুন পথের প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি, তার কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—'সুরেন্দ্রনাথের অলোক-সামান্য মেধা আছে, কিন্তু চিন্তার মৌলিকতা নাই'।

বিপিনচন্দ্রের মতে সুরেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে—আধুনিক যুগের রাষ্ট্রীয় চিন্তায় ও কর্মে সর্বভারতীয় ভাবের সঞ্চার। তাঁর প্রেরণা ও উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত 'ভারত সভা' বা ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশন 'সর্বপ্রথমে এই প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম ও চিন্তাকে একসূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করে'। বিপিনচন্দ্র একথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে স্বাদেশিকতা-উন্মেষের সেই উষা-লগ্নে সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মী-প্রতিভাই নব্যশিক্ষিত তরুণদের চিত্তে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। তিনিই গ্যারিবল্ডির স্বদেশ-উদ্ধারচেষ্টা, ইয়ং ইতালী এবং নব্য আয়ার্ল্যাণ্ডের আত্মোৎ-সর্গপূর্ণ দেশচর্যার কাহিনী ওজস্বিনী ভাষায় প্রচার করে যুবকদের মনে স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে তোলেন।

কর্মযোগে সুরেন্দ্রনাথের অসামান্য সিদ্ধিলাভের নিগূঢ় কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'যে নিগূঢ় কৌশল-সহায়ে জীব বিবিধ বিরোধী অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়াও প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মানুযায়ী আত্মরক্ষায় ও আত্মচরিতার্থতালাভে সমর্থ হয়, সুরেন্দ্রনাথ অতি আশ্চর্যরূপে সে কৌশলটি লাভ করিয়াছেন। এই কৌশলটি যে জীব লাভ করিতে পারে, সেই কেবল বিশ্বব্যাপী নির্মম জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে। এই কুশলতাগুণেই সুরেন্দ্রনাথও জীবন-সংগ্রামের জয়টীকা ললাটে ধারণ করিয়া ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে আপনার অক্ষয় কীর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন'। এইগুলিই বিপিনচন্দ্রের মতে সুরেন্দ্র-চরিত্রের ইতিবাচক দিক।

'চরিত-চিত্র' গ্রন্থে বিধৃত 'অশ্বিনীকুমার দত্ত' শীর্ষক রচনায় বিপিনচন্দ্র অশ্বিনীকুমারকে 'লোকনায়ক' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। কিন্তু এখানেও তিনি একই পন্থা অনুসরণ করেছেন। প্রথমেই তিনি নেতিবাচক ভাষায়

বলেছেন—'অশ্বিনীকুমার শিক্ষিত, কিন্তু কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন ; সদ্বক্তা কিন্তু দৈবী-প্রতিভাসম্পন্ন বাগ্মী নহেন।...তিনি সাহিত্যিক,...কিন্তু যে সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা সমাজে নূতন আদর্শ ও নূতন উৎসাহ ফুটিয়া উঠে, সে সৃষ্টি-শক্তি তাঁর নাই। তিনি দরিদ্র নহেন,...কিন্তু যতটা ধনের অধিকারী হইলে সেই ধনের শক্তিতে সমাজপতি হইয়া উঠে, অশ্বিনীকুমারের সে বিভব নাই। যে গুণ থাকিলে, যে কর্ম ও কৃতিত্বের বলে সচরাচর আমাদের মধ্যে লোক-নেতৃত্ব লাভ হয়, অশ্বিনীকুমার তার কিছুই দাবি করিতে পারেন না'। কিন্তু তারপরেই ইতিবাচক সিদ্ধান্ত উচ্চারণ করে বলেছেন—'তথাপি, তাঁর মতন এমন সত্য ও সাচ্চা লোকনায়ক বাংলার প্রসিদ্ধ কর্মিগণের মধ্যে আর একজনও আছেন বলিয়া জানি না'। বিপিনচন্দ্রের মতে অশ্বিনীকুমারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে—তাঁর চরিত্র ও শিক্ষা। স্বদেশী যে পূর্ববঙ্গে এতটা প্রসার লাভ করেছিল, তার মূলে অশ্বিনীকুমারের অবদান সর্বাধিক। বিপিনচন্দ্র বলেন—'অশ্বিনীকুমারের মৌলিক উদ্ভাবনী-শক্তি নাই। কোন একটা সর্বাঙ্গসম্পন্ন সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁর নাই। সেইজন্য এ পর্যন্ত তিনি তাঁহার চরিত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যভাবের একটা যথাযথ সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই।' কিন্তু তাতে অশ্বিনীকুমারের চরিত্র-বল বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। বিপিনচন্দ্রের মতে বৈষ্ণব ভাবের ভাবুক অশ্বিনীকুমার নর-সেবার যে অকপট আদর্শ অন্তরে নিয়ে নিঃস্বার্থ জনসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তা'ই তাঁকে লোকনায়ক বা জননায়কের স্বর্ণ-সিংহাসনে অক্ষয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। বিপিনচন্দ্র বলেন—'অগাধ অর্থ দিয়া নহে, বাগ্মিতার মোহিনী-শক্তিবলে নহে, জ্ঞানগরিমার প্রভাবেও নহে, কিন্তু জনসাধারণের সহিত চিন্তায়, ভাবে ও কার্যে সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়াই যথার্থ জননায়কের বিশেষত্ব। আমরা এদেশে অধুনা একমাত্র অশ্বিনীকুমার দত্তেই এই লোকনেতৃত্বের কতকটা আভাস পাই'।

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত 'চরিতচিত্র' গ্রন্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। আচার্য শিবনাথের উদ্যোগে স্থাপিত ক্ষুদ্র সাধকদলে দীক্ষিত হয়েই বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেছিলেন। সেদিক থেকে দেখলে শিবনাথ ছিলেন তাঁর গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। কিন্তু তা' সত্ত্বেও তাঁর চরিত-চিত্রে বিপিনচন্দ্র তাঁর মহত্ত্ব পরিস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যর্থতা ও অপূর্ণতার

দিকেও অঙ্গুলি-নির্দেশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। প্রায় অর্ধশত পৃষ্ঠাব্যাপী এই প্রবন্ধের অধিকাংশই অবশ্য তিনি ব্যয় করেছেন রামমোহন থেকে শিবনাথ পর্যন্ত ব্রাহ্ম আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতির সুনিপুণ বিশ্লেষণে। তারই ফাঁকে ফাঁকে শিবনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি শিবনাথ-চরিত্রের একটি রেখা-চিত্র পরিস্ফুট করে তুলেছেন।

আদি, ভারতবর্ষীয় এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিন প্রধান ছিলেন যথাক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। বিপিনচন্দ্রের মতে, শিবনাথ শাস্ত্রীর যে কেবল মহর্ষির সাধননিষ্ঠা বা কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভা ছিল না, তা'ই নয়। তিনি বলেন—'মহর্ষির ধন, কেশবচন্দ্রের বংশমর্যাদা—এ সকলের কিছু তাঁর ছিল না। আর এ সকল ছিল না বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজের বিকাশসাধনে মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র যে কাজটি করিতে পারেন নাই, শিবনাথ শাস্ত্রী তাহা করিয়াছেন'। বিপিনচন্দ্রের মতে, ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের ফলে, আধুনিক ইউরোপীয় সাধনার প্রেরণায় নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে অনধীনতার ভাব জাগ্রত হয়, তা' ব্রাহ্মসমাজকেই সর্বাপেক্ষা বেশী অধিকার করেছিল। মহর্ষি এই ভাবকে যতটা অবলম্বন করেন, কেশবচন্দ্র তার চেয়ে বেশী করেছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবন আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনধীনতা-প্রবৃত্তির সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পেরে উঠল না। এই অবস্থায় শিবনাথের নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অপূর্ণতা পূরণের জন্য অগ্রণী হলো। ব্রাহ্ম-আন্দোলনে এটাই হচ্ছে শিবনাথের শ্রেষ্ঠ অবদান। শিবনাথই ব্রাহ্ম-আন্দোলনকে একটা গণতান্ত্রিক রূপদানের চেষ্টা করেন।

বিপিনচন্দ্রের মতে, শিবনাথের পিতার মতো শিবনাথের নিজের চরিত্রও প্রখর ধীশক্তি এবং উচ্ছ্বসিত রসিকতা—এই দু'য়ের সমবায়ে গঠিত ছিল। তা' ছাড়া তিনি ছিলেন কবি। বিপিনচন্দ্রের ভাষায় '...তাঁর আপনার স্বরূপে শিবনাথ তত্ত্বজ্ঞানী নহেন, ভগবদ্‌ভক্ত নহেন, চিন্তাশীল দার্শনিক নহেন, মুমুক্ষু সাধকও নহেন, কিন্তু অসাধারণ শব্দসম্পদশালী সাহিত্যিক ও সুরসিক কবি'। তাঁর মধ্যে ধর্মানুরাগ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ধর্মানুরাগের নেপথ্যে কোনো স্বাভাবিক আস্তিক্য বুদ্ধি ছিল না। শিবনাথের ধর্মানুরাগ ছিল লোকহিতেচ্ছা ও লোকসেবার বাসনা-প্রণোদিত। এই স্বভাবসিদ্ধ বাসনা-বলেই তিনি সাধক-

দল গঠন করেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করেন। কিন্তু বিপিনচন্দ্র বলেন—'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের পূর্বে শিবনাথ শাস্ত্রী যে বিশ্বস্ততাসহকারে আপনার নিজস্ব প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন, এই নূতন সমাজের নেতৃপদের গুরু দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়া ক্রমে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আর এইজন্যই, ভয়াবহ পরধর্মের চাপে, আপনার অন্তঃপ্রকৃতিকে অযথা নিপীড়িত করিবার চেষ্টা করিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী নিজের জীবনেরও সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই, আর তাঁহার সমাজকেও আত্মচরিতার্থতালাভে সাহায্য করিতে পারেন নাই'।

অন্যান্য জীবনচরিতরচনার ক্ষেত্রেও বিপিনচন্দ্র একই রীতি অবলম্বন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জীবনচরিতরচনার ক্ষেত্রে অবিমিশ্রভাবে গুণকীর্তনের পরিবর্তে গুণোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দোষোদ্ঘাটনের এই যে রীতি, কোনো সৎজীবনীকারের পক্ষে এই রীতি অবলম্বন, নিরপেক্ষ, বিচারে কখনই নিন্দনীয় হতে পারে না। কিন্তু সামাজিক সম্পর্কে রক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সময় এই রীতি ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। কারণ, অপরের দৃষ্টির দর্পণে আপন অপূর্ণতা দর্শন অনেকের পক্ষেই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। শুধু রাজনৈতিক জীবনে নয়, সামাজিক জীবনেও যে বিপিনচন্দ্র মিত্র-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তার একটি সম্ভাব্য কারণ—তার্কিকতার অতিরেক এবং মুখাপেক্ষা-হীন সত্যভাষণের প্রবণতা।

'স্যার সৈয়দ আহাম্মদ' শীর্ষক চরিত্র-চিত্রটি একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পর এই রচনাটি সচিত্র কিশোর মাসিক পত্র 'মুকুল'-এ (বৈশাখ, ১৩০৫) প্রকাশিত হয়। সুতরাং এটি কিশোর পাঠ্যরচনা এবং সেইজন্য রচনার দিক থেকে স্বাভাবিক রীতির ব্যতিক্রম।

এই রচনায় বিপিনচন্দ্র স্যার সৈয়দের অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'দু'টি বস্তু থাকিলে মানুষ এ জগতে প্রকৃত বড় হইতে পারে। একটি সত্যবাদিতা ও অপর সংযম। সৈয়দ বাল্যকাল হইতেই সত্যবাদী ও সুসংযত ছিলেন।' তারপর স্যার সৈয়দের পরোপকার-প্রবৃত্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন—'সমস্ত জীবন পরের উপকার করিতে গিয়া তাঁহাকে কত নিন্দা, কত অপমান, কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই সকলের প্রতি কখনও

ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, বাল্যকাল হইতে তিনি সত্য সাধন করিয়াছিলেন'। স্যার সৈয়দের উদারতা, স্বসমাজের উন্নতিবিধানের জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে উপসংহারে তিনি মন্তব্য করেছেন—'তাঁহার মৃত্যুতে কেবল মুসলমানসম্প্রদায়ের নহে, কিন্তু হিন্দুগণও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, মনে করিতেছি'।

স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বিপিনচন্দ্র-রচিত তিনখানি জীবনীগ্রন্থের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। 'ভারতেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্রে (টাইটেল পেজ) লেখকের নাম ছিল না। বিপিনচন্দ্র তাঁর ইংরেজী আত্মজীবনীতে এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করেছেন।[১৬৭]

'ভারতেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া' অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ২৭৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। অধ্যায়গুলির নাম যথাক্রমে: সূচনা, জন্ম ও শৈশবজীবন, সিংহাসন-প্রান্তে, নবীনা মহারানী, অর্ধশতাব্দীর পূর্বে ইংলণ্ড, রাজত্বের প্রথম বৎসর, অভিষেক, শয়নাগার ষড়যন্ত্র, প্রণয় ও পরিণয়, বৈবাহিক জীবন, মন্ত্রী-পরিবর্তন, পারিবারিক সুখ ও রাজকীয় অশান্তি, আন্তর্জাতীয় প্রদর্শনী, বৈবাহিক জীবনের শেষভাগ, ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহ, মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে, আদর্শ জননী এবং আধুনিক ঘটনা।

অধ্যায়গুলির নামকরণের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে, এই চরিতাখ্যানগ্রন্থে বিপিনচন্দ্র যেমন একদিকে ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনীর অংশবিশেষের আলোচনা করেছেন, অন্যদিকে তেমন সমকালীন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পটভূমিকায় মহারানীরূপে ভিক্টোরিয়ার দক্ষতার এবং গুণাবলীরও আলোচনা করেছেন। তবে যে দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এই চরিতাখ্যান রচনায় অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন, তা' তিনি এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সূচনা-অংশে পরিস্ফুট করেছেন। তিনি বলেছেন—'রমণী-চরিতের মাধুর্য ভারতক্ষেত্রে চিরবিকশিত। নারীপূজা ভারতের প্রাচীন ধর্ম। শক্তিরূপে ভগবতী, সতীরূপে সীতা, সাবিত্রী ভারতের চিরারাধ্যা দেবতা। নারী-চরিতের পরম মাধুর্যে বিমোহিত হওয়া কবিত্বপ্রধান ভারতবাসীর পৈতৃক প্রকৃতি। মহারানী ভিক্টোরিয়া আদর্শ রমণী। তাঁহার রমণীজনোচিত চরিত্র-প্রভাবে আজ ইংরাজ রমণী-সমাজের মুখোজ্জ্বল। তাঁহার সরল ভক্তি-মাধুর্যে ইংরাজ

ধার্মিকসমাজ আজ বিমোহিত। কন্যারূপে তিনি দুহিতৃকুলের শিরোভূষণ; পত্নীরূপে তিনি একাগ্রমনা পতিপরায়ণতার পরম দৃষ্টান্তস্থল; বৈধব্যে তিনি প্রকৃত ব্রহ্মচর্যের পবিত্র আদর্শ; এবং জননীরূপে তিনি মাতৃসমাজের শিরোমণি। এই রমণীশিরোমণির সুমধুর চরিতের আদর ভারতবাসী না করিলে আর কে করিবে?'[১৬৮]

সতের বছরের মধ্যে গ্রন্থখানির তিনটি সংস্করণের প্রকাশ দেখে মনে হয় গ্রন্থখানি সমকালীন বাঙালী পাঠক-পাঠিকাসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল।

'সখা-সম্পাদক স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন' নামীয় গ্রন্থখানির আখ্যা-পত্রেও লেখকের নাম নেই। ইংরেজী আত্মজীবনীতে বিপিনচন্দ্র এই গ্রন্থরচনার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত উল্লেখ করেছেন।[১৬৯]

গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের প্রথমা পত্নী নৃত্যকালী দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।[১৭০] 'সখা' ছিল একখানি মাসিক কিশোর পত্রিকা। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১লা জানুয়ারি, ১৮৮৩।

প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম তারিখে 'সখা'র এক-একটি সংখ্যা প্রকাশিত হতো। 'সখা'র কার্যালয় ছিল ৩নং বেনেটোলা লেনে। 'সখা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন প্রমদাচরণ সেন।

আলোচ্যমান গ্রন্থখানি দ্বাদশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলির নাম যথাক্রমে : জন্ম ও শৈশবজীবন, শৈশব-শিক্ষা, কলিকাতার প্রথম শিক্ষা, কলেজ-শিক্ষা, ধর্মজীবনের সূত্রপাত, আত্ম-সমর্থন, সংসার-প্রবেশ, ব্রাহ্মসমাজে ঘনিষ্ঠতা, ইংলণ্ডে যাইবার চেষ্টা, সখার জন্ম, রোগশয্যা ও মৃত্যু, শেষ কথা।

প্রমদাচরণের পিতা তারিণীচরণ সেন ছিলেন কলকাতার অন্তর্গত ইণ্টালী থানার পুলিস-অফিসার। ইণ্টালী অঞ্চলে পিতার বাসাবাড়িতেই ১২৬৬ বঙ্গাব্দের ৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রমদাচরণের জন্ম হয়। এঁদের পৈতৃক ভদ্রাসন ছিল তদানীন্তন যশোহর জেলার (পরে খুলনা) অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামে।

বিপিনচন্দ্রের মতো প্রমদাচরণও তরুণ বয়সে ব্রাহ্ম-ধর্মচিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এর জন্য বিপিনচন্দ্রের মতো প্রমদাচরণেরও পিতার সঙ্গে ঘোর অসদ্ভাবের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত পিতা অবাধ্য পুত্রকে বিতাড়িত করেন এবং চিরদিনের জন্য পিতৃগৃহের দ্বার প্রমদাচরণের কাছে রুদ্ধ হয়ে যায়।

বিপিনচন্দ্রের মতো প্রমদাচরণও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু অনিবার্যভাবে তাঁর উচ্চশিক্ষালাভ বিঘ্নিত হয়। কিন্তু এল. এ. পাস না হওয়া সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্রের মতোই মাত্র বিশ বছর বয়সে প্রমদাচরণ চব্বিশপরগনার অন্তর্গত নকীপুর গ্রামের সরকারী-সাহায্য-প্রাপ্ত উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। অবশ্য কিছুকাল পরে তিনি কলকাতায় ফিরে এসে সিটি স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং সেখানেই বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। এই পদের বেতন ছিল তখন মাসিক ছাব্বিশ টাকা।

এই স্বল্প আয় সম্বল করে কী কঠোরভাবে কৃচ্ছ্রতাসাধন করে তিনি 'সখা' পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা করেন, তার সুন্দর বৃত্তান্ত এই চরিতাখ্যানগ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে প্রমদাচরণের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুন, রবিবার বেলা ৯টায় খুলনা শহরে অগ্রজের বাসাবাড়িতে প্রমদাচরণ অকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়—'ফুটিতে না ফুটিতে প্রমদাচরণের জীবনকুসুম ঝরিয়া পড়িল।'

প্রমদাচরণকে বিপিনচন্দ্র 'ফ্রেণ্ড' বা বন্ধু বলে উল্লেখ করেছেন। শুধু বন্ধু নয়, প্রমদাচরণ ছিলেন তাঁর সমধর্মা, সমসুখদুঃখভাগী 'একক্রিয় মিত্র'।

'সখা' যেমন সরকারী মহলে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল, তেমনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাণী লাভে ধন্য হয়েছিল। প্রমদাচরণের জীবনীরচনার প্রেরণা-উৎস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—'যাঁহার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাবলী অবলম্বনে এই জীবনী রচিত হইয়াছে, তাঁহার নাম ধন-সম্পত্তি, পদমর্যাদা বা অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিগুণে এ সংসারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই সত্য ; এ জগতে সচরাচর যে শ্রেণীর লোকের জীবনচরিত লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে, তিনি সেই শ্রেণীভুক্ত হইবার অবসর পান নাই সত্য ; কিন্তু মানবজীবনের সাধুতা, সদুদ্যম, কর্তব্য-নিষ্ঠা ও ধর্মানুরাগ যদি মহৎ পদার্থ হয়, এই সকল সদ্‌গুণের চিত্রে যদি মানব-সমাজের কোনও উপকার দর্শে, অসাধারণ অধ্যবসায়ের সাধু দৃষ্টান্ত যদি লোকমধ্যে প্রচারের যোগ্য হয়, তবে সখা-সম্পাদক প্রমদাচরণ সেনের জীবন-কথাও কাহারও না কাহারও উপকারে আসিতে পারে। প্রধানত এই উদ্দেশ্যে এবং এই আশায়ই আমরা এই ক্ষুদ্র জীবনী প্রচারে অগ্রসর হইলাম।'

একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই দু'খানি চরিত-গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়, তখনো বিপিনচন্দ্র চরিত-সাহিত্য রচনার একটি স্বকীয় শৈলী গড়ে তুলতে পারেন নি। এইজন্য 'চরিত-চিত্র' গ্রন্থের চরিত-কথাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্রের যে রচনারীতির কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা' এই দু'খানি জীবনী-গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

'যুগের মানুষ বিজয়কৃষ্ণ' প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর চরিতাখ্যানমূলক গ্রন্থ।[১৭১] একশ' সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই গ্রন্থখানি সাতাশটি অংশে বিভক্ত। অংশগুলির নাম যথাক্রমে : বিষয়-সূচনা, যুগধর্ম, বর্তমান যুগ ও যুগধর্ম, চিন্তার স্বাধীনতা—এই যুগের প্রথম বৈশিষ্ট্য, কর্মের স্বাধীনতা—যুগের অন্য বৈশিষ্ট্য, মানবতার আদর্শ, বিজয়কৃষ্ণের সাধনা ও যুগধর্ম, সাধনের তিন অবস্থা, জন্মকথা, বিজয়কৃষ্ণের বংশ-পরিচয়, বিজয়কৃষ্ণের স্বাভাবিক আস্তিক্য-বুদ্ধি, সংযম ও সত্যনিষ্ঠা, বেদান্ত অধ্যয়ন ও মত পরিবর্তন, বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিবাদ, মুক্তি-জিজ্ঞাসা, ব্রাহ্ম-সমাজের সন্ধান, ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ, উপবীত ত্যাগ, ডাক্তারি-শিক্ষা, সামাজিক উৎপীড়ন, প্রচার ব্রতের সূচনা, ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, বিজয়কৃষ্ণ ও ব্রাহ্ম-সমাজের সাধনভজন, ধর্ম-প্রচার ও কর্মযোগ, ধর্মপ্রচার ও ধর্মসাধন, ধর্মপ্রচারের আদর্শ এবং সত্যের সংগ্রাম।

প্রবর্ত, সাধক এবং সিদ্ধ—এই তিন নামে তিনটি খণ্ডে এই মহাপুরুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা বিপিনচন্দ্রের ছিল। কিন্তু সে-পরিকল্পনা তিনি পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। 'প্রবর্ত' অংশ নিয়ে পরিকল্পিত জীবনী-গ্রন্থের মাত্র একটি খণ্ডই তিনি রচনা করে যেতে পেরেছিলেন। সমকালীন যুগধর্মের সুবিস্তৃত মনোজ্ঞ ব্যাখ্যানের পটভূমিকায় বিজয়কৃষ্ণের জন্মকথা থেকে শুরু করে যশোহর জেলার অন্তর্গত বাগ-আঁচড়া গ্রামে তাঁর প্রথম ব্রাহ্মধর্ম-প্রচার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য-পদে তাঁর অভিষেক (১৭৮৭ শক : ১৮৬৫ খৃঃ) এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূচনা পর্যন্ত কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

'যুগের মানুষ বিজয়কৃষ্ণ' শ্রদ্ধাবান শিষ্যকর্তৃক রচিত ভক্তিভাজন দীক্ষা-গুরুর চরিতাখ্যান গ্রন্থ। অলৌকিকতার আবেশ নেই, অথচ বর্ণনায় আন্তরিক শ্রদ্ধার প্রকাশ গ্রন্থখানিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকা' গ্রন্থে বায়োগ্রাফি বা জীবনচরিতকে বিবরণমূলক রচনা বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে জীবনচরিতে ইতিহাস এবং গল্প—উভয় ধর্মই বিদ্যমান থাকে এবং জীবনচরিতকার বা বায়োগ্রাফারের একাধারে ঐতিহাসিকের মতো তথ্যনিষ্ঠা এবং ঔপন্যাসিকের মতো শিল্পরসিকতা থাকা বাঞ্ছনীয়।[১৭২] বিপিনচন্দ্র-রচিত চরিতাখ্যানগুলির মধ্যে সর্বত্রই তথ্য-নিষ্ঠা প্রবল এবং অনেকগুলি রচনার মধ্যে শিল্পরসিকতাও যে উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান—তা'ও অস্বীকার করা যায় না।

জীবনী রচনার মতো আত্মজীবনী রচনার প্রবণতাও বাংলা সাহিত্যে সুপ্রাচীন। কৃত্তিবাসের 'আত্মবিবরণ', কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর 'প্রার্থনা' ও 'গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণ' অংশে প্রদত্ত মুকুন্দরামের আত্মপরিচয়, ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি রূপরামের আত্মবিবরণী, ভারতচন্দ্রের আত্মপরিচয় প্রভৃতি মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে আত্মজীবনী-রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে বিদ্যমান।

বাংলা-ভাষায় গদ্যরীতির উদ্ভবের পর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক ধরনে আত্মজীবনী রচনার সূত্রপাত হয়। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাংলা-সাহিত্যে আধুনিক ধরনে আত্মচরিত রচয়িতাদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম'।[১৭৩] দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর তিরোধানের পর প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের স্ব-রচিত জীবনচরিত (অসম্পূর্ণ) গ্রন্থখানিও তার তিরোধানের পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র নারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রচনাকালের দিক থেকে দেবেন্দ্রনাথ এবং বিদ্যাসাগর—এঁদের মধ্যে কার আত্মচরিত প্রথম তা' অবশ্য বলা কঠিন। যাই হোক্, দেবেন্দ্রনাথ এবং বিদ্যাসাগরের পর বাংলা আত্মজীবনী-সাহিত্যের ধারায় রাজনারায়ণ বসুর 'আত্ম-চরিত' (১৯০৯), শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' (১৯১৮), রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' (১৯১২), কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত (১৯৩৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বাংলাভাষায় রচিত বিপিনচন্দ্রের 'সত্তর বৎসর' (আত্মজীবনী) বাংলা আত্মজীবনী-সাহিত্যে একটি উল্লেখ্য সংযোজন।[১৭৪] 'সত্তর বৎসর' ব্যতীত বিপিনচন্দ্র-রচিত 'সমসাময়িক কথা' এবং 'যৌবনের কথা' শীর্ষক দু'টি প্রবন্ধও আত্মস্মৃতিমূলক রচনারূপে গণ্য হবার যোগ্য।[১৭৫]

জীবনী রচনার মতো আত্মজীবনী রচনারও বিবিধ রীতি আছে। তবে রীতি ভিন্ন হলেও মৌল দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটিভাবে এক প্রকার। জীবনী ও আত্মজীবনীর মৌল পার্থক্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে বাংলা চরিত-সাহিত্যের গবেষক ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য বলেছেন—"নিজেকে নিরাসক্তভাবে দেখা, নিজের অতীতের মধ্যে ডুব দেওয়া, নিজেকে বিশ্লেষণ করা কঠিন কাজ। কাজেই আত্মদর্শন, আত্মবিচার এবং আত্মোপলব্ধি—'আত্মচরিত' রচনার সঙ্গে জড়িত। সেদিক থেকে 'আত্মচরিত' রচনার দৃষ্টি বহুলাংশে সাবজেকৃটিভ। নিজেকে দেখা ও অপরকে দেখার মধ্যে যে পার্থক্য—তার দ্বারাই উভয় পর্যায়ের গ্রন্থের মধ্যেকার ভেদ নির্ণীত হয়"। উক্তিটি যথার্থ।

কিন্তু আত্মজীবনী রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'আমার এই জীবনস্মৃতি বা আত্মচরিত যদি কেবল নিজের কথাই হইত, ইহাকে লোকসমাজে প্রচার করা সঙ্গত হইত না। আমার সত্তর বৎসরের জীবনকথা বাস্তবিক এই বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাসেরই কথা,……এই সত্তর বৎসরে বাংলাদেশের চিন্তায়, ভাবে, কর্মে, ধর্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এক যুগান্তর ঘটিয়াছে। আমার মতো দুই চারিজন লোক এখনও এই পরিবর্তনের সাক্ষীরূপে বাঁচিয়া আছেন। ইঁহারা চলিয়া গেলে প্রাচীন পুঁথিপত্র ব্যতীত সাক্ষাৎভাবে এই সত্তর বৎসরের ইতিহাসের সাক্ষ্য দেবার কেহ থাকিবেন না। আর কেবল পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া কোন ব্যক্তির বা সমাজের জীবনের সকল সঙ্কেত খুঁজিয়া পাওয়া যায়।…এইজন্যই কোন সমাজের ইতিহাসের সত্য মর্ম বুঝিতে হইলে সেই সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনের কথা জানিতে হয়। ইহাই আত্মচরিতের সার্থকতা।

এইভাবে যদি আত্মচরিত লিখিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহা লেখকের আত্মাভিমানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে পারে না। এইভাবেই নিজের জীবন-স্মৃতি লিখিতে বসিয়াছি'।[১৭৬] বিপিনচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে একান্তভাবে 'সাবজেকৃটিভ' বলা যায় না। নিজেকে নিরাসক্তভাবে দেখতে গেলে, নিজের অতীতের মধ্যে ডুব দিতে গেলে কিংবা নিজেকে বিশ্লেষণ করতে গেলে অন্ততঃ সাময়িকভাবে আত্মচেতনা-বিশ্লিষ্ট বস্তুনিষ্ঠতা বা অব্‌জেকৃটিভিটির অবলম্বন প্রয়োজন হয়; বিপিনচন্দ্রের আত্মজীবনী রচনারীতিতে সেই বস্তুনিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় আছে। তা' ছাড়া আত্মজীবনীকে তিনি পরবর্তী প্রজন্মের হাতে অবশ্য

পাঠ্য-ইতিহাসের আকারে তুলে দিতে চেয়েছেন। এই দিক থেকে গ্যেটের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর মিল লক্ষ্য করা যায়।[১৭৭]

বিপিনচন্দ্রের 'সত্তর বৎসর' একটি অসম্পূর্ণ রচনা। এই গ্রন্থে ১৮৮০ পর্যন্ত তাঁর বাইশ বছরের জীবনকাহিনী মাত্র স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থরচনার নেপথ্য প্রেরণা-উৎস সম্পর্কে প্রকাশক জানিয়েছেন—"১৩৩৩ সালে বিপিনচন্দ্র তাঁর এক পৌত্রের পাঠারম্ভের অনুষ্ঠানে দুইজনকে 'পুরোহিত'-রূপে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেন। একজন মৌলবী লিয়াকত হোসেন, স্বদেশীযুগের ত্যাগী কর্মী; আর একজন 'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের পর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'দক্ষিণা'রূপে 'প্রবাসী'র জন্য বিপিনচন্দ্রের নিকট হইতে তাঁর আত্মজীবন-স্মৃতি লেখার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লন। 'সত্তর বৎসর' তাহারই ফল।"

'সত্তর বৎসর'-এ বর্ণিত কাহিনী সাতাশটি অংশে বিভক্ত। অংশগুলির নাম যথাক্রমে: (১) কৈফিয়ত (২) বংশ ও গ্রাম-পরিচয় (৩) জন্মকথা (৪) শৈশব-স্মৃতি (৫) বিদ্যারম্ভ (৬) পিতার প্রকৃতি ও আমার চূড়াকরণ (৭) ফেঁচুগঞ্জ—শ্রীহট্ট (৮) শ্রীহট্টে পড়াশুনা ও বাল্য-জীবন (৯) মায়ের বাৎসল্যের বিশিষ্টতা (১০) শ্রীহট্টে সামাজিক জীবন (১১) পারিবারিক কথা—কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ (১২) শ্রীহট্টে সুরেন্দ্রনাথ (১৩) স্কুলের পাঠ শেষ—প্রবেশিকা পরীক্ষা (১৪) প্রথম কলিকাতা যাত্রা (১৫) কলিকাতা ছাত্রাবাস (১৬) রঙ্গালয় ও নতুন স্বদেশপ্রেম (১৭) সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৮) আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ (১৯) আমার ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ (২০) শিবনাথ শাস্ত্রী (২১) স্বাধীনতার সাধকদল গঠন (২২) পিতা-পুত্রে (২৩) কুচবিহার বিবাহ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা (২৪) ছাত্রজীবন শেষ (২৫) উড়িষ্যা অর্ধশতাব্দী পূর্বে (২৬) উত্তরবঙ্গ-ভ্রমণ ও শ্রীহট্টে 'জাতীয়' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (২৭) নব জাতীয়তার উদ্বোধন—নবগোপাল মিত্র ও হিন্দু মেলা।

উপরি-উক্ত খণ্ডনামের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে এ কথা সহজেই প্রতীয়মান হবে যে বিপিনচন্দ্র এই গ্রন্থে নিজের জীবনের যে অংশ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, তা' সমকালীন সমাজেতিহাসের পঠভূমিকাতেই বর্ণনা করে গেছেন। এই গ্রন্থ থেকে পর্যাপ্ত তথ্য ও উদ্ধৃতি 'পরিবার-পরিজন-পরিবেশ' এবং 'স্বাধিকার সন্ধানে' শিরোনামীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

সুতরাং এই পর্যায়ে 'সত্তর বৎসর-এ বিবৃত কাহিনীর পুনরালোচনা একই বিষয়ের পুনরুল্লেখের নামান্তর মাত্র হবে বিবেচনায় সে প্রয়াস পরিত্যক্ত হলো।

'সমসাময়িক কথা' এবং 'যৌবনের কথা' শীর্ষক রচনা দু'টিতে বিপিনচন্দ্র নিজের জীবনের কোনো নতুন তথ্য পরিবেশন করেন নি। 'সত্তর বৎসর'-এ পরিবেশিত কাহিনীর অংশবিশেষ নতুন আকারে পরিবেশিত হয়েছে। সেইজন্য বিপিনচন্দ্রের আত্মজীবনী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যনির্দেশের পক্ষে এ দু'টি রচনার পৃথক আলোচনা অপরিহার্য নয়।

॥ বিবিধ ॥

বিপিনচন্দ্রের এমন কতকগুলি রচনা আছে, যেগুলিকে বিশেষ কোন শ্রেণী-নামের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অথচ তাঁর আগ্রহ ও মননশীলতার বিচিত্র ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য সেগুলির আলোচনা প্রয়োজন। এই ধরনের রচনাগুলিকে 'বিবিধ' পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

নিম্নলিখিত রচনাগুলি এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য :[১৭৮]

সুন্দর ও সৌন্দর্য ; বন্দে মাতরম্ ; অক্ষয়চন্দ্র ও সাহিত্য-সম্মেলন ; দু'য়ের মাঝে ; ভাষার কথা ; অদৃষ্টের শিক্ষা ; বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ ; যৌবনের সাধন ; যৌবনের স্বারাজ্য।

এ ছাড়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'ভারত-সীমান্তে রুশ' এবং 'সুবোধিনী'ও এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য। 'ভারত-সীমান্তে রুশ' গ্রন্থখানির আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নেই। শ্রীযুক্ত অমল হোম কর্তৃক প্রকাশিত মুকুলদে'র 'টুয়েলভ পোর্ট্রেটস্'-এ বিপিনচন্দ্রের রচনাবলীর তালিকাভুক্ত আছে।[১৭৯]

'সুন্দর ও সৌন্দর্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র সংক্ষেপে সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। 'সৌন্দর্য আনন্দের উৎস। তাই রূপে জগৎ মুগ্ধ' ;—প্রবন্ধের মুখবন্ধে এই কথা উল্লেখ করেও তিনি বলেছেন যে, তা'ই বলে যা' কিছু প্রাণে আনন্দ বিধান করে, তাকেই সুন্দর বলা যায় না। কারণ, রূপজ আনন্দ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এবং নিরপেক্ষ হওয়া চাই। একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন —'ফলাহারের সময় মিষ্টান্নের আবির্ভাবে আহারস্থলে আনন্দকোলাহল ওঠে বলিয়া মিষ্টান্নের একটা অসাধারণ সৌন্দর্য আছে এমন বলা যায় না ; কেননা এ

আনন্দ কেবল চক্ষের সঙ্গে মিষ্টান্নের সংযোগে উৎপন্ন নহে; কিন্তু রসনার সঙ্গে রসগোল্লার পূর্বপরিচয়ের ফল মাত্র'। এরপর আরও নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির আলোচনা করে নয়টি সূত্রের মাধ্যমে তিনি সৌন্দর্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে দু'-একটি সূত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিপিনচন্দ্র-প্রদত্ত সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রথম সূত্র এই: 'যাহাতে প্রাণে অনন্তের ভাব জাগ্রত বা মুদ্রিত করিয়া দেয়, তাহাই সুন্দর'। দ্বিতীয় সূত্র: 'যাহাতে প্রাণে পূর্ণতা ও একতার ভাব জাগ্রত বা মুদ্রিত করে, তাহাই সুন্দর'। ষষ্ঠ সূত্র: 'যাহাতে প্রাণে বিশুদ্ধতার ভাব মুদ্রিত বা জাগ্রত করে, তাহাই সুন্দর।' অষ্টম সূত্র: 'যাহাতে প্রাণে প্রেমভাব মুদ্রিত বা জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহাই সুন্দর'। নবম বা শেষ সূত্র: 'যাহাতে মানবের প্রাণে অমৃতের ভাব মুদ্রিত বা জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহাই সুন্দর'।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—'চিন্তাকে তত্ত্বে পরিণত করা আবার তত্ত্বকে আরও ঘনীভূত করে সূত্রে পরিণত করা মনীষার একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। কিন্তু এই প্রক্রিয়া বাংলা-সাহিত্যে অত্যন্ত বিরল। খুব সম্ভবত বাংলার মতো য়্যানালিটিক্যাল ভাষা এই প্রক্রিয়ার অনুকূল নয়। এ ভাষায় উল্টো প্রক্রিয়াটাই অনায়াস। সূত্র এখানে তত্ত্বে এবং তত্ত্ব এখানে সহজেই চিন্তার বাষ্পীয় রূপ গ্রহণ করে। ভাষার ধর্মই এখানে লেখকের ধর্মের নিয়ামক। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এর উদাহরণ সুপ্রচুর'।[১৮০] বিপিনচন্দ্রের রচনায় চিন্তার তত্ত্বমূর্তি গ্রহণের প্রবণতা অনায়াস, সূত্র-মুর্তি গ্রহণের দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু বিরল হলেও একেবারে যে অনুপস্থিত নয়, আলোচ্যমান প্রবন্ধ তার প্রমাণ। শ্রীযুক্ত বিশী বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক রচনাটিকে (প্রচার, মাঘ, ১২৯১: জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫) সূত্রাকার-সাহিত্যের নিদর্শনরূপে উল্লেখ করেছেন। বিপিনচন্দ্র সম্ভবত বঙ্কিম-সাহিত্যের দৃষ্টান্তেই আলোচ্যমান প্রবন্ধে সূত্র-রচনায় উৎসাহিত হন। কিন্তু তা' হলেও প্রায় সমসাময়িককালে এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে বিপিনচন্দ্রের মনীষার পরিচয় দেয়।

দু'টি সংখ্যায় প্রকাশিত 'বন্দে মাতরম্' শীর্ষক রচনায় বিপিনচন্দ্র ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর দেশাত্মবোধক সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্'-এর ভাববাদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। মুখবন্ধেই তিনি বলেছেন—'বন্দে মাতরম্—গান নহে, মন্ত্র। প্রত্যেক মন্ত্রের একজন ঋষি ও এক বা ততোধিক দেবতা থাকেন।

বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের ঋষি সন্তান-সম্প্রদায়, প্রবর্তক মহাপুরুষ, পুরোহিত বঙ্কিমচন্দ্র, দেবতা জন্মভূমি।' তবে সমগ্র সঙ্গীতটির মধ্যে শুধু বন্দে মাতরম্ কথাংশই যে মন্ত্র তা' পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'যে শক্তিশালী সঙ্গীতের পুরোভাগে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সমগ্রটা মন্ত্র নহে।' বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত মায়ের সাধনমন্ত্র নহে, স্তব। মন্ত্র স্বল্পাক্ষর, স্তব যত দীর্ঘ হউক না কেন, তাহাতে তাহার স্তুতিগুণ নষ্ট হয় না। মন্ত্র অন্তরঙ্গ সাধন, স্তব বহিরঙ্গ সাধন; মন্ত্র সূত্র, স্তব বৃত্তি।…আগে মন্ত্র, পরে স্তব। মন্ত্রপ্রভাবে দেবতা প্রকাশিত হইলে, স্তব সেই প্রকাশের ছবি আঁকিয়া, তাহার রূপ-গুণের বর্ণনা করে।' মন্ত্র ধ্যানের বিষয়, ধ্যানের রাজ্য অপ্রাকৃত; আর স্তব মনের বিষয়, মনোরাজ্য প্রাকৃত। বিপিনচন্দ্রের কথায়—'ধ্যানের বিষয় মনোরাজ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহাকে প্রাকৃতের নিয়মাধীন হইয়া রূপরসাদিতে সন্নিহিত হইতে হয়। ধ্যানলব্ধ অপ্রাকৃত মাতৃরূপ মানসপটে এইজন্য—

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং… ।'

১৩১৯ বঙ্গাব্দে চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনী কর্তৃক চট্টগ্রামে যে-সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মেলনে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু এবং বঙ্কিমযুগের প্রখ্যাত প্রবন্ধকার, 'নবজীবন'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে সভাপতি-পদে বরণ করা হয় এবং তাঁকে সংবর্ধনা দান করা হয়। বিপিনচন্দ্রের 'অক্ষয়চন্দ্র ও সাহিত্য-সম্মেলন' শীর্ষক প্রবন্ধটি সেই সাহিত্য-সম্মেলনকে অবলম্বন করে রচিত। তবে প্রসঙ্গত এই প্রবন্ধে সাহিত্যের নানা বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনী কর্তৃক অক্ষয়চন্দ্রকে সভাপতি-পদে বরণ যে সময়োচিত এবং প্রাজ্ঞসম্প্রদায়োচিত কাজ হয়েছে, একথা প্রথমেই উল্লেখ করে তিনি স্বভাবসিদ্ধ নেতিমূলক ভাষায় বলেন যে অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্যে কোন নবযুগের প্রবর্তন করেন নি বা তিনি যে অলোকসামান্য কবি-প্রতিভার অথবা অনন্য-সাধারণ চিন্তাশীলতার অধিকারী, এমন কথাও বলা যায় না। তারপর ইতিবাচক ভাষায় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অবদানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন—'কবিতা-রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ শব্দ-সম্পদের পরিচয় দিয়াছেন, গদ্য লেখাতে এক সময় অক্ষয়চন্দ্র কিছু পরিমাণ সে-সম্পদের প্রমাণ

দান করিয়াছিলেন। সুললিত, সহজবোধ্য, বিবিধ রসোদ্দীপক শব্দধারার সৃষ্টি-কুশলতায় বাংলা লেখকদিগের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের নকলনবিস অনেকে হইয়াছেন, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী একজনও হন নাই।' শব্দ-সম্পদের ঐশ্বর্য এবং যথাযোগ্য শব্দ-যোজননৈপুণ্যের দিক থেকে বিচার করলে অক্ষয়চন্দ্রকে 'সাহিত্যাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করা সত্যই সঙ্গত। তবে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অবস্থার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে তিনি একথাও বলেন যে অক্ষয়চন্দ্রের গদ্য-রচনা-প্রণালী অনেকটা পুরানো হয়ে গেছে। কারণ 'আজিকার বাংলা সাহিত্যে গদ্য-রচনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ।…এমন নিরেট গাঁথুনি যে বাংলা-ভাষার শক্তিতে সম্ভব ইহা লোকে পূর্বে কল্পনা করিতে পারিত না।' তা' সত্ত্বেও অক্ষম অনুকারীদের লেখনীতে বিকৃত রূপ ধারণ না করলে, তাঁর মতে, হয়তো অক্ষয়চন্দ্রের স্টাইল (বিপিনচন্দ্রের পরিভাষায় 'এবারত') এত সহজে বাংলা গদ্য-সাহিত্যে অস্বীকৃত হতো না। চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিরূপে প্রদত্ত অক্ষয়চন্দ্রের অভিভাষণটি যে এক দিক থেকে অনেককে নিরাশ করেছে, একথাও বিপিনচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন বাংলা-সাহিত্যে বঙ্কিম-যুগের একজন প্রধান কর্মী। বাংলা-সাহিত্যে এক নবযুগের উদ্ভব ও বিকাশের তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। বিপিনচন্দ্র তাই বলেন—'আমরা তাঁহার নিকটে বিগত চল্লিশ বৎসরের সাহিত্যের ভিতরকার বিকাশটি শুনিব আশা করিয়াছিলাম।…বাঙ্গালীর প্রাণপণ চেষ্টার এই চল্লিশ বৎসরের পবিত্র পুরাণ-গাথা অক্ষয়চন্দ্রের মুখে শুনিয়া কৃতার্থ হইব, ভাবিয়াছিলাম। এ কথার সঞ্চয়রূপে, বাংলা-সাহিত্যিকদের মধ্যে এক অক্ষয়চন্দ্রই বাঁচিয়া আছেন। এই আশা করিয়া যাঁহারা তাঁহার চট্টগ্রামের অভিভাষণটি পড়িতে বা শুনিতে গিয়াছিলেন, তাঁরা যে হতাশ হইয়াছেন, ইহা কিছু বিচিত্র নহে।'

'ভাষার কথা'-'বিবিধ' পর্যায়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র সংস্কৃত এবং বাংলা-ভাষার বাক্য-গঠন-প্রণালীর সঙ্গে ইংরেজী ভাষার বাক্য-গঠন-প্রণালীর তুলনামূলক আলোচনা করে ভাষার দৃষ্টান্তে ভারতীয় এবং ইংরেজ জাতির অন্তঃ-প্রকৃতির মৌল পার্থক্যটি পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছেন।

বিপিনচন্দ্র বলেন—'আমাদের প্রত্যেকের যেমন একটা স্ব-বস্তু আছে,… সেইরূপ প্রত্যেক ভাষারও একটা স্ব-বস্তু আছে। এই বস্তুই তার নিজস্ব ও

সর্বস্ব। এই 'স্ব-এর উপরেই ভাষার সকল প্রকারের পরিবর্তন ফুটিয়া ওঠে।... এই যে ভাষার স্ব-বস্তু, তাহার অধীনতাই সাহিত্যিকের সত্য স্বাধীনতা।'

ভাষার ধর্ম কী তা' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন—'মনের ভাব ব্যক্ত করাই ভাষার ধর্ম। আর এই ধর্মের প্রেরণায় প্রত্যেক ভাষাই মনের অনুগমন করিয়া চলে।' তিনি আরও বলেন যে কর্তা, কর্ম এবং ক্রিয়া-জ্ঞানের এই তিনটি মূল উপাদান সব ভাষাতেই পাওয়া যায়। তবে 'কোনও ভাষাতে বা কর্তার, কোনও ভাষাতে বা কর্মের, আর ক্বচিৎ কোনও কোনও অপেক্ষাকৃত অপরিণত বা বর্বর জাতির ভাষায় বা ক্রিয়ারই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াপদ এই তিনটির কোথায় কিরূপ সমাবেশ হয়, তাহার দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মূল গঠন ও প্রকৃতি যে কি, ইহা বুঝিতে পারা যায়।' দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বলেন যে সংস্কৃত ভাষায় কর্তৃপদের প্রাধান্য বেশী। বাক্যের সর্বাপেক্ষা সম্মানের আসনটি কর্তাকেই দেওয়া হয়ে থাকে। তারপরে কর্মপদের স্থান এবং সকলের শেষে ক্রিয়াপদের স্থান। বাংলা প্রভৃতি দেশজ ভাষাসমূহও সংস্কৃত ভাষার এই পর্যায়টি অনুসরণ করে। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন—'আমরা যে জাতিতে জন্মিয়াছি,...তাঁদের চক্ষে চিরদিনই বিষয় অপেক্ষা বিষয়ী বড় ছিলেন। অহংটাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল, ইদংটা উপলক্ষ্য মাত্র ছিল। তাঁহারা চিরদিনই কর্তাকে কর্ম অপেক্ষা ও কর্মকে ক্রিয়া অপেক্ষা বড় বলিয়া ভাবিতেন।...ইহা আমাদের জাতীয়তার মার্কা।' কিন্তু ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি একটু ভিন্ন। ইংরেজরাও বাক্যগঠনে কর্তাকে অগ্রবর্তী স্থান দেন কিন্তু কর্তৃপদের পরে ক্রিয়াপদ এবং তারপর কর্মপদ বসে। বিপিন-চন্দ্রের কথায় 'ইংরেজ জাতির চিন্তাটা এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে তারা ক্রিয়াটাকেই কর্মের চাইতে বড় মনে করে।' তাঁর মতে, এর কারণ হলো—'ইংরেজ কর্মী, সুতরাং ক্রিয়াটা তার চক্ষে অতি বড় বস্তু।' এখানেই ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়দের মৌল পার্থক্য। তাঁর কথায়—'যাহা নিত্য তার উপরেই আমাদের মনের ঝোঁক, যাহা ক্রিয়াজন্য ও পরিণামী তার উপরে নহে।'

তবে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া—এই পর্যায়ভঙ্গ যে কখনো কখনো হয় না তা' নয়। কারণ, নিয়ম থাকলেই তার ব্যতিক্রমও থাকে। তবে সে ব্যতিক্রমেরও সঙ্গত কারণ থাকে। যেখানে ক্রিয়ার উপরেই জোর দেওয়ার প্রয়োজন হয়, সেখানে ক্রিয়াপদ আপনা থেকেই বাক্যের প্রথমে স্থান অধিকার করে। যেমন

—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।' এখানে শোনাটাই মূল কথা। বাংলাতেও 'যাচ্ছে কেমন, খাচ্ছে কেমন' ইত্যাদি প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।

'দু'য়ের মাঝে' এবং 'অদৃষ্টের শিক্ষা'—এই দু'টি রচনার বক্তব্যই এক সুরে বাঁধা। দু'টি প্রবন্ধেই যৌবনসুলভ ভাব ও ভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

যৌবন যে স্বরূপে দ্বৈতবাদী,—একথা প্রমাণের জন্য বিপিনচন্দ্র বলেছেন—".. একদিকে তার বিশ্ববিজীগিষু 'অহং', অন্যদিকে অনধিকৃত ও অবিজিত এই 'ইদং'—যৌবন এই দু'য়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া, দুইকেই আশ্রয় করিয়া, দ্বৈতবাদী হইয়া পড়ে।" তারপর ক্রমশঃ যতই সে সংসারজীবনে আঘাত পেতে থাকে, ততই সে উপলব্ধি করতে শুরু করে যে এই দুই-ই বিশ্বের শেষ কথা নয়। 'ইদং'কে অধিকার করবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে গিয়ে যৌবনের 'অহং' একদিন দেখতে পায় যে, জগৎটা তার জ্ঞানের, ভোগের, কর্মের বিষয় হলেও তার নিজের করায়ত্ত নয়। তখন সে অনুভব করে যে পুরুষকারের উপর দৈব বলে একটা কিছু আছে। বিপিনচন্দ্রের কথায়—"তখন সে এই দ্বৈত-বুদ্ধির মধ্য দিয়া, এই অহং ও ইদংকে আশ্রয় করিয়াই, যিনি অহংও নহেন, ইদংও নহেন, অথচ যাহাতে দু'য়েরই প্রতিষ্ঠা, সেই 'তৎ সৎ'-এর পথে যাইয়া দাঁড়ায়।"

'অদৃষ্টের শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধেও অনুরূপ সিদ্ধান্তই উচ্চারিত হয়েছে। যৌবনের ভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন— '…আপনার জ্ঞানই বড়, আপনার শক্তিই দড়; আপনি যাহা বুঝি না, কেউ তাহা বোঝে না…এই ভাবটা যৌবনের সহজ ভাব।' এই ভাবটি আরও পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি বলেন —'যৌবন প্রথমে ভাবে সে সকলি করিতে পারে।.. সে বিশ্বটাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চাহে।…কিন্তু হাতেকলমে এ সকল করিতে যাইয়া যৌবন দেখে যা' ভাবে তা' হয় না।.. কে যেন আড়ালে থাকিয়া তার সকল চাল অলক্ষিতে ও নিমেষের মধ্যে বিগড়াইয়া দেয়।' এইভাবে পদে পদে বিপর্যস্ত হবার পর তার আত্মচৈতন্যের উন্মেষ হয়। শেষ পর্যন্ত সেই রহস্যময় অপরাজেয় শক্তির কাছে হার স্বীকার করে অনেকে নাস্তিক হয়ে ওঠে, আবার অনেকে 'অদৃষ্ট' নামক একটা শক্তিকে মেনে নিয়ে নিজেদের চিন্তা ও কর্মকে সংযত ও সংহত করে।

'বয়ং কৈশোরকং বয়ঃ', 'যৌবনের সাধনা' এবং 'যৌবনের স্বারাজ্য' শীর্ষক তিনটি রচনাই যৌবন-বন্দনামূলক রচনা।

রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কোন্ বয়স শ্রেষ্ঠ। উত্তরে রায় রামানন্দ বলেছিলেন—বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ। রায় রামানন্দের এই উক্তিকে অনুসরণ করে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—'…আর মানুষের কৈশোর বা যৌবনই দেবতার আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠতম ও শুদ্ধতম ক্ষেত্র।' সেইজন্য তিনি মনে করেন যে যৌবনের সাধনা করতে গেলে যৌবনের উপাসনা করতে গেলে যৌবনের প্রকৃতি ও স্বরূপ আগে অনুধাবন করা দরকার।

'যৌবনের সাধন' শীর্ষক রচনায় যৌবনের প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমেই তিনি বলেছেন—'ফোটাই যৌবনের প্রকৃতি। যৌবনে ইন্দ্রিয়সকল নবচেতনা পাইয়া অভূতপূর্ব শক্তি অনুভব করিয়া অনাস্বাদিত রসের সন্ধান পাইয়া সকল প্রকারের বন্ধন ছিঁড়িয়া আপনার প্রকৃতির প্রেরণায় এই শোভাসুখপূর্ণ আনন্দময় বিশ্বের চারিদিকে ছুটিয়া যায়'। সেইজন্য তাঁর মতে, সংযমের সাধনাই যৌবনের প্রথম সাধনা হওয়া উচিত। কিন্তু বহিঃশাসনের দ্বারা সেই সংযমের সাধনা প্রযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, বিপিনচন্দ্রের কথায়—'এ সংসারে সর্বত্রই আত্মশাসন বা স্বায়ত্তশাসন একমাত্র বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন।… যৌবনই যৌবনকে নিজের প্রয়োজনে শাসিত ও সংযত করিবে'। রাষ্ট্র-নীতিবিদ্সুলভ ভাষায় একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বলেছেন—'বার্ধক্যের এ অধিকার নাই, ইংরাজের যেমন অধিকার নাই ভারত শাসন করা ; সে অধিকার কেবল ভারতবাসীরই আছে।'

'যৌবনের আত্মশাসনের দায়িত্ব ও অধিকারবিষয়ক প্রশ্নটিকে তিনি পরিস্ফুট করে তুলেছেন 'যৌবনের স্বারাজ্য' শীর্ষক রচনায়। তিনি বলেন—'যৌবনের স্বারাজ্যের অর্থ এই যে যৌবনের নিজের সার্থকতা লাভের জন্য যৌবন আপনি আপনার বিধিনিষেধ গড়িয়া তুলিবে'। তাঁর মতে যৌবনের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে নবজাগ্রত ইন্দ্রিয়গ্রামের চাঞ্চল্য। আর সেই ইন্দ্রিয়গ্রামের লক্ষ্য—ভোগ করা। কিন্তু ভোগেরও যে একটা আইনকানুন আছে, যৌবন তা' সহজে স্বীকার করে নিতে চায় না। অথচ তা' না করলে ভোগ ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

বিপিনচন্দ্র বলেন—"ভোগের আইনের প্রথম ধারা অসংযত ভোগে ভোগ হয় না, আনন্দ খুঁজিতে যাইয়া অসংযত ভোগী সর্বদাই বিষাদ আহরণ করে। ‥ ভোগের আইনের দ্বিতীয় ধারা এই, ভোগের জন্য বীর্যের প্রয়োজন। বীর্য অর্থ ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও তেজ।…সুতরাং ইন্দ্রিয়ভোগের প্রয়োজনেই ইন্দ্রিয়ের সংযমসাধন প্রয়োজনীয়। ভোগের আইনের তৃতীয় ধারা এই, ইন্দ্রিয়সকল যদিও পরিমিত বিষয়ের প্রতিই সর্বদা ছুটিয়া যায়, কিন্তু এই সকল বিষয় ভোগের লালসামাত্রই বাড়াইয়া দেয়, এই লালসার সম্যক পরিতৃপ্তি দান করিতে পারে না।…সুতরাং ভোগ্য বিষয় যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মার ভূমিতে যাইয়া না উঠিয়াছে, অর্থাৎ যতক্ষণ তাহাকে 'আইডিয়ালাইজ' এবং স্পিরিচুয়ালাইজ' করিতে না পারিয়াছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সত্য যে ভোগ তাহা হয় না।" সুতরাং যৌবনের সাধনাকে পূর্ণতা দান এবং সার্থক করতে হলে, তাঁর মতে, প্রথমেই শরীরসাধন এবং তারপরেই মানসিক সাধন, অর্থাৎ এককথায় ব্রহ্মচর্যসাধন প্রারম্ভিক লক্ষ্য হওয়া উচিত।

'ভারত-সীমান্তে রুশ' গ্রন্থের (১৮৮৫) আখ্যা-পত্রে গ্রন্থ-নামের নীচে 'অথবা অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মধ্য আসিয়ায় ভারতের দিকে রুশের রাজ্যবিস্তারের বিবরণ'—এই কথাগুলি যোগ করে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ের বেশ কিছুকাল আগে থেকে ভারতের সীমান্তবর্তী দেশ আফগানিস্থানের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠা নিয়ে রাশিয়া এবং ইংল্যাণ্ড—দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মধ্যে রেষারেষি চলতে থাকে। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ ছিল (১৮৭৮) এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বহিঃপ্রকাশ। এই সময় ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরা আফগানিস্থানের পথে রাশিয়ার ভারত-আক্রমণের আশঙ্কায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠেন, যদিও এই আতঙ্কের কারণ সংশয়মুক্ত ছিল না।[১৮১] এই রাজনৈতিক পরিবেশে বিপিনচন্দ্রের 'ভারত-সীমান্তে রুশ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থখানি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলির নাম যথাক্রমে : (১) মধ্য-আসিয়ার সাধারণ বিবরণ, (২) মধ্য আসিয়ার অধিবাসিগণ, (৩) উরুপার সঙ্গে মধ্য-আসিয়ার প্রাচীন সম্বন্ধ, (৪) রুশিয়ার গণোত্থান, (৫) রুশে পারসীকে,

(৬) ইংরাজে পারসীকে, (৭) পারস্য-ক্ষেত্রে রুশ ও ইংরাজ, (৮) রুশে খিগিজে, (৯) রুশে খেভানে।

এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বিবৃত করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন—'রুশ-ইংরাজের পরস্পর আচার-ব্যবহার; মধ্য আসিয়ায় রুশের রাজ্যবিস্তারে ভারতবাসীগণের আশা ও আশঙ্কা, ইষ্ট ও অনিষ্ট; আফগান-সীমান্তে রুশ-ইংরাজে যুদ্ধ বাধিলে তাহার জন্য দোষী হইবে কে, এবং তাহার মূল তত্ত্বই বা কি;—এই সকল বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য'।[১৮২] ইংরেজীতে লেখা বাইশখানি ইতিহাসগ্রন্থের সহায়তায় রচিত এবং ১১৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই গ্রন্থে ঐ সব বিষয়ই যথাসম্ভব সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। উপক্রমণিকায় গ্রন্থকার গ্রন্থের সারমর্ম সংক্ষেপে বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন—'রুশ ক্রমে পারস্য ও সাইবেরিয়া হইতে তুর্কিস্থানে পাদপ্রসারণ করিয়া আজি আফগান-সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। রুশের এই সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে ভারতের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। প্রথমতঃ রুশ মধ্য আসিয়া দিয়া ক্রমেই ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।···রুশের ভারতপ্রান্তে উপস্থিতিতে ভারতবাসীর ইষ্টানিষ্ট কি হইবে, সে বিচার অন্যত্র করিব; এই স্থলে এই মাত্র বলিতে পারি যে উন্নতির দিকেই হউক, আর অবনতির দিকেই হউক, রুশরাজ যে আধুনিক ভারতের ভাগ্যলিপিগঠনে বিশেষ আধিপত্য ভোগ করিবেন তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই'।[১৮৩]

'সুবোধিনী' বালক-বালিকাদের জন্য রচিত একখানি সহজ উপদেশ-গর্ভ গ্রন্থ। ইংরেজীতে যাকে 'অবজেক্ট লেসন্' বলা হয়, সেই অবজেক্ট লেসনের আকারে একুশটি সহজবোধ্য বিষয়কে এই গ্রন্থে বস্তুভিত্তিক পাঠের অঙ্গীভূত করা হয়েছে। বিষয়গুলি এইরকম: (১) মাতৃহীন বালক, (২) বালকের অনুতাপ, (৩) দুগ্ধ, (৪) দুষ্কর্মের প্রতিফল, (৫) ধান্য ও চাউল, (৬) যখনকার যা' তখনকার তা', (৭) লবণ, (৮) বালকের মহত্ত্ব, (৯) তৈল, (১০) দৌড়াদৌড়ি, (১১) চিনি, (১২) বন্ধুতা, (১৩) গোপালের জন্মতিথি, (১৪) ভাই-ভগিনী, (১৫) প্রজাপতি, (১৬) কাপড়, (১৭) দ্বিজেন্দ্রের পুরস্কার, (১৮) বাদুড়, (১৯) জল, (২০) বায়ু (২১) শিষ্টাচার। প্রত্যেকটি বিষয়ই গল্পের আকারে সহজ ভাষায় বর্ণিত। বালক-বালিকার মনে আগ্রহ ও কৌতূহলের উদ্রেক করে কতকগুলি

অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে সহজে অবহিত করা এবং এইভাবে তাদের স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ-শক্তির উদ্বোধন করাই এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য।

॥ বিপিনচন্দ্রের রচনা-শৈলী ॥

সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে পদচারণা করলেও বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে বিপিনচন্দ্রের স্থান প্রবন্ধকাররূপেই সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত—একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এইজন্য বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্যেই তাঁর রচনা-শৈলীর অনুসন্ধান করা সমীচীন। প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্যেই তাঁর সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর সর্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল।

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন—সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, বিশেষতঃ তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভাষা ছিল একাধারে সাধু ও সুসংবদ্ধ এবং সহজ ও সাবলীল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে রবীন্দ্রনাথের হাতে অবশ্য বাংলা গদ্যরীতি অভূতপূর্ব রূপান্তর পরিগ্রহ করে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যকে শুধু বাচ্যের ভারবহনে নিযুক্ত না রেখে তাকে ব্যঞ্জনার বিচ্ছুরণে অনুপ্রাণিত করেন। রবীন্দ্রনাথের সেই স্বকীয় ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত গদ্যরীতির কথা বাদ দিলে 'সবুজপত্র' প্রকাশের (বৈশাখ, ১৩২১ : ১৯১৪) পূর্ব পর্যন্ত তো বটেই, এমন কি তার পরেও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতিই বহুজনের কাছে আদর্শরীতি, বিশেষতঃ, প্রবন্ধ-সাহিত্যের উপযোগী ভাষারূপে গণ্য হয়ে এসেছে।

প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রকরণে এবং ভাষারীতিতে বিপিনচন্দ্র প্রধানতঃ বঙ্কিমী-রীতিরই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু বাংলা গদ্যে রবীন্দ্রনাথ যে 'নতুন এবারত'-এর সৃষ্টি করেন, বিপিনচন্দ্র তারও অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথই যে বর্তমান 'বাংলা-সাহিত্যে গদ্যরচনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা' করেছেন—একথাও মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। সুতরাং বিপিনচন্দ্রের গদ্যরীতি যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কিছু পরিমাণে রবীন্দ্র-রীতির অনুসরণ করেছে—একথা স্বচ্ছন্দেই বলা চলে এবং তাঁর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গদ্যরচনায় তার প্রচ্ছন্ন প্রমাণ মেলে।

প্রবন্ধ-সাহিত্যের স্বরূপের আলোচনা-প্রসঙ্গে ডব্লিউ. এইচ. হাডসন

বলেছেন যে, খাঁটি প্রবন্ধের আসল ব্যাপারটি হচ্ছে, বাস্তবিকপক্ষে, আলোচ্য বিষয়ের উপর লেখকের মন ও চরিত্রের প্রত্যক্ষ সঞ্চরণ।[১৮৪] বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের মতো বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধেও এই ব্যাপারটি লক্ষণীয়। আলোচ্যমান প্রতিটি বিষয়ের উপরেই বিপিনচন্দ্রের মুক্ত, অনুভূতিশীল মনের অবাধ সঞ্চরণের ছাপটি সুস্পষ্ট। সর্বত্র তিনি কোনো নতুন কথা বলুন আর না-ই বলুন, তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বজনগ্রাহ্য হোক্ বা না হোক্,—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের সমন্বয়-প্রয়াসে, বৈজ্ঞানিকসুলভ তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে আন্তরিক অনুভূতির মিশ্রণে তাঁর আলোচনা-পদ্ধতির তাৎপর্য অস্বীকার করা কঠিন।

'প্রবন্ধ' নামের মধ্যেই যে 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'-এর ইঙ্গিত নিহিত, বিপিনচন্দ্রের অধিকাংশ প্রবন্ধেই তার অঙ্গীকার অনুপস্থিত। তাঁর চিন্তা যেন একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে বেশীক্ষণ আবদ্ধ থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। প্রবন্ধের শিরোনামের মধ্যে যে বিষয় বর্ণনার বা আলোচনার প্রচ্ছন্ন প্রতিশ্রুতি আছে, প্রবন্ধের অভ্যন্তরে তা' অনেকস্থলেই যথাযথভাবে পালিত হয়নি। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে অবাধ পরিভ্রমণের পর আবার তিনি মূল প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত নয়, এমন অনেক প্রসঙ্গ অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় ভাবে তাঁর আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করে, যদিও বিচ্ছিন্নভাবে সেই অবান্তর প্রসঙ্গসমূহের আলোচনাও তাঁর তীক্ষ্ণ মনন এবং সহৃদয় অনুভূতির গুণে সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গচ্যুতি এবং প্রসঙ্গান্তরে পরিভ্রমণান্তে মূল প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন—অবশ্য ভাবুকতার দিক থেকে লেখকের বিশ্বকোষাকার মনের (এনসাইক্লোপিডিক মাইণ্ড) কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রায় সমসাময়িককালের প্রবন্ধলেখকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে পূর্ণমাত্রায় এবং আরও পরবর্তীকালের প্রবন্ধলেখকের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদারের প্রবন্ধে আংশিকমাত্রায় উপরি-উক্ত লক্ষণ বিদ্যমান।

বিপিনচন্দ্রের মধ্যে একটি শুচিশুভ্র শিল্পী মন ছিল কিন্তু তিনি সচেতন শিল্পী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলতঃ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, দার্শনিক এবং নীতিবিদ্। তাঁর মূল অভিপ্রায় ছিল পাঠকের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সযত্নে যুক্তি-তর্কের উপস্থাপনা, নিজে যা' সত্য বলে মনে করেন তাকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা,—সুন্দরের আধারে পরিবেশন করা নয়। এইজন্য তাঁর ভাষার মধ্যে প্রসাধন-পারিপাট্যের ন্যূনতা এবং প্রবন্ধের মধ্যে শিল্প-সুষমার দৈন্য থাকা

অস্বাভাবিক নয়। এমার্সনের প্রবন্ধের রচনা-শৈলী সম্পর্কে ব্রাউনেল সাহেব যে মন্তব্য করেছেন,[১৮৫] তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায় যে, বিপিনচন্দ্রের রচনা-শৈলী এমন একজন লেখকের রচনা-শৈলী, যিনি শিল্পপ্রাণ, কিন্তু শিল্পী নন।

তবু ভাষাশিল্পেও বিপিনচন্দ্রের নৈপুণ্য যে উপেক্ষণীয় নয় এবং কোথাও কোথাও যে তাঁর ভাষায় শিল্পীসুলভ সরসতা প্রকাশ পেয়েছে তা' কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে।

(১) উত্তর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, হিমাচলশৃঙ্গ হঠাৎ স্বর্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; ইহাও ঠিক বলা হইল না, তিলে তিলে সোনার বরণ হইয়া উঠিতেছে বলিলেই সে অপূর্ব অভিজ্ঞতার সত্য বর্ণনা হয়। মনে হইল কে যেন সোনার তুলি দিয়া গিরিরাজের টোপর রঙ্ করিয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই সোনার আলো বদলিয়া গেল। ঐ সোনার উপরে কে যেন রূপার তুলি বুলাইয়া তাহাকে রৌপ্যবর্ণ করিয়া দিতেছে। ক্রমে ইহাও মিলাইয়া যাইতে লাগিল এবং শেষে সূর্য যখন চক্রবালরেখা ছাড়াইয়া উঠিল, তখন উজ্জ্বল সূর্যালোকে হিমগিরি আপনার নিজের নিত্যরূপ ধারণ করিয়া অভ্রভেদ করিয়া দাঁড়াইল।

[সত্তর বৎসর, পৃঃ ২৫৮-৫৯]

(২) আমার মা অতি শিশুকাল হইতে, মাঘ মাসের দুরন্ত শীতে প্রত্যুষে স্নান করিয়া সেই সিক্ত বস্ত্রে তরুণ অরুণের দিকে চাহিয়া উষার উদ্ভিন্ন আলোকে বিশ্বে যখন নূতন চেতনা স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করে, তখন আমারই জন্য বর-যাচ্ঞা করিতেন; আর সন্ধ্যা পর্যন্ত একই স্থানে দাঁড়াইয়া, প্রহরে প্রহরে সূর্যমুখী ফুলের মতো, আপনার বিকচ কমলোপম মুখখানি সূর্যদেবের দিকে ফিরাইয়া, সারাদিন সেই একই প্রার্থনার আবৃত্তি করিতেন।

['প্রাণতুল্যেষু' সাহিত্য ও সাধনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১]

(৩) সাহিত্যের উদার রত্নবেদীতে বাগ্দেবীরই অধিষ্ঠান হয়, রণরঙ্গিণীর ভৈরবী নৃত্যকলার স্থান এ তো নহে। রস সাহিত্যের প্রাণ; আর প্রেম রসের সেরা। সাহিত্য-সম্মেলন প্রেমের বাঁশীই

বাজাইবে, বিরোধের ভেরী তো সেখানে বাজিতে পারে না। ···সাহিত্যের লক্ষ্য সন্ধি ও সামঞ্জস্য ; বিচ্ছেদ ও সংগ্রাম নহে। যে সাহিত্য জ্ঞানের, ভাবের, কর্মের সর্ববিষয়ের আপাত ও আকস্মিক বিরোধসকলকে, তাহাদের প্রকৃতিগত নিত্যমিলনের ভূমিতে তুলিয়া নিতে পারে না, সে সাহিত্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয় না।

['সাহিত্য-সম্মেলন' সাহিত্য ও সাধনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৪]

(৪) অনিত্যের চাঞ্চল্যের মধ্যে যে নিত্যত্বের নিত্যস্বরূপটি স্থির হইয়া 'নির্বাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' জ্বলিতেছে,—রবীন্দ্রনাথ সমষ্টিগত মানব-হৃদয়ের অতৃপ্ত-অনন্ত-রূপপিয়াসার চিরন্তন-বিষয়রূপিণী 'উর্বশী'র চিত্রে তাহা দেখাইয়াছেন। এখানে অন্যকামনা-শূন্য কাম, সর্বসম্পর্ক-বিহীনা কামিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার ধ্যান করিতেছে।·· এখানে পতঙ্গ অগ্নির মধ্যে নিজ স্বরূপের সাক্ষাৎ পাইয়া আত্মহারা।

[সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা : সাহিত্য ও সাধনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯]

বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধের বিষয়-বৈচিত্র্য তাঁর ধ্যান ও মননের আগ্রহ এবং অভিনিবেশের বিরাট ব্যাপ্তির পরিচয়বাহী। রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী ব্যতীত সমকালীন অন্য কোনো প্রবন্ধকার জীবনের এত বিচিত্র দিক, এত প্রকারের প্রশ্ন অবলম্বন করে মননশীলতার এমন পরিচয় হয়তো রেখে যেতে পারেন নি। বিপিনচন্দ্রের মতবাদ মহাকালের বিচারে কী পরিমাণে গৃহীত ও বর্জিত হবে, তা' নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে প্রবন্ধ-সাহিত্যের মাধ্যমে বিপিনচন্দ্র যে চিন্তানায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা' নিশ্চিতভাবে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভাবী সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল—একথা সর্বথা স্বীকার্য।

রস-সাহিত্য

বিচিত্র মনীষার অধিকারী বিপিনচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রয়াস শুধু প্রবন্ধ-সাহিত্যের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি, রস-সাহিত্যের আলোকোজ্জ্বল অঙ্গনেও আপন স্বাক্ষর রেখে যাবার চেষ্টা করেছে, যদিও সে স্বাক্ষর অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল।

বিপিনচন্দ্রের মধ্যে একটি শুচিশুভ্র শিল্পী মন ছিল—একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। রাষ্ট্রনীতির প্রশস্ত ক্ষেত্রে তাঁর জীবনের বিপুল কর্মোদ্যম ব্যাপকভাবে ব্যাপৃত থাকায় সে শিল্পী-মন যথোচিতভাবে বিকাশের অবকাশ লাভ করেনি। তবু সেই শিল্পী-মনের তাগিদেই তিনি অনুকূল অবসরে উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও গান রচনাতেও লেখনী নিয়োগ করেছেন। তাঁর জীবনচরিতের পূর্ণ চিত্রটি প্রদর্শনের জন্য সেগুলির যথাযথ আলোচনা প্রয়োজন।

॥ উপন্যাস ও গল্প ॥

বিপিনচন্দ্র দু'খানি উপন্যাস রচনা করেছেন। একখানি প্রথম যৌবনের রচনা, নাম—'শোভনা'; আর একখানি বৃদ্ধ বয়সের রচনা, নাম,—'রাগের পথে'। 'শোভনা' পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত [১৮৬] আর 'রাগের পথে' অসম্পূর্ণ রচনা এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।[১৮৭] 'শোভন'ার প্রথম প্রকাশের ঠিক চল্লিশ বছর পরে 'রাগের পথে' প্রকাশিত হয়। 'শোভনা'র প্রকাশের সময় বিপিনচন্দ্র ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবক, আর 'রাগের পথে' প্রকাশের সময় তিনি ছেষট্টি বছরের বৃদ্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিপিনচন্দ্রের প্রথমা কন্যার নামও 'শোভনা'।

বিপিনচন্দ্রের 'শোভনা' যখন প্রকাশিত হয়, তখন বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে পূর্ণযৌবনে পদার্পণ করেছে বলা চলে। মিসেস্ হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স-রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) যদি বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হয়, তা' হলে বাংলা উপন্যাসের বয়স তখন বত্রিশ বছর। এই সময়ের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬১), ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৬২) গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়-বল্লভ' (১৮৬৩) প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১৮৬৯), 'সীতারাম' (১৮৮৬) বাদে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত উপন্যাস, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭২), রমেশচন্দ্র দত্তর 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' (১৮৭৬), 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯), 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭), সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (১৮৭৭), 'জাল প্রতাপ' (১৮৮৩) প্রভৃতি

উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রগত করে তুলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে।

উপন্যাস-রচনায় বিপিনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। 'শোভনা'র অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) এবং 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) বিপিনচন্দ্রের কল্পনার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, যদিও আনন্দমঠের প্রভাবের পরিমাণ বেশী। কারণ, আনন্দমঠেই প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর দেশাত্মবোধের আদি মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—" 'আনন্দমঠ'-এ দেশপ্রীতিই মুখ্য বস্তু, ধর্ম অপ্রধান; 'দেবী চৌধুরাণী'তে ধর্মই প্রধান, দেশসেবা বা অত্যাচারের প্রতিরোধ একটা নামমাত্র উদ্দেশ্য"।[১৮৮]

'শোভনা'র আখ্যা-পত্রে বিপিনচন্দ্রও উপন্যাসের নামকরণ করেছেন এইভাবে :

শোভনা

ভবিষ্য ইতিহাসের একটি অধ্যায়

—০—

নামকরণের নীচে গ্রন্থের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে এইভাবে :

"জীবন সংগ্রামে ভারতের নামে
যত রক্তবিন্দু পড়িবে এবার,
শত পুত্র হবে বীর অবতার;
ভারত আঁধার ভারতের ভার
ঘুচাইবে তারা,—"

তার নীচে মুদ্রিত আছে :

'না জাগিলে সব ভারতললনা,
এ ভারত আর, জাগে না জাগে না।'

সুতরাং 'শোভনা'কে যে দেশাত্মবোধক উপন্যাস এবং সেই দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে বন্ধনমুক্তা নারীর অগ্রণী ভূমিকা যে অপরিহার্য তা' এই উপন্যাসের নামকরণ এবং আখ্যা-পত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই অনুমিত হয়।

'শোভনা' পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড একাদশ পরিচ্ছেদে, দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে, তৃতীয় খণ্ড সপ্তদশ পরিচ্ছেদে এবং চতুর্থ খণ্ড পঞ্চ পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। পঞ্চম খণ্ডটি খণ্ডিত, তবে যে পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাতে কাহিনীর উপসংহার কল্পনা করে নিতে অসুবিধা হয় না। উপন্যাসের আখ্যান-অংশ সংক্ষেপে এই :

> 'শোভনা' রমানাথবাবুর পরিবারে প্রতিপালিতা। সে জন্মলগ্নে মাতৃহীনা এবং শৈশবে পিতৃহারা। বর্তমানে তার অভিভাবক হচ্ছেন রমানাথবাবু। তিনি বিপত্নীক ; একমাত্র কন্যা লীলাবতী এবং কন্যাস্থানীয়া শোভনাকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার। এই ছোট্ট পরিবারে সেদিন বড়ো উৎসবের ধুম। কারণ, সেদিন শোভনার জন্মদিন। সেদিন সে উনিশ বছরে পদার্পণ করে সাবালিকার অধিকার অর্জন করতে চলেছে। শোভনা রমানাথবাবুকে প্রণাম করলে তিনি তাকে একটি সুন্দর বই উপহার দিলেন আর বললেন—'শোভনা, তোমার আর একটি উপহার আছে। এই মোহর-করা কাগজের তোড়াটি লও। আজ রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্বে একাকী বসিয়া এইটি খুলিয়া দেখিবে'।
>
> রাত্রে নির্জনে সেই তোড়া খুলে শোভনা যা' দেখলো তাতে সে খুবই অভিভূত হয়ে গেল। সেই তোড়া খুলে সে তার বাবার একখানি ছবি পেল, আর পেল একটি চিঠি। ছবিখানি তার বাবার,—নীচে নাম লেখা—'দেবেন্দ্রনাথ রায়'। ছবিতে বাবার রূপের পরিচয় পেয়ে সে অভিভূত হয়ে গেল। আর চিঠিতে পেল তার বাবার চরিত্রের পরিচয়। চিঠি পড়ে সে জানতে পারলো জন্মমুহূর্তে তার মায়ের মৃত্যুর কথা। আরও জানলো যে এই ঘটনার কিছুদিন পরে প্রিয়বন্ধু রমানাথবাবুর হাতে শোভনার লালন-পালনের ভার তুলে দিয়ে তার বাবা দেশত্যাগী হন। চিঠিতে আরও লেখা ছিল যে শোভনার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যয়বহনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি পরিচালনার ভার রমানাথবাবুকে দিয়ে গেছেন। চিঠির প্রধান এবং শেষ বক্তব্য ছিল এই যে দেবেন্দ্রবাবু সংসার ত্যাগ

> করেছিলেন দেশসেবার জন্য এবং শোভনাও যেন পরাধীন দেশের সেবার জন্য নিজেকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে নেয়। একই সঙ্গে আনন্দে ও বেদনায় অভিভূত হয়ে সে বাবার ছবি ও চিঠিখানি বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো যে সে বাবার নির্দেশপালনের জন্য যেভাবেই হোক্, নিজেকে যোগ্য করে নেবে।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে শোভনার এই প্রতিজ্ঞাপালনের কাহিনী দুই শতাধিক পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা-সংস্থান ও কাহিনী-বর্ণনার সূত্রে সুকৌশলে লেখক নিজের কয়েকটি প্রিয় মনোভাবের অবতারণা করেছেন। বাল্যবিবাহ ও মাদকপানবিরোধী মনোভাব এবং স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তার ও নারী-জাগরণ-সমর্থক মনোভাব এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ সরকারের প্রচারের গুণে রটনা হয়ে গিয়েছিল যে দেবেন্দ্রনাথ মারা গেছেন। কারণ, দেশত্যাগের পর তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে ভারতবর্ষের নানা শহর ও গ্রাম পর্যটন করে ভারতবাসীর পরাধীনতার গ্লানির কথা প্রচার করে বেড়ান। বাংলার বাইরে তিনি 'বাঙালী বাবা' নামে পরিচিত হন। কিন্তু ইংরেজশাসক বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত এক নারীহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে কলঙ্কলেপনের চেষ্টা করলো এবং শেষ পর্যন্ত বোম্বাইয়ে চার্নিরোডে সমুদ্রতীরে একটি মৃতদেহকে 'বাঙালী বাবা'র মৃতদেহ বলে সনাক্ত করিয়ে তাঁকে মৃত বলে প্রমাণিত করলো। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এই ঘটনাটি ছিল সম্পূর্ণভাবে সাজানো ঘটনা। তিনি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করে অক্ষত দেহে আপন অভীষ্ট সাধন করে বেড়াচ্ছিলেন।

উপন্যাসের শেষভাগে এক অতিনাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীর থেকে অনতিদূরে সুবিস্তৃত মাঠের মধ্যে এক অতি প্রাচীন ও জীর্ণ অট্টালিকার মধ্যে পিতার সঙ্গে শোভনার মিলন হলো। সেদিন ছিল বৈশাখের শুক্লা চতুর্দশী। গভীর নিশীথে পিতা-কন্যায় মিলনের পর শোভনা পিতার কাছে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। সেখানে রমানাথবাবু উপস্থিত ছিলেন ; আর উপস্থিত ছিল বিনোদবিহারী, যে শোভনার পাণিপ্রার্থী হয়ে প্রত্যাখ্যাত হবার পর দেশত্যাগী হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ও রমানাথবাবুর ইচ্ছায় বিনোদবিহারী ও শোভনার মিলন সম্পন্ন হলো। দু'জনেই

তখন দেশের জন্য আত্মোৎসর্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বৎসরান্তে এই দিনে পুনরায় সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করে দেবেন্দ্রনাথ বিদায় নিলেন।

'শোভনা' উদ্দেশ্যমূলক রচনা। উপন্যাসের বহিরবয়ব অবলম্বন করে নারী-প্রগতি এবং ভারতবর্ষের ভাবী স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তা আত্মপ্রকাশের অবসর সন্ধান করেছে। দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র-পরিকল্পনার উপর আনন্দমঠের সত্যানন্দর প্রভাব স্পষ্ট। মুখ্য চরিত্রগুলির প্রত্যেকেই এক-একটি উদ্দেশ্যের বাহনরূপে কল্পিত। দোষে-গুণে মিশ্রিত শশিভূষণের চরিত্রটি সুচিত্রিত। পতিপরায়ণা আদর্শ সতী নারীরূপে প্রেমমালার চরিত্রটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনস্তত্ত্বসম্মত বাস্তবতার পথে ইন্দুভূষণের চারিত্রিক পরিবর্তনের ইতিবৃত্তটি লেখকের কল্পনা-কুশলতার স্বাক্ষর বহন করে।

•

অসমাপ্ত উপন্যাস 'রাগের পথে' একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক রচনা। বৈষ্ণব-রস-তত্ত্বে সু-অধীতী বিপিনচন্দ্র রসের চরম পরিণতি সম্পর্কে স্বানুভূত সত্যকে একটি আখ্যান-রূপ দানের চেষ্টা করেছেন এই উপন্যাসে।

'বৈষ্ণব কবিতার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি তাঁর সেই স্বানুভূত সত্যকে তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন—'সর্বসঞ্চারণশীলতা ও সর্বানন্দ-দান রসের মুখ্য ধর্ম।· এই রস যখন প্রগাঢ় হইয়া ইহাদের দেহকে, ইন্দ্রিয়কে, স্নায়ুমণ্ডলকে, মনকে, ভাবনাকে, এককথায় ইহাদের পরস্পরের সমগ্রতাকে গ্রাস করিয়া বসে, তখন ইহারা চক্ষুসাক্ষাৎকার ব্যতীতও পরস্পরের রূপ দেখে, শ্রুতিসাক্ষাৎকার ছাড়াও পরস্পরের শব্দ শোনে, বহিরিন্দ্রিয় সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে আপনাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা একে অন্যকে গ্রহণ করে ও একে অন্যের সঙ্গ লাভ করে।…ইহাই রসের চরম পরিণতি'।

এই তত্ত্বকে আশ্রয় করেই 'রাগের পথে'র আখ্যানভাগ পরিকল্পিত। ভবানী-প্রসন্ন এবং রাধারানী পারস্পরিকভাবে পরকীয়া-প্রেমে আবদ্ধ হয়ে এই তত্ত্বকে জীবনে সত্য করে তুলেছে। লেখক অবশ্য 'আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়াঃ রাগঃ'—এই সূত্র অনুসরণ করে নায়িকা রাধারানীর দিক থেকেই রসের চরম পরিণতির চিত্রটি অঙ্কন করে তুলেছেন।

উপন্যাসের সূচনা হয়েছে এইভাবে :

'বৈশাখ মাস। পূর্ণিমা রজনী। চম্পকবেলিমোদিত বাগান।

নিভৃত লতামণ্ডপ। অনিন্দ্যরূপবতী, উচ্ছ্বসিত-যৌবনা রমণী। বিবিধ কলানুশীলনপটু সুশিক্ষিত সুপুরুষ। এসকলে মিলিয়া যাহা হইবার তাহা হইল।

ভবানীপ্রসন্ন ভাবে নাই এমনটি ঘটিবে। রাধারানী স্বপ্নেও মনে করিতে পারিত না, এমনটি ঘটিতে পারে। কিন্তু কে ঘটাইল, কে বলিবে ?'

ভবানীপ্রসন্ন বিবাহিত। রাধারানী বাল-বিধবা, ভবানীপ্রসন্নর স্ত্রী অন্নপূর্ণার দূরসম্পর্কের ভগিনী এবং দীর্ঘকাল ভবানী-অন্নপূর্ণার সংসারে আশ্রিতা। রাধারানী আযৌবন ব্রহ্মচারিণী, পুরুষ-সঙ্গ কাকে বলে তা' সে কোনোদিন জানতো না। সেদিন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বৈশাখী রজনীতে নির্জন লতা-কুঞ্জে অপ্রত্যাশিতভাবে ভবানীপ্রসন্নর বাহুবেষ্টনে আবদ্ধা হওয়ামাত্র তার এতদিনের কঠোর সংযমের বন্ধন অতর্কিতে শিথিল হয়ে গেল। লেখকের ভাষায়—'… প্রথম মিথুন যেমন করিয়া সহসা পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল, আজ এই স্বপ্নাবিষ্টা ব্রহ্মচারিণী যেন সেইভাবে তার এই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইল'।

এই ঘটনায় ভবানীপ্রসন্ন এবং রাধারানী উভয়ের মনে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। ভবানী প্রচ্ছন্ন অনুশোচনায় দেহে মনে কাতর হয়ে পড়লো। তার স্ত্রী অন্নপূর্ণা এবং অন্য লোকে প্রকৃত কারণ জানতে না পেরে মনে করলেন যে ভবানী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। লেখকের কথায়—'সেদিনের ব্যাপারে ভবানীর দেবত্ব ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে রাধারানী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। দেবতারূপে ভবানীকে হারাইয়া আজ তাহাকে রাধারানী মানুষরূপে পাইয়াছে। …রাধারানী কল্পিত দেবতাকে হারাইয়া আজ সত্য মানুষকে পাইয়াছে, তাই তার এত আনন্দ।'

এরপর ডাক্তারের পরামর্শে এবং অন্নপূর্ণার অনুরোধে ভবানী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একাকী তীর্থভ্রমণে গেল। রাধারানী বাড়ীতে অন্নপূর্ণার কাছেই রয়ে গেল। ভবানীপ্রসন্ন রাধারানীর দৃষ্টির বাইরে গিয়ে ক্রমশঃ তার দেহ, মন, স্নায়ুমণ্ডল, অনুভব ও ভাবনাকে গ্রাস করে ফেলল। যে ছিল এতদিন সাময়িকভাবে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়, সে এখন রাধারানীর কাছে অহরহ মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়ে উঠলো। এককথায়, সে ভবানীময় হয়ে উঠলো। চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকেও সে ভবানীর রূপ দেখতে লাগলো। 'বহিরিন্দ্রিয়

সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকেও' সে আপনার পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভবানীর সঙ্গ লাভ করতে লাগলো। রস এইভাবে যখন চরম পরিণতি লাভ করলো তখন স্বেদ, রোমাঞ্চ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, হর্ষঅশ্রু, ধূমায়িতা প্রভৃতি সাত্ত্বিকী বিকার তার দেহে প্রকাশিত হতে লাগলো। গুরুঠাকুর শ্রীহরিচরণ দেবশর্মার কাছে রাধারানী সেদিনের সেই লতা-কুঞ্জের কাহিনী অকপটে নিবেদন করেছিল। গুরুঠাকুর রাধারানীর ভাবান্তরের সমস্ত কাহিনী শুনে তাকে আশ্বস্ত করলেন এবং উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন যে সে যেন ভাগবত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাঠের পর একখানি খাতায় শুধু কৃষ্ণ কথাটুকু লিখে বারংবার সেটা পড়ে। তা'হলে কৃষ্ণলীলায় তার মন মগ্ন হবে এবং সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে যাবে। এই গুরু-উপদেশ অনুসরণ করে রাধারানী কেমনভাবে কামসম্পর্কবিহীনা লীলাময়ী নায়িকায় রূপান্তরিত হলো সেই কাহিনী 'রাগের পথে' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।

বাস্তবধর্মিতা উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু বাস্তবধর্ম এই উপন্যাসে দুর্বল। বাস্তবের মৃত্তিকা থেকে ঊর্ধ্বে ভাবলোকে কবি-কল্পনার অবাধ সঞ্চরণ—'রাগের পথে'র বৈশিষ্ট্য। মুখ্য চরিত্র দু'টিও রক্তমাংসের জীবন্ত মানব-মানবী না হয়ে লেখকের 'আইডিয়া'র ভাব-মূর্তি হয়ে উঠেছে। এই ধরনের রচনা বিশেষ কোনো শ্রেণীর কাছে উপভোগ্য হতে পারে, কিন্তু সর্বশ্রেণীর সাহিত্যরসিকের আনন্দ-বিধানের ক্ষমতা এর নেই, থাকতে পারে না।

বিপিনচন্দ্রের সাহিত্য-সৃজনের আকাঙ্ক্ষা শুধু উপন্যাস-রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, গল্প, কবিতা এবং গান রচনার মধ্যেও নিজেকে প্রসারিত করেছিল। তাঁর একখানি গল্পগ্রন্থ আছে ; নাম 'সত্য ও মিথ্যা'।[১৮৯] এছাড়া 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত (পৌষ, ১৩৩০) 'পরকীয়া' শীর্ষক গল্পটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

'সত্য ও মিথ্যা' পাঁচটি গল্পের সঙ্কলন-গ্রন্থ। গল্প ক'টিকে ছোট গল্প রূপেই গণ্য করা চলে। ছোট গল্পের সহজবোধ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে এডগার য়্যালান পো বলেছেন যে ছোটগল্প হচ্ছে সেই ধরনের বিবরণমূলক গদ্যরচনা 'যা' পড়তে আধ ঘণ্টা থেকে এক কি দু'ঘণ্টা লাগে'।[১৯০]

'সত্য ও মিথ্যা' গ্রন্থে বিবৃত গল্পগুলির কোনোটি পড়তেই এর চেয়ে বেশী সময় লাগে না। তা' ছাড়া, হাডসন সাহেব ছোটগল্পের গঠন-পরিকল্পনায় যে

'সিঙ্গলনেস্ অব্ এম' এবং 'সিঙ্গলনেস্ অব্ এফেক্ট' ১৯১ অর্থাৎ একমাত্র উদ্দেশ্য এবং একমাত্র ফলশ্রুতির কথা বলেছেন, তা'ও মোটামুটিভাবে এই গল্পগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

'সত্য ও মিথ্যা' এই নামকরণের তাৎপর্যটিও লক্ষণীয়। গল্প বাস্তব-জীবন-কাহিনীর শিল্পিত রূপ, সেইজন্য গল্প এক অর্থে 'সত্য'। আবার যেহেতু শিল্পিত রূপ, কাহিনীর অবিকল নকল নয়, সেই হেতু গল্প আর এক অর্থে 'মিথ্যা'।

বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের আদি প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা গল্পের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি। বিপিনচন্দ্র যখন গল্প-রচনার জন্য লেখনী ধারণ করেন, তখন জনপ্রিয় শিল্পরূপ হিসাবে ছোটগল্প বাংলা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সুতরাং গল্প-রচনায় বিপিনচন্দ্র প্রচলিত রূপ-রীতিকেই অনুসরণ করেছেন, নতুন কোনো দিগন্তের ইঙ্গিত রেখে যাননি।

'সত্য ও মিথ্যা' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্পের নাম 'লাবণ্য'। গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত। লাবণ্য পতিতা। গল্পের নায়ক তার রূপের লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়; কিন্তু সমাজের ভয়ে আত্মসংবরণ করে। গল্পের নায়কের এক গুরুভ্রাতা ব্রহ্মচারী ঐ পতিতার রূপ-লাবণ্যে আত্মসংযম হারিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং আপনার কাম-অভিলাষ ব্যক্ত করে। গৃহবর্তিনী পতিতাগণ অবশ্য ব্রহ্মচারীর ধর্মরক্ষা করে। তারা ব্রহ্মচারীকে ঘিরে কীর্তন গাইতে থাকে; ব্রহ্মচারী ঐ কীর্তনে যোগদান করে ক্রমে সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়ে। ঘটনাটি গুরুদেবের গোচর হলে গুরুদেব জানালেন—'সন্ন্যাস লইয়া স্বভাবকে শুদ্ধ করবার চাইতে রুদ্ধ করার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িলে, প্রকৃতি প্রতিশোধ লয়। মানুষমাত্রকেই যে ভক্তি করিতে না পারে, অন্য ধর্মকর্ম তার যাই হউক না কেন, সে কখনও ভগবানকে পায় না।'

গল্পটি নীতিশিক্ষামূলক (ডাইড্যাকটিক)। পতিতারও ধর্মবোধ থাকে, সেজন্য তার জীবিকার উপায়টি ঘৃণ্য হলেও মানুষ হিসাবে সে ঘৃণ্য নয়। রূপ-রীতির দিক থেকে গল্পটি তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও অঙ্গীকৃত ভাবের দিক থেকে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। পতিতার স্বপক্ষে এই ওকালতি অব্যবহিত পরবর্তীকালে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল।

দ্বিতীয় গল্পের নাম—'লণ্ডনে নন্দনলাল'। ধনীর দুলাল নন্দনলাল

ব্যারিস্টারি পড়তে বিলাতে গেল। প্রথমে সে এক পরিবারে অতিথি হয়ে বাস করতে করতে সেই দরিদ্র পরিবারের যুবতী কন্যা মেরীর প্রণয়াসক্ত হলো। কিন্তু বিলাতে তার অভিভাবক পিতৃবন্ধু স্যার জেমসের প্রতিকূলতায় মেরীর সঙ্গে তার মিলন হলো না। কোনো নেটিভ ভারতীয় যে ইংরেজদুহিতাকে বিবাহ করে—স্যার জেমস্ এটা পছন্দ করেন না। তিনি নন্দনলালকে স্থানান্তরিত করলেন। বিরহে মেরী প্রাণত্যাগ করলো। নন্দনলাল শোকে অসুস্থ হয়ে পড়লো।

নন্দনলালকে সুস্থ এবং প্রফুল্ল করবার জন্য স্যার জেমস্ লুসি নামে এক সুন্দরী যুবতী দাসীকে তার পরিচর্যায় নিযুক্ত করলেন। লুসির সঙ্গলাভে কিছুদিন পরে নন্দনলাল পূর্বশোক অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হলো, লুসির সঙ্গে তার অল্প ঘনিষ্ঠতাও জন্মালো। কিছুকাল পরে নন্দনলাল বাসস্থান পরিবর্তন করলে লুসির সঙ্গে তার সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটলো। তবে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রয়ে গেলো। এইভাবে কিছুকাল কাটলে একদিন লুসি কোলে একটি শিশু নিয়ে অতর্কিতভাবে আবির্ভূত হলো। তার হাবভাবে সে যেন বুঝাতে চায় যে শিশুটি নন্দনলালের ঔরসে তার গর্ভে জাত। নন্দনলাল বিস্মিত এবং বিমূঢ়। লুসি যেমন সহসা এসেছিল, তেমন সহসা চলে গেল।

এর পরেই আবির্ভূত হলো এক রুদ্রমূর্তি ইংরেজ-নন্দন। সে নিজেকে লুসির ভাই বলে পরিচয় দিল এবং শুরু হলো নন্দনলালকে কেলেঙ্কারীর ভয় দেখিয়ে অর্থশোষণ।

মাসছয়েক পরে নন্দনলাল বিলাতত্যাগে উদ্যত হলো। স্যার জেমসের সঙ্গে বিদায়-সাক্ষাৎ করতে গেলে দৈবক্রমে লুসির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। লুসি জানালো যে শিশুটি তার নয়, তার প্রভুর। সে নন্দনলালের সঙ্গে কৌতুক করেছিল মাত্র। যে ব্যক্তি লুসির ভাই পরিচয় দিয়ে অর্থশোষণ করেছিল, সে প্রকৃতপক্ষে লুসির ভাই নয়, এবং এই অর্থশোষণ তার অজ্ঞাতসারেই চলছিল। ভারমুক্ত নন্দনলাল দেশে ফিরে এলো। ইংরেজ-সভ্যতা তার সহ্য হলো না।

এটিও শিক্ষামূলক গল্প। বিলাতগামী ভারতীয় যুবকগণের বিড়ম্বনা ও ব্যর্থতার উদাহরণ। স্যার জেমসের উক্তি—'সাদায়-কালোয় বে' হয়, এটি আমি চাই না'। ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের মনোভাবের পরিচায়ক —চক্ষুরুন্মীলক।

তৃতীয় গল্প হচ্ছে—'মৃণালের কথা'। রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের প্রত্যুত্তর হিসাবে রচিত বিদ্রূপাত্মক গল্প। লেখকের বক্তব্য—স্বামী-সংসারই নারীর সব ; স্বামী-সংসারনিরপেক্ষ 'নারীত্ব' মিথ্যা ও দুষ্ট কল্পনা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মেজোবউ মৃণাল দীর্ঘকাল সংসারজীবনে আবদ্ধ থাকবার পর উপলব্ধি করেছে যে সংসার থেকে মুক্তি না পেলে প্রকৃত নারীত্বের স্বাদ পাওয়া যায় না। সুতরাং সে সংসার ত্যাগ করেছে।

বিপিনচন্দ্রের গল্প এইখান থেকে শুরু হয়েছে। মৃণাল পুরীতীর্থে এক আত্মীয়ের সঙ্গে বেড়াতে এসে আর স্বামীগৃহে ফিরলো না। তার ভাই শরৎকে নিয়ে পুরীতে এক বাড়ী ভাড়া করে বাস করতে লাগলো। মৃণালের স্বামী তার ভগিনীকে মৃণালের গৃহত্যাগের সংবাদ জানালে কটকনিবাসিনী ভগিনী তার দেবরকে 'মৃণালকে চোখে চোখে' রাখতে নিযুক্ত করলো।

এই দেবরটি মৃণালের ভাই শরতের বন্ধু এবং সেই সুবাদে মৃণালের গৃহে অতিথিরূপে আশ্রয় গ্রহণ করলো। মৃণাল এখন কবিতা লেখে এবং নিয়ত কাব্যচর্চা করে। এই কাব্যচর্চা উপলক্ষ করেই শরতের আর এক সাহিত্যিক বন্ধু এসে জুটলেন। এই সাহিত্যিকের সঙ্গে মৃণালের খুব মনের মিল হলো। একদিন এই নতুন বন্ধু সন্ধ্যাবেলায় মৃণালকে সমুদ্রতীরে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে মৃণালের শ্লীলতাহানি করতে উদ্যত হলো, কিন্তু সদাসতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত দেবর যথাসময়ে বাধা দেওয়ায় মৃণাল অধিক লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি পেল। কপট সাহিত্যিক জুতা-প্রহার খেয়ে বিদায় নিল।

এই ঘটনায় মৃণালের চৈতন্যোদয় হলো। সে স্বামীর সংসারে ফিরে যাবার জন্য মন স্থির করলো। অনুশোচনার সুরে স্বামীকে পত্র লিখে সে জানালো 'তোমায় যতদিন আমি কেবল আমারি মতন একজন মানুষ বলে ভাবতাম, ততদিন আমি আমার সত্য ঠাকুরকে পাই নাই। আর মানুষ ভেবেই তো তোমাকে এত অযত্ন, এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছি।···আপনার ভোগটাকেই বড় ভেবেছি···এবার এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বুঝলাম, দিয়েই সুখ, পেয়ে নয়।··যে আপনাকে বড় করে, সে-ই ছোট হয়ে যায়।···আমি তোমার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তোমার সমান হতে গিয়ে তোমাকেও ধরতে পাল্লাম না, নিজেকেও রাখতে পাল্লাম না। আজ এই কলঙ্কের কালি মেখে, তোমার চরণের ধূলি হয়ে, তোমাকেও ধরেছি, নিজেকেও পেয়েছি'।

বিপিনচন্দ্রের মতে স্বামীর ও স্বামীর পরিবারের মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়ে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারলে, তবেই নারী-জন্ম সার্থক। ভাব-বিলাসে মত্ত হয়ে পতি ও পতিগৃহ পরিত্যাগ করে নির্ঝঞ্ঝাট আনন্দোপভোগের চেষ্টা অজ্ঞাতসারে বৃহত্তর ঝঞ্ঝাটকেই ডেকে আনে।

বিপিনচন্দ্রের মতে রবীন্দ্রনাথের মৃণাল হিস্টিরিয়াগ্রস্ত—অর্থাৎ অল্পবিস্তর পাগল। রবীন্দ্রনাথের মৃণালের পাগলামিকে তিনি স্ব-সৃষ্ট মৃণালের রহস্যময় আচরণের মাধ্যমে স্ফুটতর করে তুলেছেন। বিপিনচন্দ্রের মৃণাল কখনও তার শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী—শ্যামপুকুর থেকে টালা—সোজাপথে যায় না। শিয়ালদহে রেলে চেপে দমদম গিয়ে, সেখান থেকে ছ্যাকড়াগাড়ীতে সে টালায় গেছে। একবার শোভাবাজারে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় নৌকায় উঠে, বাগবাজারে এসে রাত্রে রান্নাবান্না করে, পরের দিন সকালে শ্যামবাজারের পোলের কাছে নৌকা লাগিয়ে, পালকি করে বাপের বাড়ী গেল। সুতরাং তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল-চরিত্র অপ্রকৃতিস্থ নারীত্বের প্রতিচ্ছবি। পাঠক-পাঠিকার মনে এই ধরনের চরিত্র, তাঁর মতে, শুভ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

চতুর্থ গল্প হলো 'কল্যাণী'। এই গল্পটিও উত্তম পুরুষে বর্ণিত। কল্যাণী লেখকের অধ্যাপক রাধামাধববাবুর কন্যা এবং বন্ধু ললিতের পত্নী। বিবাহের পর ললিত পত্নীপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে বন্ধু-বান্ধব, বিষয়-কর্ম, সব পরিত্যাগ করলো। বছরখানেক পরে কল্যাণী একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে ললিতের গৃহত্যাগ করে চলে গেল। একখানি পত্র রেখে গেল, কিন্তু গৃহত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা বা গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ দিল না। ঘটনাচক্রে মনে হলো যে সে এক পূর্ব-পরিচিত যুবকের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে যাত্রা করেছে।

কল্যাণীর গৃহত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় ললিত সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করলো। উপন্যাস লিখে সে খ্যাতি অর্জন করলো এবং নাটক রচনা ও পরিচালনায় নিজেকে ব্যস্ত করে তুললো। রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে এসে এক অভিনেত্রীর সঙ্গে তার যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মালো। সে ঐ অভিনেত্রীকে বিবাহ করতে মনস্থ করলো। অভিনেত্রী হলেও সে কুলকামিনী, কুলটা নয়। তার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই কুলীনসমাজভুক্ত। তার মা বালবিধবা এবং পিতা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। তার পিতা হিন্দু বা ব্রাহ্ম—কোনো সামাজিক প্রথায় তার

মাকে বিবাহ না করলেও উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্ক পবিত্র ছিল, তবে সামাজিক সম্মান ছিল না। অভিনেত্রী ললিতকে সত্যই শ্রদ্ধা করতো, সুতরাং ললিতের বিবাহ-প্রস্তাবে সে সম্মত হলো না এবং এক পত্রে ললিতকে আপন জীবনেতিহাস জানিয়ে দিল।

অবশেষে জানা গেল, কল্যাণী ব্রহ্মদেশে বা অন্য কোথাও কু-উদ্দেশ্যে যায়নি। ললিতের মোহভঙ্গের জন্যই তার পিতার গুরুদেবের কাশীর আশ্রমে আত্মগোপন করে ছিল। পুত্রবতী কল্যাণীর সঙ্গে অভিনেত্রী মঞ্জরী একত্রে লেখককে সংবর্ধনা করলো। গুরুদেব জানালেন যে মঞ্জরী তার শিষ্যা এবং কল্যাণী এখন পিতৃগৃহে ফিরে যাবার জন্য উৎসুক।

প্রকৃতপক্ষে এখানেই গল্পের শেষ। গল্পটির উপসংহারে নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ধর্ম-রহস্যের অলৌকিকতার মধ্যে উপসংহার টানা হয়েছে বলে আর্টের সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ললিতকে মোহমুক্ত করাবার উদ্দেশ্যে কল্যাণীর পতিগৃহত্যাগ ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকের সুমিত্রার জালন্ধর রাজ্য-পরিত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'রাজা ও রানী' অবশ্য অনেক পূর্ববর্তী রচনা।

'সত্য ও মিথ্যা' গল্পগ্রন্থের আর একটি গল্প—'বাৎসল্যের আতিশয্য'। এই গল্পেও লেখকই গল্পের কথক। লেখকের বাল্যবন্ধু নগেন একটু বেশী বয়সে বিবাহ করে। তার স্ত্রী নলিনীসুন্দরী, কিন্তু প্রসাধনের ব্যাপারে সে অপটু ও অমনোযোগী। নগেনের ইচ্ছা, নলিনী একটু প্রসাধন-পারিপাট্যের দিকে মন দিক, কিন্তু নলিনী কিছুতেই তার সে ইচ্ছা পূরণ করতো না। স্বামীর আদর-যত্নের দিকেও তার মন ছিল না।

ক্রমে নলিনীর দু'টি পুত্র ও তিনটি কন্যার জন্ম হলো। নলিনী সন্তানদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে, নগেনের যত্ন করবার তার সময় হয় না। বরং ক্রমে নগেনের অশনেবসনেও টান পড়লো। স্ত্রীর অনাদরে এবং আত্মগ্লানিতে সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। অসুস্থ অবস্থায় সেবাযত্ন পাওয়া দূরে থাক, নিয়মমতো পথ্য পাওয়াও তার ভাগ্যে ঘটে না। অথচ তার সংসারে পাচক আছে, পরিচারক আছে। অফিস থেকে ফিরে আসবার সময় নগেন কিছু ছাতু কিনে আনতো এবং তাই দিয়ে পথ্য করতো। নগেন সেবা-শুশ্রূষার কথা উত্থাপন করলেই নলিনী বলতো—'নিত্য রোগী দেখে কে?'

স্ত্রীর অবহেলায়, অত্যাচারে নগেন চল্লিশ বছরেই জরাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। অবশেষে একদিন সে বিরক্ত হয়ে চাকুরি ছেড়ে সংসার ত্যাগ করলো। তার সমস্ত সম্পত্তি তাদের সন্তানদের জন্য ন্যাস করে রেখে গেল এবং লেখককে ঐ ন্যাসের অছি নিযুক্ত করলো।

'বাৎসল্য'-এর আতিশয্যের চাপে কী ভাবে 'মধুর'-এর অপমৃত্যু ঘটে—এই গল্পে বিপিনচন্দ্র তারই একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন।

বিপিনচন্দ্রের সাহিত্য-চিন্তায় নিছক কলাকৈবল্যবাদের স্থান ছিল না,—একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। সমগ্র চিন্তার অঙ্গ হিসাবে তাঁর সাহিত্য-চিন্তাও ছিল উদ্দেশ্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত। সে উদ্দেশ্য – সমাজ ও সামাজিক মানুষের কল্যাণ। এই পর্যায়ের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হবে যে 'উপন্যাস ও গল্প' রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর সৃজনী-কল্পনার ধমনী ও শিরায় সদ্যোক্ত উদ্দেশ্যবাদ প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত হয়েছে।

॥ কবিতা ও গান ॥

'উপন্যাস এবং গল্প ব্যতীত বিপিনচন্দ্র কিছুসংখ্যক কবিতা এবং গানও রচনা করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র-রচিত কবিতা এবং গানগুলি যথাক্রমে পরিশিষ্ট-'খ' অংশে সংযোজিত হলো।

বিপিনচন্দ্র-রচিত যে কয়টি কবিতা পাওয়া গেছে, তার মোট সংখ্যা হচ্ছে—পনের। এগুলির মধ্যে এগারোটি ১৩১২-১৩ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন'-এ আর চারটি ১৩২২-২৩ বঙ্গাব্দে 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'বঙ্গদর্শন'-এ কবিতাগুলি দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। প্রথম কিস্তিতে (কার্তিক, ১৩১২ : অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯০৫) প্রকাশিত কবিতাগুলির নাম যথাক্রমে : (১) স্বদেশ (২) ব্রত (৩) ভিখারী (৪) উপনয়ন (৫) আগ্নেয়গিরি (৬) প্রলয় এবং (৭) বঙ্গবিভাগ। দ্বিতীয় কিস্তিতে (বৈশাখ, ১৩১৩ : এপ্রিল—মে ১৯০৬) প্রকাশিত কবিতাগুলির নাম যথাক্রমে : (১) পূজারী (২) জীর্ণতরী (৩) পাদপাদপ এবং (৪) সন্ন্যাস। কবিতাগুলি বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী-আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকায় রচিত। তাই কবিতাগুলি উচ্ছ্বসিত দেশাত্মবোধের সজীব প্রাণ-রসে উদ্দীপিত। প্রত্যেকটি কবিতা চৌদ্দ চরণে গঠিত এবং প্রত্যেক

চরণের মাত্রা-সংখ্যাও চৌদ্দ। একমাত্র 'ভিখারী' শীর্ষক কবিতাটি ব্যতিক্রম, তেরোটি চরণে সমাপ্ত। সুতরাং এগুলি যে 'চতুর্দশপদী কবিতা'র ঢঙে রচিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে চতুর্দশপদী হলেও ঠিক সনেট-পদবাচ্য নয়। কারণ, কয়েকটি কবিতার প্রথম চারটি চরণে সনেটের আদর্শে মিত্রাক্ষর-স্থাপনের প্রয়াস দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে অবয়ব-গঠনে সনেটের রূপ-রীতি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হয়নি। প্রত্যেকটি কবিতার কায়ায় সনেটের ঘনপিনদ্ধতা আছে, কিন্তু স্তবকবন্ধনে অষ্টক এবং ষট্‌ক বিভাগ লক্ষ্য করা যায় না। অথচ চরণের অভ্যন্তরে ছেদ ও যতি ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য রচয়িতার ছন্দের উপর নিপুণ অধিকারের স্বাক্ষর বহন করে।

'স্বদেশ' শীর্ষক কবিতায় নবজাগ্রতা দেশমাতৃকার যে বাণী-মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে, তা' দৈন্যে দীর্ণ, অপমানে জীর্ণ এবং বেদনায় বিষণ্ণ :

> বেদনার মাঝে আজি জেগেছে চেতনা,
> পেয়েছি তোমার দেখা হে মোর স্বদেশ !
> নত-আঁখি জল-ভরা ছিন্ন চীরবেশ
> শিয়রে দাঁড়ায়ে আছ কথা কহিছ না।......

'ব্রত' শীর্ষক কবিতায় দেশ-মাতৃকার মুক্তি-যজ্ঞে অংশ-গ্রহণের জন্য 'বঙ্গ-কুলাঙ্গনাগণ'কে আহ্বান জানানো হয়েছে :

> ওগো বঙ্গকুলাঙ্গনা সতীলক্ষ্মীগণ,
> আজি বঙ্গমাতা কাঁদি তোমাদের দ্বারে
> হানিছেন কর। ... ...
> আর কিছু নয় শুধু চাহিছেন তিনি
> রমণীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত উদ্‌যাপনা
> তোমাদের ঘরে, যার পুণ্যফলে জিনি
> লভে পৌরুষ রতন—হৃত কোহিনুর
> ভারতের।

'বঙ্গবিভাগ' শীর্ষক কবিতায় বঙ্গভঙ্গজনিত আঘাতকে বঙ্গের নবজাগরণের ভূমিকারূপে ব্যাখ্যা করে বঙ্গজননীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়েছে :

> রাজার শাণিত খড়্গ নিষ্ঠুর আঘাতে
> পারেনি করিতে দ্বিধা তোমারে স্বদেশ !

শুধু ভাঙিয়াছে তব নিদ্রার আবেশ,
দিয়াছে চেতনা। আজি নবীন প্রভাতে
যুগযুগান্তের সুপ্ত নিমীলিত আঁখি
মেলিয়াছ, হেরিতেছ তরবারি-লেখা
বিদারণ রেখাগুলি স্থিরদৃষ্টি রাখি
রুধিরাক্ত বক্ষোপরি।··· ···

'সন্ন্যাস' শীর্ষক কবিতায় স্বদেশের কল্যাণের জন্য সমস্ত দ্বিধা শঙ্কা বিসর্জন দিয়ে অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের সঙ্কল্প উচ্চারিত হয়েছে:

কার লাগি আগুপিছু? কুলিশকঠোর
কর চিত্ত, লহ দীক্ষা নব জীবনের।
হে স্বদেশ, গুরু মোর তাপস নির্বাক,

*   *   *

সর্ববাধাবন্ধহীন নির্মুক্ত বৈরাগী
কর মোরে! ··· ···
··· ··· অগ্নিমন্ত্র তবু
নিত্য জপি' চিত্ত মাঝে হে অন্তরতম,
সর্বদ্বিধাশঙ্কাহীন মৃত্যুঞ্জয়ী হব।

'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত (জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩২৩) তিনটি কবিতা— 'পিরীতি', 'রূপ' এবং 'পূর্বরাগ' (নায়িকার পক্ষে এবং নায়কপক্ষে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে লঘু ত্রিপদী-বন্ধে রচিত। প্রতি চরণে পর্ব-সংখ্যা তিন। মাত্রাসঙ্কেত যথাক্রমে: ছয়+ছয়+আট=কুড়ি। যেমন—

১। পুছিও না মোরে সে কেমন জন বলিতে নারিব আমি।
নয়ন দেখেছে, নয়ন না জানে, কেমন সে রূপখানি॥
(রূপ)

২। কি বলিব সখি, বলিবার এ কি, বলিলে বুঝিবে কে?
শুন, বিপরীত মিলায়ে বিধাতা, গড়েছে পিরীতে দে'॥
(পিরীতি)

৩। বসন্ত দুপুরে আঙিনার ধারে
বসিয়া বকুল-ছায়!

অপরূপ রূপ লাগিনু আঁকিতে
যেমন পরাণে ভায় ॥

(পূর্বরাগ—নায়িকার পক্ষে)

'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে বিপিনচন্দ্রের কবি-প্রতিভার প্রসন্ন স্বাক্ষর বহন করে, তবে 'নারায়ণ'-এ প্রকাশিত কবিতাগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণের জন্য গতানুগতিক রচনা।

পরিশিষ্ট-অংশে সংযোজিত ছয়খানি গানের মধ্যে দু'খানি 'স্বদেশী গান' এবং বাকী চারখানি 'ব্রহ্মসঙ্গীত'। স্বদেশ-ভক্তি এবং স্বদেব-ভক্তির আন্তরিক আবেদনে গানগুলি সার্থক রচনা।

Literature Vol. I ; H. A. Taine, D. C. L. London, 1899, Introduction, P. 10.

(১১) The Study of Hinduism ; B. C. Pal, Pp. 122-23.

(১২) 'জয় রাধে গোবিন্দ। বল, রাধে গোবিন্দ।' : বিপিনচন্দ্র পাল, 'প্রবাহিণী' (সাপ্তাহিক), ২রা শ্রাবণ, ১৩২১ : ১৯১৪।

(১৩) 'Sri Krishna : The Prophet of Race Fusion in India' (Written on August 26, 1905), *vide* 'Writings and Speeches', Vol. I : B. C. Pal, 1958, Pp. 58-64 ; 'The Soul of India' : B. C. Pal (First published in 1911) ;

'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' ; বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়)—ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ও পৌষ, ১৩২০ (১৯১৩) ; 'যৌবনে কৃষ্ণকথা' ; প্রবাহিণী ৯ই শ্রাবণ, ১৩২১ ; 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' : নারায়ণ—পৌষ, ১৩২১ থেকে ভাদ্র, ১৩২৩ এর (১৯১৪-১৬) মধ্যে ধারাবাহিকভাবে ১৩টি সংখ্যায় প্রকাশিত ; 'শ্রীকৃষ্ণ' : প্রবর্তক—মাঘ, ফাল্গুন, ১৩২৯, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ, ১৩৩০ (১৯২২-২৩) ; 'শ্যামমেব পরং রূপম্' : নারায়ণ, আষাঢ়, ১৩২৫ ; 'তদুচিত গৌরচন্দ্র' : নারায়ণ—বৈশাখ, ১৩২৩ (১৯১৬) ;

'Sri Krishna' : B. C. Pal (First published in 'The Bengalee' in 1925 in the form of 'Letters written to a Christian Friend') প্রভৃতি।

(১৪) 'বাংলা সাহিত্যের নবযুগ' : শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ৪র্থ সং ১৩৫৯, পৃঃ ১৭৩।

(১৫) ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম' নামে ধারাবাহিকভাবে 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় মুদ্রিত হতে থাকে। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ—১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ।

(১৬) 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম' : গৌরগোবিন্দ রায়, ৪র্থ সং ১৯৪০, অবতরণিকা, পৃঃ ৵০।

(১৭) বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত' (১ম) ১৮৮৬ ; নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' (যথাক্রমে ১৮৮৭, ১৮৯৩, ১৮৯৬) তুলনীয়।

(১৮) ত্রিপুরাশঙ্কর সেন ; পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৮।

(১৯) 'The Soul of Europe and America in Christ : The Soul of India is, in the same way, Shree Krishna'.—'Author's Apologia'.—The Soul of India : B. C. Pal, 1958.

(২০) 'Shree Krishna reveals the full Life, Light and Love of the Supreme Being. This is why he is regarded as the complete or the highest and most perfect Avatara'—'Incarnation of Iswara'—Shree Krishna : B. C. Pal, 1964, P. 18.

(২১) 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' : নারায়ণ, পৌষ, ১৩২১।

(২২) 'The Study of Hinduism' : B. C. Pal, 1968, P. 26.

(২৩) Ibid, P. 35.

(২৪) Ibid, P. 88.

(২৫) 'Indeed, as Nature formed an essential factor in the life of man, so did also society, at every stage of its growth'.—The Study of Hinduism : B. C. Pal, P. 63.

(২৬) Ibid, P. 64

(২৭) 'বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা ও দুর্গোৎসব' : সাহিত্য ও সাধনা—বিপিনচন্দ্র পাল, ২য় খণ্ড, ১৯৬০, পৃঃ ২।

(২৮) 'যৌবনের টানে' : প্রবাহিণী—ভাদ্র ৫, ১৩২১ (১৯১৪)।

(২৯) 'বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা ও দুর্গোৎসব' : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩।

(৩০) 'ভগবদ্‌গীতা'—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১২।

(৩১) 'নবজীবন' : বিপিনচন্দ্র পাল—'আলোচনা', ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা ১৮০৬-০৭ শকাব্দ (১৮৮৪-৮৫), পৃঃ ২৫-২৯।

(৩২) 'আভাস ও আকাঙ্ক্ষা'—জেলের খাতা : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ১০২।

(৩৩) 'স্বধর্ম ও পরধর্ম'। বিপিনচন্দ্র পাল, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ (১৯১০)।

(৩৪) 'আচার ও প্রচার' : বিপিনচন্দ্র পাল, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৭ (১৯১০)।

(৩৫) ঐ ঐ ঐ

(৩৬) 'হিন্দুর ধর্ম' : বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১৩১৮ (১৯১২); 'হিন্দুধর্মের সার্বজনীনতা' : বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১৩১৮; 'হিন্দুধর্মের বিচিত্রতা' : বঙ্গদর্শন. আষাঢ়, ১৩১৯; 'হিন্দুধর্মের বহুমুখীনতা' : বঙ্গদর্শন ভাদ্র, ১৩১৯ (১৯১২)। 'হিন্দুধর্মের বিচিত্রতা' শীর্ষক প্রবন্ধ বিপিনচন্দ্রের ছদ্মনাম 'শ্রীহরিদাস ভারতী' নামে প্রকাশিত। এই নামেই তাঁর উপন্যাস 'শোভনা' প্রকাশিত হয়। দ্রঃ Works of Bipin Chandra Pal (A Bibliography) compiled by Pulin Behari Sen : Studies in the Bengal Renaissance, Jadavpur, 1958, P. 599.

(৩৭) প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত।

(৩৮) 'Memories of My Life and Times' : B. C. Pal, Vol. II, Foreword, P. V.

(৩৯) 'ব্যক্তি ও সমাজ' : বিপিনচন্দ্র পাল.(ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সম্মিলনে প্রদত্ত ভাষণের ইন্দ্রকুমার চৌধুরী কর্তৃক গৃহীত অনুলেখন।) নব্যভারত, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৩২ (১৯২৫)।

(৪০) 'সমাজ-শক্তি' : বিপিনচন্দ্র পাল, 'আলোচনা' ২য় খণ্ড, ১৮০৭-০৮ শকাব্দ (১৮৮৫-৮৬), পৃঃ ৩-১৫।

(৪১) 'নূতনে পুরাতনে' : বিপিনচন্দ্র পাল, 'নারায়ণ', অগ্রহায়ণ, ১৩২১ (১৯১৪; ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)।

(৪২) 'সামাজিক সমস্যা'; বিপিনচন্দ্র পাল, 'বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ (১৯১১)।

(৪৩) 'অমৃত গরল' : বিপিনচন্দ্র পাল; 'আলোচনা', ১ম খণ্ড, শ্রাবণ, ১৮০৭ শকাব্দ (১৮৮৫), পৃঃ ৩৮৭-৯৪।

(৪৪) 'বাঙালীর বাল্যক্রীড়া ও তাহার বিষময় ফল (প্রথম প্রস্তাব): বিপিনচন্দ্র পাল; 'আলোচনা', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১-১২।

(৪৫) প্রবন্ধটি ১২৯২-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত।

(৪৬) 'অক্ষয়বাবু ও বিধবাবিবাহ': বিপিনচন্দ্র পাল, 'আলোচনা', ১ম খণ্ড পৃঃ ৩০৫-২৬।

(৪৭) 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম': শ্রীহরিদাস ভারতী, 'বঙ্গদর্শন' বৈশাখ, ১৩১৯ (১৯১২)। 'রাষ্ট্রনীতি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'স্বদেশী বা জাতীয়তা' শীর্ষক প্রবন্ধেও বর্ণাশ্রম-ধর্ম সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে।

(৪৮) 'শ্রাদ্ধের কথা': বিপিনচন্দ্র পাল; 'বিজয়া', শ্রাবণ, ১৩২১ (১৯১৪)।

(৪৯) 'হিন্দুশ্রাদ্ধের অর্থ ও অধিকার': সাহিত্য ও সাধনা, ২য় খণ্ড; বিপিনচন্দ্র পাল, ১৯৬০, পৃঃ ৯।

(৫০) 'সাম্যবাদ ও সাম্যসাধন': বিপিনচন্দ্র পাল; 'সাহিত্য', বৈশাখ, ১৩২৯ (১৯২২)।

(৫১) '...আমরা সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখন হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে—কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক—কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চা'হ' —'সাম্য (উপসংহার)': বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬, পৃঃ ৪০৬।

(৫২) 'The purpose of society would be frustrated at the outset if the nature of a mathematician met an identical response with that to the nature of a brick layer. Equality does not even imply identity of reward for effort so long as the difference in reward does not enable me, by its magnitude, to invade the right of others'.—A Grammar of Politics'—Harold J. Laski, Fifth edition, London, 1967, Pp. 152-53.

(৫৩) 'আমার মন'—কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬২।

(৫৪) এই প্রবন্ধগুলি ছাড়া বিপিনচন্দ্রের 'Swadeshi & Swaraj' গ্রন্থের সমস্ত প্রবন্ধ, 'Writing and Speeches, Vol. I' এবং 'Nationality and Empire' গ্রন্থের অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং 'নবযুগের বাংলা' গ্রন্থের 'বঙ্কিম-সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি' শীর্ষনামীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত 'ব্যক্তি, সমাজ, বিশ্বমানব' নামধেয় অংশ এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য।

(৫৫) 'রাজধর্ম': বিপিনচন্দ্র পাল; 'ভাণ্ডার', বৈশাখ, ১৩১২ (এপ্রিল—মে, ১৯০৫—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)।

(৫৬) 'The Community perpetually retains a supreme power of saving themselves from the attempts and designs of anybody, even of their legislators, whenever they shall be so foolish or wicked as to lay and

carry designs against the liberties and properties of the subject'.—Treatises on Government, II : John Locke, P. 149.

(৫৭) 'রাজা ও প্রজা' : বিপিনচন্দ্র পাল ; বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), আশ্বিন, ১৩১২ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৫)।

(৫৮) (ক) 'বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা' : বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১৩১২ (অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯০৫)।

(খ) 'বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা' : বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০৫)।

(৫৯) 'স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজম্' প্রবন্ধটি 'শ্রীঃ' ছদ্মনামে (বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১৩১২) এবং 'নেশন বা জাতি' প্রবন্ধটি পূর্বোক্ত প্রবন্ধের অনুবৃত্তিরূপে (বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩১৩) বিপিনচন্দ্র পালের স্বনামে প্রকাশিত। প্রথম প্রবন্ধটি এবং তার প্রথম অনুবৃত্তি যথাক্রমে 'স্বদেশী বা জাতীয়তা' এবং 'নেশন বা জাতি' শিরোনামে বর্তমানে বিপিনচন্দ্রের 'রাষ্ট্রনীতি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

(৬০) (ক) 'জিজ্ঞাসা' : শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্মা, বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ (১৯০৬)।

(খ) 'জিজ্ঞাসায় নিবেদন' : শ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তী, বঙ্গদর্শন, আষাঢ়, ১৩১৩ (১৯০৬)।

(৬১) (ক) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ' : রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গদর্শন ; জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮ (১৯০১) (খ) 'নেশন কি' : রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গদর্শন (সাহিত্য-প্রসঙ্গ), শ্রাবণ, ১৩০৮ (১৯০১)। (গ) 'হিন্দুত্ব' : রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১৩০৮। প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। (ঘ) 'রাষ্ট্র ও নেশন' : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩০৮ (১৯০১)।

(৬২) 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা-সাহিত্য' : সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৬৭, পৃঃ ৬৮।

(৬৩) ঐ ঐ পৃঃ ৬৯।

(৬৪) 'India's Fight for Freedom' : Profs. Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, 1958, P. 167.

(৬৫) (ক) শিবাজী-উৎসব : বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩১৩, (১৯০৬)।

(খ) শিবাজী-উৎসব ও ভবানীমূর্তি : বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১৩১৩, (১৯০৬)।

(৬৬) ১৩১৪ সালের আশ্বিন সংখ্যার বঙ্গদর্শনে যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিপিনচন্দ্রের 'শিবাজী-উৎসব ও ভবানীমূর্তি' শীর্ষক প্রবন্ধের বক্তব্যের সমালোচনা করে 'শিবাজী-উৎসব' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

(৬৭) 'কংগ্রেসী কথা' : বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০৬)।

(৬৮) 'আবেদন ও আন্দোলন' : বিপিনচন্দ্র পাল, ভারতী, ফাল্গুন, ১৩১৩ (১৯০৭)।

(৬৯) 'রাজভক্তি' : বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১৩১৪ (জুলাই—আগষ্ট, ১৯০৭)।

(৭০) 'ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত, একথা সত্য। হিন্দু-ভারতবর্ষের রাজভক্তির একটু বিশেষত্ব আছে। হিন্দুরা রাজাকে দেবতুল্য ও রাজভক্তিকে ধর্মস্বরূপে গণ্য করিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্যগণ একথার যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন না।...' 'রাজভক্তি': রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাণ্ডার, মাঘ, ১৩১২। দ্রঃ 'রাজা প্রজা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৮

(৭১) 'ইজ্জৎ', শ্রীঃ,—বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১৩১৫ (জুলাই—আগস্ট, ১৯০৮)

(৭২) 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা-সাহিত্য': সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৬৭, পৃঃ ৭৪

(৭৩) 'ভারতের ভবিষ্যৎ ও লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন-নীতি': বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১৩১৯ (১৯১৩)

(৭৪) Provincial Autonomy has been mentioned in the Despatch of August, 1911, not as a definite pledge, but as a distant ideal. Here Lord Hardinge's Government, sowed, so to say, the seed of the future Constitution of India'.—Nationality and Empire—B. C. Pal, P. 167.

(৭৫) 'আমরা কি চাই?': বিপিনচন্দ্র পাল; 'নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এবং শ্রাবণ, ১৩২৮ (১৯২১); 'অনধীনতা না স্বাধীনতা', নব্যভারত ভাদ্র, ১৩২৮ (১৯২১); 'স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', নব্যভারত, আশ্বিন, ১৩২৮ (১৯২১); 'কঃ পন্থা?', নব্যভারত, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ (১৯২১)।

(৭৬) 'The Hindu Concept—Swadheenata'—Nationality and Empire: B. C. Pal, 1916, P. 33.

(৭৭) 'বিপিনবাবুর কঃ পন্থা?': শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্মা; নব্যভারত, মাঘ, ১৩২৮ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯২২)।

(৭৮) 'হিন্দু-মুসলমান আঁতাত': বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গবাণী (বৈঠকী কথা), শ্রাবণ, ১৩৩০ (১৯২৩); 'রাষ্ট্রীয় ভারত—হিন্দু ও মুসলমান': বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গবাণী (বৈঠকী কথা), আশ্বিন, ১৩৩০ (১৯২৩)।

(৭৯) নাট্যকলা ও রসতত্ত্ব: বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১৩১৩ (১৯০৬)

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা:	ঐ	অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ (১৯১২)
কাব্যের লক্ষণ:	ঐ	'এষা' শীর্ষনামে ১৩২০-র আষাঢ়, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যার পরিবর্তিত নাম।
কবিতার কষ্টিপাথর:	নারায়ণ	ভাদ্র, ১৩২২ (১৯১৫)
ধর্ম, নীতি ও আর্ট:	ঐ	আশ্বিন, ১৩২২
ধর্ম ও আর্ট:	ঐ	অগ্রহায়ণ, ১৩২২

(৮০) 'বাংলা সমালোচনা পরিচয়'—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, মাঘ, ১৩৭৬, পৃঃ ১২১।

(৮১) 'বিবিধ প্রবন্ধ', ১ম খণ্ড, বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ, ১৩৬৬, পৃঃ ১৮২

(৮২) বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ, ১৩৬৬ পৃঃ ৮৫৪।

(৮৩) 'বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় খণ্ড, বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ, পৃঃ ২৫৮।

(৮৪) ধর্ম ও আর্ট: নারায়ণ, অগ্রহায়ণ ১৩২২। দ্রঃ সাহিত্য-সাধনা, ২য় খণ্ড, বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ৩০-৩১।

(৮৫) 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা' : বিপিনচন্দ্র পাল ; 'বিজয়া' ও বঙ্গদর্শন' ; অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ (১৯১২)। বর্তমানে 'সাহিত্য ও সাধনা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত।

(৮৬) 'সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি' : নবজীবন, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১২৯৩ (১৮৮৭)।

(৮৭) 'The primary IMAGINATION I hold to be the living power and prime Agent of all human Perception,...The secondary Imagination I consider as an echo of the former, co-existing with the conscious will,...It dissolves, diffuses, dissipates, in order to recreate ; or where this process is rendered impossible, yet still at all events it struggles, to idealize and to unify'.—Coleridge. Quoted in 'Literary Criticism' : W. K. Wimsatt, Jr. & Cleanth Brooks, 1967, P. 389.

(৮৮) সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা : সাহিত্য ও সাধনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮-১৯।

(৮৯) 'বাংলা সমালোচনা পরিচয়' : শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃঃ ১২২-২৩।

(৯০) 'কবিতার কষ্টিপাথর' : বিপিনচন্দ্র পাল, নারায়ণ, ভাদ্র, ১৩২২ (১৯১৫)।

(৯১) 'এষা' : বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩২০ (১৯১৩)। 'কাব্যের লক্ষণ' নামে বিপিনচন্দ্রের 'সাহিত্য ও সাধনা' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত ; পৃঃ ৭৬।

(৯২)

বঙ্গদর্শন,	চৈত্র	১৩১৮	বিপিনচন্দ্র পাল :	চরিত্রচিত্র—রবীন্দ্রনাথ
প্রবাসী,	আষাঢ়	১৩১৯	অজিতকুমার চক্রবর্তী :	রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন ?
বঙ্গদর্শন,	অগ্রহায়ণ,	১৩১৯	বিপিনচন্দ্র পাল :	সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা
সবুজপত্র,	বৈশাখ,	১৩২১	রবীন্দ্রনাথ :	বিবেচনা ও অবিবেচনা
প্রবাসী,	জ্যৈষ্ঠ,	১৩২১	রাধাকমল মুখোপাধ্যায় :	লোকশিক্ষক বা জননায়ক
সবুজপত্র,	শ্রাবণ,	১৩২১	রবীন্দ্রনাথ :	বাস্তব
ঐ	মাঘ,	১৩২১	রাধাকমল মুখোপাধ্যায় :	সাহিত্যে বাস্তবতা
ঐ	ঐ	ঐ	প্রমথ চৌধুরী :	বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি ?
সাহিত্য	বৈশাখ,	১৩২২	রাধাকমল মুখোপাধ্যায় :	সাহিত্য ও স্বদেশ

(৯৩) "...realism as an aesthetic norm comes into view not only for literary but for pictorial art at about the same time, in the exhibition by Courbet of 1855 and the publication of Flaubert's Madame Bovary in 1856. Flaubert's theory of realism was concerned with the professional procedures of a novelist. He conceived a scientific detachment, a coolness and care, in the observation of materials. ...Inherent in its sociological implications, the here and now democratic 'truth' which is pursued, was the notion of the ordinary, and hence the notion of the monotonous, the meagre, the drab, the under-privileged, even the

seamy. And the realism rather quickly intensified into the phase called 'naturalism'. Of this phase the greatest exponent was Zola. Literary 'realism' and 'naturalism' constituted an aesthetic centred in the prose novel, which was the literary genre most directly dedicated to the social problems of the 19th century.'—Literary Criticism ; W. K. Wimsatt. Jr. & Cleanth Brooks, Pp. 456-57.

(৯৪) (১) 'বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম' : শ্রীপ্রেমদাস বাবাজী : আলোচনা, ১ম খণ্ড (১৮০৬-০৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দ)। সূচীপত্রে বিপিনচন্দ্রের রচনার তালিকা-ভুক্ত।

(২) 'রাধিকার প্রেম' (২ দফায় প্রকাশিত)। আলোচনা, ২য় খণ্ড (১৮০৭-০৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দ)। প্রথম খণ্ডে সূচীপত্রে লেখকের নাম আছে।

(৯৫) বাংলা সমালোচনা পরিচয় : শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৪৯।

(৯৬) 'বাংলার বৈশিষ্ট্য (মানবতার সাধন) নবযুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ১৫।

(৯৭) 'But the boldest and the grandest achievement of the Vaishnava thought of Bengal is its conception of the Absolute as the Perfected Man. This idea is older than Shree Chaitanya Mahaprabhu, the founder of the Bengal school of Vaishnavism'.—'Bengal Vaishnavism' : B. C. Pal, 1962, P. 28.

(৯৮) বাংলা সমালোচনা পরিচয় : শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৪৯।

(৯৯) 'The Sport or Leela of the Lord, which is the very plinth and foundation of the philosophy and art of Bengal Vaishnavism, is therefore, an eternal process of differentiation and integration, Prakriti separating Hereslf from Purusha and eternally striving to be re-united to Him. This is the Central idea in the whole scheme of Bengal vaishnavism'.—Bengal Vaishnavism : B. C. Pal, Pp. 9-10.

(১০০) 'মহাজনসিদ্ধান্তে পুরুষ ও প্রকৃতি' : বিপিনচন্দ্র পাল। নারায়ণ, চৈত্র ১৩২৩ (১৯১৭)

(১০১) Bengal Vaishnavisn (Chapter III) : B. C. Pal, P. 45. সম্ভবত: Oxford Dictionary প্রদত্ত 'Romance' শব্দের অন্যতম অর্থ 'Sympathetic imagination'-কে অবলম্বন করেই বিপিনচন্দ্র 'রস'-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ করেছেন Romance.

(১০২) 'The essential characteristic of romance is the Pursuit of the unseen and the ideal through the seen and the real.'—Ibid, P. 47,

(১০৩) 'The most distinguishing character of the bhakti cult of Bengal is what may be called its vicariousness.'—Ibid, P. 50

(১০৪) 'মহাজন পদাবলী ও রসকীর্তন' : সাহিত্য ও সাধনা—বিপিনচন্দ্র পাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬১-৬২।

(১০৫) 'Vicariousness is a fundamental element of our enjoyment of all art-creations, whether of Painting, or Sculpture or Poetry and the drama or music ?—Bengal Vaishnavism : B. C. Pal, P. 50,

(১০৬) 'বৈষ্ণব কবিতার কথা' : বিপিনচন্দ্র পাল, নারায়ণ, ফাল্গুন, ১৩২২ (সাহিত্য ও সাধনা ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭)

(১০৭) 'রসের পথে' : বিপিনচন্দ্র পাল, প্রবাহিণী, শ্রাবণ ২৩, ১৩২১ (১৯১৪)।

(১০৮) ঐ ঐ ঐ

(১০৯) ঐ ঐ ঐ

(১১০) 'বৈষ্ণব কবিতার রসগ্রহণ' : বিপিনচন্দ্র পাল, প্রবাহিণী, শ্রাবণ ১৬, ১৩২১ (১৯১৪)।

(১১১) (ক) 'রসের রূপ' (বাৎসল্য ও মাতৃমূর্তি) : বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১৩১৯।
(খ) রসের রূপ (দাস্যমূর্তি/সখামূর্তি) : বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১৩১৯।

(১১২) 'বৈষ্ণব মহাজন ও বাঙ্গালা মহাজন-পদ' : বিপিনচন্দ্র পাল ; নারায়ণ, মাঘ, ১৩২৩।

(১১৩) 'আদিরস' : বিপিনচন্দ্র পাল ; নারায়ণ, আষাঢ়, ১৩২৪ (১৯১৭)।

(১১৪) 'বাংলা সমালোচনা পরিচয়' : শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৫০।

(১১৫) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬০।

(১১৬) 'সাহিত্যে নবযুগ—বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র', 'বঙ্কিম-সাহিত্য', 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যা' এবং 'বঙ্কিম-সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ চতুষ্টয় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়যথাক্রমে ১৩২৯-এর পৌষ, ফাল্গুন, চৈত্র এবং ১৩৩০-এর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রবন্ধগুলি 'নবযুগের বাংলা' (১৯৬৪) গ্রন্থে সন্নিবেশিত। 'বাংলার নবযুগে বঙ্কিম-সাহিত্য' 'প্রবর্তক' পত্রিকায় ১৩৩০-এর শ্রাবণ সংখ্যায় এবং 'জাতীয়তা ও বঙ্কিমচন্দ্র' 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১৩৩২-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

(১১৭) 'নবযুগের বাংলা' : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ১৫৫।

(১১৮) পূর্বোক্ত গ্রন্থ : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ১৫৯।

(১১৯) 'অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে। বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, একথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে। 'বাঙালির বাহুবল'—বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ, পৃঃ ২১৩।

(১২০) 'ভারত-কলঙ্ক'—বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪১।

(১২১) নবযুগের বাংলা : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ১৭১।

(১২২) 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' : শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নব্যভারত ; ১৩৩১-এর শ্রাবণ, ভাদ্র এবং মাঘ সংখ্যা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

(১২৩) 'Plot, characters, dialogue, time and place of action, style and a stated

or implied philosophy, then, are the chief elements entering into the composition of any work of prose fiction, small or great, good or bad'.—An Introduction to the Study of Literature : William Henry Hudson, First Indian Edition 1967, P. 131.

(১২৪) 'এই তিনখানা উপন্যাসই বাঙ্গালীকে বাঙ্গলাদেশের ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছে।...এই তিনখানি উপন্যাস বাঙ্গালার দেশাত্মবোধের ত্রিপদ বেদী'। 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২২।

(১২৫) '...Criticism may be regarded as having two different functions—that of interpretation and that of judgement....the majority of Critics, while conceiving judgement to be the real end of all criticism, have freely employed interpretation as a means to that end.'—W. H. Hudson : OP. cit., P. 267.

(১২৬) '...Judicial criticism rests on the idea that the so-called laws of literature are like the laws of morality or the laws of the State—that is, they are imposed by an external authority and are binding on the artist as the laws of morality and of the State are binding on the man.'—W. H. Hudson : OP. cit., P. 270.

(১২৭) "The novelist was not to 'tell the reader' about what happened but to render it as action. Moreover, the action was not to be rendered with photographic fidelity but as it would make its impression upon a human observer. Hence, Ford's name for the new art, Impressionism." —'Literary Criticism' : William K. Wimsatt, Jr. & Cleanth Brooks, Third Indian Reprint, 1967, P. 684.

(১২৮) বাংলা সমালোচনা পরিচয়, শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৬১-৬২।

(১২৯) বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ, পৃঃ ৪০৮।

(১৩০) নোবেল পুরস্কারলাভের পরেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক খ্যাতি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপ্ত হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার বিজয়ের সংবাদ পান। দ্রঃ রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ড : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তৃতীয় সং, ১৩৬৮, পৃঃ ৩৬৪।

(১৩১) 'বঙ্কিমচন্দ্র'—চরিত-চিত্র : বিপিনচন্দ্র পাল, ১৯৫৮ পৃঃ ৫৪।

(১৩২) 'Sainte-Beuve wished to study an author in both his genealogy and his living family—in his father, his mother, his sisters and brothers, and even in his children (Nouveaux lundis, III, 18ff.). He would study the author's childhood, his early environment, even the landscape in which he grew up...'. Literary Criticism : William K.

Wimsatt, Jr. & Cleanth Brooks, Indian Edition, 1967, P. 535 (Foot-Note).

(১৩৩) 'রবীন্দ্রনাথ'—চরিত্র-চিত্র : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ: ২৮৪-৮৫।

(১৩৪) 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন ?' : অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৯ (১৯১২)।

(১৩৫) 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা'—সাহিত্য ও সাধনা, প্রথম খণ্ড, বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ: ১০৩।

(১৩৬) 'আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রের দিদিকে দেখিলাম। যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।' শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) : ১৯১৭।

(১৩৭) H. Rider Haggard (1856-1925) Historical Novel and Romance Writer. 'She' (1887) ; 'Cleopetra' (1889).

(১৩৮) রবীন্দ্রনাথ : অজিতকুমার চক্রবর্তী, ১৯৬৭ পৃ: ৬৫-৬৬ (প্রথমে ১৩১৮ সালের প্রবাসী'র আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত)।

(১৩৯) 'কাব্য-গ্রন্থ' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত), ১৯০৩-০৪ ; ২য় ভাগ (ক)। নারী, কল্পনা, লীলা, কৌতুক।

(১৪০) '...if the object which I have proposed to myself were adequately attained, a species of poetry would be produced, which is genuine poetry ; in its nature well adapted to interest mankind permanently, ...' 'Wordsworth's Preface of 1800' : Lyrical Ballads (1798) Wordsworth and Coleridge, London, 1921, Appendix, P. 252.

(১৪১) 'The third characteristic of literature...is its permanence,...(Test of Literature). The first of these is universality, that is, the appeal to the widest human interests and the simplest human emotions.—English Literature : William J. Long, Boston, U. S. A. 1919, Introduction, Pp. 4-5.

(১৪২) 'এষা' : বিপিনচন্দ্র পাল : বঙ্গদর্শন, আষাঢ়, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২০। 'এষা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় (ভাদ্র, ১৩২০) লিখিত। বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত 'এষা'র প্রথম সংস্করণের (ফাল্গুন, ১৩৬২) সঙ্গে 'পরিচয়' নামে (ঈষৎ পরিমার্জিত আকারে) সংযোজিত।

(১৪৩) (ক) '৺ কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল ও তাঁহার কাব্য-প্রতিভা' ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে অনুষ্ঠিত (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ : ৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৬) অক্ষয়-কুমারের স্মৃতিসভায় পঠিত।

(খ) 'অক্ষয়কুমার বড়াল'—আধুনিক বাংলা-সাহিত্য : মোহিতলাল মজুমদার।

(গ) 'অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা'—নানা নিবন্ধ : ডক্টর সুশীলকুমার দে।

(১৪৪) 'এষা' : পরিচয়—বিপিনচন্দ্র পাল, 'এষা', বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৬২ পৃঃ ৶৹

(১৪৫) 'Love, in human wise to bless us,
In a noble Pair must be :
But divinely to possess us,
It must form a precious Three.'
—Goethe's Faust, Part II, Act III.

(১৪৬) 'করঙ্ক' : বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১৩১৯ (১৯১৩)

(১৪৭) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড : ডক্টর সুকুমার সেন, ১৩৫০, পৃঃ ৪৩৮।

(১৪৮) 'কাব্যে নবীনচন্দ্র'—বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, চতুর্থ সং, ১৩৫৯, পৃঃ ১৮৪।

(১৪৯) 'ধর্ম ও আর্ট (আধুনিক বাংলা সাহিত্য)' : সাহিত্য ও সাধনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২-৩৫।

(১৫০) 'অভিভাষণ' : বিপিনচন্দ্র পাল : কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ (১৯২৯)।

(১৫১) বাংলা চরিত-সাহিত্য : ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য, ১৯৬৪, পৃঃ ১১৮

(১৫২) ঐ ঐ পৃঃ ১৪৪

(১৫৩) চরিত্র-চিত্র : বিপিনচন্দ্র পাল, ১৯৫৮।

(১৫৪) ১-৪ সংখ্যক প্রবন্ধ বর্তমানে বিপিনচন্দ্রের 'সাহিত্য ও সাধনা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। 'বিলাতে রবীন্দ্রনাথ' নামীয় প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন'-এ ১৩২০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

(১৫৫) সত্তর বৎসর (আত্মজীবনী) : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ৬।

(১৫৬) 'The value of the life-story of any individual consists, therefore, not in itself, however great or noble that life may be, but only as a revelation, an explanation and interpretation of the hidden currents of social history and evolution that, entering into it, shapes and moulds it to its universal end. The end is the Education of the Race. In this view, biographies of individuals become both the text and the commentaries of Universal Social Revelations'—Memories of My Life and Times, Vol II : B. C. Pal, Foreword, PP. V-VI.

(১৫৭) রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ড : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১, পৃঃ ৩৫৯।

(১৫৮) ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩৫৯।

(১৫৯) 'বিপিনচন্দ্র পাল' : ভবতোষ দত্ত ; বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৮৮০ শক (১৯৫৮)।

(১৬০) বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ (মে-জুন, ১৯১৩)।

(১৬১) 'The duty of an honest biographer is to portray the prominent imperfections as well as excellencies of his hero.—'The Principles of True Biography' (1818), Compiled in 'Biography as an Art', Selected

criticism 1560-1960, Edited by T. L. Clifford, Oxford University Press, 1962.

(১৬২) 'Throughout, Emerson's conception is democratic, Carlyle's authoritarian.'—'Emerson Handbook' : Frederic Ives Carpenter, New York, P. 63.

(১৬৩) "For Emerson, the function of great men is to teach and inspire others to greatness, for Carlyle, heroes are 'guides to dull host, which follows.' Emerson's great men are less god-like, less tyrannical and are never to be worshipped..."—Ibid P. 63.

(১৬৪) "Je n'impose rien ; je ne propose rien : j'expose' i.e., I impose nothing, I propose nothing, I expose."—'Eminent Victorians' : Lytton Strachey, 1918, Preface, P. 21

(১৬৫) 'Works of Bipinchandra Pal'—A Bibliography by Pulinbehari Sen, Vide Studies in the Bengal Renaissance, Jadavpur, P. 586.

(১৬৬) 'Eminent Victorians' is neither history, nor biography. It is a polemic.'—'Eminent Victorians.' Introduction by Noel Annan, P. 9.

(১৬৭) Memories of My Life and Times, Vol. II : B. C. Pal, P. 19.

(১৬৮) ভারতেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া' : বিপিনচন্দ্র পাল, ২য় সং, ১০৯৬, পৃঃ ২-৩।

(১৬৯) 'My life of Pramada Charan was meant to be a memorial volume, a tribute of his friends to him. It passed through one edition only.'—Memories of My Life and Times, Vol. II : B. C. Pal, pp. 19-20.

(১৭০) "প্রিয়তম নৃতা, এই পবিত্র উৎসব দিনে আমার প্রাণের ভালবাসা সহ তোমার প্রিয় দাদামণির এই জীবনীখানি তোমাকেই অর্পণ করিলাম।" ১১ই মাঘ, ব্রাহ্মসংবৎ ৫৭। —'সখা-সম্পাদক স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন,' ১৮৮৭, পৃঃ ২।

(১৭১) রচনাটি ১৩২৯-৩০ বঙ্গাব্দে 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'যুগের মানুষ বিজয়কৃষ্ণ' নামে প্রকাশিত হয়। 'প্রবর্ত্তক বিজয়কৃষ্ণ' নামে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৪১ বঙ্গাব্দ। 'যুগের মানুষ বিজয়কৃষ্ণ' নামে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ ১৩৭২ (১৯৬৫)। ইংরেজীতে লিখিত 'Saint Bijoy Krishna Goswami' ও (১৯৬৪) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(১৭২) Biography, a narrative which seeks, consciously and artistically, to record the actions and recreate the personality of an individual life. ......At the same time, the biographer shares with the historian a concern for truth to fact, and he shares with the novelist the ambition to create a work of art.'—Encyclopaedia Britannica, Vol. 3, 1960. P. 593A.

(১৭৩) 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৬৩, পৃ: ১০৪।

(১৭৪) 'সত্তর বৎসর' প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'তে (মাঘ, ১৩৩২—বৈশাখ, ১৩৩৫)। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—জুলাই, ১৯৬২। দ্রঃ ইংরেজিতে রচিত এবং দু'খণ্ডে প্রকাশিত Memories of My Life and Times গ্রন্থ (১৯৩২ এবং ১৯৫১)।

(১৭৫) 'সমসাময়িক কথা', নব্য ভারত : বৈশাখ, আষাঢ়-কার্তিক, ১৩২৯ (১৯২২); 'যৌবনের কথা'; সংহতি; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ, ১৩৩১ (১৯২৪)।

(১৭৬) সত্তর বৎসর : বিপিনচন্দ্র পাল, কৈফিয়ত, পৃঃ ৬-৭।

(১৭৭) 'Little Call as he may have to instruct others, he wishes nevertheless to open out his heart to such as he either knows or hopes to be of like mind with himself, but who are widely scattered in the world; he wishes to knit anew his connections with his oldest friends, to continue, those recently formed, and to win other friends among the rising generation for the remaining course of his life. He wishes to spare the young those circuitous paths, on which he himself had lost his way.'—Goethe. Quoted by S. T. Coleridge in his 'Biographia Literaria', 1917, P. XVI.

(১৭৮) 'সুন্দর ও সৌন্দর্য'—আশা, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ১১ই মাঘ, ব্রাহ্ম সংবৎ ৬৩ (১৮৯৩); 'বন্দে মাতরম্' : ধর্ম (সাপ্তাহিক) ১১ই মাঘ এবং ১৮ই মাঘ, ১৩১৬ : ১৯১০। 'অক্ষয়চন্দ্র ও সাহিত্য-সম্মেলন' : বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১৩২০ (১৯১৩) দ্রঃ সাহিত্য ও সাধনা ১ম খণ্ড; 'দু'য়ের মাঝে' : প্রবাহিণী (সাপ্তাহিক), শ্রাবণ ৩০, ১৩২১ (১৯১৪); 'ভাষার কথা' : নারায়ণ, পৌষ, ১৩২১ (১৯১৪); 'অদৃষ্টের শিক্ষা' : প্রবাহিণী, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২১ (১৯১৪); 'বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ,' 'যৌবনের সাধন' এবং 'যৌবনের স্বারাজ্য' : নব্যভারত, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ, ১৩২৯ (১৯২২-২৩)।

(১৭৯) (ক) 'ভারত-সীমান্তে রুশ' (১৮৮৫), Vide, 'Twelve Portraits' By Mukul Dey with an introduction by the Hon'ble Justice Sir John G. Woodroffe, Published by Amal Home, 1917.

(খ) 'সুবোধিনী' : বিপিনচন্দ্র পাল, ২য় সংস্করণ, ১৮৯৫।

(১৮০) 'সাহিত্য-চিন্তা'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, চৈত্র, ১৩৭৫, ভূমিকা পৃঃ ৩-৪।

(১৮১) 'The Second Afgan War was the outcome of the desire of two rival powers, Russia and England, to establish their influence in Afganistan. The English statesmen were afraid of a Russian invasion of India through Afganistan. Whether this menace was a real one may

be seriously doubted.'—'Political Relations 1858-1905' (Afganistan and the North-West Frontier): An Advanced History of India by Majumder, Raychoudhury & Datta, 1956, P. 435.

(১৮২) 'ভারত-সীমান্তে রুশ' : বিজ্ঞাপন—গ্রন্থকারস্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৫।

(১৮৩) 'ভারত-সীমান্তে রুশ' : উপক্রমণিকা, পৃঃ ১১।

(১৮৪) 'The Central fact of the true essay, indeed, is the direct play of the author's mind and character upon the matter of his discourse.'—'The Study of Essay': An Introduction to the Study of Literature by W. H. Hudson, pp. 334-35.

(১৮৫) '...the style of a writer who is artistic but not an artist.'—American Prose Masters: W. C. Brownell, P. 184.

(১৮৬) 'শোভনা' : হরিদাস ভারতী ; প্রথম প্রকাশ—মাঘ, ১২৯০ (জানুয়ারি, ১৮৮৪)। দ্বিতীয় মুদ্রণ—কার্তিক, ১৩১০ ; তৃতীয় মুদ্রণ—১৩২৯। দ্রঃ Works of Bipinchandra Pal, A Bibliography by Pulinbehari Sen: Studies in the Bengal Renaissance, Jadavpur, P. 599.

(১৮৭) 'রাগের পথে' বিপিনচন্দ্র পাল, 'সংহতি', বৈশাখ, ১৩৩১ – আশ্বিন, ১৩৩১ (১৯২৪)।

(১৮৮) 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' : শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৬৯, পৃঃ ৬৯।

(১৮৯) 'সত্য ও মিথ্যা' : বিপিনচন্দ্র পাল। প্রথম সংস্করণ—মাঘ, ১৩২৩ ; দ্বিতীয় সংস্করণ—কার্তিক, ১৩২৫ (১৯১৮)।

(১৯০) '...requiring from half an hour to one or two hours in its perusal'.—Edgar Allan Poe. Quoted by W. H. Hudson in his 'An Introduction to the Study of Literature', P. 337.

(১৯১) 'Singleness of aim and singleness of effect are, therefore, the two great canons by which we have to try the value of a short story as a piece of art'.—An Introduction to the Study of Literature: W. H. Hudson, P. 340.

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুগপুরুষ

(COLOSSUS)

[লাল-বাল-পাল]

'Why, man, he doth bestride the narrow world
Like a colossus, and we petty men
Walk under his huge legs, and peep about
To find ourselves dishonourable graves'.

—*Cassius* ; *Julius Caesar, Act I, Sc. ii.*

সার্দ্ধ-শতাব্দী-সঞ্চিত রুদ্ধ আবেগরাশি তখন স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিয়ে স্বাধীনতালাভের অস্থির চাঞ্চল্যে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সশস্ত্র শাসন-শোষণরূপী দুর্গের রুক্ষ প্রাকারে উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে আছড়ে পড়ছে। ইংরেজের অমানুষিক নিপীড়নকে ভারতবাসী 'হ্যামার অব্ গড্' (ঈশ্বরের মুদ্গরাঘাত)[১] মনে করে হাসিমুখে মাথা পেতে নিচ্ছে। 'পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ' জনগণমনঅধিনায়কেরা কম্বুকণ্ঠে শোনাচ্ছেন অভীক বাণী—মাভৈঃ ; শত-সহস্র-লক্ষ কণ্ঠে জলধিগর্জনকে নির্জিত করে উচ্চারিত হচ্ছে তিনটি প্রিয় নাম—'লাল-বাল-পাল'।

বস্তুতঃ সেদিনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুর্মর আত্মিক শক্তি মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল এই তিন ব্যক্তি পুরুষের মধ্যে। লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল ভারতাত্মার জীবন্ত বিগ্রহে পরিণত হয়েছিলেন। এই তিনের মধ্যেও আবার বিশিষ্টতায় অনন্য ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। তিনিই ছিলেন আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের প্রথম যুগের অগ্রগামী ভাবুক এবং শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক।

মহাত্মা গোখেলের সেই বহুপ্রচারিত প্রশস্তি এবং লালা লাজপত রায়ের সেই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি সমকালীন বঙ্গদেশবাসীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাপ্য ছিল বিপিনচন্দ্রেরই। গোখেল বলেছিলেন—'হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্ টু ডে, ইণ্ডিয়া থিংকস্ টুমরো' (বাংলা দেশ যা' আজ ভাবে, ভারতবর্ষ তা' ভাবে কাল)। আর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে

লালা লাজপত রায় বলেছিলেন—'আমাদের ভাগ্যনির্ধারণে আমাদের পক্ষে মধ্যস্থের ভূমিকাগ্রহণের এবং আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে সঙ্গত। আমার মনে হয়, সেই অগ্রগতির পথে নেতৃত্বগ্রহণের জন্য বাংলার মানুষকে অভিনন্দিত করা কর্তব্য।......এবং যদি ভারতবাসী বঙ্গবাসীর কাছ থেকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করে, তা' হলে আমি মনে করি সংগ্রাম ব্যর্থ হবে না'।[২]

যে চিন্তাধারার ও কর্মপ্রণালীর প্রতি মহাত্মা গোখেল ও লালা লাজপত শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, সে চিন্তাধারা ও কর্মপ্রণালী সমগ্র জাতির মর্ম থেকে উদ্‌গীত হলেও বিপিনচন্দ্রই ছিলেন তার মুখ্য বাহক ও প্রচারক। কম্বুকণ্ঠ বিপিনচন্দ্রের অতুলনীয় বাগ্‌সামর্থ্যের স্বীকৃতি জানিয়ে একদা মহারাষ্ট্রকেশরী আত্মবিনয় প্রকাশ করেছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে স্বীয় ভাষণের মুখবন্ধে তিলক বলেছিলেন—'আমার না আছে মিস্টার ব্যানার্জির মতো বাগ্মিতা, না আছে বিপিনচন্দ্র পালের মতো ভেরীনিন্দিত কণ্ঠস্বর।...'[৩]

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র নব্য ভারতের যে বাণীমন্ত্র মাদ্রাজে দক্ষিণ-ভারতবাসীকে শুনিয়েছিলেন, তার প্রভাবে উদ্বুদ্ধ উন্মাদনার সমুজ্জ্বল পরিচয়টি বিধৃত হয়েছে মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর স্মৃতিচারণায়: 'বাবু বিপিনচন্দ্র পাল নতুন রাজনৈতিক মতের প্রচারকরূপে মাদ্রাজে পূর্ণ যশের অধিকারী হয়ে উঠলেন। কয়েকদিন যাবৎ তিনি সমুদ্রসৈকতে দাঁড়িয়ে আবেগতপ্ত ভাষায় সূক্ষ্ম যৌক্তিকতাপূর্ণ ভাষণ দান করলেন। মৃদুমন্দ সান্ধ্য বায়ুতে বাহিত হয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর সহস্র সহস্র শ্রোতার শ্রুতিপথে প্রবেশ করে তাদের সমগ্র আত্মায় পরিব্যাপ্ত হলো, দুর্বার সর্বভুক্ বাসনার উত্তাপে তাদের সমগ্র সত্তা প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। বাগ্মিতা এর পূর্বে ভারতবর্ষে এমন বিজয়লাভের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি; কথিত শব্দের শক্তি আর কখনও এমন ব্যাপক আকারে প্রদর্শিত হয়নি'।[৪] জন-জাগরণে বিপিনচন্দ্রের সক্রিয় ভূমিকার প্রতি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়ে বিপিনচন্দ্রের কারামুক্তির অব্যবহিত পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্'-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তাঁকে তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন।[৫]

বাস্তবিকপক্ষে বিপিনচন্দ্র অবিস্মরণীয়, কারণ শব্দব্রহ্মের পূর্ণ সামর্থ্য সহজেই তাঁর কণ্ঠ এবং লেখনীতে অভিব্যক্ত হতো। অপ্রতিরোধ্য ছিল তাঁর আকর্ষণ।

লালা লাজপত লাল　　　বালগঙ্গাধর তিলক বাল　　　বিপিনচন্দ্র পাল পাল)

প্রখ্যাত বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি চয়ন করতে গিয়ে এই আকর্ষণীয়তার একটি পরিচয় দিয়েছেন : "মনে আগুন ধরে যেত বিপিনবাবু যে-সময় সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে উঠে বলতেন,—'তোমরা কি আসবে না, ভাই, ওই গোলামখানার মোহ কাটিয়ে? ওই একখানা চোতা কাগজের লোভে আকাশচারী হয়ে শুধু ভাগাড়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে? বয়কট করো ওদের স্কুল-কলেজ। ইংরেজ জেল দেবে? ইংরেজের জেলটা কত বড় ভাই? বাংলাদেশটার চেয়ে কি বড়?'...সমগ্র জনতা নিস্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধবৎ। মনে পড়ছে সে সময়ের মনোভাব; সবাই অনুভব করত—তখন যদি ইংরেজের সৈন্য ও পুলিস এসে গুলিগোলা চালাত, একজনও বোধ হয় পালাত না। সবাই দাঁড়িয়ে মরত।"[৬]

জনচিত্তে বিপিনচন্দ্র কীভাবে অমর আসনের অধিকারী হয়ে উঠলেন, সে-কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যাদুগোপাল আরও বলেছেন—"বিপিনবাবুর সমর্থকের দল বাড়তে লাগলো তরুণদের মাঝখান থেকে।...শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল হলেন এবার 'বিপিনবাবু'। তার পরের স্তরে উঠলে তাঁর নাম ভূমার অধিকারী হয়। সে অবস্থায় নামটি হয় 'মন্ত্র'। লাল-বাল-পালও এমনি করে হয়েছিল মন্ত্র। ছোট-বড়-বয়স নির্বিশেষে সবাই উচ্চারণের অধিকারী..।"[৭]

শুধু বাক্-বিভূতির জন্যই নয়, দূরদৃষ্টি এবং অগ্রগামী চিন্তার ঐশ্বর্যেও যে বিপিনচন্দ্র বরণীয় ছিলেন, সে যুগের আর একজন প্রখ্যাত বিপ্লবী স্বদেশীযুগের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে 'নিউ ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের 'দি টেস্ট অব্ প্যাট্রিয়টিজ্ম্' (স্বদেশপ্রেমের পরীক্ষা) শীর্ষক একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে[৮] মতিলাল রায় মন্তব্য করেছেন—'১৯০২ সালে তিনি যেন আসন্ন ভবিষ্যতের পদক্ষেপ শুনিতে পাইয়াই পূর্বরাগ গাহিতেছিলেন।...কাল সে উত্তর অচিরেই দিবার জন্য তাঁহাকে ও তাঁহার জাতিকে এইভাবেই প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিল। বিপিনচন্দ্র সেদিন এমনি স্পষ্টদর্শী ও অগ্রগামী নব চিন্তার উন্মেষ করিয়াছেন।'[৯]

শুধুমাত্র মিত্রের স্বীকৃতি ও গুণমুগ্ধ ভক্তের স্তুতি বিপিনচন্দ্রকে তদানীন্তন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সাধকত্রয়ীর মধ্যে বিশিষ্টে পরিণত করেনি। আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের মুক্তিকামী মানুষের মনোবীণায় যে নামটি ঝঙ্কৃত হতো,

তা' প্রতিপক্ষেরও শ্রুতি আকর্ষণ করেছে, আদায় করে নিয়েছে সবিস্ময় প্রশংসা। প্রাচ্য জাপান প্রতীচ্যের সমস্ত অপপ্রয়াস ব্যর্থ করে প্রবল রুশশক্তিকে পরাস্ত করলে, তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের তরুণ বুকে যে আগুন জ্বালিয়েছিল, সে আগুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল একটি মুখ। ভারতের ইংরেজ-শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম আর্ল অব্ রোনালড্‌সে দেখেছিলেন সে মুখের দীপ্তি : 'এখন থেকে একটি নতুন আশা—মুক্তি ও স্বাধীনতার আশা বাংলা দেশের আত্মার অভ্যন্তরে উজ্জ্বল শিখায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। বাংলাদেশে বিপিনচন্দ্র পালের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই নতুন অভিমতের একজন প্রতিভাদীপ্ত দিব্য প্রবক্তার আবির্ভাব ঘটলো, যিনি স্ব-অবলম্বিত অভিমতে স্বদেশবাসীর মতান্তরসাধনের কাজে স্বকীয় সত্তার সমস্ত শক্তি ও ভাবাবেগ নিয়োজিত করেছিলেন'।[১০]

স্যার ফ্রান্‌সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড বলেছিলেন : 'অগ্নিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত বাঙালীদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন একতম এবং যোগ্যতম। বাহ্যতঃ তিনি ছিলেন নম্র, ভদ্র এবং পরিমার্জিত ; তাঁর চাহনির মধ্যে বলিষ্ঠতা ও অধিনায়কত্বের কোনো চিহ্ন ছিল না'।[১১] অথচ বিস্ময়বিমুগ্ধ ইয়ং হাজব্যাণ্ড দেখেছিলেন—'কিন্তু একান্ত শান্ত ভঙ্গিতে ও নির্ভুল ইংরেজিতে তাঁর ভিতর থেকে অনর্গল ধারায় বৃটিশশাসনের প্রতি তীব্রতম মন্তব্য এবং বৃটিশশাসনের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক প্রস্তাবসমূহ প্রকাশ পেত'।[১২]

ভ্যালেণ্টাইন চিরোল, যিনি লোকমান্য তিলকের বিরুদ্ধেও বিষোদ্গার করতে দ্বিধাবোধ করেন নি, তিনিও বিপিনচন্দ্রকে 'উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং উচ্চাঙ্গের মননশক্তি ও উচ্চ চরিত্রগুণসম্পন্ন মানুষ' বলে উল্লেখ করেছিলেন।[১৩]

'দি হিস্টরিয়ানস্ হিস্ট্রি অব্ দি ওয়ার্লড' গ্রন্থেও বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করে বলা হয়েছে—"রাজদ্রোহমূলক ভাবধারার মুখ্য প্রচারক ছিলেন বাবু চন্দ্র পাল নামে জনৈক সুশিক্ষিত বাঙালী। তিনি যথেষ্ট যোগ্যতা ও বিপুল বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতাসমূহে অভ্রান্ত ভাষায় ভারতের 'নব আন্দোলন-সমাচার'-এর উদ্দেশ্যাবলী প্রকাশ পেত।"[১৪]

লাল-বাল-পাল তিনজনেই তদানীন্তন ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনের পুরোধা হলেও অপর দু'জন থেকে পালের প্রভেদ ছিল প্রভূত। পরাধীনতার গ্লানি তিনজনকেই পীড়িত করেছে, তিন জনেরই মনে জ্বলেছে স্বাধীনতার আগুন,

কিন্তু মূল সত্ত্বের প্রভেদের কারণে সে আগুনের প্রকৃতি হয়েছে পৃথক। বহু বিস্তৃত জ্ঞান এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী তিলক ছিলেন স্বভাবে চিৎ-পাবন ব্রাহ্মণ। ফ্রানসিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ডের বর্ণনায় তিলকের চরিত্রবল-সমুদ্ভাসিত বাস্তব মূর্তিটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। স্যার ফ্রান্সিস লিখেছেন—"তিলক ছিলেন ভাবাবেগ ও উগ্রতার মূর্ত বিগ্রহ—প্রত্যক্ষ এবং অব্যবহিত সংগ্রামের পক্ষপাতী। উচ্চাঙ্গের রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌সুলভ সাবধানী প্রাজ্ঞতার পরিচয় তাঁর আচরণে ছিল না।······তিনি কোনো বাধা মানতেন না; তিনি জানতেন শুধু কাজ।···তিনি ছিলেন অনার্স গ্রাজুয়েট, অতএব সংস্কৃতিমান। তা' সত্ত্বেও তিনি রানাডে ও গোখেলের মতো হিন্দু-সংস্কারকদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করেছিলেন।···১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হিন্দু বাল্য-বিবাহের কুফল প্রশমনের জন্য যখন 'কনসেণ্ট বিল'-এ (সম্মতিদান বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি) উচ্চতর বয়সের কথা উল্লিখিত হয়, তখন যে সমস্ত হিন্দু ঐ ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে তিনি স্বধর্মদ্রোহী এবং হিন্দু-ধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতী বলে নিন্দা করেছিলেন।"[১৫]

এখানেই তিলক এবং বিপিনচন্দ্রে প্রভেদ। নিজের বিচারবুদ্ধিকে বিপিনচন্দ্র কখনও শাস্ত্র বা লোকাচারের যুপকাষ্ঠে বলি দেন নি। তাঁর সমগ্র জীবন-কাহিনী তাঁর এই বিশিষ্ট স্বভাবের সাক্ষ্য বহন করে। এই কনসেণ্ট বিলকে কেন্দ্র করে কলকাতায় যে আন্দোলন হয়, বিপিনচন্দ্র সেই আন্দোলনে কনসেণ্ট বিলের স্বপক্ষে যোগদান করেছিলেন। সে প্রসঙ্গ 'দেশনায়ক' পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই বিলের স্বপক্ষে যোগদানের জন্য একবার তাঁর প্রাণনাশেরও চেষ্টা হয়। এক রবিবারের সন্ধ্যাবেলা তিনি যখন তাঁর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাসায় কেরোসিন প্রদীপের নীচে বসে বই পড়ছিলেন, তখন রাস্তার অপর পরের অন্ধগলি থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে রিভলভারের গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। ভাগ্যক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেই গুলি রাস্তায় গ্যাসের আলোক-স্তম্ভে লাগে এবং তাঁর জীবন রক্ষা পেয়ে যায়।[১৬]

তিলকের উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার উৎস ছিল—প্রথা-নিগড়বদ্ধ সনাতন হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ চিন্তা। আর বিপিনচন্দ্র ছিলেন মুক্তবুদ্ধি পুরুষ। তাই তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামিমিশ্রিত উগ্র সাজাত্যাভিমানকে রাজনৈতিক চিন্তায় প্রশ্রয় দান না করে যৌগিক স্বাদেশিকতা-তত্ত্ব (কম্পোজিট প্যাট্রিয়টিজম্)

উদ্ভাবন করে ভারতীয় রাজনীতিকে এক যুগোপযোগী প্রাগ্রসর কার্যক্রম দান করেছিলেন। বিপিনচন্দ্রের সময়োচিত আবির্ভাবই জাতীয়তাবাদী (ন্যাশ-নালিস্ট) আদর্শের আন্দোলনকে ধর্মরক্ষা ও কুসংস্কাররক্ষার আন্দোলনের পথান্তরগামিতা থেকে রক্ষা করেছিল।

অথচ তিলক ও বিপিনচন্দ্র—উভয়ের স্বভাব ও চিন্তাধারার মধ্যে মিলও ছিল যথেষ্ট। দু'জনেই ছিলেন সু-অধীতী ব্যক্তি, দু'জনেই প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বিপিনচন্দ্রের মতো তিলকও বৃটিশ জাতির বিরুদ্ধে অসদিচ্ছা মনে পোষণ করতেন না। বরং বৃটিশের স্বাধীনতা-প্রিয়তা এবং বৃটিশের জনজীবনে অনুসৃত সদাচারসমূহের তিনি ছিলেন গুণমুগ্ধ। তাঁর বিবাদ ছিল বৃটিশ আমলাতন্ত্রের সঙ্গে এবং ইংল্যাণ্ড ও ভারতের সেই স্থিত স্বার্থের সঙ্গে, যা' ভারতবাসীকে বৃটিশ নাগরিকতার পূর্ণ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখতে চেয়েছিল।[১৭] আবার বিপিনচন্দ্রের মতো তিলকের রাজনৈতিক কার্যক্রমে হিংসারও (ভায়োলেন্স) কোনো স্থান ছিল না।[১৮]

লালা লাজপতের সহকর্মী হলেও বিপিনচন্দ্র ছিলেন আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। কারণ, মনীষী বিনয়কুমার সরকারের ভাষায়: "বিপিন পালের দার্শনিক ধীশক্তিমত্তা এবং সমন্বয়বাদী উপস্থাপনার প্রতি লাজপতের কোনো সহানুভূতি ছিল না। 'সোল অব্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে বিপিনচন্দ্র যে সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা' থেকে লাজপতের নীরস গদ্যময় দৃষ্টিভঙ্গি অনেক দূরবর্তী ছিল। অথচ এটা কৌতূহলজনক যে যুব-পাঞ্জাবের নির্মাতারূপে লাজপত অপেক্ষা যুব-বাংলার নির্মাতারূপে বিপিন পালের অবদান কম ছিল না।"[১৯] লাজপতও ছিলেন বিপিনচন্দ্রের মতো বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের অন্যতম দূরদর্শী প্রচারক। তিনিও লেখার মাধ্যমে সুসংবদ্ধ চিন্তাধারা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তবে এই ক্ষেত্রে তাঁর লেখাসমূহ এবং চিন্তাধারা গঠনে তাঁর দান সমসাময়িক সমস্যাবলী এবং বর্তমান ব্যাপারের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ ছিল।[২০] এখানেই ছিল লাজপতের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের মনোভঙ্গির একটি মৌল পার্থক্য। বিপিনচন্দ্র সমকালকে চিরকালের পটভূমিকায় যথাসম্ভব দাঁড় করিয়ে সমকালীন সমস্যাবলীর সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য সচেষ্ট হতেন। আর সূক্ষ্ম চিন্তা এবং দার্শনিক প্রবণতা ছিল তাঁর স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সম্ভবতঃ এইজন্যই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির আসনগ্রহণের জন্য শ্রীযুক্ত খপর্দে যখন লোকমান্য তিলকের প্রস্তাবানুসারে তরুণ পাঞ্জাবের অবিসংবাদিত নেতা লালা লাজপত রায়ের নাম সমর্থন করেন, বিপিনচন্দ্র তাতে সম্মতি না দিয়ে সভাপতির আসনের জন্য লোকমান্য তিলকের নাম প্রস্তাব করেন।[২১] কারণ, পাঞ্জাবকেশরী অপেক্ষা লোকমান্যের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের প্রকৃতিগত মিল ছিল বেশী। কিন্তু লাজপত বা তিলক, যে কোনো একজন সভাপতি হলেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর নরমপন্থী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের প্রভাব শিথিল হতে বাধ্য ভেবে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু সর্বজনবরেণ্য দাদাভাই নৌরজীর নাম সভাপতির আসনের জন্য প্রস্তাব করেন। দাদাভাই তখন একাশি বছরের বৃদ্ধ এবং এর আগে তিনি দু'বার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। তা' সত্ত্বেও দাদাভাই ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ভূপেন্দ্রনাথের ধারণা যে মিথ্যা ছিল না, তার প্রমাণ মেলে ১৯০৬-এর ৪ঠা নভেম্বর ভারত-সচিব মর্লি সাহেবের কাছে লেখা ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টোর একখানি ব্যক্তিগত পত্রে। ঐ পত্রে মিণ্টো লিখেছিলেন—'...যদি তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পালের মতো গরমপন্থীরা (এক্সট্রিমিস্টস্) প্রাধান্য লাভ করে, তাহলে তাদের সঙ্গে যুঝে ওঠা অসম্ভব হবে এবং কংগ্রেসই ভেঙে যাবে'।[২২]

লাল-বাল-পাল,—এই ত্রিনাথের প্রত্যেকেই তখন ছিলেন একদিকে স্বদেশী নরমপন্থী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ, অন্যদিকে বিদেশী শাসককুলের শিরঃপীড়া। স্বদেশী নেতৃবৃন্দ এবং বিদেশী শাসকবৃন্দ—উভয়পক্ষই তখন এই অগ্রগামী দেশ-নায়কদের দমনের জন্য বদ্ধপরিকর।

তিলকজী এর আগেই একবার (১৮৯৭) কারাবরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সরকারী নির্যাতন তখন বিপিনচন্দ্র এবং লালাজীর জন্য অপেক্ষমান। বিপিন-চন্দ্রের ক্ষেত্রে আবার সরকারী দমনমূলক প্রচেষ্টায় নেপথ্য প্রেরণা জুগিয়েছিল তাঁরই স্বদেশীবাসী প্রতিপক্ষ। কারণ, তাঁদের সামনে তখন বিপিনচন্দ্রকে নিরস্ত করবার আর কোনো সোজা পথ খোলা ছিল না। ১৯০৭-এর ১৯-এ মার্চ লর্ড মিণ্টো উল্লাসভরে মর্লিসাহেবকে জানালেন—"আমার সেরা সংবাদ আমার পত্রের শেষাংশের জন্য রেখে দিয়েছি।...আমার এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ছিল। সেই প্রতিনিধিদলে ছিলেন দ্বারভাঙার মহারাজা,

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, কংগ্রেসের জনৈক সভ্য মিস্টার চৌধুরী, 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন এবং আর তিনজন মুসলমান ভদ্রলোক। তাঁদের আলাপ-আলোচনার মূল বক্তব্য ছিল—দেশে যে অশান্তি ও বিদ্বেষ রয়েছে তার নিরসনের জন্য তাঁরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত।...সে দৃশ্য সত্যই অদ্ভুত... বঙ্গেশ্বর (এস্. এন্. ব্যানার্জি) আমার সোফায় বসে বাঙালীর বিপজ্জনক ভাবাবেগ প্রশমনের জন্য আমার সাহায্য চাইছেন এবং বিপিনচন্দ্র পালের অমিতাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করছেন।"[২৩] বিপিনচন্দ্র যাঁকে তাঁর প্রথম জীবনের রাজনৈতিক গুরু বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁকে লক্ষ্য করে জুলিয়াস সীজারের মতোই তিনি বলতে পারতেন—'দাউ টু মাই সুরেন্দ্রনাথ!' তিলক বা লাজপতকে এ বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু এই ধরনের বিড়ম্বনা আমৃত্যু বিপিনচন্দ্রের সঙ্গী হয়েছিল। দেশবাসীর এত প্রশংসা, আবার এত বিরোধিতা এবং পরিশেষে এত উপেক্ষা আর কোনো জাতীয় নেতাকে ভোগ করতে হয়নি।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই মিঃ মিণ্টো মিঃ মর্লিকে জানান—'আমি মনে করি যে বিপিনচন্দ্র পালকে এইভাবে বক্তৃতার দ্বারা দেশময় রাজদ্রোহ প্রচার করে দেশবাসীকে উত্তেজিত করতে দেওয়া আমাদের উচিত নয়'।[২৪]

এর পর সরকারী রোষ-দৃষ্টি লালা লাজপত রায়ের দিকে নিবদ্ধ হলো। ১৯০৭-এর ৮ই মে মিঃ মিণ্টো এক জরুরী তারবার্তায় মিঃ মর্লিকে জানালেন—"রাজদ্রোহমূলক আন্দোলন দু'টি প্রধান আকার ধারণ করেছে। লাহোর, অমৃতসর, পিণ্ডি, ফিরোজপুর, মুলতান প্রভৃতি শহরে প্রকাশ্যে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীদের হত্যার প্ররোচনা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং জনসাধারণকে ইংরেজদের আক্রমণ করে স্বাধীন হবার কথা বলা হচ্ছে। যে জাঠেদার-সম্প্রদায় থেকে সৈন্য নিয়োগ করা হয়ে থাকে, সেই জাঠেদার-সম্প্রদায়ের নৈতিক অবনতি ঘটানোর জন্য সুশৃঙ্খল চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এই সমস্ত আন্দোলনের নায়ক এবং কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হচ্ছেন ক্ষত্রী নেতা লালা লাজপত রায়, যিনি কংগ্রেসের পাঞ্জাব-প্রতিনিধি হয়ে বিলাতভ্রমণ করে এসেছেন। তিনি বৃটিশ সরকারের প্রতি তীব্র ঘৃণাপরায়ণ একজন বিপ্লবী এবং উৎসাহী রাজনৈতিক কর্মী। তিনি নিজে অন্তরালে অবস্থান করেন; কিন্তু এদেশীয় যে সমস্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে ছোটলাটের এ বিষয়ে কথা হয়েছে, তাঁদের কাছ থেকে ছোটলাট নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছেন যে তিনিই এই

আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক।"[২৫] এর দু'দিন পরেই (১০ই মে, ১৯০৭) লালাজীর প্রতি দ্বীপান্তর-দণ্ডাদেশের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

লালাজীর মতো বিপিনচন্দ্র কোনো গুপ্ত আন্দোলনের নায়ক ছিলেন না। ইংরেজ সরকারও সে সংবাদ জানতেন। তা' সত্বেও বিপিনচন্দ্র তখন বিদেশী শাসকের চোখে কী পরিমাণ ভীতির পাত্র হয়ে উঠেছিলেন তা' জানতে পারা যায় মিঃ মর্লির কাছে মাসাধিক কালের ব্যবধানে প্রেরিত মিঃ মিণ্টোর আর একখানি তারবার্তায়। এই তারবার্তায় মিঃ মিণ্টো জানান—'আমি বিপিনচন্দ্র পালের নির্বাসনের প্রস্তাব করে সদ্য একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি।......আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে চরম উপায় অবলম্বনের ক্ষেত্রে আপনার আরও সমর্থন লাভের জন্য আপনার উপর অকারণ চাপ সৃষ্টি করা একান্তভাবে আমার অনভিপ্রেত, কিন্তু বিপিনচন্দ্র পালের আচরণ এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে যে তার বিপদের দিকটা আমরা উপেক্ষা করতে পারি নে। আপনি জানেন, আমরা এসব ক্ষেত্রে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করবার নীতিই গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু ফ্রেজার এই নীতির বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় পুরানো যুক্তিগুলি উত্থাপন করেছে এবং আরও বলেছে যে বিপিনচন্দ্র পালের মোকদ্দমার মতো বিশেষভাবে প্রচারিত মোকদ্দমায় ১২৪-এ ধারানুসারে অপরাধ সাব্যস্ত করবার জন্য উপযুক্ত জুরি কলকাতায় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আমি তাই ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করবার চেয়ে দৃঢ়ভাবে নির্বাসনের পক্ষপাতী ; কারণ, সেইটাই হবে সহজ এবং অধিকতর কার্যকর পন্থা। তাতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের জন্য মনোযোগ আকৃষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবে অথচ জনমনে একটা ধারণা সৃষ্টি করবার সুযোগও পাওয়া যাবে।'[২৬] এই ঘটনা থেকে একথা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে বিপিন-চন্দ্রের প্রতি নির্বাসন দণ্ডাদেশ প্রদানের আয়োজন প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। এর মাস দু'য়েক কালের মধ্যে বন্দে মাতরম্ ফৌজদারী মামলায় জড়িত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছয় মাসের জন্য কারাবন্দী হতে হয় বলেই সম্ভবতঃ তখনকার মতো বৃহত্তর সরকারী রোষ-দৃষ্টি থেকে তিনি অব্যাহতি পান। এর এক বছরের মধ্যেই (জুলাই, ১৯০৮) 'লাল-বাল-পাল্'-এর বালগঙ্গাধর তিলক পুনরায় সরকারী রোষের অধীন হন। রাজদ্রোহমূলক রচনার দায়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর প্রতি ছয় বছরের দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়।

কিন্তু দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে যাঁরা উৎসর্গীকৃত প্রাণ, নির্যাতনকে তাঁরা অভিশাপের মতো নয়, আশীর্বাদের মতোই গ্রহণ করে সঙ্কল্পসিদ্ধির পথে স্থির পদক্ষেপে অগ্রসর হন। 'লাল-বাল'-এর মতো 'পাল'ও তাই করেছিলেন।

বিপিনচন্দ্র তখনও বক্সার জেলে বন্দী, বাংলাদেশ তাঁর সক্রিয় নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত। এমন সময় গুণমুগ্ধ অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় লিখলেন—'বাংলা দেশে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালই হচ্ছেন বর্তমানে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সক্রিয় মস্তিষ্ক…।'[২৭] এর আগেই সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের নথিতে বিদেশী শাসকের দাসেরা লিখেছিল—'ভ্রাম্যমাণ গণবক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, যিনি অন্য যে কোনো লোকের চেয়ে জনমনে বেশী উত্তেজনার উত্তাপ সঞ্চার করেছিলেন'।[২৮]

নব্যবঙ্গের বিপ্লবীসমাজ বিপিনচন্দ্রের উপর কতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, বিপিনচন্দ্রের কারামুক্তির পর 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (১২ই এপ্রিল, ১৯০৮) অরবিন্দ তার সুস্পষ্ট উল্লেখ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং স্বদেশী ও স্বরাজের অভ্যুদয়কে নিষ্পিষ্ট করবার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক তখন উন্মত্ত তাণ্ডবে নগ্ন বর্বরতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অত্যাচারের বীভৎস প্রচণ্ডতায় দেশ কিছু পরিমাণে হতচকিত, বিপর্যস্ত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। চারিদিক নৈরাশ্যের কুয়াশায় আচ্ছন্ন। এতদিন বিপিনচন্দ্র ছিলেন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। অধীর আগ্রহে সংগ্রামী বাংলা তাঁর কারামুক্তির শুভ লগ্নের প্রতীক্ষা করেছে। এখন তিনি মুক্ত, দেশ আবার তাঁকে নিজের মধ্যে ফিরে পেয়েছে। এই অবস্থায় অরবিন্দ লিখলেন যে এ যাবৎ দেশে যা' করা হয়েছে, তা' হচ্ছে ভাবী কার্যকলাপের একটা অস্পষ্ট রূপরেখা মাত্র। এই নিয়েই দেশ যদি সন্তুষ্ট থাকে তবে যেটুকু করা হয়েছে তা'ও উধাও হবে, আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং দেশ আবার আগেকার অবস্থায় ফিরে যাবে। 'সুতরাং সর্বত্র আন্দোলনে নতুন বেগ সঞ্চার করা প্রয়োজন এবং যেহেতু শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র এখন কারাগারের বাইরে, যা' কিছু করণীয় অবশ্যই তা' করা হবে'।[২৯] বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্ব-সামর্থ্যে কি সুগভীর আস্থা! বিপিনচন্দ্র এসেছেন, আর ভাবনা নেই, সমস্ত ব্যবস্থা অবশ্যই হবে। ঐ সংখ্যার 'বন্দে মাতরম্'-এ আর একটি প্রবন্ধে অরবিন্দ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন যে দেশের আন্দোলনের প্রকৃতিটি 'এখনও জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারে নি। তবে উপলব্ধি করবার

শক্তি তাঁদের আছে। যদি কারও কণ্ঠস্বর সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোলবার ক্ষমতা রাখে, তা'হলে তা' বিপিনচন্দ্রের'।[৩০]

বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক নবজাগরণে বিপিনচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরবর্তীকালে বহুজনের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করলেও, সমসাময়িককালে অরবিন্দের মতো আর কারও বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। বিপিন-চন্দ্রের কারামুক্তির বৎসরাধিক কাল পরে (বিপিনচন্দ্র তখন বিলাতে) অরবিন্দ ঘোষ তাঁর বিখ্যাত 'উত্তরপাড়া ভাষণে' বিপিনচন্দের প্রশস্তি উচ্চারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন—'এক বছরেরও বেশী আগে আমি এখানে আসি। যখন আমি আসি, তখন আমি একা ছিলাম না; জাতীয়তাবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিব্য প্রবক্তা আমার পাশে বসে ছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে যে নির্জনবাসে পাঠিয়েছিলেন, সেখান থেকে তখন তিনি বেরিয়ে আসেন। কারাকক্ষের সেই নীরব নির্জনতায় বসে তিনি ঈশ্বরের বাণী শুনতে পান। তাঁকেই আপনারা শ'য়ে শ'য়ে এসে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এখন তিনি বহুদূরে, তাঁর সঙ্গে এখন আমাদের হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান।'[৩১] দেশের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিপিনচন্দ্রের অনুপস্থিতি সেদিন কী শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল, অরবিন্দের আবেগ-তপ্ত উক্তির মধ্যে তা' সুপরিস্ফুট।

অনেক পরবর্তীকালে অরবিন্দ-অনুজ বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ ঘোষ লিখলেন—'স্বদেশীযুগে বিপিনচন্দ্রকে না হইলে কোনো অগ্নিবর্ষী বয়কটের সভাসমিতি জমিত না, তাঁহার আকাশপ্লাবী উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারিত দেশপ্রেমের ও ইংরাজ-বিদ্বেষের অগ্নিকণা না হইলে সকল অনুষ্ঠানই শিবহীন দক্ষযজ্ঞের ন্যায় প্রাণহীন মনে হইত'।[৩২] বিপিনচন্দ্র ব্যতীত নিপীড়িত ভারতের 'শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশা ধ্বনিয়া' তুলতে কে আর সেদিন সমর্থ ছিল! মনীষী বিনয়কুমার সরকার সঙ্গত কারণেই লিখেছিলেন—'আমার বিচারে সে যুগের আসল নেতা বিপিন পাল। ১৯০৫ সনের আগস্ট থেকে ১৯০৮ সন পর্যন্ত বাঙালী জাতকে তাতিয়ে তোলবার ভার ছিল বিপিন পালের হাতে। বিপিন পালের গলার আওয়াজ না শুনলে যুবক-বাংলার জন্ম হতো না। বিদ্যায়, দার্শনিকতায়, রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানে, বিপ্লবযোগে, কর্তব্যনিষ্ঠায় বিপিন পালের ঠাঁই উঁচু ছিল'।[৩৩] বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও অকপটে স্বীকার করেছেন—'...হাতিয়ার যখন আমাদের নেই, শুধু হাতে খালি মনের জোরে যতটা পারা যায় এবং যত রকমে

পারা যায় অবৈধ বিদেশী রাজশক্তিকে বাধা দিতে হবে। এই কথা বিপিনচন্দ্রের পূর্বে কেউ বলেন নি। বয়কট, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও প্যাসিভ রেজিস্টান্স ভারতের রাজনীতিতে বিপিনচন্দ্রের দান। এ দেশের সমসাময়িক ইতিহাসে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবুক হিসাবে তাঁর স্থান অতি উচ্চে'।[৩৪] ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনে বিপিনচন্দ্রকে সভাপতিরূপে বরণ করবার প্রাক্‌কালে শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত বলেছিলেন—'আমরা এখানে আমাদের স্বরাজলাভের জন্য সমবেত হয়েছি। বিপিনবাবু, যিনি আমাদের মধ্যে এই স্বাধীনতার চেতনা উদ্রেকের জন্য অতটা করেছেন, এখনও আমাদের পরামর্শদানের জন্য তাঁকেই আহ্বান করা শোভন হবে'।[৩৫]

সত্যই বিপিনচন্দ্র ছিলেন সে যুগের 'কলোসাস'। আর এই কারণেই শত-সহস্র জনের মুগ্ধ হৃদয়ের অনাবিল প্রীতি লাভ করেও তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন নিঃসঙ্গ, একাকী। তাঁর উচ্চতা যদি একটু কম হতো, দৃষ্টি যদি শুধু বাংলা দেশ, এমনকি ভারতবর্ষের তৎকালীন আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, যদি তা' পৃথিবীব্যাপী সমগ্র মানবজাতির অনাগত অথচ আসন্ন ভবিষ্যতের দূরপ্রসারী দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত না হতো, তবে ক্ষণিক স্বার্থসন্ধানী ক্ষুদ্র মানুষের ভক্তিচন্দনতিলক 'ভালে নিয়েই অনবচ্ছিন্ন গৌরবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জনপ্রিয় নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে পারতেন। কিন্তু কলোসাসের পক্ষে নিজেকে অতখানি খর্ব করে, নিজের ঋষিদৃষ্টিকে 'এক্সপিডিয়েন্সি' বা সুলভ সুবিধাসন্ধানের ঠুলি পরিয়ে অন্ধপ্রায় করে অবিরাম জনতোষণের সার্থক সাফল্যের আত্মপ্রসাদ উপভোগ করা সম্ভবপর নয়। তাই ক্ষুদ্র, খণ্ড সত্যের স্বার্থে অখণ্ড, শাশ্বত ন্যায়ের পক্ষ এবং বিবেকের পক্ষ পরিত্যাগের হীনতা অবলম্বনে স্বীকৃত হওয়া তাঁর জীবনধর্মের অনুকূল ছিল না। বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে জান্তব প্রবৃত্তির প্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে নায়কত্ব আঁকড়ে রাখবার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। বিপিনচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকা বিপিন-চরিত্রের সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন তা' এই প্রসঙ্গে যথার্থভাবে প্রণিধানযোগ্য : 'বিবেকের স্বাধীনতা, অন্তরাত্মার স্বাধীনতা প্রভৃতি বর্ণনা লেখার মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ভাবগুলিকে যদি মূর্তিমান রূপে কল্পনা করা যায়, তাহা

হইলে বিপিনচন্দ্র পালকে তাহার প্রতীক বলা যাইতে পারে।……বিচার ও যুক্তি দিয়া যাহা তাঁহার নিকট গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয় নাই, অনুভূতি দিয়া যাহা তিনি সঙ্গত বলিয়া বোধ করেন নাই, তাহার সম্মুখে কোনদিন তিনি মাথা নোয়াইতে সম্মত ছিলেন না। কি রাজনীতিতে, কি সমাজে, কি ধর্মাচরণে, কি দার্শনিকতায়, কি সাহিত্যে, কি সংবাদিকতায়, কি আইনসভায়—বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এই মনীষীর কার্যে ও আচরণে এই এক বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে'।[৩৬] এইজন্য সুযোগ সুবিধা লাভের অপেক্ষাকৃত অনুকূল দিনগুলিতে লুব্ধ জনতার সঙ্গী হতে যেমন তিনি পারেন নি, তেমনি শুধু আবেগবশে তামসরজনীর তন্ত্রসাধনায় যোগ দিতেও অসম্মত হয়েছিলেন। যে কোনো প্রকার সাময়িক স্বার্থসাধনের জন্য যে কোন প্রকার আপসরফায় স্বীকৃত হওয়া বিপিনচন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব ছিল। শুধুমাত্র বর্তমানের সুবিধা নয়, শুধুমাত্র নিজ সম্প্রদায়, জাতি ও দেশের নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর ভবিষ্যৎ কল্যাণে তাঁর ভাব ও ভাবনার পরিধি রচনা করতো বলেই, সেই উন্মত্ত জাতিবৈরিতার দিনেও তিনি ইংরেজজাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারেন নি, খিলাফত আন্দোলন এবং গান্ধীজী ও আলিভ্রাতৃদ্বয়ের চুক্তি সমর্থন করতে পারেন নি এবং মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে তেমন উৎসাহ বোধ করতে পারেন নি।

'ম্যাজিক' নয়, 'লজিকের' ধাতুতে গড়া ছিলেন বলেই বিপিনচন্দ্র গান্ধীজী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য ও সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহ ও আপত্তি প্রকাশ করেন। যাঁরা শুধু ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হন এবং যাঁরা স্বল্পতম ক্লেশ স্বীকারে অতি বৃহৎ ও মহৎ ফললাভের দূরাকাঙ্ক্ষা করেন—সেই সমস্ত ব্যক্তিই এই কারণে বিপিনচন্দ্রের কুৎসারটনায় মুখর হয়ে ওঠেন। মহাত্মা গান্ধী-অনুসৃত কার্যক্রমের অপূর্ণতা তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ও তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে ব্যক্ত করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বিপিনচন্দ্র যা' যা' বলেছিলেন, তার যৌক্তিকতা এতই গভীর ছিল যে উত্তেজনার উদ্বেল মুহূর্তে তার পূর্ণ তাৎপর্যগ্রহণ ও অনুসরণ অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। গান্ধীজী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর যে অপূর্ণতাগুলি বিপিনচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারেনি, সেগুলি হচ্ছে : (১) এই আন্দোলনের কর্মসূচীতে অনতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর গুরুত্ব

করা হয়েছে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, সম্মানসূচক উপাধিবর্জন ইত্যাদি) অথচ অতি প্রয়োজনীয় বিষয় উপেক্ষিত রয়ে গেছে (যেমন,—বৃটিশ পণ্য বয়কট, এই দেশের বৃটিশ বাণিজ্যোদ্যোগসমূহ থেকে ভারতীয় মূলধন ও শ্রম প্রত্যাহার); (২) এতে বিভিন্ন বিষয়ের অভাবাত্মক দিকগুলি গৃহীত হয়েছে অথচ তাদের ভাবাত্মক দিকগুলি গড়ে তোলা হয়নি; এবং শেষতঃ এই কর্মসূচীতে প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের জন্য করণীয় বিষয় কিছুই রাখা হয়নি।[৩৭]

তিনি উপরি-উক্ত ভাষণে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বললেন—'আমাদের বিরোধিতা অসহযোগ আন্দোলনের মূল আদর্শ বা নীতি সম্পর্কে নয়, অসহযোগ আন্দোলনের বাস্তব রূপায়ণের জন্য যে বিশেষ রূপরেখা তৈরী করা হচ্ছিল, তার সম্পর্কেই আমাদের বিরোধিতা'।[৩৮] যে যে কারণে ১৯০৫-০৭-এর সুতীব্র আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হয়ে পড়ে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা' ব্যক্ত করে বিপিনচন্দ্র বলেন—'১৯০৫-এ, ১৯০৬-এ এবং ১৯০৭-এ আমাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল, তার কারণ সে আন্দোলন বড়ো রকমের জাতীয় ধর্মঘটের পর্যায়ে পৌছতে পারেনি। এবং কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের আপত্তির কারণ ছিল এইজন্য যে ঐ প্রস্তাবে জাতীয় ধর্মঘটের কথা যে চিন্তা করা হয়েছে তার ইঙ্গিত পর্যন্ত ছিল না। ঐ প্রস্তাবে সরকারী স্কুল-কলেজ, বৃটিশ আদালত, নতুন লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বয়কটের সঙ্গে সম্মানসূচক উপাধি ও পদ বর্জনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ বয়কট ও বর্জন যাঁদের স্পর্শ করবে, তাঁরা জাতির একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের অধিকাংশেরই বর্তমান সরকারের সঙ্গে, বিশেষতঃ সরকারের বৃহত্তম দুর্গ বিশেষ শক্তিশালী বৃটিশ পুঁজিপতি এবং বণিকমহলের সঙ্গে সহযোগিতার সুযোগ অবারিত রয়ে গেছে।'[৩৯] কোনো বৃহৎ আন্দোলনের সার্থকতায় জনগণের সক্রিয় ভূমিকা যে অপরিহার্য, দেশনায়করূপে বিপিনচন্দ্র মনেপ্রাণে তা' বিশ্বাস করতেন। এইজন্য সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হোক্, এটি তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টি যে অভ্রান্ত, যুক্তি যে অকাট্য তা' স্বীকার করতে হয়েছিল অনেককে।

অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে বরিশালে বাবু বিপিনচন্দ্র পাল যে ভাষণ দেন, সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক দর্শনে দূরকল্পনার ঋদ্ধির মধ্যে এর গুরুত্ব নিহিত।.....বিপিনচন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে তিনি ভারতবর্ষের

ভাবী সংবিধানের পরিকল্পনার খসড়া তৈরির উদ্দেশ্যে সংবিধান রচনা-বিষয়ক সাম্প্রতিক রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বসমূহের আলোকে দেশের অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টা করেছেন। যতদূর আমরা জানি, এদেশের আর কোনো রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্ এ কাজ করেন নি। বিপিনচন্দ্র এই দিকে চিন্তা উদ্রিক্ত করে তুলেছেন।'[৪০] কিন্তু নেতৃবৃন্দ তথা দেশবাসীর 'তবু ভরিল না চিত্ত'। এর কারণটিও অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ব্যাখ্যা করেছেন—'কিন্তু বিপিনচন্দ্রের ভাষণের যা' প্রধান ত্রুটি বলে যে কোনো লোকের কাছে মনে হবে, তা' হচ্ছে এই যে ঐ ভাষণে প্রাদেশিক বিষয়ের চেয়ে সর্বভারতীয়, তা'ও নয়, সমগ্র জগদ্‌গত বিষয়সমূহের উপর অনেক বেশী জোর দেওয়া হয়েছে'।[৪১] নিতান্ত ক্ষুদ্র প্রাদেশিক চিন্তার কূপমণ্ডূক হতে অস্বীকার করাও যে কখনো কখনো অপরাধের ব্যাপার হয়ে ওঠে, উপরি-উক্ত মন্তব্য তার প্রমাণ।

বিপিনচন্দ্রের এই সময়কার চিন্তা ও তাঁর দেশবাসীর মনের ভাবের মধ্যে তখন ফারাক্ আশমান-জমিন্। য়্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা এর বিবরণ দিয়ে লিখেছিলেন—'…সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশ যা' চেয়েছিলেন, তিনি তাঁদের তা' দিতে সমর্থ হননি। তাঁরা চেয়েছিলেন ম্যাজিক, কিন্তু তিনি তাঁদের দিয়েছিলেন লজিক'।[৪২] স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—মাত্র সার্ধদশক আগে যে বিপিন পাল বাংলাদেশকে তাতিয়ে দিয়েছিলেন, সারা ভারতকে দিয়েছিলেন মাতিয়ে, যাঁর নাম 'মন্ত্র' হয়ে উচ্চারিত হতো কণ্ঠে কণ্ঠে, রক্তে দিত দোলা, বুকে তুলতো ঝড়, আজ তাঁর এই পরিণাম কেন ?

এ প্রশ্নের জবাব ইতিপূর্বেই দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ—'…পাল কাজের লোক কিংবা রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের যোগ্য না হলেও তিনিই ছিলেন দেশের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তি'।[৪৩] শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তির নঙর্থক দিকটি একান্তভাবে বাস্তবতাসম্মত। রাজনৈতিক নেতৃত্বের সামর্থ্য দলের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। আর একথা কে না জানেন যে, নিজের বিবেকের দাবি অক্ষুন্ন রেখে দলের মন রক্ষা করা যায় না। বিপিনচন্দ্রের স্বভাব সত্যই এই ধরনের প্রবণতার প্রতিকূল ছিল। পৃথিবীর সর্বকালে সর্বদেশে মানবহিতৈষী স্বাধীনচেতা চিন্তাবীরদের ক্ষেত্রে যা' হয়েছে, বিপিন-চন্দ্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শুধু ভাবের জোয়ারে না ভেসে

ভাবনার কূলে নেমেছিলেন বলেই তিনি আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজলাভের পর সেই স্বরাজের স্বরূপ কেমন হবে, ভাবী স্বাধীন ভারতের সংবিধানের একটি রূপ-রেখার মাধ্যমে তা' দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশবাসী যখন তাঁর সে কথায় কর্ণপাত করলো না, তখন তিনি সখেদে বলেছিলেন—'কিন্তু সেই হিসাব-নিকাশের দিন আসবে যেদিন জনসাধারণ আবিষ্কার করবে যে তারা যখন এক জিনিসের স্বপ্ন দেখছিল, তখন তাদের নেতারা অন্য জিনিসের কথা বলেছিলেন'।[৪৪] ১৯৪৭-৬৭ সালের 'ভারত দ্যাট ইজ্ ইণ্ডিয়া'র ভাব-মূর্তি কি ১৯২১-এই বিপিনচন্দ্রের ধ্যানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল!

বিপিনচন্দ্রের বিজ্ঞ পরামর্শ সেদিন গ্রাহ্য না হলেও তাঁর চিন্তা ও বুদ্ধি যে ভুল করেনি, সে-কথা স্বীকৃত হলো দীর্ঘকাল পরে যখন ভাবের জোয়ারে ভাসিয়ে দেওয়া 'স্বরাজের' তরণী সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এবং ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা ভাগ-বাঁটোয়ারার ভাঁটার কাদায় আঘাটায় আটকে গেল। মহাত্মা গান্ধীর একান্ত ভক্ত সহকর্মী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু একদিন নির্মোহ হয়ে লিখলেন—'দেশ তখন নবকর্মের উন্মাদনায় মত্ত, চিন্তা ও বুদ্ধিকে তখন ব্যাঘাতসৃজনকারী বলিয়া মনে করা হইতেছে, স্বেচ্ছায় বৃত মহাত্মা গান্ধীকে নির্বিচারে অনুসরণ করাই দেশজোড়া সৈনিকসম্প্রদায়ের ধর্ম বলিয়া আমরা মনে মনে স্থির করিয়াছি। এ অবস্থায় বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা চিন্তামণি প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বাণী কর্মকোলাহলে আমাদের চিত্ত বা বুদ্ধিকে স্পর্শ করিল না। খেলাফত-সমস্যা তুর্কীর নবজাগরণের ফলে নিষ্ফল হইয়া গেল; কিন্তু সেই আন্দোলনের আওতায় মুসলিম সমাজের যে স্বকীয়তা সাজাত্যবোধের পরিপন্থী হইয়া দেখা দিল, তাহাই উত্তরকালে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়া আমাদের সমূহ ক্ষতিসাধন এবং স্থায়ী সমস্যার মধ্যে পরিণতি লাভ করিল'।[৪৫]

একালের সমালোচক সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—"বিপিনচন্দ্র ছিলেন লজিকের পক্ষপাতী, তাই অসহযোগ আন্দোলনের 'ম্যাজিক' বুঝতে পারেননি। গান্ধীবাদী আন্দোলনের উন্মাদনায় তিনি বুদ্ধিজীবনের অস্বীকৃতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন; তেমনি নির্বিচার গুরুবাদ বা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের অন্ধ অনুসরণও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। ব্যক্তিপূজার বিরোধী বুদ্ধিবাদী বিপিন-

চন্দ্রের সঙ্গে গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের সংঘর্ষ ঘটা সেদিন তাই খুবই স্বাভাবিক ছিল।"[৪৬]

প্রকৃতপক্ষে অসহযোগ আন্দোলনের 'ম্যাজিক' বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বিপিনচন্দ্র গান্ধীজীর কর্মপন্থা সর্বাংশে অনুসরণে অসম্মত হয়েছিলেন। ম্যাজিক যে প্রকৃতকে অপ্রকৃত এবং অপ্রকৃতকে প্রকৃত প্রতীয়মান করে, অথচ আসলে সবই অলীক এই সত্য জানা ছিল বলেই বিপিনচন্দ্র হুঁশিয়ারি জারী করেছিলেন। কিন্তু বেহুঁশ স্বরাজের ব্যাপারীদের কানে তা' প্রবেশ করেনি। হুজুগপ্রিয়, ম্যাজিকবশ 'দেবতা, জনসংঘ, লোকমত' তাই ক্রুদ্ধ হয়ে ফুঁশে উঠেছিল। তাদের পক্ষ থেকে তাই একজন লিখলেন—"বিপিনবাবুর অতি-বিস্তৃত অভিভাষণটির সমালোচনার প্রয়োজন দেখি না। তাতে না আছে উপকার, না আছে আনন্দ। তিনি লোকের চোখ লক্ষ্য করে যে তর্কের ধূলো উড়িয়েছিলেন, তা'ও তাদের চোখে পড়েনি। সুতরাং সেটা ঝেড়ে ফেলার পরিশ্রম স্বীকারেরও কোনো প্রয়োজন নেই। তবে তিনি অমৃত বলে যে অন্ন লোকের মুখের সামনে ধরেছিলেন এবং লোকে যা অদেয়মগ্রাহ্যম্ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে তার একটু পরিচয় দিলে ক্ষতি নাই। উক্ত অপূর্ব সামগ্রীর প্রধান উপাদান দু'টি স্বাধীন ভারতের শাসন-প্রণালীর স্কীম বা খসড়া এবং ইংরেজের সঙ্গে রফার (স্বরাজের দফা-রফার) শর্ত। আর তার প্রধান মসলা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি কার্পণ্যভাব।......স্বরাজের স্কীম—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এককথায় এই অতি-দীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ স্কীমের যে টিপ্পনী করেছেন তা' অতুলনীয়। তাঁর নিজের স্বরাজের স্কীম কি, এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, আই য়্যাম্ নট এ স্কিমিং ম্যান। স্কীম তো একটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যে স্কিমিং কোথায় তার একটু বিশদ ব্যাখ্যা দরকার। গত নাগপুর কংগ্রেসের ক্রীড-এর আলোচনাকালে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনবাবু 'স্বরাজ'শব্দটিকে 'ডিমোক্রেটিক' বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আপত্তিবশতঃ উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। সে সময় চিত্তরঞ্জনবাবুর সহিত বিপিনবাবুর সম্বন্ধের বিষয় বিবেচনা করে দেখলে উক্ত বিশেষণটি বিপিনবাবুর লজিক্যাল মাথার সৃষ্টি, এরূপ অনুমান করলে বোধহয় মারাত্মক ভুল হবে না। যাই হোক্, শুভ অবসর উপস্থিত হওয়ামাত্র তিনি এক ঢিলে দু'টি নয় অনেকগুলি পাখী শিকারের ব্যবস্থা করে ফেললেন। সেগুলি এই :—(১) অবাঙালী কংগ্রেসের

মাথায় বাঙালী কন্‌ফারেন্সের লগুড়াঘাত দ্বারা বাঙালীর নষ্ট প্রভুত্ব উদ্ধার; (২) বিশ্ববিজয়ী মহাত্মা গান্ধীকে কৌশলক্রমে পরাভব করার বিমলানন্দ উপভোগ; (৩) ভাবী স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের উদ্ভাবয়িতারূপে পুণ্যশ্লোক হওয়া।...স্বরাজই উদ্দেশ্য—নন্‌-কো-অপারেশন উপায় মাত্র। স্বরাজলাভ হলে নন্‌-কো-অপারেশনের স্মৃতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসবে এবং সেই সঙ্গে গান্ধী যাবেন মিলিয়ে এবং দেদীপ্যমান হয়ে উঠবেন শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু (স্বরাজের স্কীম যাঁর সৃষ্টি)।"[৪৭]

গান্ধীজীর বরদৌলী-সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা কী পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হয়ে যায়, সে-কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯২১) গান্ধীজী বরদৌলীতে সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য দ্বিতীয়বার প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু সত্যাগ্রহ আরম্ভের পূর্বেই তিনি বাধা পান। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়—'উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক এক গ্রাম্য শহরের লোকেরা স্থানীয় পুলিসদের সামান্য কলহের সুযোগ লইয়া পুলিস থানা আক্রমণ করে ও ২১ জন দেশীয় পুলিস ও চৌকিদারকে নৃশংসভাবে হত্যা করে (৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। চৌরিচৌরার ঘটনা দেখিয়া-শুনিয়া বিবেচক লোকে বুঝিলেন ধর্ম-উপদেশের দ্বারা রাজনৈতিক স্বার্থ-বুদ্ধিকে আধ্যাত্মিক করা যায় না। গান্ধীজীও বুঝিলেন সত্যাগ্রহের সময় হয় নাই,'...[৪৮] জনসংঘ, লোকমত প্রভৃতি গালভরা নামের মোহে যে অসহিষ্ণু তরুণেরা নন্‌-কো-অপারেশনের নেশায় মত্ত হয়ে যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধির বাঁধ ভেঙে ছুটতে চেয়েছিলেন, গান্ধী-বিরোধিতার অপরাধে বিপিনচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন, তাঁরা অচিরেই দেখতে পেলেন গান্ধীজী নিজেই নন্‌-কো-অপারেশন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। অপরের কথা থাক্‌, চৌরিচৌরার দুর্ঘটনার পর গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ-আন্দোলন স্থগিতের সিদ্ধান্তকে গান্ধীজীর একান্ত অনুরক্ত শিষ্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বীকার করে নিতে পারেননি।[৪৯]

একক ব্যক্তিত্ব-নির্ভর আন্দোলনের ভাবী সাফল্য যে সংশয়মুক্ত নয়, দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন বিপিনচন্দ্র তা' আগেই অনুভব করেছিলেন এবং সেইজন্য আশঙ্কা প্রকাশ করে অকপট ভাষায় সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন—'বর্তমান আন্দোলনের শক্তির হেতুর মতো এর অপর সীমাবদ্ধতার হেতুও মহাত্মা গান্ধীর

বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব। যে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনে এই ধরনের ব্যক্তিগত প্রভাবের মূল্য অপরিসীম।…সেই সঙ্গে এর অপরিহার্য বিপদও (অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে) এই যে, যদি কোনো কারণে এই ব্যক্তিগত প্রভাব অপসৃত হয়, এই ধরনের প্রভাবের উপর যে কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে, তা' ধসে পড়ে যায়। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের অকালমৃত্যুতে যা' ঘটেছে, তার দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে রয়েছে'।[৫০] অথচ তৎকালীন সত্য তিনি অস্বীকার করেন নি যে 'তিনিই (মহাত্মা গান্ধী) ভারতে স্বরাজ-লাভের উদ্দেশ্যে হিন্দু ও মুসলমানকে এত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতায় আবদ্ধ করেছেন।'[৫১] বিপিনচন্দ্রের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল। গান্ধীজী সরে দাঁড়িয়েছিলেন—আন্দোলনও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক পরবর্তীকালে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন।[৫২]

ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আপস-রফা ব্যতীত যে তদানীন্তন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গত্যন্তর ছিল না, বিপিনচন্দ্র সেই অপ্রিয় সত্যটি সর্বজনসমক্ষে ব্যক্ত করে দেওয়ায় তাঁর উদ্দেশ্যে সেদিন বহু কটুকাটব্য নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। নির্ভীক সত্যকাম বিপিনচন্দ্র তাঁর অবুঝ, অসহিষ্ণু শ্রোতাদের স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন—'অতএব অহিংস অসহযোগের মাধ্যমে স্বরাজলাভের একমাত্র সম্ভাবনা ভারতের জনগণ ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে আপস-রফার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। এবং সর্বদাই আপস-রফার অর্থ হচ্ছে আদান-প্রদান'।[৫৩] তিনি ঐ ভাষণে স্পষ্টই বলেছিলেন যে, যে কোনো পরিমাণ নৈতিক চাপ সৃষ্টি করেও বৃটিশ সরকারকে ভারত-ত্যাগে বাধ্য করা যাবে না। তাঁর মতে, 'যদি আর একটি ইউরোপীয় যুদ্ধ বাধে কিংবা গ্রেট বৃটেনের অভ্যন্তরে যদি কোনো ভয়ঙ্কর বিপ্লবের উত্থান ঘটে, তবেই এই ব্যাপার কল্পনা করা যেতে পারে।'[৫৪] বিপিনচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই বৃটিশ সরকার ভারত-ত্যাগে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। দীর্ঘকাল পরে হলেও, সেদিনের সেই অবুঝ, অসহিষ্ণুদের একজন, মন্মথনাথ সান্যাল বিপিন-চন্দ্রের উপরি-উক্ত ভাষণাংশ উদ্ধৃত করে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী স্মৃতি-তর্পণ উপলক্ষে স্বীকার করেছেন—"আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বরিশাল অধিবেশনে সভাপতির যে ভাষণের জন্য গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে

তাঁর চির-বিচ্ছেদ ঘটে গেল, তাতে কী আপত্তিজনক বা অপরাধের কথা তিনি বলেছিলেন। যদিও অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করবো যে, বিপিনচন্দ্রের বিরুদ্ধে যাঁরা সরব হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাতে তখন আমিও দ্বিধাবোধ করিনি। সেই যৌবনচাপল্য আজ মনে উদিত হলে মন কুণ্ঠাতেই ভরে যায়।..... বিপিনচন্দ্রের এই উক্তিগুলিকে আজ যেন ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্রফেটিক আটারেন্স' অর্থাৎ আপ্তোক্তি, তাই বলে মনে হয়। ইতিহাস তাঁর উক্তির যাথার্থ্য দেশকে অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রমাণিত করেছে। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, এই ভাষণটিই তাঁর রাজনীতিক জীবনে প্রায় সমাপ্তির দাঁড়ি টানার হেতুস্বরূপ হয়েছিল"।[৫৫]

তাঁর নবম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে চপলাকান্ত ভট্টাচার্য লিখলেন—'এটা অবশ্য স্বীকার্য যে ব্যাকুল দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে তাঁর স্থান কারও নীচে ছিল না এবং তাঁর সমস্ত কর্মের মধ্যে বাংলার প্রতি গভীর মমত্ববোধ মিশ্রিত ছিল। এমন কি সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচণ্ড অগ্রগতির মধ্যেও তাঁর তীক্ষ্ণ ও বিশ্লেষণী-বুদ্ধিসঞ্জাত ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে বাংলাদেশের রাহুগ্রস্ত হবার আভাস এবং তার স্থায়ী ক্ষতির সম্ভাবনা ধরা পড়েছিল'।[৫৬] কারণ, 'বিপিনবাবু যে কর্মসূচী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা' কংগ্রেস কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বাংলা যখন তা' অসহায়ের মতো চেয়ে দেখছে, তখন অন্যেরা তা' গ্রহণ করে লাভবান হচ্ছে।'[৫৭]

সে সময়ে না হলেও আজ স্বীকৃত হচ্ছে—"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যুগোপযোগী সংস্কারসাধন করে সকলের স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও সাধনার সমন্বয়-প্রয়াস এবং সর্বভারতীয় সংস্কৃতির যে-ফেডারেশন স্থাপনের কথা তিনি ভেবেছিলেন তা' আজকের পৃথিবীতে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ব্যর্থতা প্রকট হওয়ার পর নতুন করে বিবেচনার দাবি রাখে।......তাঁর ইম্পিরিয়াল ফেডারেশন প্রস্তাবটিকে হয়তো সেই সময়ে (১৯১০-১৯১১) গালভরা তত্ত্বকথা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সেটি যে কত সময়োপযোগী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তা পরবর্তীকালে জাপানের আগ্রাসী-নীতি, চীনের অভ্যুত্থান, ঐসলামিক দেশগুলির জোটবন্ধনের প্রয়াস ইত্যাদি ঘটনা প্রমাণ করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের পরিবর্তে সংযুক্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর (ফেডারেল সেলফ্ রুল) প্রয়োজন 'লীগ অব নেশনস' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে"।[৫৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রাজনৈতিক মতান্তরের জন্য যে প্রিয় সুহৃদ এবং ভাব-শিষ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্রের চির-বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তিনিও প্রয়াণের অব্যবহিত পূর্বে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে যে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন, তাতে বিপিনচন্দ্রের নামোল্লেখ না করেও বিপিনচন্দ্রের ইম্পিরিয়াল ফেডারেশন-তত্ত্বের প্রতি প্রায় প্রকাশ্য সমর্থন জানান। তিনি বলেন—'বাস্তবিকপক্ষে সাম্রাজ্য-ধারণা আমাদের অনেকগুলি সুযোগ-সুবিধার ইঙ্গিত দেয়। আজকের দিনে ডোমিনিয়ন স্টেটাস আর কোনো অর্থেই দাসত্ব নয়। · এটা উপলব্ধি করা গেছে যে বর্তমান অবস্থায় কোনো জাতি বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচতে পারে না এবং ডোমিনিয়ন স্টেটাস যেমন একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্য নামক বৃহৎ জাতিসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সংগঠক-উপাদানকে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করে, তেমন প্রত্যেককে আত্মোপলব্ধির অধিকার দেয়, · ···আমি মনে করি যে ভারতবর্ষ তার নিজের মঙ্গলের জন্য, কমনওয়েলথের মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, কমনওয়েলথ-এর মধ্যে স্বাধীনতালাভের জন্য চেষ্টা করবে এবং সেইভাবে মানবতার সেবা করবে'।[৫৯]

তবু বিপিনচন্দ্র সেদিন উপেক্ষিত হয়েছিলেন। কারণ—'দল কেবল লজিকে গড়ে ওঠে না, একটু ম্যাজিকও চায়।'[৬০]

কারণ, ডক্টর রাধাবিনোদ পালের কথায়—'ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রচণ্ড আন্দোলনকে তিনি কখনই ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জনকামনায় তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেন নাই।'[৬১]

কারণ, দলের উন্নতি নয়, দেশের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, এবং শুধু ভারতবাসীর নয়, সমগ্র বিশ্বমানবের উন্নতি বিপিনচন্দ্রের চরম কাম্য ছিল।

কারণ, এই কর্তাভজা গুরুবাদের দেশে "গান্ধী-প্রভাবিত যুগে যখন লক্ষ কোটি জনতা গান্ধীজীর অঙ্গুলিহেলনে সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মতো চালিত হইতেছে, তাহারই মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছি—'রাষ্ট্রনীতিতে গুরুবাদ মানি না'।[৬২]

কারণ, 'গণতন্ত্রসমূহ অকৃতজ্ঞতার জন্য কুখ্যাত। তারা মানুষের কায়িক ও মানসিক শক্তিকে চরমভাবে ব্যবহার করে এবং তারপর তাদের বর্জন করে আবর্জনা-স্তূপে নিক্ষেপ করে।'[৬৩]

কারণ, দলীয় রাজনীতির আপাতলাভজনক কিন্তু পরিণামে সর্বনাশা কার্যকলাপ বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমিক বিপিনচন্দ্র সমর্থন করতে পারেন নি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্যদলের সঙ্গে এইজন্যই তাঁর বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল। তিনি 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে কলকাতা করপোরেশনে স্বরাজ্যদলের বিরোধিতা করে লেখেন যে স্বরাজ্যদল স্বজন-পোষণ-নীতি অনুসরণ করছেন এবং মহাত্মা গান্ধী 'দলের ঐক্য' বজায় রাখার নামে এই একাধিপত্য সমর্থন করছেন। তিনি স্পষ্টতঃই বলেন—'স্বরাজ্যদল অধিকৃত করপোরেশন গত বছর বেঙ্গল কাউন্সিলের ভোটের উপর প্রভাব-বিস্তারের উদ্দেশ্যে তার পৃষ্ঠপোষকতাকে কাজে লাগিয়েছে—এটা অখ্যাতির ব্যাপার। নতুন করপোরেশনে প্রথম দিকে যে সমস্ত লোক নিয়োগ করা হয়, সে সমস্ত লোকদের অনেকেই কি বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্যদের আত্মীয়-স্বজন নন'?[৬৪] এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর ক্রুদ্ধ স্বরাজ্যদলের মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা বিপিনচন্দ্রের অভিযোগের সরাসরি কোনো জবাব দিতে না পেরে, মূল প্রসঙ্গটিকে পাশ কাটিয়ে সম্পাদকের বরাবর এক পত্রের মাধ্যমে ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিপিনচন্দ্রকে ব্যঙ্গ করে লিখলেন—…'আমি আশা করি, পাল-মশায় আবার যখন স্কুলমাস্টারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, তখন তিনি তাঁর সমসাময়িক ইতিহাসের জ্ঞানকে ঝালিয়ে নিলে ভালো করবেন'।[৬৫]

বাস্তবিকপক্ষে বিপিনচন্দ্র কোনোদিনই দলনেতা ছিলেন না, দলনেতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন জনশিক্ষক এবং সর্বোপরি স্বদেশ-প্রেমিক বা প্যাট্রিয়ট। এই কারণেই দলীয় রাজনীতির সঙ্গে মতান্তরের জন্য তিনি সকল দলের দ্বারাই পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। দলীয় রাজনীতিতে ন্যায়-বিচারের যে সংজ্ঞা 'মিত্রের হিতবিধান এবং শত্রুর ক্ষতিসাধন'[৬৬], বিপিনচন্দ্র তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে কখনই সম্মত হতে পারেন নি। রাজনীতির চলমান স্রোতের আবর্তে বিপিনচন্দ্র যে নীর থেকে তীরে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তার একটি কারণ হয়তো এই যে 'প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন সমসাময়িক কালের অগ্রগামী এবং বৃদ্ধবয়সে নবতর আন্দোলনের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারেন নি'।[৬৭] এই 'নবতর' আন্দোলন সম্পর্কে তখন কোনো মোহ পোষণ করবার কারণ থাক্ বা না থাক্, এ কথা তো অনস্বীকার্য যে পরিবর্তিত যুগ-মানসের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এই আন্দোলনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে 'নবতর' মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল।

এ ছাড়া দেশনায়কের আসন থেকে বিপিনচন্দ্রের অপসৃতির সম্ভবত

অন্যতর কারণও ছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে তিনি পুঁজিবাদ-বিরোধী আন্দোলনকেও যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি এই কারণেই তিনি সন্তোষজনক বিবেচনা করতে পারেন নি। অথচ এই অগ্রগামী চিন্তা তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না। বরিশাল সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে—'বৃটিশ প্রথমে এদেশে এসেছিল ব্যবসায়ী-রূপে এবং সম্পূর্ণভাবে না হলেও তারা এখনও প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থেই এখানে রয়েছে'।[৬৮] সুতরাং অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীতে অর্থনৈতিক বয়কটের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত এবং অর্থনৈতিক বয়কট সার্থক করতে হলে শুধু বিলাতী পণ্য বর্জন নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ বাণিজ্যোদ্যোগসমূহ থেকে ভারতীয় মূলধন এবং শ্রম প্রত্যাহার করে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। পুঁজি-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যে শেষ পর্যন্ত নিরর্থক হতে বাধ্য,—এই প্রাগ্রসর চিন্তা সেকালের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। পুঁজিবাদকে যদি তিনি অছিবাদের পোশাক পরিয়ে দাঁড় করাতে পারতেন, তা' হলে তাঁর পক্ষে পুঁজিবাদী এবং মধ্যবিত্ত—উভয় শ্রেণীর সমর্থন লাভ করা অসম্ভব হতো না। কিন্তু বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মতে: 'বিপিনচন্দ্রের আদর্শনিষ্ঠা ছিল অসাধারণ, সেই আদর্শনিষ্ঠার জন্য তিনি সকল বিপদ লাঞ্ছনা ক্ষতি স্বীকার করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না'।[৬৯] আর অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর ভাষায়—'অনমনীয় সত্যনিষ্ঠার ফলে তিনি পূর্বেও যেমন একাকী পথচলায় অভ্যস্ত ছিলেন, এবারে যেন সেই চলাই তাঁহার একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল'।[৭০]

বাস্তবিকপক্ষে মানবসমাজের আচরণের এক সুপ্রাচীন ইতিবৃত্ত বিপিনচন্দ্রের জীবনে আশ্চর্যভাবে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের ধারায় অবিমৃষ্যকারিতার যে আবর্ত মধ্যে মধ্যে পৃথিবীর সব দেশেই প্রগতির প্রবাহকে সাময়িকভাবে শ্লথ করে দিয়েছে, আমাদের দেশেও তা' অপ্রতুল হয়নি।

শিশু যখন প্রথম চলতে শেখে, তখন তার টলোমলো পা সামলাবার জন্য বর্ষীয়ান অভিভাবকের হাত ধরবার প্রয়োজন হয়। তারপর শিশু যখন নিজে চলতে শেখে, তখন অভিভাবকের হাত ছেড়ে সে সতীর্থ বন্ধুর সঙ্গেই চলে।

সবদেশেই গণ-শিশুর এই একই ব্যবহার,—মানব-শিশুর মতোই। শিশু বড়ো হলে আর কারও হাত ধরে চলতে চায় না,—বর্ষীয়ান অভিভাবকের মনে যেমন এ নিয়ে ক্ষোভ করবার কিছু নেই, বিপিনচন্দ্রের মনেও তেমনি কোনো বিকার ছিল না। পরাধীন মনের অন্ধকার কাটিয়ে দিয়ে জাতিকে স্বাধীনতাস্পৃহার আলোকে দাঁড় করিয়ে দিলে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ জাতি তাঁর উপর নির্ভরতাকে আর প্রয়োজনীয় বলে মনে করেনি। ব্যক্তি-জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে পরিমাপ করলে এ ব্যবহারকে কৃতঘ্ন মনে হয় বটে, কিন্তু বিপিনচন্দ্রের জীবন, চিন্তা ও চেতনা কখনই তুচ্ছ প্রতিদানের অপেক্ষায় থাকে নি।

দূরদ্রষ্টা বিপিনচন্দ্রের ভারত-চিন্তা সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রচার-পর্যটন উপলক্ষে দক্ষিণ ভারতে যাবার পথে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল বিপিনচন্দ্র কটকে এক ভাষণ দান করেন। সেই ভাষণে ভাবী স্বাধীন ভারতের সম্ভাব্য সংবিধানের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপিত করে বিপিনচন্দ্র বলেছিলেন—'প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রদেশগুলি নিয়ে স্বতন্ত্র রাজ্যসমূহ গঠিত হবে। হয়তো তা' হবে ন্যাশনালিটি বা জাতীয়তা অনুসারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সেই রাজ্যসমূহ থাকবে। দেশীয় রাজ্যসমূহও অনুরূপভাবে একই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। সমগ্র রাষ্ট্রের নিয়ামক হবেন প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি। তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মতো ক্ষমতাসম্পন্ন হবেন…'। বিপিনচন্দ্রের এই উক্তি উদ্ধৃত করে একালের ঐতিহাসিক-দম্পতি হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় সখেদে মন্তব্য করে বলেছেন—'আজ আমরা ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির অধিনায়কত্বে ভারতে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র লাভ করেছি, কিন্তু আমরা আর সেই ব্যক্তিটির কথা স্মরণ করি না, যিনি বর্তমান শতাব্দীর উষা-লগ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার মতো স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ভারতের রূপরেখা আমাদের উপহার দিয়েছিলেন'।[৭১]

বিপিনচন্দ্র ছিলেন সত্যই স্বয়ং এক ইতিহাস,—সচরাচর আমরা যাকে বলি 'যুগমানব' বা 'যুগপুরুষ'। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে, তিনি যেন কবি ব্রাউনিংয়ের কল্পনার সৃষ্টি সেই 'প্যাট্রিয়ট' বা দেশপ্রেমিকের মতো, যার অভ্যুদয়কালে—'গোলাপে গোলাপে ছাওয়া ছিল পথ'। ব্রাউনিংয়ের প্যাট্রিয়টের অভ্যুদয়-দিনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সহস্র কৌতূহলী দৃষ্টি;

আবার নিষ্ক্রমণ-দিনেও সেই জনতা, কৌতূহলী দৃষ্টি কিন্তু সে দৃষ্টি প্রেমহীন, অবজ্ঞায় ভরা। যে বিপিনচন্দ্র বৃটিশ-কারামুক্ত হয়ে এলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয়েছিল, তিনিই যখন ভব-কারামুক্ত হয়ে অনন্ত জীবনের অভিমুখে যাত্রা করলেন, সেদিন একশ' লোকও তাঁকে চিরবিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে সমবেত হলো না। তবে ব্রাউনিংয়ের প্যাট্রিয়ট শেষের দিনে দেখে গেলেন উন্মত্ত ক্রোধের বিকৃত মূর্তি, আর বিপিনচন্দ্র নিয়ে গেলেন ইতিহাসের প্রাপ্য—স্বার্থান্ধ মানুষের নীরব উদাসীনতা।

বিরাট পুরুষের বিশাল মূর্তি প্রাকৃত দেহে লোকলোচনের অন্তরালে চলে গেল বটে, কিন্তু যে বিপুল কর্মোদ্যোগের তিনি সূচনা করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, সেই কর্মোদ্যোগের অপরিহার্য ফল উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে স্বাধীনতার বাস্তব বিগ্রহরূপে দেখা দিল। 'লাল-বাল-পাল' হয়ে গেল ভারতেতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

সূত্র-নির্দেশ

(১) 'Repression is nothing but the hammer of God that is beating us into shape so that we may be moulded into a mighty nation,...we are iron upon His anvil and the blows are showering upon us not to destroy but to re-create.'—'Jhalakati Speech'—Speeches of Aurobindo Ghose, Chandernagore, 1922, Pp. 133-34.

(২) 'We are perfectly justified in trying to become arbiters of our destiny and in trying to obtain freedom. I think the people of Bengal ought to be congratulated on being leaders of that march in the van of progress···And if the people of India will just learn that lesson from the people of Bengal, I think the struggle is not hopeless'.—Lajpat Rai's speech at the Benares session of Congress, 1905.

(৩) 'I have not the eloquence of my friend, Mr. Benerjee,...nor the trumpet voice of Mr. Bipinchandra Pal,...'.—Speech at the Calcutta session of Congress, 1906 : Quoted in 'Life and Work of Lal, Bal and Pal' by Dr. P. D. Saggi, New Delhi, 1962, P. 175.

(৪) '...Babu Bipinchandra Pal burst into full fame in Madras as a preacher of the new political creed. For several days on the sands of

the beach he spoke words hot with emotion and subtly logical, which were wafted by the soft evening breeze to tens of thousands of listeners, invading their whole souls and setting them aflame with the fever of a wild consuming desire. Oratory had never dreamt of such triumphs in India ; the power of spoken words had never been demonstrated on such a scale.'—'My Master Gokhale' : Rt. Hon'ble V. S. Srinivas Shastri, Madras, 1946, P. 58.

(৫) '...the foremost man among us'.—'A Great Message' : 'Bande Mataram Daily', March 12, 1908.

(৬) 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' : যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রথম সং, ১৩৬৩ (১৯৫৬), পৃঃ ২২৮-২৯ ।

(৭) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৫৯ ।

(৮) 'Patriotism is love of one's country, and love's test is sacrifice.... The Congress here, and its British Committee in London, are both begging institutions. We have given a new name to begging ; We call it agitation... Agitation is not, in any sense, a test of true patriotism. That test is self-help and self-sacrifice ; and the time perhaps is coming, faster than we have thought, when Indian patriotism will be put to this test. Will it be able to stand it ? Time will show.'—New India, 17th July, 1902, *vide* Swadeshi & Sawraj : B. C. Pal, Pp. 1—4.

(৯) 'শতবর্ষের বাংলা' : শ্রীমতিলাল রায়, চন্দননগর, ১৩৩১ (১৯২৪), পৃঃ ৬৫-৬৭ ।

(১০) 'Henceforth a new hope—the hope of liberty and independence—burned with a bright flame in the soul of Bengal. A gifted prophet of this new creed arose (in Bengal) in the person of Bepinchandra Pal, who threw the whole strength and passion of his being into the work of proselytising his countrymen to the creed of his adoption.'—'The Heart of Aryavarta' : Earl of Ronaldshay, 1925, P. 89.

(১১) 'One of the first and ablest of the fiery Bengalis was Bepinchandra Pal. In appearance he was mild and gentle and refined ; there was nothing strong and masterful in his look.'—'Dawn in India' : Sir Francis Younghusband, London, 1931, P. 40.

(১২) 'But in the quietest manner and in perfect English he could set flowing from him an uninterrupted succession of the most seathing comments on British rule and the most radical proposals for supplanting it.'—*Ibid*, P. 40.

(১৩) 'Mr. Bepinchandra Pal, a high-caste Hindu and a man of great intellectual force and high character···,—'Indian Unrest' : Valentine Chirol, London, 1910, P. 9.

(১৪) "The chief purveyor of seditious ideas was Babu Bipinchandra Pal, a Bengali of considerable education, much ability, and of very great eloquence, whose speeches displayed in unmistakable language the aims of the 'Gospel of the New Movement' in India."—'The Historian's History of the World' edited by Henry Smith Williams, London, Vol. XXI, P. 668.

(১৫) Sir Francis Younghusband ; *Op. Cit.*, Pp. 35-36.

(১৬) Memories of My Life and Times ; B. C. Pal, Vol. II, Pp. 117-18.

(১৭) 'Mr. Tilak had no ill will against the British but was an admirer of the virtues of British Public life and British love of liberty...His quarrel was with the Bureaucracy and the vested interests in England and India which wanted to withhold from Indians the full rights of British citizenship.'—Lokamanya Tilak : Dr. B. G. Bhat, Poona, 1956, P. 3.

(১৮) *Ibid*, P. 3.

(১৯) '...Lajpat had no sympathy with Bepin Pal's philosophical comprehensiveness and synthetic presentations. The intellectual subtleties of the latter's Soul of India were the farthest removed from his matter of fact and prosaic view of things, and it is interesting that Bepin Pal is no less the maker of Young Bengal than Lajpat of the Young Punjab.'—'Creative India' : Benoy Kumar Sarkar, Lahore, 1937. P. 508.

(২০) '...in this field his writings and contributions to thought were cofined almost exclusively to contemporary questions and current affairs.'—*Ibid*, P. 505.

(২১) 'Khaparde supported Tilak's suggestion regarding the election of Lala Lajpat Rai as President. But Bipinchandra Pal and men of his way of thinking were advocating that Tilak should become the President of the Congress.'—'Congress and Congressmen in the Pre-Gandhian Era' : B. B. Majumder & B. P. Mazumder 1967. P. 64.

(২২) 'If the extremists, such as Tilak and Bipinchandra Pal, gain the

ascendency, it will be impossible to deal with them, and the Congress itself split up.'—The Evolution of India and Pakistan, 1858-1947, Select Documents, ed. C. H. Philips, pp. 77-78.

(২৩) "My best item of news I have kept till the end of my letter...I was to receive a deputation...the deputation consisted of the Maharaja of Darbhanga, Surendra Nath Banerjee, Mr. Choudhury, a member of the Congress, Narendra Nath Sen, Editor of the 'Indian Mirror' and three Mahamedan gentlemen. The burden of their conversation was that they are most anxious to put an end to unrest and bad feeling··· it was simply marvellous...to see 'the king of Bengal' (S. N. Banerjee) sitting on my sofa···asking for my assistance to moderate the evil passions of the Bengali, and inveighing against the extravaganoes of Bepinchandra Pal."—Minto to Morley, March 19, 1907, 'India, Minto and Morley" by Mary Countess of Minto, London, 1934, Pp. 108-109.

(২৪) '...I do not think we should allow Bepinchandra Pal to stump the country preaching sedition as he has been doing'.—Minto to Morley, April 2, 1907 : *Ibid*, P. 123.

(২৫) Minto to Morley (Telegram—deciphered) May. 8, 1907 : *Ibid*, P. 125.

(২৬) Minto to Morley, June 27, 1907 : *Ibid*, Pp. 147-148.

(২৭) 'Srijut Bipinchandra Pal is the most powerful brain at present at work in Bengal.' 'The Glory of God in Man' : Bande Mataram, Weekly Edn., March 1, 1908, *vide* 'Bande Mataram and Indian Nationalism' : Prof. Mukherjees, P. 63.

(২৮) 'The Chief of the itinerant demagogues was Bipinchandra Pal who did more to inflame the minds of the masses against the Government than any one else.'—হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় রচিত 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ' গ্রন্থের ৮৪ পৃষ্ঠা (২নং পাদটীকা) দ্রষ্টব্য।

(২৯) 'It is therefore necessary to give a new impetus to the movement everywhere, and now that Srijut Bepinchandra is out of prison, the necessary will no doubt be done'—'The Work Before Us' : Bande Mataram, Weekly Edn., April 12, 1908, *vide* 'Bande Mataram and Indian Nationalism' : Prof. Mukerjees, P. 69.

(৩০) 'The people have not yet understood, but the power to understand is

in them, and if any voice can awake that power, it is Bepinchandra's. —The New Ideal, Bande Mataram, Weekly Edn., April 12, 1908 : *Ibid* P. 77.

(৩১) 'It was more than a year ago that I came here last. When I came I was not alone ; one of the mightiest prophets of Nationalism sat by my side. It was he who then came out of the seclusion to which God sent him, so that in the silence and solitude of his cell he might hear the word that He had to say. It was he that you came in your hundreds to welcome. Now he is far away, separated from us by thousands of miles'.—Uttarpara Speech : Speeches of Aurobindo Ghose, 1932, P. 84.

(৩২) 'সর্বজনবরেণ্য বিপিনচন্দ্র' : বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, যুগান্তর, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৫৮ ।

(৩৩) 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' : হরিদাস মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৪২, পৃঃ ৩৩২ ।

(৩৪) 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' : যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রথম সং ১৩৬৩, পৃঃ ২৫৮

(৩৫) 'We have assembled here to win our Swaraj and it is in the fitness that Bepin Babu who has done so much to rouse this spirit of freedom among us should be asked to guide us now.'—'Bengal Provincial Conference' : A. B. Patrika, March 26, 1921,

(৩৬) 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (সম্পাদকীয়), ৭ই নভেম্বর, ১৯৫৮ ।

(৩৭) 'Presidential Address, Barisal, 1921' (Bengal Provincial Conference) published by Suresh Ch. Dev, Calcutta, Pp. 13-14.

(৩৮) *Ibid.*, P. 14.

(৩৯) *Ibid.*, Pp. 14-15.

(৪০) 'It was a great speech that Babu Bepinchandra Pal delivered as President of the Provincial Conference at Barisal. Its greatness consists in its wide outlook and the richness of speculations in political philosophy....the merit of Babu Bepinchandra is that he has tried to examine the conditions in India in the light of the latest political theories on Constitution-making with a view to sketch out a plan for the future Constitution in India. No political thinker in this country, so far as we are aware, has done this. Bepinchandra has stimulated thought in this direction.'—A. B. Patrika (Editorial), March 27, 1921.

(৪১) 'The great defect of Babu Bepinchandra's speech which would occur

to anybody is that it lays far greater stress on all India, nay, all world subjects than on provincial matters.'—*Ibid*, March 27, 1921.

(৪২) '...he had not been able to give them what the vast majority of the Conference wanted. They wanted magic but he had given them logic'. —President's Closing Remarks' (Associated Press of India) : A. B. Patrika, March 30, 1921.

(৪৩) '...Pal though not a man of action or capable of political leadership, was perhaps the best and most original thinker in the country.'— Aurobindo on Himself and on the Mother. P. 52.

(৪৪) 'But the day of reckoning would come when the people discovered that they had been dreaming of one thing and their leaders were talking of another.'—'President's Closing Address', Barisal Conference : A. B. Patrika, March 30, 1921.

(৪৫) 'বিপিনচন্দ্র পাল' : নির্মলকুমার বসু, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৮৮০ শক (১৯৫৮), পৃ: ১৭০

(৪৬) 'বিপিনচন্দ্র পাল' : বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৬৮, পৃ: ২১৪।

(৪৭) 'বরিশাল সম্মেলন ও বিপিনবাবু' : দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, 'ভারতী'—বৈশাখ, ১৩২৮ (১৯২১)।

(৪৮) 'রবীন্দ্র-জীবনী' : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড, ১৯৬১, পৃ: ৯৭-৯৮।

(৪৯) 'Chouri Chaura and its consequences made us examine these implications of non-violence as a method and we fell that if Gandhiji's arguments for suspension of civil resistance was correct, our opponents would always have the power to create circumstances which would necessarily result in our abandoning the struggle. Was this the fault of non-violent method itself or of Gandhiji's interpretations of it ? After all, he was the author and originator of it and who could be a better judge of what it was and what it was not ?'—Mahatma Gandhi ; Jawharlal Nehru, Signet Press, Calcutta, 1949, P. 50.

(৫০) Bengal Provincial Conference, Barishal, 1921 (Presidential Address), P. 121.

(৫১) *Ibid*, P. 119.

(৫২) 'The first phase of Non-Co-operation Movement ended with Gandhi's cry of halt, and any chance of its revival at an early date was removed by his confinement behind the walls of prison. For, the whole

movement centred round one person, and his disappearance gave a death blow to it at least for the time being.'—'History of the Freedom Movement in India' : R. C. Majumder, Vol. III, 1963, P. 162.

(৫৩) 'The only possibility, therefore, of the attainment of Swaraj by non-violent non-co-operation is through a compromise between the British Government and the people of India. And a compromise always means give and take...'.—Presidential Address—Bengal Provincial Conference, Barisal, 1921, P. 85.

(৫৪) 'This is only conceivable in the event of another European war or a tremendous internal revolution in Great Britain itself...'—*Ibid*, P. 84.

(৫৫) 'স্বাদেশিক মন্ত্রের উদ্গাতা মনীষী বিপিনচন্দ্র' : মন্মথনাথ সান্যাল, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই নভেম্বর, ১৯৫৮।

(৫৬) '...it must be admitted that in his ardent love for the country, he was second to none and in what he did he was urged by a deep attachment to Bengal. Even in the onrush of political movement his keen and analytical intellect could foresee that it would result in the eclipse of Bengal and lead to her permanent injury.'—'Bipinchandra Pal' : Chapalakanta Bhattacharjee, Hindusthan Standard, May 20, 1941.

(৫৭) 'The programme that Bipin Babu had prophesied has been fully accepted by the Congress, but Bengal is left to look on helplessly while others benefit from its acceptance.'--*Ibid*, Hindusthan Standard, May 20, 1941.

(৫৮) বিপিনচন্দ্র পাল, : 'বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা'—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ: ২১৫।

(৫৯) 'Text of Presidential Address—Mr. C. R. Das on Empire Idea : The Bengalee. May 2, 1925.

(৬০) 'বরিশাল সম্মেলন ও বিপিনবাবু', দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, ভারতী, বৈশাখ, ১৩২৮ (১৯২১)।

(৬১) ডক্টর রাধাবিনোদ পাল ; আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ই নভেম্বর, ১৯৫৮।

(৬২) আনন্দবাজার পত্রিকা (সম্পাদকীয়) : ৭ই নভেম্বর, ১৯৫৮।

(৬৩) 'Democracies are notoriously ungrateful. They use men to the utmost limit for their physical and mental power and then discard them and throw them on the scrap heap.'—'Democracy's Ingratitude' : The Statesman (Editorial), May 22, 1932.

(৬৪) 'It is notorious that the patronage in the Corporation seized by the Swarajists has been used last year to influence votes in the Bengal

Council. Did not many of the earliest appointments made by this new Corporation go to relatives and Portegees of the members of the Bengal Council?'—Englishman, 14th July, 1925.

(৬৫) 'I hope next time when Mr. Pal assumes the role of schoolmaster, he would do well to brush up his knowledge of contemporary history'. —Letter to the Editor by Jonab Abdul Matin Choudhury, Forward, July 15, 1925.

(৬৬) 'Doing good to your friends and harm to your enemeies.'—'Plato's Republic', Book I: Everyman's Library, No. 64, 1958, P. 6.

(৬৭) '...in his prime in advance of his time and in old age of being out of steps with newer movements.'—'Democracy's Ingratitude': The Statesman (Editorial), May 22, 1932.

(৬৮) '...the British came to this country first as traders and they are here today mainly, if not entirely, in the interest of their trade and commerce.'—Presidential Address, B. P. Conference, Barisal 1921, P. 15.

(৬৯) 'সর্বজনবরেণ্য বিপিনচন্দ্র' : বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ; যুগান্তর (রবিবাসরীয় সাময়িকী), ২৩-এ নভেম্বর, ১৯৫৮।

(৭০) 'বিপিনচন্দ্র পাল' : নির্মলকুমার বসু ; বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৮৮০ শক (১৯৫৮)।

(৭১) 'Today we have got in India a Sovereign Republic since 1950 with an elected President at its head, but we no longer remember the man who in the very early of present century gave us the vision of Free Indian Republic.'—'Bepinchandra Pal and India's Struggle for Swaraj': Prof. Mukherjees, P. 77.

পরিশিষ্ট 'ক'

[Letter to Pandit Matilal Nehru]

Dear Mr. Nehru,

I don't know how you feel ; I am afraid you are so taken up with your arguments just now that you may have no time to feel anything else. But I am somewhat troubled over the policy that must be followed by the Independent in view of the Congress resolution on Non-co-operation. You know I do not agree with it. Of course, the only vital point of difference is the question of the councils boycott and that is a matter which I may well pass over, neither support nor oppose ; as regards the rest—national schools, arbitration courts, boycott of foreign goods etc., these are the positive side of the Resolution, and they have my fullest support. But this is not the *real question*. That question is the domination of our nationalist policy by the Khilafat Committee. I do not know if you are aware of it that for the last 8 or 10 years, I have been the most open and relentless opponent of Pan-Islamism. I thought it was dead, and so frankly lent my pen and voice to support the Khilafat movement, but the last week has convinced me that the Khilafat was only a cover for the Pan-Islamic propaganda. Hindu-Moslem unity is alright, but are we going to be fooled by these Pan-Islamists as the Government was one time ? This Khilafat agitation spells a very serious danger to our cause. And excuse me for saying it, S. A. (Shaukat Ali) has been using Mr. Gandhi for his own ends. I did not like the letter's statement in the Subjects Committee that he did not care for

Swaraj, he cared for Hindu-Moslem unity and the Khilafat. The Khilafat has precedence in his thought and endeavour over the Punjab tragedy. It is just here that I sense a great danger to let ourselves be led by him. As a boy of 18, I could not sacrifice my conviction to obey my father ; as a youngman I rose in revolt against Keshub Chander Sen when he developed pontifical tendencies. I fear this a million-fold more in Politics. I cannot lend myself to this new spirit of hero-worship in the masses which kills people's freedom of thought and practically paralyses by the dead weight of unreasoning reverence their individual conscience. I am not blind to the possibilities of good in the great hold that Mahatmaji has got on the populace. But there is the other side, and in the earlier stages of democracy these personal influences, particularly when they are due to the inspiration of mediaeval religious sentiments, are simply fatal to its future. This does not remove that inherited slave-mentality which is the root of all our degradations and miseries. And here, perhaps, may come a more fundamental conflict of inner spirit than on the Congress Resolution itself. Of course, I need hardly say that these deeper things cannot be openly discussed in the press or on the platform. But when they are at the back of one's mind, they are bound to tinge one's discussion of public questions. This is how I feel. And it is for you to think and frankly tell me what might be done, under the curcumstances regarding the Independent.

I have always very scrupulously refused to impose my personal views on the Independent, and whenever I have put

that they are only mine and may not be that of others, or in consonance with the general policy of the paper, I have always written above or under my own name. So far there is no difficulty. But there has hitherto been a general agreement in spirit upon vital questions. If you are at one with the spirit of rank, and shall I put it,—irreverent or merciless spirit of democracy and rationalism which would not be afraid of denying God and all else as reason demanded it, then there won't be any difficulty. But otherwise, that is the problem. Kindly do not mistake my intention. I do not wish to get away from you, and if I have to, it will be with great regret. The loss will be more mine than yours. Because I have had a vehicle for my thoughts during these two months such as I had not after the Bande matarm was killed. And even if I may have to be relieved of the responsibility of the editorial office, my pen will be at the service of the Independent as much as it is now. God willing, I propose to return to Allahabad by Monday night's Punjab mail.

Yours sincerely

10th September, 1920 Bepin Chandra Pal

P. S. Since writing the above, I have come to learn what some of the speakers said the other day in the open Congress. I understand that Dr. Kitchlew (I could not follow him) declared 'you Hindus will have to fall in line with us; if you don't, you will see what the consequences will be'. This is reported to me (we are having a consultation at Mr. Chakrabarty's) by a very respectable leader from the

Punjab,—Raizada Bhagat Ram and was repeated by Mr. Chaman Lal. Yesterday Syed Ikramulla Sahib, Bar-at-Law, voted for our amendment, and as he was getting down the steps and Raizada Bhagat Ram was with him, a Pathan rushed up from the crowd and told him—'Look here, you are Pir, and you have voted against Mussalmans. If you were in Peshawar, you would have been killed to-day.' Rambhoj Datta choudhury appealed to the Congress that 'you must not reason, you must not question, you must follow the Commander-in-chief'. There are more evidences of this character which confirm me in my conviction that the movement of Mahatma Gandhi is fraught with very serious moral and political danger to the country.

10th September, 1920

পরিশিষ্ট—'খ'

॥ কবিতাগুচ্ছ ॥

বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়), কার্তিক, ১৩১২ (১৯০৫)।

'শ্রী' ছদ্মনামে প্রকাশিত

'স্বদেশ'-এর অন্তর্গত ঃ—

১

স্বদেশ

বেদনার মাঝে আজি জেগেছে চেতনা,
পেয়েছি তোমার দেখা হে মোর স্বদেশ !
নত-আঁখি জল-ভরা ছিন্ন চীরবেশ
শিয়রে দাঁড়ায়ে আছ কথা কহিছ না।
উদাসী প্রবাসী তুমি ঘরে আপনার,
'যথারণ্য তথা গৃহ' কুপুত্রের মাঝে।
অচেতন পশ্চিমের সুতীব্র সুরার
মত্ততায় সন্তানেরা, লজ্জাহীন সাজে
লুন্ঠিত ধূলায়, মুখে শৌণ্ডিকের ভাষা,
তোমার অমৃতবাণী লুপ্ত রসনায়।
অতীত গৌরব তব, ভবিষ্যের আশা,
আজিকার যাহা কিছু—বিদেশীর পায়
নিঃশেষ দিয়াছি ঢেলে। এ কি হেরি আজ,
ভিখারীর বেশে তুমি ওগো রাজরাজ !

২

ব্রত

ওগো বঙ্গ কুলাঙ্গনা সতীলক্ষ্মীগণ,
আজি বঙ্গমাতা কাঁদি তোমাদের দ্বারে
হানিছেন কর। নিরাশ কোরো না তাঁরে,

ভিখারিণী জন্মভূমি, তবু মা যে হন
তোমাদের। শুন তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা।
আর কিছু নয় শুধু চাহিছেন তিনি
রমণীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত উদ্‌যাপনা
তোমাদের ঘরে, যার পুণ্য ফলে জিনি
লভে পৌরুষ রতন—হৃত কোহিনুর
ভারতের। দেশহিতব্রতধারিণীর
কল্যাণীর বরমাল্যে দৈন্য হবে দূর
পুরুষের, স্তনে তাঁর শিশু হবে বীর
রাখী তার ভ্রাতৃহস্তে বল দিবে আনি,
তবে ভুলিবেন মাতা সর্বদুঃখ গ্লানি।

৩

ভিখারী

সর্বাঙ্গে বিভূতি-মাখা কণ্ঠে ভিক্ষাঝুলি,
ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে কে তুমি সন্ন্যাসী
ভিখারী শিবের সম! বাতায়ন খুলি
অন্তঃপুরলক্ষ্মীগণ অপূর্ব সঙ্গীত
শুনিছেন তব। করুণার—বেদনার
শত উৎসধারা বক্ষে বক্ষে উৎসারিত।
গাহিতেছ বৈরাগ্যের গান বারংবার
মৌনব্রত কর্মরত নব জীবনের
উদ্বোধনগীতি। মাগিতেছ প্রীতিভিক্ষা
শুধু, চাহিতেছ স্বার্থত্যাগ, সংযমের
অজিন-কৌপীন-বাস রিক্ত সজ্জা, দীক্ষা
অগ্নিমন্ত্রে তব। সুখ স্বার্থ হিংসা দ্বেষ
গীতে তব ভুলে যাই হে মোর স্বদেশ!

৪

উপনয়ন

আজি তব ভগ্ন-দেবালয়ে হোমানল
ভাল করি জ্বাল ওগো তাপস মহান্ !
বাজাও তোমার শঙ্খ, তোমার বিষাণ,
তারস্বরে কর উচ্চারণ অবিরল
বীজমন্ত্র তব। এসেছি আমরা আজ
ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, বাল-বৃদ্ধ, যুবা-নারী
তব ভক্তদল—দাও দীক্ষা, দাও সাজ
বৈরাগ্যের পবিত্র গৈরিক। ব্রহ্মচারী
আজি হ'তে মোরা ; লভি নব জীবনের
দ্বিজত্ব নবীন শূদ্র-বিপ্র-স্ত্রী-পুরুষে।
দাও কণ্ঠে যজ্ঞ-উপবীত সকলের
নির্বিচারে। আজি এই মঙ্গল প্রত্যুষে
তব যজ্ঞকুণ্ড হ'তে যজ্ঞানল ল'য়ে
গৃহে ফিরি যাই সবে অগ্নিহোত্রী হ'য়ে।

৫

আগ্নেয়গিরি

গভীর অতলস্পর্শ হৃদয়ের তলে
আগ্নেয়গিরির সম ধরিছ অনল।
আজি ভস্মধূমাচ্ছন্ন তুমি অচঞ্চল
হে মোর স্বদেশ শুধু ধক্ ধক্ জ্বলে
রাবণের চিতা বক্ষমাঝে রাত্রিদিন !
প্রমোদ প্রাসাদ রচি সুখের শয়নে
আলস্যে বিলাসে কাটি গেছে কর্মহীন
দীর্ঘ দিবা। নিদ্রা আজি নাহিক নয়নে

ভোগ অবসাদ-ক্লিষ্ট জর্জরিত হিয়া
নিশীথ শয়ন ত্যজি' আজি এ আঁধারে
তব পৃথ্বীতলে তপ্ত বক্ষ পাতি দিয়া
শুনিলাম কম্পমান মর্মের মাঝারে
অব্যক্ত ক্রন্দন তব গুমরি গুমরি
উঠিতেছে মুহুর্মুহু। উঠিনু শিহরি!

৬

প্রলয়

কতদিন বল আর রাখিবে সম্বরি
বক্ষোমাঝে রুদ্ধশ্বাস, বেদনাগভীর
সন্তানের অবহেলা, ঘৃণা বিদেশীর
সহিবে নীরবে? কবে উঠিবে বিদরি
মেদিনী অম্বরতল ক্রন্দনের স্বরে
ঢালি দিবে উচ্ছ্বসিত যুগযুগান্তের
অগ্নিপ্রস্রবণ, হৃদয়ের স্তরে স্তরে
হতেছে সঞ্চিত নিত্য যাহা। প্রলয়ের
প্রবল আঘাতে বিলাসের কারাগার
নিমিষে ভাঙিয়া দিবে, দিবে চূর্ণ করি
বিলাস-সম্ভার যত পণ্য বীথিকার।
সেইদিন ভারতের চির বিভাবরী
হবে সুপ্রভাত, দ্বাদশ আদিত্যগণ
আনিবেন ভারতের মহাজাগরণ।

বঙ্গবিভাগ

রাজার শাণিত খড়্গ নিষ্ঠুর আঘাতে
পারেনি করিতে দ্বিধা তোমারে স্বদেশ!

শুধু ভাঙিয়াছে তব নিদ্রার আবেশ,
দিয়াছে চেতনা। আজি নবীন প্রভাতে
যুগযুগান্তের সুপ্ত নিমীলিত আঁখি
মেলিয়াছ, হেরিতেছ তরবারি-লেখা
বিদারণ রেখাগুলি স্থিরদৃষ্টি রাখি
রুধিরাক্ত বক্ষোপরি। শুধু ক্ষুণ্ণ রেখা,
ছিন্ন করে সাধ্য কার পূত দেহ তব
কুলিশ কঠোর? এই ব্যবচ্ছেদ-খাদ
ভরিয়া বহিয়া যাক্ তরঙ্গ ভৈরব
বঙ্গবক্ষঃক্ষত বিগলিত মেঘনাদ,
রক্তগঙ্গা—পুণ্যস্পর্শ যার দিবে প্রাণ
সহস্র সন্তানে, দিবে বরাভয়দান।

বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়), বৈশাখ, ১৩১৩ (১৯০৬)
'শ্রীঃ' ছদ্মনামে প্রকাশিত।

পূজারী

হে স্বদেশ, হে দেবতা, অভাজন জনে
দিলে তুমি শঙ্খঘণ্টা পূজা-উপচার,
তোমার মন্দিরে দিলে আরতির ভার;
পূজারী করিলে মোরে আজি পুণ্যক্ষণে।
ক্ষুদ্র আমি অতি দীন অভক্ত সন্তান,
তোমার প্রাঙ্গণতলে ভক্তপদধূলি
লভিবারে এসেছিনু, তুমি দিলে স্থান
তোমার চরণতলে, নিলে মোরে তুলি'
দুর্গতির গ্রাস হতে হে শিবসুন্দর।
পুণ্যনীরে ধুয়ে দিলে কলঙ্ক-কালিমা,
খুলি নিলে ছিন্নবাস, দিলে শুক্লাম্বর,

শুভ্র উত্তরীয়, রক্তচন্দন-শোণিমা
তোমার স্বাক্ষরলিপি ভালে লিখি' দিলে,
নিষ্ফল জীবন মোর সার্থক করিলে।

জীর্ণতরী

ওগো জীর্ণতরি, তোমারে ডুবাতে চায়
বিদেশী বণিকদল শত ছিদ্র করি,
আজি বক্ষ তব জলে উঠিয়াছে ভরি
অতল জলধিগর্ভে তুমি মগ্নপ্রায়।
ওগো কে আছিস্ তোরা আয় ত্বরা করি—
এখনও হয়নি নৌকাডুবি সর্বনাশ—
রুদ্ধ করি ছিদ্রমুখ বক্ষে চাপি ধরি
জল সেঁচি রক্ষা কর্ অন্তিম নিশ্বাস।
হে তরণি ছিন্নপাল, ছিন্নরশারশি,
নবীন নাবিকদল নূতন কাণ্ডারী
এতদিন পরে আজি দলে দলে বসি
তোমারে করেছে পূর্ণ। হে নব সংসারি,
আবার বাঁধিয়া বুক ল'য়ে শত দাঁড়ী
ভরাপালে নবোৎসাহে দাও তবে পাড়ী।

পান্থপাদপ

হে বিশাল লক্ষবাহু বিটপি মহান্
হে প্রাচীন মৃত্যুঞ্জয়, কত যুগ ধরি
একাকী দাঁড়ায়ে আছ নীরব প্রহরী
হেরিতেছ জগতের পতন-উত্থান!
কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা সহিয়াছ তুমি

হে সহিষ্ণু মহাশাখি! পাতি স্নিগ্ধ ছায়া
নিষ্ঠুর পথিকদলে বিশ্রামের ভূমি
করিয়াছ দান। তারা ভুলি স্নেহমায়া
অতিথিবৎসল বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া
মিটায়েছে রক্তভৃষা, কুঠারের ঘাতে
কেটেছে তোমার শাখা, লয়েছে লুটিয়া
তোমার সোনার ফল। কি অভিশম্পাতে
শুষ্কপর্ণসমাচ্ছন্ন ওগো অনাহারি
তোমার মলিনচ্ছবি আজিকে নেহারি।

সন্ন্যাস

শুভলগ্ন যায় বয়ে বিলম্ব কিসের,
ওরে মূঢ় মন্দবুদ্ধি কি বা আছে তোর,
কার লাগি আগুপিছু? কুলিশ কঠোর,
কর চিত্ত, লহ দীক্ষা নবজীবনের।
হে স্বদেশ, গুরু মোর তাপস নির্বাক্,
জ্বাল হোমবহ্নি তব বিরজার লাগি,
শিখা সূত্রোপাধি নাম ভস্ম হয়ে যাক্,
সর্ব বাধাবন্ধহীন নির্মুক্ত বৈরাগী
কর মোরে! কেড়ে লহ মুখ হতে মম
প্রগ্‌লভ প্রলাপবাণী; অগ্নিমন্ত্র তবু
নিত্য জপি' চিত্তমাঝে হে অন্তরতম,
সর্ব দ্বিধাশঙ্কাহীন মৃত্যুঞ্জয়ী হব।
নিষ্কাম কল্যাণব্রতে দেহমনপ্রাণ
শ্রেষ্ঠ চরিতার্থতায় লভুক নির্বাণ।

নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

অন্তর্যামী

—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

তুমি হাসিতেছ বধূ! তাই মনে হয়
সেই পথখানি মোর কাছে অতিশয়!
এদিকে ওদিকে চাই পাগলের মত
মন-উপবনে মোর ঘুরিছি সতত!
তবু পথ নাহি মিলে দিশাহারা মন,
রূপ-রস-গন্ধ নাহি—আঁধার বিজন!
সব গীতি থেমে গেছে ছিন্ন ফুলহার—
সম্মুখে আলোক নাহি, পশ্চাতে আঁধার!
তবু সেই পথ লাগি ঘুরিছি সতত
এই ঘোর মন-বনে পাগলের মত!

পথের লাগিয়া মন মন-পথবাসী
আমি ত আমাতে নাহি শুধু কাঁদি হাসি!
গৃহহীন একা যেন স্বপ্নে হেসে উঠি,
না পেয়ে সে পথে পুনঃ স্বপ্ন যায় টুটি'!
কে যেন আমার মাঝে পথ খুঁজে মরে
আকুল নয়নে, কার অশ্রুজল ঝরে!
সে যে আমি, সে যে আমি, আমি সে পাগল!
সব ভুলে অন্ধকারে কাঁদিছি কেবল!
মন মাঝে এক সুরে বাঁশী বাজে ওই
কোথা পথ কোথা পথ কই পথ কই!

৩

সব তার ছিঁড়ে গেছে একখানি তার
প্রাণ-মাঝে দিবানিশি দিতেছে ঝঙ্কার!
সব আশা ঘুচে গেছে একটি আশায়,

ভূলুণ্ঠিত প্রাণ-লতা আকাশে দোলায়।-
সব শক্তি সব ভক্তি যা' কিছু আমার,
এক সুরে প্রাণ মাঝে কাঁদে বারবার!
সব কর্মশেষে আজ মন-একতারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশাহারা!
সেই পথ লাগি আজ মন পথবাসী
সেই পথখানি মোর গয়া-গঙ্গা-কাশী!

৪

সে পথের হইতাম ধূলিকণা যদি
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি!
বুকে বুকে থাকিতাম
কভু নাহি ছাড়িতাম
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি!
সে পথের পথিকের পদতলে বাজি
মিশে মিশে হইতাম পদরজ-রাজি,—
আঁকড়িয়া থাকিতাম
মিশে মিশে হইতাম
ধূলায় ধূসর তার পদ-রজ-রাজি!

৫

ধূলায় ধূসর তার চরণতলায়
ধূলি হয়ে থাকিতাম দিবস নিশায়!
কিছুতে না ছাড়িতাম
জেগে লেগে রহিতাম
সেই পথ পথিকের চরণতলায়!
একদিন অকস্মাৎ কম্পিত পরাণে
তারি পায় উঠিতাম মন্দির-সোপানে।
কি গান যে গাহিতাম
হাসিতাম কাঁদিতাম
চরণের ধূলা হয়ে মন্দির-সোপানে!

৬

কি আর কহিব বধূ! আমি যে পাগল!
কি যে কহি কি যে গাহি আবল তাবল।
আমি মত্ত দিশাহারা
দীন কাঙ্গালের পারা
একটি আশার আশে পথের পাগল!
নয়ন দরশহীন হৃদয় বিকল,
সব অঙ্গ জর-জর শিথিল বিফল,
ফিরে ফিরে গৃহে আসি
শুধু অশ্রুজলে ভাসি!—
বুকে টেনে লও ওগো! পরাণ পাগল!
পাগলেরে আর তুমি কর' না পাগল!

দ্রষ্টব্য : 'নারায়ণ'—প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। সূচীপত্রে বিপিনচন্দ্র পালের নাম আছে ; কবিতার শেষে নাম নেই। অথচ দেশবন্ধু-কন্যা অপর্ণাদেবী-সম্পাদিত 'কবিচিত্ত' গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৮-১৬১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'অন্তর্যামী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নারায়ণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ (১৯১৬)

—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

পিরীতি

১

পিরীতি পিরীতি, কি তার প্রকৃতি, কেমন মূরতি ধরে ?
পিরীতির কথা, কহে যথা তথা, কেহ কি দেখেছে তারে ?
এ অঙ্গে অনঙ্গে, সদা এক সঙ্গে, রঙ্গে বসতি করে।
এরূপে অরূপে, মিলায়ে স্বরূপে, রসের মূরতি ধরে ॥
নিজ রসে মজি, এ মূরতি ভজি, সহজে পিরীতি পায়।
রস তনুখানি, রসের পরাণি, রসেতে ভাসিয়া যায় ॥

২

কি বলিব সখি, বলিবার একি, বলিলে বুঝিবে কে ?
শুন, বিপরীত মিলায়ে বিধাতা, গড়েছে পিরীতি দে' ॥

এই ত বয়ান জুড়ায় পরাণ, তবু যেন এই নয়।
এ রুচির দেহ বাড়াইছে লেহ, এ নহে মরমে কয়॥
এ রূপ দরশে আঁখি অনিমেষ, নারি তবু দেখিবারে।
এ তনু পরশে হইনু অবশ, ছুঁতে নারি তবু তারে॥
এই অঙ্গ গন্ধ নাসা করে অন্ধ, মিটে না পিয়াসা কভু।
এই কণ্ঠধ্বনি শ্রুতি রসায়নী, শ্রবণ পূরে না তবু॥
এ মানুষই হয়, এ মানুষ নয়, হেঁয়ালি ভাঙ্গিবে কে?
অঙ্গেরে ধরিয়া, অনঙ্গে পাইয়া, পিরীতি জানয়ে সে।

নারায়ণ—আষাঢ়, ১৩২৩

—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

রূপ

পুছিও না মোরে, সে কেমন জন, বলিতে নারিব আমি।
নয়ন দেখেছে, নয়ন না জানে, কেমন সে রূপখানি॥
সে রূপ পরশে, আঁধোয়া এ আখি, কে কারে দেখিবে বল?
কিবা সে বরণ, কিবা সে গঠন (কেবল) মরম ছুঁইয়া গেল!
মরম ছুঁইয়া, পরাণে পশিয়া, স্বজিল আপন কায়।
পরাণ চিরিয়া বাহির করিলে, দেখিতে পাইবে তায়॥
মিছা কহিলাম চিরিলে পরাণ, দেখা নাহি পাবে তার।
পিঞ্জর ভাঙ্গিবে, পাখী পালাইবে, ভাঙ্গা শুধু হবে সার॥

নারায়ণ—আষাঢ়, ১৩২৩

—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

পূর্বরাগ

[নায়িকার পক্ষে]

সখি! কি আর কহিব তোরে!
আপনি না বুঝি আপন বেদন
পারাণ কেন যে এমন করে॥

(আমি) জানি না এ হিয়া কিসের লাগিয়া
সদাই অধীর হইয়া ছুটে।
চিনে না যাহারে স্মরিয়া তারে
কেন গো গুমরি গুমরি উঠে॥

শুধাইলি যদি, শোন তবে বলি
কেন যে আমার এমন ভেল।
দুটি আঁখি দিয়া, জড়াইয়া মোরে
কেমনে মরমে বিঁধিল শেল॥

(একদিন) বসন্ত দুপরে আঙ্গিনার ধারে
বসিয়া বকুল-ছায়।
অপরূপ রূপ লাগিনু আঁকিতে
যেমন পরাণে ভায়॥
মাথার উপরে দুলিল মাধবী
আকুল ভোমরাকুল;
সমুখেতে নীল স্বচ্ছ সরোবরে
ফুটিল কতই ফুল॥
শ্যামল তৃণের কোমল আসনে
আবেশে বসিল সে।
ডাহিনে হেলিয়া, পড়িছে ঢলিয়া
পুলকে পুরিছে দে'॥
আঁকিতে আঁকিতে শোভন সে-রূপ
নিঁদ আঁখিতে ছায়।
শ্রীমুখ তাঁহার নারিনু ভুলিতে
ঘুমায়ে পড়িনু হায়॥

জাগিয়া দেখিনু বেলা অবসান
একেলা চলিনু জলে।
আমাতে গো যেন, আমি আর নাই
(যেন) চলেছি স্বপনবলে ॥
সে মধুর রূপে ভরল এ দিঠি
(শুনি) কি মধুর গীতি কানে।
সে রূপে সে গীতে, মন্ত্রমুগ্ধ যেন
ডুবিনু তাহারি ধ্যানে ॥

*

জানি না কেমনে জাগিনু সহসা
চকিতে মেলিনু আঁখি।
যেই মুখখানি নারিনু আঁকিতে
তাই কি সমুখে দেখি!
(অমনি) মুদিল নয়ন, কাঁপিল হৃদয়
মোহে ঝাঁপিল চিত।
জীবনে মরণে করে কোলাকোলি
বুঝি না একি এ রীত ॥

———

২

[নায়ক পক্ষে]

বরণে কিরণে খেলে লুকাচুরি,
বাসন্তী সাঁঝের বেলা।
অকারণে হিয়া, উঠিল কাঁদিয়া,
জুড়াতে করিনু মেলা ॥

কোথা বা যাইব, কিসে জুড়াইব,
কিছুই নাহিক জানি।
দুটি চক্ষু মোর পড়িল যেদিকে
ধরিনু সে পথখানি ॥

কভু আশে পাশে কভু বা আকাশে
চাহিয়া চলিনু বাটে।
সহসা চমকি, দেখিনু তাহারে
জলেরে যাইছে ঘাটে ॥

* * *

রাঙ্গা বাস পরি নামিছে সন্ধ্যা
পছিম গগন-কোলে।
পূজিবারে তারে, নাহিছে জগত
অলকা-আলোক-জলে ॥

লতায় পাতায়, ধরণীর গায়
পড়িছে গলিয়া সোনা।
(সেই) সোনার তরঙ্গে লাবণির তরী—
ভাসে মরাল-গমনা ॥

* * * *

সোনার কলসী ধরিয়া কক্ষে
পৃষ্ঠে দুলা'য়ে বেণী।
বিজন পথেতে, আপন ভাবেতে
মগন চলেছে ধনি ॥

কোথা তার প্রাণ, কোথাই বা দেহ,
কিছু যেন নাহি জানে।
হেন মনে লয়, মুরলী কাহারো
বুঝি বা বাজিছে কানে ॥

ডাগর ডাগর নীরদ নয়ন
চেয়ে যেন কারো পানে।
সে রূপ-সায়রে ডুবিবার তরে
চলেছে সিনান-ভানে ॥

*　　*　　*　　*

ছায়াটা আমার　　পড়িল সহসা
তাহার চরণ আগে।
হরিণীর মত　　চমকিয়া উঠি
চাহিল আমার বাগে॥

তড়িত-চমকে　　সে আঁখির জ্যোতিঃ
লাগিল আমার চোকে।
নিভিল তখনি,　　আঁধার ভুবন—
আগুন আমার বুকে॥

গীতিগুচ্ছ

স্বদেশী গান

১

পূরবী/আড়াঠেকা

আর সহে না, সহে না, সহে না জননী,
এ যাতনা আর সহে না।
আর নিশিদিন হয়ে শক্তিহীন
পড়ে থাকি প্রাণ চাহে না।
তুমি মা অভয়ে জননী যাহার
কি ভয়, কি ভয়, এ ভবে তাহার—
দানবদলনী ত্রিদিবপালিনী
করালরূপাণী তুমি মা।
উর মা আজিকে সে রূপে পরাণে
ডাকি মা কালিকে, ডাকি মা সঘনে,
নয়নে অশনি জাগাও জননী,
না হলে এ ভয় যাবে না।

২

পূরবী/একতাল

বাজায়ো না আর মোহন বাঁশরি,
রুদ্ররূপে ভীমবেগে প্রকাশ' পরাণে আসি।
ত্যজিয়া মুরলী ধরহ কৃপাণ,
শাণিত খাণ্ডা, অসি খরসান—
কুঞ্জে কুঞ্জে শ্মশান মশান ভীষণ সাজাও আজি।
দলিত করহ চরণতলে সকল ভীরুতা সব দুর্বলে—
সমরভেরী নিনাদ করালে নাচাও শোণিতরাশি।

———

বি. দ্র. গান দু'টির সুর ও তাল নির্দেশ করেছেন বিপিনচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী অমিয়া দেব॥

ব্রহ্মসঙ্গীত

৩

প্রাণসখা হে, বিহর হৃদয়-মাঝে।
নয়নে নয়নে থাক, আমি দেখি তোমায় প্রাণ ভ'রে।
যখন তোমায় আমি (আমি) ধরি প্রাণে,
আগে সুবসন্ত হৃদ্‌কাননে। (এমন দেখি নাই, দেখি নাই।)
দেখি ত্রিভুবন হয় নব শোভাময়, অরুণের ছটা ফুটে।
আর জেগে ওঠে প্রাণ গেয়ে নব গান, মোহ-আঁধার টুটে।
তখন আত্মপরজ্ঞান হয় অবসান, প্রেমতরঙ্গ ছুটে।
আর সর্বজীবে হয় প্রেমের উদয়, চিদানন্দ জেগে উঠে।
নরাধম আমি ধরে রাখতে নারি ঐ রূপের জ্যোতি হৃদ্‌কন্দরে—
আমার গতি কী হবে হে।
তাই বলি হে, বলি হে বন্ধু,
আমায় ছেড় না, ছেড় না, ছেড় না বন্ধু,

আমায় বেঁধে রাখো (রাখো) চরণতলে, আর পিয়াও সদা প্রেমমধু।
আমি দ্বারে দ্বারে মিছে ঘুরে মলাম।
তায় নিরবধি পাই বেদনা শুধু (বন্ধু, তোমায় ছেড়ে)।
তোমায় বন্ধু ব'লে (ব'লে) ডাকলে পরে,
(আমি আর তো কিছুই জানি না হে)
(নাম বিনা কিছুই জানি না হে)
আমার প্রাণে উথলে প্রেমসিন্ধু (শুধু বন্ধু ব'লে)॥

৪

এস, পশিয়ে পরাণে, মরমের কানে, শুনি সে মধু নাম।
(কিবা মধুর মধুর রে, পরাণ আকুল করে।)
ঘুচিবে যাতনা ভয় ভাবনা, ঘুচিবে সকল কাম
(ব্রহ্মনামের গুণে)।
কাম ক্রোধ আদি যত রিপুগণ নামগন্ধ যদি পায়
কাঁপি থরথর ভয়ে জড়সর আপনি দূরে পালায়
(ব্রহ্মনামের তেজে)।
মায়ামোহজাল, ভবের জঞ্জাল, ছুঁইলে নামের আগুন,
আঁখির পলকে হয় ভস্মময়—এমন নামের গুণ।
জ্ঞানের গরবে সঙ্গীত যার প্রাণ সেও যদি নাম পায়
ত্যজি অভিমান তৃণের সমান সকলের পায়ে লুটায়
(মান আর থাকে না)।
আপনার প্রেমে, আপনার নামে, বাঁধা পড়ে দয়াময়—
নরাধম জন লইলে শরণ আপনি এসে কোলে লয়॥

৫

রামকেলি/কাওয়ালি

গাও রে প্রভাতে ব্রহ্মনাম।

গাও রে আনন্দে ব্রহ্মনাম। কর ব্রহ্মপদে সবে প্রণাম।
করিছে উষাসতী মঙ্গল-আরতি, গায় বিহগ প্রেম গান—
ভূতল গগন প্রেমে নিগমন করে ব্রহ্মরূপ ধ্যান।
হেন শুভযোগে মোহধুমে ম'জে কত আর রহিবে শয়ান?
খোলো রে নয়ন, হও সচেতন, ভজো রে করুণানিধান।
ব্রহ্মনামামৃত-পুণ্যসরসীনীরে কর রে কর ভাই স্নান,
প্রাণথাল ভরি প্রেমকুসুম লয়ে পূজ রে পূজ প্রাণারাম।
সাধুসন্ত সাথে ব্রহ্মচরিতসুধা পিওরে পিও অবিরাম—
ভবভয় বন্ধন হইবে খণ্ডন, পাইবে হৃদয়ে স্বর্গধাম।

৬

মনোহরসাহী/খয়রা

প্রাণরমণ, হৃদিভূষণ, হৃদয়রতন স্বামী, ওহে হৃদয়রতন স্বামী,
আমি পাপে কলঙ্কিত, মোহে অভিভূত, তথাপি তোমারি আমি।
আমার আর কেহ নাই, কেহ নাই, তথাপি তোমারি আমি॥
ওহে তুমি হে আমার জীবন-আধার, চিরদিন তব আমি॥
আমার আঁখির জ্যোতি, শ্রবণের শ্রুতি, কণ্ঠমাঝে তুমি বাণী,
আমার শরীরে শকতি, হৃদয়ে ভকতি, মনোমাঝে চিন্তামণি॥
আমার দর্শন শ্রবণ পরশ মনন সকলেরই মূলে তুমি,
তবু তোমায় না দেখিয়ে মোহে অন্ধ হয়ে করি শুধু 'আমি' 'আমি'॥
ওহে দাও খুলে আঁখি, প্রাণভরে দেখি, তুমি প্রাণ, আমি প্রাণী—
ওহে অন্তরে বাহিরে নিরখি তোমারে, শুনে চলি তব বাণী॥

———

দ্র. এই 'গীতিগুচ্ছ' বিশ্বভারতী পত্রিকা (কার্তিক-পৌষ, ১৮৮০ শক : ১৯৫৮) থেকে সংগৃহীত।

॥ ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী ॥

গ্রন্থাবলী :

(অ)

অক্ষয় কুমার বড়াল —এষা (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ), ১৩৬২

অজিত কুমার চক্রবর্তী —রবীন্দ্রনাথ (বিশ্বভারতী), ১৯৬৭

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় —ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৬৫

(আ)

আশুতোষ ভট্টাচার্য —আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৯৬৩

(ক)

কৃষ্ণকুমার মিত্র —আত্মচরিত, ১৯৩৭

কেদারনাথ দাশগুপ্ত সংকলিত —শিক্ষার আন্দোলন, ১৯০৫

(গ)

গগন চন্দ্র হোম —জীবনস্মৃতি, ১৩৩৬

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী —শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ, ১৯৫৬

গৌরগোবিন্দ রায় —শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৪০

(ত)

তারাপদ মুখোপাধ্যায় —আধুনিক বাংলা কাব্য, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন —উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, ১৩৬৫

(দ)

দেবীপদ ভট্টাচার্য —বাংলা চরিত সাহিত্য, ১৯৬৪

(ন)

নবীন চন্দ্র সেন —পলাশীর যুদ্ধ, ১ম সংস্করণ

নলিনী কিশোর গুহ —বাংলায় বিপ্লববাদ, ১৩৬১

নেপাল মজুমদার —ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ১ম খণ্ড, ১৯৬১

(প)

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় —রবীন্দ্রজীবনী, ২য় ও ৩য় খণ্ড, ১৯৬১
—ভারতে জাতীয় আন্দোলন (প্রথম গ্রন্থম্ সং), ১৯৬৭

প্রমথ নাথ বিশী —চিত্র-চরিত্র, ১৩৭২
—সাহিত্য-চিন্তা (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), ১৩৭৫

(ব)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় —কমলাকান্তের দপ্তর, ধর্মতত্ত্ব, বিবিধ প্রবন্ধ, সাম্য—বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় —বাংলা সাময়িক পত্র, ২য় খণ্ড, ২য় সং, ১৩৫৯
—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, ১৯৩১
—রাজা রামমোহন রায় (সাহিত্য সাধক চরিতমালা), ১৩৬৭

বিপিনচন্দ্র পাল —শোভনা, ১৮৮৪
—সখা সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন, ১৮৮৭
—ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ১৮৮৪
—ভারত সীমান্তে রুশ, ১৮৮৫
—সুবোধিনী, ১৮৯২
—ভক্তি সাধন, ১৮৯৪
—জেলের খাতা, ১৯৫০ (১ম সং, ১৯১০)
—মার্কিনে চারিমাস, ১৩৬২
—রাষ্ট্রনীতি, ১৩৬৩
—নব যুগের বাংলা, ১৩৬২

—সত্য ও মিথ্যা, ১৩২৫ (১ম সং, ১৩২৩)
—চরিত্র-চিত্র, ১৯৫৮
—সাহিত্য ও সাধনা, ১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৫৯ এবং ১৯৬০
—সত্তর বৎসর (আত্মজীবনী) ১৯৬২
—যুগের মানুষ বিজয়কৃষ্ণ, ১৯৬৫ (১ম সং, ১৩৪১ : ১৯৩৪)

(ভ)

ভবতোষ দত্ত —চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৬৮ : ১৯৬১
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত —ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম

(ম)

মতিলাল রায় —শতবর্ষের বাংলা, ১৩৩১
মোহিত চন্দ্র সেন সম্পাদিত —কাব্যগ্রন্থ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ২য় ভাগ, (১৯০৩-০৪)
মোহিতলাল মজুমদার —আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ১৩৫০
—সাহিত্য বিতান, ১৩৪৯

(য)

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় —বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, ১৩৬৩

(র)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর —কালান্তর, ১৩৫৫
—রবীন্দ্র রচনাবলী—দশম, একাদশ, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী সং ; একাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং
—লোক-সাহিত্য, ১৩৭২
রাজনারায়ণ বসু —সেকাল আর একাল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৬৩

(শ)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় —শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব (প্রথম প্রকাশ ১৯১৭)
শশিভূষণ দাশগুপ্ত —বাংলা সাহিত্যের নবযুগ

শিবনাথ শাস্ত্রী —রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ৩য় সং (১ম সং ১৯০৩)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় —বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ৪র্থ সং, ১৩৬৯
—বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ১৯৬৫

স

সখারাম গণেশ দেউস্কর —দেশের কথা, ১৩১১ (১৯০৪)

সুকুমার সেন —বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৩৫০

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত —বাংলা সমালোচনা পরিচয়, ১৩৭৬

সুশীল কুমার গুপ্ত —উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ, ১৩৬৬ (১৯৫৯)

সুশীল কুমার দে —দীনবন্ধু মিত্র, ১৯৫১
—নানা নিবন্ধ, ১৩৬০

সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর —ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন, ১৯৬৩

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় —স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৬৭

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় —বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, ১৯৬৮

স্বামী বিবেকানন্দ —পরিব্রাজক, ভাববার কথা, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (জন্মশতবর্ষ সং, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯

(হ)

হরিদাস মুখোপাধ্যায় —বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১৯৪২

হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় —উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, ১৯৬১
—জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০

—স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ, ১৯৬১

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত —প্রেমধর্ম, ১৩৪৫

হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ —কংগ্রেস, ১৩২৭

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত —দেশবন্ধু-স্মৃতি, ১৩৩৩

—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ২য় খণ্ড

(A)

Atkinson, Brooks (New York) —The Selected Writings of Ralph Waldo Emerson.

Aurobindo (Sri) —Speeches of Aurobindo Ghosh, Chandernagar, 1932.

—The Doctrine of Passive Resistance, 1948.

—Sri Aurobindo on Himself and on the Mother, 1953.

—Bankim-Tilak-Dayananda, 1947.

(B)

Banerjee, D. N. —The Future of Democracy and Other Essays, 1953

Banerjee, Surendra Nath —A Nation in Making, 1925

Bhat, B. G. —Lokamanya Tilak, 1956

Bose, Nemai Sadhan —The Indian National Movement, 1965

Bose, Subhas Chandra (Netaji) —The Indian Struggle, Netaji Research Bureau, Calcutta, 1967

Brownell, W. C. —American Prose Masters

Burns, C. D. —Political Ideals, 4th Edn.

(C)

Carpenter, Frederic Ives —Emerson Handbook, University of California

Chirol, Valentine —Indian Unrest, 1910

Clifford, J. L. (Edited) —Selected Criticism (1560-1960), Oxford University Press, 1962

Cole, C. D. H. —Essays in Social Theory, 1950

Coleridge, S. T. —Biographia Literaria

(D)

Dey, Dr. Sushil Kumar —Bengali Literature in the 19th Century, 1962.

Dey, Mukul —Twelve Portraits, 1917

Dodwell, H. H. —The Cambridge History of India, Vol. V (1st Indian Reprint)

Dunning, M. A. —A History of Political Theories, Vol. III (From Rousseau to Spencer), Allahabad, 1966.

Dutta, Dr. Bhupendra Nath —Swami Vivekananda (Patriot-Prophet), 1954.

Dutta, R. C. —The Economic History of India, Vol. I, London, 1956
—Do— Vol. II, Delhi, 1963.

(G)

Ghosh, Sankar —Renaissance to Militant Nationalism In India, Orient Longman, 1962.

Gupta, Atul Chandra edited —Studies in the Bengal Renaissance, Jadavpur, 1958

(H)

Hobhouse, L. T. —The Metaphysical Theory of the State, 1951

Hudson, William Henry —An Introduction to the Study of Literature (1st Indian Edition), 1967

(I)

Ibsen Henrick —An Enemy of the People

(J)

Jayakar, M. R. —The Story of My Life, Vol. I., 1958

(L)

Lasky, Harold J. —A Grammar of Politics, 5th Edn., 1967

Legouis and Cazamian's —History of English Literature, London, 1961

Locke, John —Treatises on Government, Vol. II.

Long, William J. —English Literature, 1919

Majumder, Dr. Biman Behari and Bhakta Prasad —Congress and Congressmen in the Pre-Gandhian Era (1885-1917), 1967

Majumder, Dr. Biman Behari —History of Indian Social and Political Ideas, 1967

Majumder, Dr. Ramesh Chandra —History of the Freedom Movement in India, Vols. II and III, 1963

Majumder, Roy Choudhury and Dutta —An Advanced History of India, 1956

Minto, Mary Countess of —India, Minto and Morley (1905-1910), 1934.

Mody, Homy —Sir Pherozeshah Mehta, 2nd Edn.

Mukherjee, Haridas and Mukherjee Uma —A Phase of Swadeshi Movement, 1953

—Bande Mataram and Indian Nationalism, 1957

—Bepin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj, 1958

—India's Fight for Freedom,' 1958
—Sri Aurobindo and the New Thought in Indian Politics, 1964

Murray, Dr. Robert — The History of Political Science from Plato to the Present, 1926

(N)

Nehru, Jawaharlal — Mahatma Gandhi (Signet Press), 1949

Nevinson, Henry W. — The New Spirit in India, 1908.

(P)

Pal, Bipin Chandra — Beginnings of Freedom Movement in India, 1959
—Bengal Provincial Conference, Barisal (Presidential, Address) ; 1921 Published by Suresh Chandra Deb.
—Bengal Vaishnavism, 1962
—Character Sketches, 1957
—Indian Nationalism : Its Principles and Personalities, 1918
—Memories of My Life and Times (Vols. I and II), 1932 and 1951
—Nationality and Empire, 1916
—Responsible Government, 1917
Saint Bijoy Krishna Goswami, 1964

-Shree Krishna, 1964
-Swadeshi and Swaraj, 1954
Swaraj, the goal and the way Madras, 1931
-The Brahmo Samaj and the Battle for Swaraj, 1945
-The Indian Legislative Assembly, 1924
-The New Economic Menace to India, 1920
-The Soul of India, 1950
-The Study of Hinduism, 3rd Edn. 1968
-The World Situation and Ourselves, 1919
-The New Spirit, 1907
-Writings and Speeches, Vol. I, 1954

Plato -Republic, Book I (Everyman's Library)

Philips, C. H. edited -The Evolution of India and Pakistan, 1858-1947

(R)

Rai, Lajpat —Young India, 1927

Raymont T. —Principles of Education

Reisner, I. M. and Goldberg N. M. edited —Tilak and the Struggle for Indian Freedom, New Delhi, 1966

Ronaldsay, Earl of —The Heart of Aryyavarta, 1925

Roy, Manabendra Nath —India in Transition, 1922

(S)

Saggi, Dr. P. D. —Life and Work of Lal, Bal and Pal, 1962

Sarker, Benoy Kumar —Creative India, 1937
—Villages and Towns as Social Patterns, 1941

Sarker, Jadunath —The History of Bengal, Vol. II, University of Dacca, 1948

Seal, Dr. Brojendranath —Ram Mohan Roy, 1959

Sen, Amit —Notes on the Bengal Renaissance, 1957

Shastri, Rt. Hon'ble V. S. Srinivas —My Master Gokhale, 1946

Shelley, P. B. —Episychidion

Sinha, N. K. —The Economic History of Bengal, Vol. I, 3rd Edn., 1965

—do—edited —The History of Bengal (1757-1905), University of Calcutta, 1967

Sitaramyya, B. Pattabhi —The History of Indian National Congress, Vol. I, 1946

Strachey, Lytton —Eminent Victorians, 1959 (First Edition, 1918)

Symonds, John Addington —A Short History of Renaissance in Italy, 1893

(T)

Taine, H. A. —History of English Literature, Vol. I, 1899

Tripathi, Amalesh —The Extremist Challenge, 1967

(V)

Varma, V. P. —Modern Indian Political Thought, 1961

(W)

Wayper, C. L. -Political Thought, 1965

William, Henry Smith edited —Historian's History of the World, Vol. XXI, 1907

Wimsatt, W. K. (Jr.) and Brooks, Cleanth —Literary Criticism (A Short History), Third Indian Reprint, 1967

Wolpert S. A. —Tilak and Gokhale, University of California Press, 1962

Wordsworth and Coleridge —Lyrical Ballads (Wordsworth's Preface of 1800)

(Y)

Younghusband, Sir Francis —Dawn in India, 1931

মাসিক পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য :

আনন্দবাজার পত্রিকা

আলোচনা (মাসিক)

আশা („)

কল্লোল (মাসিক)

ধর্ম (সাপ্তাহিক)

নবজীবন (মাসিক)

নব্যভারত („)

নারায়ণ („)

প্রদীপ (মাসিক)

প্রবর্তক („)

প্রবাসী („)

প্রবাহিনী (সাপ্তাহিক)

বঙ্গদর্শন-নবপর্যায় (মাসিক)

বঙ্গবাণী (মাসিক)

বঙ্গভাষার লেখক

বিজয়া (মাসিক)

বিশ্বভারতী পত্রিকা (মাসিক)

ভাণ্ডার (মাসিক)

ভারতী (”)

মুকুল (”)

যুগান্তর

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন পাল প্রদত্ত বিবরণী

সখা (মাসিক)

সবুজপত্র (”)

সংহতি (”)

সাহিত্য (”)

সোনার বাংলা (নবপর্যায়—মাসিক)

হিন্দু (সাপ্তাহিক)

A. B. Patrika

Bande Mataram

Encyclopaedia Britannica, Vol. III 1960

Hindu (Weekly-English Supplement),

Hindu Review.

New India

Speeches and writings of Gopal Krishna Gokhale, Vol. II (Political)

The Bengalee

The Calcutta Gazette (Pt. I).

The Englishman.

The English Works of Raja Ram Mohan Roy, Panini Office Allahabad,

The Hindusthan Standard

The Modern Review.

The Report of the Proceedings of the Bengal Provincial Conference

The Statesman

নির্দেশিকা

অ

অকল্যাণ্ড কলভিন (স্যার)—১১৮

অক্ষয় কুমার দত্ত—১৵০, ২৴০, ২।০, ২।৴০ ২৸৴০, ২৸৵০, ৩১১

অক্ষয় কুমার বড়াল—২৯৮, ৩২৮—৩৩১

অক্ষয় চন্দ্র সরকার—৯২, ৯৩, ২৫৮—২৬০, ২৯১, ৩০৩, ৩১০, ৩৬২, ৩৬৩

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়—৬৭

অখিল চন্দ্র দত্ত—১৬৯, ৪১৬

অজিত কুমার চক্রবর্তী—২৭২, ২৯৫, ২৯৮, ৩০২, ৩২৩, ৩২৬, ৩৩৭

অজ্ঞাবাদী (য়্যাগনষ্টিক)—২৪১

অনুশীলন সমিতি—১৫৫

অপূর্বকৃষ্ণ বসু—১৪৮

'অবকাশ রঞ্জিনী' (গ্রন্থ)—৩৩৩

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর—১৩৪

অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্তী—৯৯

অমলেশ ত্রিপাঠী—৩৲ [সূত্র—৮]

অমল হোম—৩৬০

অমৃত বাজার পত্রিকা—৪৪, ৪৫, ১০১—১০৪, ১০৬, ১২৫, ১৩১, ১৩২, ১৭৪, ৪১৮, ৪১৯

অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ)—৩৯, ৮৯, ৯৯, ১০১, ১০২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৯—১৪১, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৫৯, ১৫১—১৫৫, ১৭২, ৩১০, ৪০৫, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৯

অশ্বিনী কুমার দত্ত—১৩৮, ১৪৭, ১৬৮, ৩৪৯, ৩৫০

'অশ্রুকণা' (গ্রন্থ)—৩২৮

বিপিনচন্দ্র—৩৪

'অশ্রুমালা' (গ্রন্থ)—৩২৮

অসহযোগ আন্দোলন—১৬৬—১৬৮, ২৮৩

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ডঃ)—২।৵০ [সূত্র—৬৩]

আ

আইন অমান্য আন্দোলন—১৭৮

'আত্মীয় সভা'—৸০, ৸৵০, ৸৶০

'আদি (ব্রাহ্ম) সমাজ'—১৬

আনন্দ চন্দ্র মিত্র—২৭

আনন্দ বাজার পত্রিকা—৪১৬

আনন্দ মোহন বসু—১৭, ৩০, ৩৪, ৭০, ৯১, ৯৩, ১৩৪

আনাতোল ফ্রান্স—১৬৪

আবদুল গফুর—১৪২

আবদুল রসুল (জনাব)—১৫৫, ১৩৮

আর. এ. এন. সিংহ—১৪৯

আর. সুব্বিয়ার—১৪৬

'আর্য দর্শন' (পত্রিকা)—১৮

আর্ল অব রোনালড্‌সে—৪০৮

'আলালের ঘরের দুলাল' (গ্রন্থ)—২।৶০, ৩৭৩

'আলোচনা' (পত্রিকা)—৫৩, ৯২, ৯৩, ২৫৯

'আশা' (পত্রিকা)—৯৫

আশুতোষ ভট্টাচার্য (ডঃ)—৩৫৭

অ্যানি বেসান্ট (মিসেস)—১৫৯—১৬১

অ্যারিস্টটল—২॥৶০, ১৮৪

অ্যালান অকটেভিয়ান হিউম (মিঃ)—১১৮

ই

'ইউনিট্যারিয়ান সোসাইটি'—৮৶৹
ইংলিশ্ এডুকেশন অ্যাক্ট—৪৩
'ইংলিশম্যান' (পত্রিকা)—১৭৯, ৪২৬
ইকনমিক হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' (গ্রন্থ)—১২৩
'ইনডিপেণ্ডেণ্ট' (পত্রিকা)—১৬৭
'ইন্ মেমোরিয়ম্' (গ্রন্থ)—৩২৮, ৩৩০, ৩৩১
ইন্দ্রনাথ দেবশর্মা—২৭২
'ইণ্ডিয়া' (পত্রিকা)—১০৮
'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' (পত্রিকা)—১০৮, ১৫৩
'ইণ্ডিয়ান স্টুডেণ্ট' (পত্রিকা)—১০৮, ১৫৬
ইবসেন (নাট্যকার)—১৮০
'ইভলিউশন অব রিলিজিয়ন' (গ্রন্থ)—২৪৫
'ইম্পিরিয়াল ফেডারেশন' (তত্ত্ব)—১৯১, ১৯২, ১৯৪, ২৮২, ৪২৪, ৪২৫
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (ন্যাশনাল লাইব্রেরী)—৬০
ইয়ং বেঙ্গল—৷৷৶৹, ১৷৷৵৹, ১৷৷৶৹, ২৷৵৹
ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি—১৸৶৹, ২৷৷৹, ২৷৷৴৹

ঈ

'ঈশ' (উপনিষদ)—৸৵৹
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৸৴৹, ২৴৹, ২৷৴৹, ১৪, ৩৩৭
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—৷৷৶—৸৴, ১৸৹—১৸৵৹, ২৴৹, ২৵৹, ২৷৹—২৷৶৹, ১৭, ১৮১, ২৫৯, ৩৫৭

উ

উইলবার ফোর্স—১৷৶৹
উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ (স্যার)—৭০
উইলিয়াম কেরী—১৷৵৹, ২৵৹
উইলিয়াম জে. লঙ্—৩২৭
উইলিয়াম জোনস—২৪১
উইলিয়াম টি. স্টেড—৩৪৫
উইলিয়াম ডিগবী (মিঃ)—৭০
উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (লর্ড)—৷৷৵৹, ১৷৶৹, ১৷৷৴৹
'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' (গ্রন্থ)—৩২৮
'উদয়াদিত্য উৎসব'—১২৯
উপনিষদ—৸৵৹, ২৩৮
উপেন্দ্রনাথ দাস—১৮
উমাচরণ বসু—১৷৷৶৹
উমাপদ রায়—২৮

এ

এ আই. লেভকভস্কি (ঐতিহাসিক)—১৫৬
'একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'—১৷৷৶৹
এডউইন মণ্টেগু (ভারতসচিব)—১৫৯
এডগার য়্যালান পো—৩৭৯
এডিংটন সিমণ্ডস—৵৹, ৶৹
এডুকেশন কমিটি—১৷৷৴৹
'এডোনাইস' (গ্রন্থ)—৩২৮
এডুলজি দিনশ'—১২৯
এনড্রু ফ্রেজার—১২৬, ১২৭, ৪১৩
এলফিন ই. ফক্স (মিস)—৭৯—৮১
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা—৩৫৭
এণ্টুনি ফিরিঙ্গি—২৴৹
এমার্সন—৬০, ৬২, ৬৫, ৩৩৭, ৩৪৪, ৩৭১
'এমিনেণ্ট ভিক্টোরিয়ানস' (গ্রন্থ)—৩৪৪, ৩৪৫

এমিলি জোলা—২৯৮
এলেন কয়—১৬৪
'এষা' (গ্রন্থ)—৩২৮—৩৩২

ও

ওয়ারেন হেস্টিংস—।/০, ॥৵০, ১৷০, ২৲
ওয়ার্ড—১৷৵০, ১৸০
ওয়ার্ডসওয়ার্থ—৩২৭
ওয়েলেসলি (লর্ড)—২
ওলি বুল (মিসেস)—৭৭, ৭৯
ওহাবী আন্দোলন—২৸৵০, ২৸৶০

ক

'কংগ্রেস অব রিলিজিয়নস, বোস্টন'—৭৮
কংগ্রেস লীগ স্কীম—১৫৯
কটক একাডেমী—৩১, ৩২, ৩৪, ৯০
'কঠ' (উপনিষদ)—৸৵০
'কনসেণ্ট বিল এজিটেশন'—১২১
'কবিতানিচয়' (গ্রন্থ)—৩২৮
'কবিতাবলী' (গ্রন্থ)—১৮, ৩৩৩
'কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন'—১৷৶০, ১৷৷/০
'করঙ্ক' গ্রন্থ—৩৩২
করন্দিকর—১৬১
কর্ণওয়ালিস (লর্ড)—২৲, ২॥/০
'কলকাতা কংগ্রেস'—১৬৮
'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'—২৶০
'কলকাতা স্কুল সোসাইটি'—২৶০
কলিকাতা মাদ্রাসা—১/০
কাউন্সিল অব এডুকেশন—১॥৵০
কাজী নজরুল ইসলাম—৩৩৫, ৩৩৬
কাণ্ট—২৪০
কায়কোবাদ (মুন্সি)—৩২৩
'কারবনারাই'—২৬
কার্জন (লর্ড)—৭১, ৯৮, ১২৪-১২৬, ১২৮, ১৩০, ১৪২, ১৪৪, ১৮২, ১৮৩
কার্ডিন্যাল নিউম্যান—৩২৩
কার্পেণ্টার (ডক্টর)—।৵০
কার্লাইল—৩৩৭, ৩৪৪
কার্লাইল সার্কুলার—৪২, ১৩৪, ১৩৫
কালিদাস—৩২৪, ৩২৬
কালী প্রসন্ন রায়—৯৩, ১০১
কালী প্রসন্ন সিংহ—৩৭৩
কালীবর বেদান্তবাগীশ—৬২
কালী শঙ্কর সুকুল—২৭
কাশীনাথ তর্কবাগীশ—॥৵০
কাশীপ্রসাদ ঘোষ—১॥৶০
কিংসফোর্ড—১৪৮
কিশোরী মোহন মিত্র—৸/০
কুক (মিস)—১৸০
কুমার কৃষ্ণ দত্ত—১৩৭, ১৫৮
কুমার দেব চট্টোপাধ্যায়—৩৩৭
'কুরুক্ষেত্র' (গ্রন্থ)—৩৩৪
কুর্বে—২৯৮
কৃত্তিবাস—৩৫৭
'কৃত্তিবাসের রামায়ণ' (গ্রন্থ)—৩
কৃষ্ণকুমার গুপ্ত—১০৬
কৃষ্ণকুমার মিত্র—১২৫, ১৩১, ১৩৮, ১৫০, ৩৫৭
কৃষ্ণদাস পাল—১১৯
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—১॥৶০
কেয়ার্ড (অধ্যাপক)—২৪৫
কেলকার—১৬১
কেলভিন—॥০
কেশবচন্দ্র সেন—১৵০, ১৪—১৭, ২৫—২৭, ৩৪, ৩৬, ৬১, ৬৩—৬৫, ৭৩, ৭৬, ১৮১, ২৫৭, ২৪২, ৩১১, ৩৪৭, ৩৫১
কোম্‌ত—৩১৭, ৩১৮

কোলব্রুক—২৪১
কোলরিজ—২৯৭, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৬
'কৌমুদী' (পত্রিকা)—৫৩, ৯৫, ৯৬
কৌলীন্য প্রথা—॥০, ৸৶০
ক্যানিং লাইব্রেরী—১৮
ক্যাপটেন বেলামিজ চ্যারিটি স্কুল—১।০
ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী (ন্যাশনাল লাইব্রেরী)—৬০
ক্যালকাটা ফ্রি স্কুল—১।০
ক্লাইভ (লর্ড)—৶০, ১৸৶০
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—১২৯
ক্ষেত্র মোহন সিংহ—১০১

খপর্দে—১৬১, ১৬৪, ৪১১
খিলাফত আন্দোলন—১৬৭, ১৭১, ১৮২, ২০৯, ২১০, ২৮৫, ৪১৭, ৪২০
খৃষ্ট—২৪৩

গগনচন্দ্র হোম—২৮, ৯২
গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন (প্রথা) —॥০
'গরমপন্থী'—১৪৫
গিরিজা প্রসন্ন রায়চৌধুরী—৩১০
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—১০২, ১৩৯
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ('বেঙ্গলী'-সম্পাদক) —২৸৶০
গিরিশ চন্দ্র বসু (আচার্য)—৩১
গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী—৩২৮
'গীতা' (গ্রন্থ)—৩১৮
'গীতাঞ্জলি' (গ্রন্থ)—৩৪৩
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যার)—৯৩
গোপাল কৃষ্ণ গোখেল—৪২—৪৫, ৪৭, ১৪৩, ১৭৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৯
গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ডঃ)—১১৩
গোপী মোহন ঘোষ—৩৭১
গোবিন্দ চন্দ্র রায়—১৮
গোরাচাঁদ বসাক—১।৶০
গোলোক নাথ শর্মা—২৶০
'গোস্বামীর সহিত বিচার' (গ্রন্থ) —২৶০
গৌরগোবিন্দ রায়—২৪২—২৪৪, ৩৩৭
গৌর মোহন বিদ্যালঙ্কার—১৸০
গ্যারিবল্ডি—৩৪৯
গ্যেটে—৩৩১, ৩৫৯
গ্রাব (মিঃ)—৬৬
গ্রীণ—১৯৫

'ঘরোয়া' (গ্রন্থ)—১৩৪

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৩৭
চণ্ডীচরণ মুন্সী—২৶০
চণ্ডীদাস—৩০২,৩০৬,৩২৬,৩২৯,৩৪১
চন্দ্রনাথ বসু—২৯১,৩১০
চপলাকান্ত ভট্টাচার্য—১৭২, ৪২৪
'চরিত কথা' (গ্রন্থ)—৩৩৭,৩৩৮
চাণক্য শ্লোক—৩
'চারি প্রশ্নের উত্তর' (গ্রন্থ)—২৶০
'চারিত্র পূজা' (গ্রন্থ)—৩৩৭
'চারুপাঠ' (গ্রন্থ)—২।০
চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু)—৯৬,১৩৭, ১৩৮, ১৪৯, ১৫৮, ১৬২, ১৬৭—১৭০, ১৭৩, ১৭৬, ১৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৯, ৪২১, ৪২৫, ৪২৬
'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'—২॥৶০, ২॥৶০
'চৈতন্য চরিতামৃত' (গ্রন্থ)—২০৯

চৈতন্য মহাপ্রভু—২৩৯, ৩৬৬
চৈতন্য লাইব্রেরী—১২৪

ছ

'ছাত্র সভা' (স্টুডেণ্টস অ্যাসোসিয়েশন)—১৭
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—।৵০, ১৸৶০

জ

জওহরলাল নেহেরু (পণ্ডিত)—৪২২
জন স্টুয়ার্ট মিল—১৯৭
'জনশক্তি' (পত্রিকা)—২৮৪
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—২।৵০
জয়দেব – ৩০৬, ৩২৬
জর্জ টমসন—২৸৵০
জর্জ বার্নার্ড শ'—১৬৪
জর্জ ব্রানডিস – ১৬৪
'জাতিভেদ প্রথা'—।৶০, ॥০
'জাতীয় কংগ্রেস'—১২০
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড—১৬২, ১৬৬, ২৮৫
'জ্ঞানাঙ্কুর' (পত্রিকা)—১৮
জ্ঞানাঞ্জন পাল—২১৫, ২২৩, ২২৬, ২২৭
জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত—১৭৭
জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি—১৬৩, ১৭৪
'জীবন চরিত' (গ্রন্থ)—২।৵০
'জীবন দেবতা' (তত্ত্ব)—২৮৪
'জীবন স্মৃতি' (গ্রন্থ)—৩৫৭
'জীবনের ঝরাপাতা' (গ্রন্থ)—১৩০
জেফারসন—২৬৪
জোনাথান ডানকান—১।৵০
জোসেফ ব্যাপ্টিষ্টা (মিঃ)—১৬০, ১৬৭
জোসেফ ব্যামফাইল্ডে ফুলার—১২৭, ১৩২, ১৩৮, ১৪১, ১৪২
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৮

ট

টহলরাম গঙ্গারাম—১২৮
টম পেইন—২৬৪
টমাস ডি কুইন্সী—২৯০
'টাইমস্' (পত্রিকা)—৭১
'টুয়েলভ পোর্ট্রেটস' (গ্রন্থ)—৩৬০
টেইন (মিঃ)—২৪১
টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র)—২।৶০
টেনিসন—৬০, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩১
ট্রিটস্‌কে—১৯০
'ট্রিবিউন' (পত্রিকা)—৫৩,৫৯,৯৩,৯৪
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—১৬৫
ট্রেভার্স (রেভারেণ্ড)—৬৭

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭

ড

'ডন সোসাইটি'—১৩৫
ডব্লিউ. এইচ. হাডসন—৩৬৯
ডব্লিউ. এস. কেইন—৬৬, ৬৮, ৭০
ডব্লিউ. টি স্টীড—১৯১
'ডাইরেক্টরেট অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন—১॥৵০
'ডায়ালেকটিকস্ অব্ রিজন' (গ্রন্থ)—২৪৫
ডালহৌসি (লর্ড)—২৭৭
ডেভিড ড্রুমণ্ড—১॥৵০
ডেভিড হেয়ার—১।৵০, ১।৵০, ১॥৶০
ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন্ (বেথুন)—১৸০, ১৸৵০

ঢ

'ঢাকা-প্রকাশ' (পত্রিকা)—১১

ত

'তত্ত্ব কৌমুদী' (পত্রিকা)—৩০

'তত্ত্ববোধিনী' (পত্রিকা)—৸০, ২।০, ২৸/০, ২৸৵০

'তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠী'—॥৶০

'তত্ত্ববোধিনী সভা'—২৸৵০

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—৩৩৩, ৩৭৩

তারাকিশোর চৌধুরী (ব্রজবিদেহী শান্তদাস)—২৭

তারাচাঁদ চক্রবর্তী—২৸/০

তারিণী চরণ মিত্র—২৵০

তারিণী চরণ সেন—৩৫৪

তিতুমীর (তিতুমিয়া)—২৸৶০

'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য' (গ্রন্থ)—২।৶০

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন—২৶০

'তুহফাৎ-উল-মুয়াহহিদীন্' (গ্রন্থ)—।৵০

দ

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—১॥৶০, ১৸/০, ২৸/০

দাদাভাই নৌরজী—৬৯, ৭০, ১২৩, ১৪০, ১৪৫, ২০০, ৪১১

'দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' (পত্রিকা)—১১১

'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' (গ্রন্থ)—১৬৮

'দি এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যানসেস য়্যাক্ট'—১৫৪

'দি ক্রিমিনাল 'ল (য়্যামেণ্ডমেণ্ট) য়্যাক্ট'—১৫৫

'দিগ্‌দর্শন' (পত্রিকা)—২৶০

'দি ডিমক্রাট' (পত্রিকা)—১০৫, ১১১

'দি নিউস্‌পেপারস্‌ য়্যাক্ট'—১৫৪

'দি বেঙ্গলী' (পত্রিকা)—১০১, ১১৩, ১৩১

'দি সিডিশ্যাস্ মিটিংস্ য়্যাক্ট'—১৫৪

'দি হিস্টরিয়ানস হিষ্ট্রি অব দি ওয়ার্লড' (গ্রন্থ)—৪০৮

দি হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০৫)—॥৵০

দীনবন্ধু মিত্র—২।/০, ১৮, ৩০০, ৩১১, ৩৩৭

দুর্গাকুমার বসু—৭

দুর্গামোহন দাশ—৩০, ৫৪, ৫৫, ৯১, ৯২, ৯৬

দেবব্রত বসু—৯৯

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি)—৸৶০ ১৵০, ১৸/০, ২।০, ২৸৵০, ১৬, ৩১১, ৩৪০, ৩৫১, ৩৫৬, ৩৫৭

দেবীপদ ভট্টাচার্য (ডঃ)—৩৩৬, ৩৩৭, ৩৫৮

'দেশভক্ত সভা'—১৫৩

'দেশের কথা' (গ্রন্থ)—১২৩

দ্বারকানাথ ঠাকুর (প্রিন্স)—॥৶০, ২৸/০, ৩৪০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—৩২৮, ৩৪১

দ্বিতীয় আকবর—॥৵০

ধ

'ধর্মনীতি' (গ্রন্থ)—২।০

ন

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—৩০৩

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—৩৩৭

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার (হরিহরানন্দনাথ কুলাবধূত)—।/০

নন্দকুমারের ফাঁসি—।/০

নবগোপাল মিত্র (ন্যাশনাল মিত্র)—১৮, ৩৪

নবজাগরণ [রেনেসাঁস]—৵০, ৶০, ।৶০, ॥০, ॥৶০, ২।৶০, ১৩, ১৪, ২৩, ২৪২, ২৫১

'নবজীবন' (পত্রিকা)—৯২, ২৪৪, ২৫৮, ৩৬২
'নববাবু বিলাস' (গ্রন্থ)—২/০
নব-বিধান—৩৬, ৬৪
'নববিবি বিলাস' (গ্রন্থ)—২/০
নবীনচন্দ্র সেন—২৪২, ২৪৩, ৩৩৩ ৩৩৪
'নব্যভারত' (পত্রিকা)—২৮৩
'নরম পন্থী'—১৪৫
নরম্যাল এঞ্জেল—১৬৪
নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ (ডঃ)—৷৵০
নরেন্দ্রনাথ সেন (সংবাদিক)—১৩২, ৪১২
নাগপুর কংগ্রেস—১৬৭, ১৬৮
'নারায়ণ' (পত্রিকা)—২৪৫, ২৯৯
নারায়ণ বিদ্যারত্ন—৩৫৭
নারায়ণ স্বামী—৩৭
নারায়ণী (পাল)—২
'নিউ ইণ্ডিয়া' (পত্রিকা)—৩৯, ৯৬—১০০, ১০৭, ১১৪, ১৩৩, ১৩৭
নিউ ম্যানচেস্টার কলেজ—৬৫
নিতাই বৈরাগী (কবিয়াল)—২/
নিরঞ্জন পাল—১৭৪
নিরাকার-তত্ত্ব—২৪৮, ২৪৯, ২৫৩
নিরাকারবাদী—৸৵০
'নির্বাণ' (গ্রন্থ)—৩২৮
নির্মলকুমার বসু (অধ্যাপক)—৪২০,৪২৭
নির্মলচন্দ্র চন্দ্র—১৭৫
নিশীথ সেন—১৬২
নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স)—১০২, ১৩১, ১৩৯—১৪১, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৯, ১৫৭, ২০৩, ৪১৬
'নীলদর্পণ' (গ্রন্থ)—১৮
নৃসিংহ (কবিয়াল)—২/০
নেপাল মজুমদার—১৯৯ [সূত্র-২২৯, ২৩০]
নেপোলিয়ন—৩৪৮
নেভিনসন (মিঃ)—১৪১
নোয়েল য়্যানান—৩৪৫
ন্যাশানাল টেম্পারেন্স অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক—৭২, ৭৭-৭৬
ন্যাশানাল থিয়েটার—১৮
'ন্যাশনাল পেপার' (পত্রিকা)—৩৪
এন. এম. যোশী—১৬৫
এন. সি. সেন—১৬২

পট্টভি সীতারামিয়া—১২২
'পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্য' (গ্রন্থ)—২।৶০, ৩৩৪
পরাশর সংহিতা—৷৶০, ৸০
'পরিদর্শক' (পত্রিকা)—৩৫, ৯০, ৯১
'পলাশীর যুদ্ধ' (কাব্য)—/০, ৩৩৪
পলাশীর যুদ্ধ—৶০, ।/০, ২৲, ২৷০ ২৷/
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—২৯১, ৩১০ ৩১৩, ৩১৬
'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ' (গ্রন্থ)—২৵০
'পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নস (১৮৯৩), শিকাগো'—৭৪
পি মিত্র—৭৮
পূর্ণচন্দ্র বসু—২৯১, ৩১০
পৃথ্বীশ চন্দ্র রায়—১১৩
পৈলগ্রাম—১, ২৯, ৩২, ৫৫
প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)—১৷৶০, ২।৶০, ২৸/০, ৩১১, ৩৭৩
প্যারী মোহন আচার্য—৩১, ৩৩
প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় (রাজা)—১২১, ১২৭
প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স (নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ)—১০২, ১৩১, ১৩৯-১৪১, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৯, ১৫৭, ২০৩, ৪১৬

'প্রচার' (পত্রিকা)—৯২, ২৪৪
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ—৩৭৩
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—৬১, ৭৩, ৮১
'প্রতাপাদিত্য' (গ্রন্থ)—১২৯
প্রতাপাদিত্য উৎসব—১২৯
প্রতিমা দেবী—৩৪২
প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—৯৩, ৯৪
'প্রদীপ' (পত্রিকা)—১০১
'প্রবাসী' (পত্রিকা)—২৯৫, ৩৫৯
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়—৩৪১—৩৪৩, ৪২২
'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (গ্রন্থ)—২।/০
প্রমথ চৌধুরী—৩৭০, ৩৭২
প্রমথনাথ বিশী (অধ্যাপক)—।৵০, ৩৬১
প্রমথ লাল সেন—৬৫, ৬৬
প্রমদাচরণ সেন—৩৫৪, ৩৫৫
প্রসন্ন কুমার ঠাকুর—২।/০ ; ২৸/০, ২৸৵০, ৫৬
'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (গ্রন্থ)—৩৩৫
প্রিন্স অব ওয়েলস—২৮০
'প্রিয় প্রসঙ্গ' (গ্রন্থ)—১২৮
প্রেসিডেন্সি কলেজ—১২, ১৩, ১৮, ২৬
প্লুটার্ক—৩৩৭
প্লেটো—১৮৪

ফ

'ফরওয়ার্ড' (পত্রিকা)—৪২৬
'ফাউস্ট' (গ্রন্থ)—৩৩১
'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (গ্রন্থ)—৩৭৩
'ফেডারেটেড কমনওয়েলথ'—১৭৭
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ—১।/০, ১৸৵০, ২৵০, ২৶০
'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'—১৸০
ফিরিঙ্গি কমল বসু—১।৵০
ফ্রবেলের বিকাশতত্ত্ব—৩৯
ফ্রানসিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড (স্যার)—৪০৮, ৪০৯
ফ্লবেয়ার—২৯৮

ব

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—২।০, ২।/০, ১৩, ১৬, ৯২, ১২৪, ১৩২, ১৮১, ১৯৫, ২০১, ২০৭, ২০৮, ২৩৬, ২৩৭, ২৪২, ২৪৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৯১—২৯৩, ২৯৫, ২৯৬, ৩০৩, ৩১১—৩২০, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৫৫, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৯, ৩৭৩, ৩৭৪
'বঙ্গদর্শন' (পত্রিকা)—১৩, ১৮, ৩১১, ৩১২
'বঙ্গদর্শন' নবপর্যায়, (পত্রিকা)—১৩৬, ২৯৮, ৩০৭, ৩২০, ৩২৮, ৩৪০, ৩৮৫
'বঙ্গবাণী' (পত্রিকা)—৭৪, ২৮৭
বঙ্গবাসী' (পত্রিকা)—১২১
বঙ্গবাসী কলেজ—৩২
বঙ্গবিভাগ (প্রথম)—৪২, ৯৮, ১২৩, ১২৬-১২৮, ১৩২, ১৩৮, ১৪২, ১৯৬, ২৬৯, ২৭০
'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (গ্রন্থ)—৩১৩
বঙ্গীয় জনসভা—১৬২
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন, বরিশাল—১১২, ১৬৮—১৭৩, ২৮৯, ২৯০, ৪১৬—৪১৮, ৪২৩, ৪২৭
বদরুদ্দিন তায়েবজী—১১৮
'বন্দেমাতরম্' (পত্রিকা)—৯৯, ১০১—১০৭, ১৩৯-১৪২, ১৪৬-১৫০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৭২, ১৯৬, ২৮২, ৪০৫, ৪১৪

'বন্দেমাতরম্' (সঙ্গীত)—৩৬১
'বন্ধুবর্গ সমবায় সভা'—৸৴০
বয়কট—১৩২, ১৩৫, ১৩৯, ১৪৩, ১৪৪, ১৯৬, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৮, ৪২৭
বরদলৈ—১৬২
'বর্তমান ভারত' (গ্রন্থ)—২৬৮
বলশেভিক আন্দোলন—২০২, ২০৩
বলেন্দ্র নাথ ঠাকুর—১৩০
বল্লাল সেন—৷৴০
বসওয়েল—৩৩৭
'বস্তুতন্ত্রতা' (তত্ত্ব)—২৯৫—২৯৮
বহু বিবাহ (প্রথা)—৷৶০, ৷৷০, ৸৴০
'বাংলা চরিত সাহিত্য' (গ্রন্থ)—৩৩৬, ৩৩৭, ৩৫৮
'বাঙ্গালার ইতিহাস' (গ্রন্থ)—২৷৴০
বায়রণ—৩২৬
বারীন্দ্র কুমার ঘোষ—৪১৫, ৪২৭
বার্কলে—২৪০
বাল গঙ্গাধর তিলক (লোকমান্য)—১৩৯, ১৪৩, ১৪৫, ১৫৪, ১৫৯—১৬১, ১৬৪, ১৬৬, ২০০, ২৭৪, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৮—৪১৩, ৪২৩
বাল্য বিবাহ, (প্রথা)—৷৶০, ৷৷০, ২৫৮ ২৫৯
'বাসুদেব চরিত' (গ্রন্থ)—২৷৴০
'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (গ্রন্থ)—২৷০
বি. কে লাহিড়ী—১৬২, ১৬৯
বি. চক্রবর্তী—১৬২
বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী (প্রভুপাদ)—৩০, ৬০, ৬২—৬৫, ২৪২, ২৫৩, ৩০১ ৩৫৬
বিজয় চন্দ্র চ্যাটার্জি—১০১, ১০৬, ১৩৭
বিজয় চন্দ্র মজুমদার—১৭৪
বিজয়রাঘবাচারিয়ার—১৬৭
বিদ্যাপতি—৩০৬, ৩২৬, ৩২৯, ৩৪১
'বিদ্যাসাগর চরিত স্বরচিত' (গ্রন্থ)—২৷৴০, ৩৫৭
'বিধবা বিবাহ' (প্রথা)—৷৷৶০-৸৴০, ২৷৵০
'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'—২৷৴০
'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'—৷৷৵০
বিনয় কুমার সরকার (মনীষী)—৪১০, ৪১৬
বিবেকানন্দ (স্বামীজী)—১৶ , ৩৯—৪১, ৭২—৭৪, ৭৭, ৭৮, ১২৪, ১২৮, ১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৮, ১৮১, ২০১, ২০২, ২৩৭, ২৬৮, ৩৩৫, ৩৪৩
বিমান বিহারী মজুমদার (ডঃ)—৷৷০, ৸০, ৸৴০, ২৷৷৶০, ২৸০
বীণা দাস—১৭৮
বীরেশ্বর পাঁড়ে—২৯১, ৩১
বুয়র যুদ্ধ—৬৯, ১২৪
'বৃত্রসংহার' (গ্রন্থ)—৩৩৩
'বেঙ্গল থিয়েটার—১৮
'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' (পত্রিকা) —৫৩, ৫৪, ৯১, ৯৩, ২৫৯
'বেঙ্গল স্পেক্টেটার' (পত্রিকা)—৸০
'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (গ্রন্থ)—২৷৴০
'বেদান্ত গ্রন্থ' (গ্রন্থ)—২৶০
'বেদান্ত সার' (গ্রন্থ)—২৶০
বেন্থাম—২৸০
বেলুড় মঠ—১৩৮
'বোধোদয়' (গ্রন্থ)—২৷৴০
ব্যোমকেশ চক্রবর্তী (অধ্যাপক,—৩১
'ব্রজাঙ্গনা' (গ্রন্থ)—৩৩৩
ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৸৵০

ব্রজেন্দ্র নাথ শীল (আচার্য)—।/০, ।৵০, ৸৶০, ২৪১
ব্রজেন্দ্র নাথ সেন—৩৪, ৩৫
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—১৩৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৯
ব্রাউনিং—৩২৪, ৩২৬, ৪২৯
ব্রাউনেল—৩৭১
ব্রাহ্মধর্ম—২।০
'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' (পত্রিকা) —৩০, ৯১
'ব্রাহ্ম সমাজ'—॥০, ॥৶০, ৸৵০, ৸৶০, ১/০, ১৵০, ১৪—১৭, ২৪—২৭, ২৯, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৬০, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৭৩, ৯১, ৯২, ৯৫, ২৪২, ২৫৪, ৩৪৬, ৩৫১, ৩৫৬
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন— ২৸৵০
ব্রিটিশ য়্যাণ্ড ফরেন ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন—৬৫
ব্রিটিশ য়্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি— ১৸০
ব্লাউণ্ট (কর্ণেল)—৭৯
ব্লাকস্টোন—২৸০
ব্লুনট্স্‌লি—১৯৪

ভ

ভগিনী নিবেদিতা (মিস নোবল্)— ৭৭, ৭৮, ১৩৮
'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (গ্রন্থ)— ২৵০
ভবতোষ দত্ত—৩৪২
ভবতোষ রায়—১১৪
;—৩২৬
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—২/০, ৩৩৬
ভলটেয়ার—৩৩৭
'ভাণ্ডার' (পত্রিকা)—১৩৬
ভারতচন্দ্র—১৸৵০, ২।/০, ৩৫৭
'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (গ্রন্থ) —২।০
'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ'—১৫, ১৬
'ভারত মিহির' (পত্রিকা)—৫৪, ৯০
ভারত সভা—১১৬, ৩৪৯
'ভারতী' (পত্রিকা)—১২৮, ১৩৫
ভিক্টোরিয়া (মহারাণী)—২৬৮, ৩৫৩, ৩৫৪
ভি. পি মাধব রাও—১৬৪
ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—৩৭৩
'ভূদেব-চরিত' (গ্রন্থ)—৩৩৭
ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত (ডক্টর)—৬৩, ৯৯
ভূপেন্দ্র নাথ বসু—৪১১
ভোলা ময়রা (কবিয়াল)—২/০
ভ্যালেণ্টাইন চিরল (মিঃ)—১৬১, ৪০৮

ম

'মডার্ণ রিভিউ' (পত্রিকা)—১৯১
মতিলাল ঘোষ—১০১, ১৫১, ১৫২
মতিলাল নেহেরু (পণ্ডিত)—১১১, ১১২, ১৬১, ১৬৭, ১৭৬
মতিলাল রায়—৪০৭
মদনমোহন তর্কালঙ্কার—৸০, ১৸০, ১৸/০
মদন মোহন মালব্য (পণ্ডিত)—১৬০, ১৬১, ১৬৭, ২০০
মন্মথ নাথ সান্যাল—৪২৩
মনিয়ের উইলিয়ামস—৸৶০
মনোমোহন বসু—১৮
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা—১৩৮
মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট—১৬১
মণ্টেস্কু—২৸০

মর্লি (মিঃ)—১০৩, ৪১১—৪১৩
মহম্মদ আলি জিন্না (কায়েদে আজম) —১৬০, ১৬৭
'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী' (গ্রন্থ)—৩৩৭
'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত' (গ্রন্থ)—৩৩৭
মাইকেল মধুস্থদন দত্ত—২।৴০, ২।৶০, ১৪, ১৮১, ২৯১, ৩০০, ৩১১, ৩৩৩
'মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জীবন চরিত' (গ্রন্থ)—৩৩৭
মানকুমারী বস্থ – ৩২৮
মানবেন্দ্র নাথ রায়—২০৬
মাণ্ডুক্য (উপনিষদ)—৸৶০
মার্টিন লুথার—॥০, ১৴০
মার্শম্যান (ডাঃ)—১৷৶০
মিণ্টো (লর্ড)—১৪২, ২৮২, ২৮৩, ৪১১—৪১৩
মীরকাসিম (নবাব)—২॥০
মীরজাফর (নবাব)—১৸৶০, ২॥০
মীর নাসির আলি (তিতুমীর)—২৸৶
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (কবিকঙ্কন)—৩৫৭
মুকুল দে—৩৬০
মুণ্ডক (উপনিষদ)—৸৴০
মুরারিপুকুর বোমার মামলা—১০২, ১৫৩, ১৫৪
মুরে (রেভারেণ্ড)—১৮৯
মুর্শিদাবাদ—॥৴০
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—২৴০
মেকলে—১।৴০, ১॥০, ১॥৴০
মেকিয়াভেলী—১৮৫
'মেঘনাদবধ কাব্য' (গ্রন্থ)—৩৩৩
মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন—১৭
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী)—১১১, ১১২, ১৬৬—১৬৯, ১৭১, ১৭৮, ১৮২, ২৮৩ ২৮৬, ৪১৭, ৪২০—৪২৩, ৪২৫—৫২৭
মোহনলাল—৴০
মোহিত চন্দ্র সেন—৩২৬
মোহিতলাল মজুমদার—২।৴০, ৩৭০
মৌলানা আক্রাম খাঁ—১৬২
ম্যাক্সমূলর—২৪১, ২৪৪, ২৪৬
ম্যাটসিনি (ম্যাজ্জিনি)—২৬, ১৮৭, ১৮৯
'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' (পত্রিকা)—৭১, ১২৭
ম্যানচেস্টার নিউ কলেজ – ৭১
ম্যাসপ্রেট (মিঃ)—১০
এম. আর. জয়াকর—১৬১, ১৬৩

য

যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—১২৭
যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত (দেশপ্রিয়)—১৭৬
যতীশ রঞ্জন দাস—৯১
যদুনাথ সরকার (স্যার)—৴০,৶০,২॥
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় – ৪০৭, ৪১৫
'যুগান্তর' (পত্রিকা)—৯৯, ১৪৮, ১৫৪, ১৫৫
যোগীন্দ্রনাথ বস্থ—৩৩৭
যোগেন্দ্র চন্দ্র বস্থ—৯৩
যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩১০
যোগেশ চন্দ্র বাগল—১২৯

য়

য়্যাডাম সাহেব (পাদরি)—৸৶০
'য়্যান এনিমি অব দি পিপল' (গ্রন্থ)—১৮০

র

রঘুনন্দন (স্মার্ত)—॥৴০

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—২।/০, ২।৶০ ২৯১, ৩০০, ৩১১, ৩৩৩, ৩৩৪
রঙ্গস্বামী—১৬৪
রজত নাথ রায়—১০৬, ১৩৭, ১৪৯
রথীন্দ্র নাথ ঠাকুর—৩৪২
রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর—৶০, ।৶০, ১৲, ১।/০, ২৵০, ২।/০, ৩৯,৪০, ৪২, ১০০, ১২৩, ১২৪, ১৩০, ১৩৩ - ১৩৭, ১৪৪, ১৫৫, ১৬৬, ১৭১, ১৮২, ১৯৯, ২৩৫, ২৫১, ২৭২—২৭৪,২৮০, ২৮২, ২৯১, ২৯২, ২৯৪, ২৯৭, ৩০৩, ৩১০, ৩২০ —৩২৮, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৫৭, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৯, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৮০, ৩৮২ - ৩৮৪ ৪২০
রমা প্রসাদ রায়—৸/০
রমেশ চন্দ্র দত্ত—২৷৷/০, ২৷৵০, ৭০, ১২৩, ৩৭৩
রমেশ চন্দ্র মজুমদার (ডঃ)—২৸৶০, ১৫৩, ৪২৩
রসিক কৃষ্ণ মল্লিক—১৷৶০, ২৸/০
রাখি-বন্ধন—১৩০, ১৩৪
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—৩০৩
রাজ চন্দ্র চৌধুরী—৩৪, ৩৫
রাজনারায়ণ বসু—১৷৶০, ১৮, ৩৪, ৩১১, ৩৫৭
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—২৵০
রাজেন্দ্র লাল মিত্র—২৯১, ৩৪৮
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—২৯৮
রাধাকান্ত দেব—১৸০, ১৸/০, ২।/০ ২৸৵০
রাধানগর—।/০
রাধানাথ রায়—৩১
রাধানাথ শিকদার—১৷৶০
রাধাবিনোদ পাল (ডঃ)—৪২৫
রানাডে—৪০৯
রামকুমার বিদ্যারত্ন—৩৩
রামকৃষ্ণ পরমহংস—১৵০, ১৷৶, ৩৬, ৬২—৬৪, ১৮১, ২৫৩
রাম গোপাল ঘোষ—৸০, ১৷৶০, ১৸/০, ২৸/০
রাম চন্দ্র পাল—২
রামতনু লাহিড়ী—১৷৶০
'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (গ্রন্থ)—৩৩৭
রাম বসু - ৶০
রাম মোহন রায় (রাজা)—।০—১৵০, ১।/০, ২/০, ২৶০, ২।০, ২।৵০, ২৷৶০—২৸/০, ১৪, ৬২, ৬৩, ৯৫, ৯৬, ১২৪, ১৮১, ২০৭, ২৩৭, ২৫৩, ৩১১, ৩৪৩, ৩৪৫—৩৪৭
রামরাম বসু (মুন্সি)—২৵০
রামানন্দ (রায়)—২৩৯, ৩৬৬
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—৩৫৯
রামানন্দ নন্দী (কবিয়াল)—২/০
রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী—২৪১, ২৯১, ৩১০, ৩৩৭, ৩৩৮
রাসু (কবিয়াল)—২/০
রাস্কিন—৯৫
রিজলী (মিঃ)—৯৮
রিপন (লর্ড)—২৭৭
'রিপাবলিক' (গ্রন্থ)—১৮৪
'রিপ্রেজেন্টেটিভ মেন' (গ্রন্থ)—৩৪৪
রিফর্ম বিল—২৸০
রিফর্মেশন আন্দোলন—৷০
'রিভিউ অব রিভিউজ' (পত্রিকা)—১৯১, ৩৪৫
রুশো—২৬৪
রুশোর প্রকৃতি শিক্ষা তত্ত্ব—৩৯
রূপ নারায়ণ রায়—১।৵০

রূপরাম—৩৫৭
রেঁনা—২৭২
রেনেসাঁস—৵০, ২।৶০
রেমণ্ট—৩৯
'রৈবতক' (গ্রন্থ)—৩৩৪

ল

লক—২৫৭
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—১২৯, ১৩০
'লাল-বাল-পাল'—১৪৫, ১৮০, ৪০৪, ৪০৭, ৪০৮, ৪১০, ৪১৩, ৪১৪, ৪২৯,
লালা লাজপৎ রায় (পাঞ্জাবকেশরী) —১৩৯, ১৪৫, ১৪৭, ২০০, ২৭৪, ৪০৪, ৪০৫, ৪১০—৪১৩
লাস্কি (হ্যারল্ড জে.)—২৬৪
লি (মিঃ)—৬১
'লিবার্টি' (পত্রিকা)—১১৩, ১৭৪
লিয়াকত হোসেন (মৌলবী)—৩৫৯
লীগ অব নেশনস—৪২৪
লীটন স্ট্রাচি—৩৩৭, ৩৪৪, ৩৪৫
ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স সোসাইটি—২৸৵০

শ

'শকুন্তলা' (গ্রন্থ)—২।৵০
শঙ্করাচার্য—৩২৪
শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্মা—২৮৭
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—৩২৪
শরৎচন্দ্র রায়—২৭
'শরৎ সরোজিনী' (গ্রন্থ)—১৮
শরৎচন্দ্র সেন—১৫৮
শশিভূষণ দাশগুপ্ত (ডঃ)—৩৩৪
শাহ সৈয়দ আহমদ—২৸৶০
শিবনাথ শাস্ত্রী (পণ্ডিত)—।০, ॥৶০, ১৶০, ১।০, ১৸৵০, ১৩, ২৬—২৮, ৩০, ৩৭, ৩৮, ৯৯, ১১৫, ১২০, ২০১, ২০২, ৫৩৭, ৩৫০—৩৫২, ৩৫৭
শিবাজী উৎসব—১২৯, ২৭৪—২৭৬
শিশিরকুমার ঘোষ (মহাত্মা)—৩৪৮
'শিশুবোধ' (গ্রন্থ)—৩
শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়—৯৩, ৯৪
শেলী—৩২৩, ৩২৬, ৩২৮
শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা—১৫৩, ১৫৭, ২৮২
শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী—১০১, ১০৬
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ডঃ)—৩১৩, ৩৭৪
শ্রীকৃষ্ণ—২৪২—২৪৪
শ্রীকৃষ্ণ সিংহ—১॥৶
শ্রীচৈতন্য—৮, ১৭
শ্রীনিবাস শাস্ত্রী—৪০৬
শ্রীরামপুর কলেজ—১।৵০
শ্রীরামপুর মিশন—২৵০, ২৶০
শ্রীহট্ট—১, ৪—১৩, ২৩—২৫, ২৯, ৩২, ৩৪—৩৭, ৫৪, ৯০, ৯১, ১২০, ১২৬,
শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয়—৯০, ৯১
'শ্রীহট্ট প্রকাশ' (পত্রিকা)—৯০
শ্রীহট্ট সম্মিলনী—৩৪

স

'সংবাদ প্রভাকর' (পত্রিকা)—২৶০, ২।৵০
'সংহতি' (পত্রিকা)—১৭৭
'সখা' (পত্রিকা)—৩৫৪, ৩৫৫
সখারাম গণেশ দেউস্কর—৯৯, ১২৩, ২৭৪
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—৩৩৭, ৩৭৩
'সঞ্জীবনী' (পত্রিকা)—১৩১
সতীদাহ (প্রথা)—॥৵০—॥৶০
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১৩৫
সতীশচন্দ্র রায়—৩০৩
সতীশ রঞ্জন দাশ—৯১

সত্যরঞ্জন দাশ—৯৬
সতেন্দ্র প্রসাদ সিংহ (লর্ড)—১৬২
'সন্ধ্যা' (পত্রিকা)—১০৪, ১৩৪, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৫
'সবুজ পত্র' (পত্রিকা)—৩৬৯
'সমদর্শী' (পত্রিকা)—১৬
'সমাচার চন্দ্রিকা' (পত্রিকা)—২৶৹
'সমাচার-দর্পণ' (পত্রিকা)—২৶৹
'সম্বাদ কৌমুদী' (পত্রিকা)—২৶৹
সরলাদেবী চৌধুরাণী—১২৮—১৩০
সর্দার দয়াল সিং মাঝিথিয়া—৯৩, ৯৪
সলিম উল্লা (নবাব)—১২৭
সহমরণ, (প্রথা)—।৶৹—॥৵৹
'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (গ্রন্থ)—॥৵৹
সহমরণ বিষয়ে প্রর্বতক ও নিবর্তকের সম্বাদ (গ্রন্থ)—।৵৹, ২৵৹
সাকার তত্ত্ব—২৪৮, ২৪৯, ২৫৩
সাদারল্যাণ্ড—৯, ১০
সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ—১৬, ৩০, ৫৩
'সামাজিক চুক্তি মতবাদ'—২৬৭
সিটি স্কুল—৩০
সিডিশন কমিটি রিপোর্ট—১৪৬
সিপাহী-বিদ্রোহ—১, ১৪, ১১৭, ১৮৯, ২৬৮
সিরাজউদ্দৌল্লা—৵৹, ১৸৶৹
সিলেট ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউশন (শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয়)—৩৪, ৩৭
সীতানাথ তত্ত্বভূষণ—১৬, ৬২
সুকুমার সেন (ডঃ)—২৴৹, ৩৩৪
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৩৩২
সুন্দরী মোহন দাস (ডক্টর)—১১, ১২, ২৪, ২৫, ২৭, ৩৭, ৫৬
সুবোধচন্দ্র মল্লিক—১৩৭, ১৩৮
সুব্রামনিয়া আয়ার—১৪৬
সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী)—১৬৮
সুরাট কংগ্রেস—১৫৪
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাষ্ট্রগুরু)—৯, ১০, ১৭, ২৬, ৩৪, ৭১, ৯৩, ১০১, ১১৫, ১১৬, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৫০, ১৬০, ৩৪৭—৩৪৯, ৪১২
'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (গ্রন্থ)—১৮
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—১৬২, ৩৪১
সুশীলকুমার গুপ্ত (ডঃ)—॥৴৹
সুশীলকুমার দে (ডঃ)—১।৹, ১৸৶৹, ২৲
সুহৃদ সমিতি—১৫৫
সেক্সপীয়র—৩২৬
সেণ্টপল—২৬৩
সেণ্টেবুভে—৩২০
সেলমা লাগেরলফ—১৬৪
সেসিল বিডন (ছোটলাট)—৸৴৹
সৈয়দ আমেদ (স্যার)—১১৯
সৈয়দ আহাম্মদ (স্যার)—৩৫২, ৩৫৩
সৈয়দ বদরুদ্দিন তায়েবজী—১১৯
'সোনার বাংলা, নবপর্যায়' (পত্রিকা)—১১৩
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—৸৵৹—৸৶ [সূত্র ২৬]
সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ডঃ)—২৭৩ [সূত্র-৬২, ৬৩] ২৮১—৮২ [সূত্র—৭২]
সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়—২০৬ [সূত্র ২৪৪], ৪২০
'স্কুল বুক সোসাইটি'—১॥৴৹
'স্টেটসম্যান' (পত্রিকা)—৪২, ১৭৯
স্ট্যানলি জ্যাকসন (গভর্নর)—১৭৮
স্বদেশ বান্ধব সমিতি—১৫৫
স্বদেশী ভাণ্ডার—১৩০
স্বরাজ আন্দোলন—১৩৭, ১৪০, ১৪৫, ১৪৬, ১৯১

'স্বরাজ' (পত্রিকা)—১০৮, ১৫৬, ১৫৭
"স্বর্ণলতা' (গ্রন্থ)—৩৩৫
'স্মরণ' (গ্রন্থ)—৩০৮
স্মেণ্ট—।৶০

হ

হরচন্দ্র ঘোষ – ১॥৶০
হরপ্রসাদ রায়—২৵০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—২৯১, ৩০৩ ৩১০
হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়—১৬ [সূত্র—২২], ৬৪ [১০], ১০ [২২], ১০১ [২৩, ২৫] ১০২ [২৬], ১০৩ [৩১], ১০৭ [৩৭], ১৩২ [৭৫, ৭৬], ১৩৫ [৮০], ১৩৭ [৮৪] ১৪২ [১০০], ১৪২—৪৩ [১০১], ১৪৫—৪৬ [১১১], ১৪৬ [১১৩], ৪২৮
হরিদাস হালদার—১০১
হরিনাথ দে—৬৬
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—২৸৶
হরিহরানন্দনাথ কুলাবধূত (নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার)—।৴০, ৸৵০
হরুঠাকুর (কবিয়াল)—২৴০
হানা ক্যাথেরীণ ম্যালেন্স —৩৭৩
হাফেজ—৩২৬
হাডসন (ডব্লউ. এইচ)—৩৭৯
হার্ডিঞ্জ (লর্ড)—২৮২, ২৮৩
হার্বার্ট স্পেনসার —১৯৪, ২৪০, ২৪৫, ২৪৬
হিউম—৭০, ১৪৯, ২৪০, ১৪৬
'হিতবাদী' (পত্রিকা)—১০১
'হিন্দু' (পত্রিকা)—১১৪, ১৭৮
হিন্দু কলেজ—১।৴০, ১॥৵০, ১॥৶০, ২৶০
'হিন্দু পেট্রিয়ট' (পত্রিকা)—২৸৶০, ১১৯
'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা' (নিবন্ধ)—২৫৮
'হিন্দুমেলা'—১৬, ১৮, ৩৪
'হিন্দু রিভিউ' (পত্রিকা)—১০৮, ১০৯
'হিন্দু হিতৈষিণী' (পত্রিকা)—১১
'হিরোজ অ্যাণ্ড হিরো ওয়ারশিপ' (গ্রন্থ)—৩৪৪
হীরেন্দ্র নাথ দত্ত—১৫১
হুইটম্যান—৩৩৬
হেগেল—১৮৯, ১৯০, ১৯৫, ২৪০
হেনরী কটন (স্যার)—১২৭
হেনরী বারবুসি—১৬৪
হেনরী লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও—৸০, ১॥৵০, ১॥৶০, ২৸৴০
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮, ৩৩৩. ৩৪০
হেমচন্দ্র বাগচী—১৪৮
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (ডঃ)—১৫৯, ১৬৯
হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ—১০১, ১০৫, ১০৬, ১৫০
হেরকোর্ট বাটলার (স্যার)—৪৫
হোমরুল লীগ—১৫৮—১৬০, ১৬৩
হোমী মোদী—১৪৫
হোরেস হেম্যান উইলসন—২৪১
হ্যারিস (মিঃ)—৮০, ৮১
হ্যালিডে—১৸৴০